ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাএ ৯৮৭
পাণ্ডুলিপি : অনুবাদ বিভাগ,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রকাশক
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রাকর
এস. খান
শাহজাহান প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৯৭/২, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা—২

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

সূচীপত্র

ই তি হা স

আধুনিকতার সংজ্ঞা। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ১
রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাঙলা কবিতা। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭
প্রধানত তিরিশের কবি ও রবীন্দ্রনাথ। রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী ৬১
সন্ধিক্ষণের কবিতা। অলোক রায় ৭৭
তিরিশের কবিতা। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ৯০
চল্লিশের কবিতা। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ১২৩
পঞ্চাশ। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৫
ষাট-দশকের কবিতা। মণীন্দ্র গুপ্ত ১৬৩
ভাষার মুদ্রা—আধুনিক কাব্য। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০
বাঙলা ছন্দ : রবীন্দ্রনাথ এবং তারপর। দীপংকর দাশগুপ্ত ২০৬

অ নু ষ ঙ্গ

প্রথম-বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাব্যপাঠক। সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় ২২৫
শব্দ, পুরাণ, মুখচ্ছদ। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ২৩৭
সাহিত্য পরিভাষা। রঞ্জিত সিংহ ২৫২
আধুনিক বাঙলা কবিতা : অনুবাদচর্চা। অরুণকুমার ঘোষ ২৫৮
কাব্যনাট্য ও তার ভাষা। অশ্রুকুমার সিকদার ২৭৮
কবিতার সাময়িকী ও আধুনিকতা। সুবীর রায়চৌধুরী ২৯৬
সংকলন অনুবাদ পর্যালোচনা··· : নির্বাচিত পঞ্জী। নচিকেতা ভরদ্বাজ ৩০২

লেখক পরিচয়

অরুণকুমার ঘোষ। 'আধুনিক বাংলা কবিতা পাঠ'এর প্রণেতা। বাঙলা ভাষাসাহিত্যের অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। পশ্চিম জার্মানির হার্শবার্গএ সম্প্রতিপ্রবাসী। সন্ত প্রকাশিত কাব্য 'দেবীকে স্নানের ঘরে নগ্ন দেখে'।

অলোক রায়। বাঙলা ভাষাসাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা।

অশ্রুকুমার সিকদার। বাঙলা ভাষাসাহিত্যের অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। 'সাহিত্যচিন্তা'-পত্রিকার সম্পাদক। পশ্চিমবঙ্গ গেজেটিয়ারের সরকারি দপ্তর থেকে সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত।

দীপংকর দাশগুপ্ত। ভারত সরকারের নৃতত্ত্ব বিভাগের সংযুক্ত ভাষাতত্ত্ববিৎ।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি কবি জীবনানন্দ দাশ-বিষয়ে গ্রন্থরচনারত।

নচিকেতা ভরদ্বাজ। সন্ত অবসরপ্রাপ্ত সহযোগী গ্রন্থাগারিক, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, কলকাতা।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত। 'অলিন্দ'-কাব্যপত্রের সম্পাদক। তুলনামূলক সাহিত্য-বিষয়ের অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

মণীন্দ্র গুপ্ত। 'পরমা'-কাব্যপত্রের সম্পাদক। রাজ্য সরকারি দপ্তরের ইঞ্জিনীয়ার।

রঞ্জিত সিংহ। অধুনা-অপ্রচলিত 'এক বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা'র অন্যতম সম্পাদক। কোনো প্রসিদ্ধ বিপণন-সংস্থার উচ্চ পদে সংযুক্ত।

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী। ইংরেজি সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক, চন্দননগর সরকারি কলেজ, হুগলি।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্বশেষ গ্রন্থ 'আলো আঁধারের সেতু : রবীন্দ্র-চিত্রকল্প'। বাঙলা ভাষাসাহিত্যের অধ্যাপক, নৈহাটি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ, নৈহাটি।

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা।

সুধীর রায়চৌধুরী। সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদের সাহিত্যসাধকচরিতমালার জন্য 'বুদ্ধদেব বসু'র জীবনী রচনা সম্পন্ন করেছেন। তুলনামূলক সাহিত্য-বিষয়ের অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস

১

আধুনিকতার সংজ্ঞা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

প্রাচীন ও আধুনিক কবিতার প্রস্থানভূমির পার্থক্য যদি এক কথায় বলতে হয়, এটুকু বললেই পর্যাপ্ত হবে, প্রাচীন কাব্যের মূলসূত্র রচয়িতার আত্মবিলুপ্তি এবং পরবর্তী কবিতার উপপাদ্য অভিমানী অহং। এই প্রভেদ সত্ত্বেও বাঙলা কবিতায় আধুনিকতার চরিত্র ও মাত্রা সংক্রান্ত আলোচনায় মধুসূদন-পূর্ব অধ্যায়ের প্রবেশাধিকার অস্বাভাবিক নয়।

বাঙলা কবিতা যখন গীতিপরবশ ছিল, কবি নিজের নাম অর্থাৎ আত্মপ্রসঙ্গ নিয়ে অস্বস্তি অনুভব করতেন সবচেয়ে বেশি। য়ুরোপেও প্রায় গোটা মহাকাব্যের যুগ ও মধ্যযুগীয় দৃশ্যমঞ্চে ঐ সচেতন আত্মনিগ্রহের প্রবণতাকে Curtius 'veiled expression of the author's name' বলে উল্লেখ করেছেন। বাঙলা কবিতায় এই অনাত্মমণ্ডল এত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল যে আমাদের জনৈক প্রাগাধুনিক আলংকারিক তথা ঐতিহাসিক এরকম অনুশাসন দিয়ে গেছেন :

আভোগেতে কবিনায়কের নাম হয়।

—নরহরি চক্রবর্তী, ভক্তিরত্নাকর।

অর্থাৎ গানের স্থায়ী, অন্তরা, কি সঞ্চারীতে নয়, সর্বান্ত্য ঐ আভোগ-অংশে কবির নাম সন্নিবেশিত হবে।

সন্দেহ নেই, 'আধুনিক' শব্দটি উচ্চারণ করেছিলেন রঙ্গলাল; বিহারীলাল স্বগত কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন 'অন্তরেতে দৃষ্টি রাখো।'— তবু একদিন 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র সূচনায় মধুসূদন যখন 'সেই আমি' শব্দবন্ধটি মন্দ্রস্বরে জ্ঞাপন করলেন তখন থেকেই আমরা জেনেছি, কবিতার নামের মতোই জরুরি কবির নাম এবং সেই নাম কবিতার শেষে নয়, কবিতার প্রারম্ভে বিরাজ করবে।

বৈষ্ণব পদাবলীর স্বাভাবিকতা কালক্রমে ক্ষুণ্ন হয়ে এসেছিল। উত্তরকালীন শাক্ত পদাবলীতে অবশ্যই নিঃশর্ত স্বতঃস্ফূর্তি ছিল, কিন্তু সেই স্বাভাবিকতা শিল্পিত নয়। অতঃপর রামনিধি গুপ্তের কবোষ্ণ আবেগ নতুন উৎসমুখ উন্মোচিত করতে চাইলেও কবিওয়ালাদের সমবায়ী মন্ময়তায় তা উপেক্ষিত হয়েছে। এবং সমবেত মন্ময়তা কৃত্রিমতার নামান্তর। উনিশ-শতকী কবিসমাজেও এই রোমন্থরত ক্লান্তিকর কৃত্রিমতার জের রয়ে গিয়েছিল এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় নব্য-রোম্যান্টিক মনোভঙ্গি তথা যথার্থ

আধুনিকতার পূর্বাভাস দেখা দিয়েছিল :

> **What is curious to note is that, in Bengal (as was the case in France in the last century), the illumination had led to a mechanical subjectivity, and that has been the environment out of which the neo-romantic movement has taken its rise. For the genesis of that movement it is essential that there should be a transition from a mechanical to an egoistical subjectivity, and this transition has actually taken place in the imaginative and intellectual culture of Bengal.**
>
> **—Brajendranath Seal, New Essays in Criticism,** পৃ ৩১।

কালক্রমে রবীন্দ্রনাথে এই নব্য-রোম্যান্টিকতা আয়ত আত্মস্থতা অর্জন করল। মধুসূদন দত্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রধান সাদৃশ্য এইখানে যে তাঁরা দুজনেই স্বগতকে তদ্গত করে তুলেছেন। এবং কারুকার্যের অন্তরালে আপন-আপন আর্তিকেও তাঁরা লুকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। মধুসূদনের 'এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,/জ্যোতির্ময় কর বঙ্গে—ভারতরতনে' এবং রবীন্দ্রনাথের 'দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি লজ্জা দিয়ো না'— দুটি উক্তিই চিরায়ত আত্মসংবরণের দৃষ্টান্ত। উভয় ক্ষেত্রেই রোম্যান্টিক উচ্ছ্বাস ক্লাসিক বীজমন্ত্রে সংবৃত। ক্লাসিক কবিতা, সুতরাং, বিষয়বস্তু নির্বাচনের উপর নির্ভর করে না, তা একান্তভাবেই কারুকৃতিসম্ভব। ল্যাণ্ডরের ভাষায়, **'the name is graven on the workmanship.'**

রবীন্দ্রনাথের কখনো ধারণা হয়েছিল তিনি মধুসূদনের বিরুদ্ধে সঙ্গত অনাস্থা এনেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, মধুসূদনের কবিতা থেকে স্বতন্ত্র হওয়ার প্রয়োজনেই বয়ঃসন্ধিক্ষণে তাঁর সেই মধুসূদন-হননের প্রয়োজন ঘটেছিল। অথচ মুক্তক রীতির স্বীকরণে তিনি মধুসূদনের কাছেই ফিরে এসেছিলেন, যেমন কল্লোলীয় কবিরা স্বেচ্ছায় একদিন রবীন্দ্রনাথে প্রত্যাবৃত্ত হয়েছেন। স্বয়ংস্বতন্ত্র কবিসত্তা নির্মাণের আস্পৃহায় রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের মতোই বিভিন্ন প্রভাব স্বীকরণ করে নিয়েছিলেন এবং নিজের চতুষ্পার্শ্বে একটি ধ্রুপদী পৃথিবী গড়ে তুলেছিলেন। অথচ, রবীন্দ্রনাথ একদিন যেমন মধুসূদনের গড়া ধ্রুব দেবায়তনের বিরুদ্ধে দ্রোহাত্মক ধিক্কার উত্থাপন করেছিলেন, আধুনিক কবিরাও রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করতে গিয়ে অনুরূপ বিদ্রোহবুদ্ধির উদাহরণ রেখেছিলেন।

সমস্যাটা কতকাংশে একই। স্বতন্ত্র হয়ে উঠবার সমস্যা। জাতকের একটি গল্প প্রসঙ্গত জরুরি। সোনালি একটি পাহাড়ে অনেক পাখি থাকত। কিন্তু পাহাড়ের

সোনালিতে সব পাখিকেই একরকম দেখাত। তাই একদিন সেই পাহাড় থেকে পাখিরা সব ছিটকে পড়ল যে যার আপন লক্ষ্যে। বাঙলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সেই কনকাচল, আধুনিক কবিরা যাকে একদিন সজোরে পরিত্যাগ করে এসেছিলেন।

সত্বর সিদ্ধান্ত প্রণয়নের উৎসাহে একটা কথা ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ দশকে এক অর্থে নিজেই নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। অর্থাৎ আধুনিকতার আন্দোলনে তিনিই প্রথম সেই পাখি, যাকে নিশ্চিন্ত ও প্রতিষ্ঠিত শেষাদ্রি পরিহার করতে হয়েছিল। ম্যাথু আর্নল্ড-কথিত যে sanity বা সুমিতি চিরায়ত কবিতার বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথ সেই সনাতন ভারসাম্যকে শেষ পর্যায়ে অতিক্রম করতে প্রলুব্ধ না হলে কখনোই এরকম বাক্য নির্মাণ করতে পারতেন না যে 'নীরজার আজকালকার মনখানা বাদুড়ের চঞ্চুক্ষত ফলের মতো'—অথবা 'কাঁটা-আগাছার মতো/অমঙ্গল নাম নিয়ে আতঙ্কের জঙ্গল উঠেছে/চারি দিকে সারি সারি জীর্ণ ভিতে ভেঙে পড়া অতীতের বিরূপ বিকৃতি/কাপুরুষে করিছে বিদ্রূপ।'

কিন্তু, লক্ষ্য করতে হবে, ভগ্নভিত্তির এই বিদ্রূপ কাপুরুষকে হৃতোদ্যম করলেও পুরুষকার তার দ্বারা নির্জিত নয়। এবং প্রযতাত্মা রবীন্দ্রনাথের মাঙ্গলিক পৌরুষ উদ্যত দুঃসময়ের ভয়াবহ প্রাচীরটি শেষ পর্যন্ত উল্লঙ্ঘন করে গিয়েছিল। মাঙ্গল্যপ্রবণ পাঠক-সমাজ রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' পর্যন্ত তার শুভেচ্ছা বিছিয়ে দিয়েছে, কিন্তু অতঃপর আর অগ্রসর হতে সাহস পায় নি। হয়তো তাঁর অন্তিম দশকের কবিতা আদ্যোপান্ত পড়লে তার সিদ্ধ-রসের সংস্কার চুরমার হয়ে যেত না। সে ঝুঁকি তৎকালীন পাঠকসমাজ নেয় নি। অতএব এটাই তথ্যের খাতিরে স্বীকার্য, রবীন্দ্রনাথ আর তাঁর পাঠকের মধ্যে সিদ্ধ-রসের যে অমুক্ত ও প্রশান্ত সামঞ্জস্য ছিল সেটি শেষ পর্বে ঈষৎ কেঁপে গিয়েছিল। ঐ পর্বেই প্রথম পর্যায়ের আধুনিক কবিরা সেই আসন্ন বিপর্যাসের সুযোগ নিয়েছিলেন। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বিবৃতিতে সেই কথাটি স্পষ্ট :

> সম ও বিষম (positive and negative) তড়িৎ যদি পরিবাহচক্রে (cycle) অব্যাহত ভাবে প্রবাহিত হইতে পারে তবেই তাড়িৎশক্তি প্রকাশ পায়, চক্রের মধ্যে অবচ্ছেদ (break) থাকিলে তাহা ব্যর্থ হয়। সেইরূপ কবিচিত্তধারা ও পাঠকচিত্তধারার অয়নচক্র যেখানে অব্যাহত থাকে, সেইখানেই আনন্দ উৎপাদিত হয়।
>
> —কাব্যপরিমিতি, পৃ ৩৬।

তা হলে মরমী কবিতার রসও কি নিখিল পাঠকচিত্ত পরিগ্রহণ করতে পারে? এর উত্তরে যতীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> **Mystic** কবিতার চক্র সম্পূর্ণ করিতে **mystic** পাঠকচিত্তের প্রয়োজন; অর্থাৎ

> যে পাঠক চিত্তে সেই ঢেউয়ের ভাবস্মৃতি একেবারে ঘুমাইয়া পড়ে নাই এবং অনুরূপ ঢেউয়ের দোলা যে চিত্তকে আজিও মধ্যে মধ্যে নাড়া দেয়, সেই পাঠকচিত্ত সহকর্মী **mystic** কাব্যের রস গ্রহণ করিতে সফল হয়।
>
> —ঐ, পৃ ১০২।

বিশ্লিষ্ট পংক্তিটিতে একটি ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন। মিস্টিক কবিতার পাঠকসংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। রবীন্দ্রনাথের মরমী-পর্যায়ের কবিতার অন্তর্লীন ঐশ্বর্য সম্পর্কে সন্দিহান না হয়েও নব্য-যাত্রাভূমির যুগোপযোগিতা বিষয়ে যতীন্দ্রনাথ এই মর্মে নিশ্চিত ছিলেন যে বিশ্বাবর্তে রবীন্দ্রমুহূর্তটি সেই মুহূর্তে ঠিক ততোটা আর কার্যকরী নয়। অর্থাৎ যে-কারণে গ্যোয়েটের চেয়েও বায়রন একদা গ্যোয়েটেরই করুণায় দিগ্বিজয়ী সাব্যস্ত হয়েছিলেন, সেই **zeitgeist** বা যুগচৈতন্যের ভূমিকা এখন সর্বাগ্রগণ্য বলে স্বীকৃত হল। একমাত্র অগ্রজ প্রমথ চৌধুরীই সুনির্বাচিত শ্রোতৃমণ্ডলীর উপর জোর দিয়ে আধুনিকতার প্রথম যৌক্তিক ভিত্তিপাথরটি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন এবং ঐ নির্বাচনে সুচির রুচিরা বহুলাংশত সহায়তা করেছিল। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর রচনার প্রাকরণিক যুক্তিবাদের বহির্ব্যূহে তিনি নিজে এবং তাঁর পাঠকেরা প্রতিহত হলেন। ফলত তাঁকে আমরা জানলাম নিছক বক্রোক্তিজীবিত বাগীশ্বর বলে। কবি-ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ সমসাময়িকতার আকর্ষণী শক্তিতে উৎকেন্দ্রিক হতে থাকলেন, এবং যতীন্দ্রনাথ কিংবা মোহিতলাল মনে করে বসলেন সত্যমাত্রেই অপ্রিয়। কল্লোল-পর্বের নিষ্ঠাবান অথচ বহির্মুখী যুগ-ভাষ্যকার প্রাসঙ্গিক বিবরণী দিতে গিয়ে আধুনিকতার সেই পরিত্যক্ত সংজ্ঞাটির উপর হাত রেখেছেন :

> মোহিতলালকে আমরা আধুনিকতার পুরোধা মনে করতাম। এক কথায়, তিনিই ছিলেন আধুনিকোত্তম। মনে হয়, যজন-যাজনের পাঠ আমরা তাঁর কাছ থেকেই প্রথম নিয়েছিলাম। আধুনিকতা যে অর্থে বলিষ্ঠতা, সত্যভাষিতা বা সংস্কাররাহিত্য তা আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম তাঁর কবিতায়।
>
> —কল্লোল-যুগ, পৃ ১৩৩-৩৪।

অর্থাৎ সেই মুহূর্তে অচিন্ত্যকুমারের কাছে সৌকুমার্য, সৌজন্য ও শ্রেয়োসংবিতের অনটনই যথার্থ আধুনিকতা। যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর মূল্যাঙ্কনেও সেই ঊনাত্মক মনোভঙ্গিই আধুনিক :

> ভাবের আধুনিকতার দিক থেকে যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ বাঙলা সাহিত্যে এক অভিনব অভিজ্ঞতা।
>
> ঐ, পৃ ১৩৭।

ভাবের আধুনিকতা যে প্রধানত আমদানি-করা-পণ্য নির্ভর, তার প্রমাণ প্যারডি-

প্রবণতা ও মানবিকতার যতীন্দ্রীয় ধাতুসংকর :

বহুদিন পরে এলে মোর ঘরে
বন্ধু, পরম ক্ষণে,
কাল রজনীতে হয়ে গেছে ঝড
রজনীগন্ধা বনে।

—'সদ্য বিধবা'।

যতীন্দ্রনাথের কাকবন্ধ্যা কবিতা অবশেষে গৃহীত পরাভবে যখন সুন্দরের কাছে ফিরে এল তখন দেরি হয়ে গেছে। সেই সমর্পণের বিধুরিমা মোহিতলালে নেই, কিন্তু তাঁর দেহঘোষণা ও ক্ষণজীবনবোধ আজ বড়ো বেশি অবান্তর হয়ে গেছে, কেন না আজ আমরা ভাবের আধুনিকতায় বীতস্পৃহ। পক্ষান্তরে, রূপের আধুনিকতাই এই মুহূর্তে উপাস্য হয়ে উঠেছে।

ভাব থেকে রূপে আধুনিকতা যখন সঞ্চরমাণ সেই মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লেখেন :

আমার সম্পর্কীয় একটা অপবাদ শুনেছি যে আমার নিজের ছাঁদের কবিতা ব্যূহ বেঁধে আছে বাঙলা সাহিত্যকে ঘিরে। তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহী অসহিষ্ণুতা প্রায় দেখতে পাওয়া যায়। সে বিদ্রোহ জয়ী হোক এ আমি অন্তরের সঙ্গে কামনা করি। তাই আমি আনন্দ পেয়েছি অমিয়চন্দ্রের কাব্যে তাঁর স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে।

স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য ভাব ও রূপের সামীপ্যে চিহ্নিত। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলতে গিয়ে অমিয় চক্রবর্তী দেখিয়েছেন, যথার্থ স্বকীয়ত্ব বা আধুনিকতা প্রমূল্যসমূহের সৌষম্যের নামান্তর :

In the poetry of the great modern, Rabindranath Tagore, a fine balance of values can be found ; and that is so because his genius accepts the Age under the scrutiny of full poetic responsibility··· Self-creation, according to Tagore, lies at the root of human existence, and the self-creative urge of man makes him use the materials of life by mastering the law of perfect being.

—**Modern Tendencies in English Literature**, ভূমিকা, পৃ ৯।

অথচ স্বয়ংশুদ্ধ সত্তার দ্বারা জীবন থেকে আহৃত উপাদানপুঞ্জের পরিমার্জনা তৎকালীন কবিদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তা সত্ত্বেও রবার্ট ব্রিজেস একদিন যেমন হপ্‌কিন্সকে অন্তর্মুখী নবত্বের দাবিতে নতুন যুগের পাঠকের কাছে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথও প্রকাশ্য স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন অমিয় চক্রবর্তীকে। রবীন্দ্রনাথ রবার্ট

ব্রিজেসের মতো অতীতপরায়ণ ছিলেন না। পিছুটান মুছে নিজেকে তিনি অমিয় চক্রবর্তী তথা আধুনিক কাব্যপ্রবাহের সঙ্গে সুশ্লিষ্ট করতে পেরেছিলেন বলে 'এলোমেলো ছিন্নচেতন টুকরো কথার ঝাঁক' অথবা 'ছেঁড়া মেঘের আলো পড়ে দেউল চূড়ার ত্রিশূলে'—এই রকম দুঃস্বপ্নজাগর পংক্তি রচনা করতে পেরেছিলেন।

তাই রবীন্দ্রনাথের আদি-মধ্য-অন্ত থেকে বারংবার কণ্ঠস্বরের সাহায্য নেওয়ার দরকার পড়ল। কয়েকটি বিক্ষিপ্ত নজির :

১. গন্ধ তোমার ঘিরে চারি ধার,
উড়িছে আকুল কুন্তলভার,
নিখিল গগন কাঁপিছে তোমাব
পরশবসতরঙ্গে।
হাসিমাখা তব আনত দৃষ্টি
আমারে করিছে নূতন সৃষ্টি,
অঙ্গে অঙ্গে অমৃতবৃষ্টি
বরষি করুণাভবে।

—'অন্তর্যামী,' চিত্রা।

তোমারই কেশের প্রতিচ্ছায়ায়
গোধূলির মেঘ সোনা হযে যায়
পাকা দ্রাক্ষার অরাল লতায়
তোমারই তনুব মদিরা ভরা ;
পথপার্শ্বের অপরাজিতা, সে
তোমারই দৃষ্টি লক্ষ্যহরা।

—'চপলা,' অর্কেস্ট্রা। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

২. ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম।

—'জীবনদেবতা,' চিত্রা।

অন্ত দূরের মধ্যে কে আছ
আছ অন্তরে তবু ;
তোমার নাগাল সহজ নয় তো কভু—
কল্পবিহীন সৃজন ব্যথায় শিল্পীকে শুধু যাচো।

—'শিল্পিত', পারাপার। অমিয় চক্রবর্তী।

৩. মুক্ত হও হে সুন্দরী!

ছিন্ন করো রঙিন কুয়াশা,

অবনত দৃষ্টির আবেশ,

এই অবরুদ্ধ ভাষা,

এই অবগুণ্ঠিত প্রকাশ।

সযত্ন লজ্জার ছায়া

তোমারে বেষ্টন করি জড়ায়েছে অস্পষ্টের মায়া

শতপাকে,

মোহ দিয়ে সৌন্দর্যেরে করেছে আবিল ;

অপ্রকাশে হয়েছে অশুচি।

তাই তোমার নিখিল

রেখেছে সরায়ে কোণে।

—'অপ্রকাশ,' বীথিকা।

তা হলে উজ্জ্বলতর করো দীপ, মায়াবী টেবিলে

সংকীর্ণ আলোর চক্রে মগ্ন হও, যে-আলোর বীজ

জন্ম দেয় সুন্দরীর, যার গান সমুদ্রের নীলে

কাঁপায়, জোছনায় যার ঝিলিমিলি-স্বপ্নের শেমিজ

দিগ্বিজয়ী জাহাজেরে ভাঙে এনে পুরোনো পাথরে।

—'মায়াবী টেবিল', দ্রৌপদীর শাড়ি। বুদ্ধদেব বসু।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই সমস্ত আহরণই সহজ উত্তরাধিকার। এবং চিরন্তনের ঝর্ণাতলা থেকে জল ভরে নিতে গিয়ে প্রত্যেকেই এঁরা নিজস্ব ভৃঙ্গার ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কৃত্রিম বিচ্ছেদ না রেখে তাঁরই স্বরায়তনের মধ্যে সবাই আপন-আপন স্বরায়ণ, intonation, খুঁজে পেয়েছেন, এবং স্বরায়ণের পার্থক্যে তাঁদের নিজ-নিজ কথাবস্তু পৃথক্ হয়ে গিয়েছে। কেন না রবীন্দ্রনাথ সেই অতীন্দ্রিয়, যাকে ইন্দ্রিয়ে পরিণত করা যায়।

স্বরায়ণের প্রভেদেই প্রসঙ্গের প্রভেদ। একই শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা সত্ত্বেও 'তোমার আমার প্রেম প্রাকৃতিক, লিলি' (বিষ্ণু দে) এবং 'কিছু এর প্রাকৃতিক, কিছু এর প্রেম', (অমিয় চক্রবর্তী) আমেরু আলাদা। আবার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'তোমারে প্রণাম করি। তোমাতেই লই ভরে অন্তরের ডালা' এবং বিষ্ণু দে-র 'সাগরে যে গঙ্গা আনি সে তোমারই আনন্দভৈরবী'—এই দুই উচ্চারণের প্রসঙ্গ বহিরঙ্গত এক হওয়া সত্ত্বেও প্রথমোক্ত প্রপন্নার্তির সঙ্গে শেষোক্ত আত্মপ্রতীতির

প্রভেদ দুস্তর। সুতরাং স্বরায়ণ অর্জনের প্রয়োজনে নিকট ও সুদূর, আলো ও উপচ্ছায়া, সংধ্বনি ও প্রতিধ্বনির দিকে এই কবিরা চোখকান মেলে ধরেছেন। তাই বিষম উৎসকেও স্বরচিত পরিমণ্ডলের চাহিদায় রূপান্তরিত করতে তাঁদের অসুবিধা হয় নি। এরকম দুটি দৃষ্টান্ত :

১. Man
And, all work done, dismisses all
Out of intellect and sight
And sinks at last into the night.
Echo
Into the night.

—ইয়েট্‌স।

মার্কিন ডাঙার বুকে ঝোড়ো অবসান গেল মিশে ॥
অবসান গেল মিশে ॥

—অমিয় চক্রবর্তী।

২. Send my roots rain

—হপ্‌কিন্স।

জল দাও আমার শিকড়ে।

—বিষ্ণু দে।

ইয়েট্‌স ও অমিয় চক্রবর্তী, হপ্‌কিন্স ও বিষ্ণু দে—এইরকম যুগ্মোল্লেখ সম্ভব নয়, কেন না, পরক্ষণেই পাঠক দেখবেন হপ্‌কিন্সের 'my taste was me' অমিয় চক্রবর্তীতে 'শরীরী চৈতন্যে বাঁধা আমার সংগ্রহ'য় অনুরণিত, ইয়েট্‌সের 'beauty tightened like a bow' বিষ্ণু দে-র হাতে রূপান্তরিত হয়ে 'আতত শরীর এই বুঝি দেবে টঙ্কার'। সুতরাং কোনো একজন আধুনিক বাঙালি কবিকে অপর একজন বিদেশি কবিতে নিমজ্জিত মনে করার কারণ নেই। উনিশ-শতকী পূর্বসংস্কারে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে হুইটম্যানের সঙ্গে রেখায়িত করা যাবে না, সুধীন্দ্রনাথকে মালার্মে অথবা বিষ্ণু দে-কে এলিয়টের সঙ্গে সমীকৃত করার প্রয়াসও অচিরেই অবান্তর সাব্যস্ত হবে।

কল্লোল ও সদ্য-কল্লোলোত্তর যুগ প্রত্যেক কবিকে স্বীয় স্বরগ্রামে উপনীত হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কেন না, 'if the style is the man it is also the age'. এই যুগ, নানায়তনিক যুদ্ধ যার একাধারে কবচ ও আয়ুধ, বিঁধেছিল এই কবিদেরও, একাধিক নতুন শর্তে। অমিয় চক্রবর্তীর সংবেদনে তারও

অন্তঃসাক্ষ্য আছে :

> Modern poetry is concerned with the exploration of causal links between nature and human will ; a knowledge of unity (given by the revelations of science and by the extension of man's awareness in varied spheres of experience) has brought new responsibility to the artist. The cataclysm of civilization during periods of war and the continuing tragedies of an age have made the poets conscious of their function in a social system with which their thoughts and actions are inevitably allied.

—ঐ, ভূমিকা, পৃ ১৩-১৪।

এই নতুন দায়িত্ববোধের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরো পরে সমর সেন রবীন্দ্রাতিগ দিক্‌দিগন্তের কথা বলেছেন। ভারতীয় ও পশ্চিমী দর্শন, সংগীত ও চিত্রকলার সঙ্গে সামীপ্য সেই মুহূর্তে কী রকম জরুরি হয়ে উঠেছিল সেই প্রসঙ্গে এক নিশ্বাসে তিনি উচ্চারণ করেছেন আবদুল করিম খান, যামিনী রায়, বাখ্‌, বেঠোভেন, মার্ক্স্‌-লেনিন, ফরাসী প্রতীকবাদী গোষ্ঠী, রিল্‌কে এবং কয়েকজন অগ্রণী রুশ শিল্পীর নাম। শুধু রবীন্দ্রনাথ আর শেলিই সেদিন পর্যাপ্ত ছিলেন না, সংস্কৃত সাহিত্যের ভিতরে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করা যাচ্ছিল, সমর সেন স্মৃতিচারণসূত্রে এই সব কথা জানিয়েছেন। মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে সংস্কৃত সাহিত্যের ডুবুরি ছিলেন তার চেয়ে অন্যতর অন্বেষার কথাই এখানে আভাসিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথকে একই সঙ্গে প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন করে নিজস্ব মননমুদ্রা প্রতিষ্ঠা করবার দুরূহ চাহিদায় এই কবিরা চতুর্দিকে যাত্রা করেছেন এবং অবশেষে নিজেদের কাছেই ফিরে এসেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও জেম্‌স্‌ জয়েসের মৃত্যুর আগে তাঁরা কেউই স্বনিকেত হন নি। প্রায় সকলেই এঁরা বিবর্তনের অন্যতর চাবিকাঠি পেয়ে যাবার জন্য উৎসুক ছিলেন। সেই হিসেবে কল্লোল-পর্ব একটি উল্লেখযোগ্য পর্বাঙ্গ মাত্র। নূতন Decembrist কিংবা Sturm and Drang আন্দোলনের স্বয়ম্পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে তার তুলনা অংশতই খাটে।

কিন্তু এ সব সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের সামান্য লক্ষণ এক জায়গায়। সে হল বক্তব্যের অভিমুখিতা। প্রেম/অপ্রেম, ঈশ্বর/নাস্তিকতা-প্রমুখ বর্গব্যূহগুলি পরস্পর-বিভাজিত হয়ে এঁদের কবিতায়—একমাত্র ব্যতিক্রম জীবনানন্দ—কাজ করে এসেছে। যেখানে তাঁরা রবীন্দ্রবিরোধী বলে নিজেদের গণ্য করেছেন, সেখানে তাঁরা কখনো কখনো বিশেষভাবেই রবীন্দ্রগোত্রীয়, তাঁদের অনুভূত প্রতীতি ও বক্তব্যের অনুকূল

বাগ্মিতায়। কারো কারো কবিতায়—যেমন অজিত দত্ত বা প্রেমেন্দ্র মিত্র—এই বাচ্যার্থস্পৃহা চোখে পড়ে, উচ্চারণের সতেজ আভা সত্ত্বেও, কবিতার উপরিতলেও। কারো কারো গীতিধর্মী রচনায়—অনন্য উদাহরণ সঞ্জয় ভট্টাচার্য—শ্রোতৃনিরপেক্ষ আত্মকথনের ঝুঁকি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত জনগোষ্ঠীর হৃদয়ে পৌঁছবার জন্যেই বিবৃতিপ্রবণতা আচম্‌কা প্রকট হয়ে ওঠে। বুদ্ধদেবের সহজাত লরেন্সধর্মী দেহাত্মবাদ যখন বোদ্‌লায়েরের প্রসাদ পেয়েছে, তার পরেও, এমন কি যে-পর্বে তিনি রিল্‌কে-ঋদ্ধ—দাঁড়িয়ে থাকে একভিত্তিক বাচ্যার্থের মূল্যেই, যদিও কবিত্বের অভাব সে ক্ষেত্রে কখনোই ঘটে না। বিষ্ণু দে-র কবিতায় বিবর্তন সবচেয়ে দৃশ্যত প্রকট। কিন্তু তিনিও প্রকৃতি ও ব্যক্তিস্বভাব, লোকায়ত এবং স্বানুভূতের দ্বৈরথ পার হয়ে যান বৈঠকী সামাজিকতার আপেক্ষিক গুরুত্বে। এবং অমিয় চক্রবর্তীর কাছেও শেষ পর্যন্ত বিবর্তনের অর্থ কাল-পর্যায়ের মধ্য দিয়ে শুভময়তায় উত্তরণ।

একাধারে স্টোয়িক ও এপিক্যুরিয়ান কবি সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের বিদগ্ধমুখমণ্ডনের ছলাকলা যতই ইন্দ্রিয়সুভগ হোক, সেখানেও কবিতা ও গদ্যে একটি অভিন্ন, অবিভক্ত মনন অসামান্য অথচ একমুখী সার্থকতায় শিল্পায়িত হয়েছে। তাই dissociation of sensibility বা 'বিবিক্ত বোধ' সুধীন্দ্রনাথের কবিস্বভাবে অনুপস্থিত এবং তাঁর কাব্য—প্রতীকী আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য রক্ষা করেও—গদ্যের রাজত্বেরই অপরূপ প্রান্তসীমারেখা হয়ে আছে।

সালঙ্কারা কবিতার পুরোহিত সুধীন্দ্রনাথের মুগ্ধ পাঠক প্রাগাধুনিক অলংকারশাস্ত্রের কয়েকটি মুহূর্তে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য। মধ্যযুগীয় যুরোপীয় কবিতায় expolitio, interpretatio, frequentio, suasoriae প্রভৃতি যে সমস্ত প্রকরণ নিত্যব্যবহার্য ছিল সবই বক্তব্যবিষয়কে স্পষ্ট করবার তাড়নায়। Annominatio বা শব্দক্রীড়াও ছিল, কিন্তু তাও বক্তব্যনির্ভর। মধ্যযুগীয় ভারতীয় কবিতায় ত্রিপদী, ষট্‌পদী, ধবল, ওবী, চর্যা প্রভৃতি যে সমস্ত রূপাঙ্গ ছিল বলে জানা যায় তাদেরও প্রধান উদ্দেশ্য কোনো-না-কোনো বিষয়বস্তুর অভিক্ষেপ। অর্থাৎ গদ্যের রূপভেদ ছাড়া মহত্তর কোনো সৌন্দর্যসৃষ্টি এসব ক্ষেত্রে লক্ষ্যভুক্ত হয় নি। সে দিক থেকে আধুনিক বাঙলা কবিতা কি কোনো স্বাতন্ত্র্য সূচিত করে নি?

উল্লিখিত সকল কবিই সেই গদ্যনিরপেক্ষ মহত্ত্বকে কখনো না কখনো স্পর্শ করেছেন, কিন্তু তার লাফর্গ-কথিত বৈদ্যুতিক গহ্বরে নিজেদের সমর্পণ করেন নি। জীবনানন্দই খুব সম্ভব অন্তর্বিস্মৃত কাব্যজিজ্ঞাসাকে নিজের ভিতরে পরিপূর্ণভাবে অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন।

১৮৯৯: নজরুল ইসলাম এবং জীবনানন্দের জন্মবর্ষ। শুধু এই সহকালীনতাই কি

প্রথম-পর্বের জীবনানন্দের উপরে নজরুলের প্রভাবশালিতার জন্য দায়ী? তার চেয়েও গভীরতর কোনো প্রাথমিক সাযুজ্যসূত্র ছিল:

> নজরুলের সাহায্য ছাড়া সে দিন মুক্ত যৌবন তার ভাষা খুঁজে পায় নি···নির্বাধ, উদ্দেশ্যহীন, যুক্তিহীন যৌবনের প্রাণচঞ্চলতায় নজরুল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আবেগঘন মন নিয়ে জীবনানন্দ যে নজরুলের দিকেই ঝুঁকে পড়বেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই।
>
> —সঞ্জয় ভট্টাচার্য, আধুনিক বাঙলা কবিতার ভূমিকা, পৃ ৩০।

নজরুলের বাচংযম তাঁর যৌবনবিদায়ী গীতিগুচ্ছে, পদ্যবন্ধে নয়। ঐ পদ্যভাষণগুলি মহতী জনসভার উদ্দেশে প্রদত্ত হলেও গানগুলি একান্তভাবেই স্বগতস্বনন। একযোগে ইমেজপূজারী ও নিহিতার্থনিষ্ঠ (surrealist) জীবনানন্দের কবিতা ঐ স্বগত স্বনন বা অন্তর্লীন মনোকথনে আশ্রিত। দুটি উদাহরণ দিয়ে কথাটা স্পষ্ট করতে চাই:

১. প্রকৃতির সব কার্য অতি ধীরে ধীরে
এক-এক শতাব্দীর সোপানে সোপানে
পৃথ্বী সে শান্তির পথে আসে নি এখনো,
কিন্তু এক দিন তাহা আসিবে নিশ্চয়।

—কবি-কাহিনী।

২. সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;
সে অনেক শতাব্দীর মানুষের কাজ;
এ বাতাস কি পরম সূর্যকরোজ্জ্বল;
প্রায় ততদূর ভালো মানবসমাজ
আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গড়ে দেবো, আজ নয় ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।

—'সুচেতনা'।

রবীন্দ্রনাথের স্থির মুহূর্ত থেকে জীবনানন্দের সময় কতখানি সরে এসেছে এ দুটি স্তবক তার আভ্যন্তর অভিজ্ঞান। প্রথম স্তবকটিব অনতিজটিল প্রত্যক্ষতার বিকল্পে বিলম্বিত পয়ারের দ্বিতীয় স্তবকটিতে এসেছে স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তির ইন্দ্রজাল এবং 'ক্লান্ত ক্লান্তিহীন' শব্দদ্বৈতের দুর্জ্ঞেয় অথচ অনুভবগোচর oxymoron বা প্রতীপাভাস।

সমকালীন গদ্য থেকেও কবিতা কী দুস্তর পার্থক্য নির্বাচন করে নিতে পারে, তারও দুটি উদাহরণ এখানে রাখা আবশ্যক:

১. ধানকাটা শেষ হইয়া গিয়াছে। চরে আর একটিও ধানগাছ নাই। সেখানে

এখন বর্ষার সাঁতার-জল। চাহিলে কারো মনেই হইবে না যে এখানে একটা চর ছিল···শূন্য ভিটাগুলিতে গাছ-গাছড়া হইয়াছে। তাতে বাতাস লাগিয়া সোঁ সোঁ শব্দ হয়। সেখানে পড়িয়া যারা মরিয়াছে, সেই শব্দে তারাই বুঝি নিশ্বাস ফেলে।

—অদ্বৈত মল্লবর্মণ, তিতাস একটি নদীর নাম।

২. ধান কাটা হয়ে গেছে কবে যেন—ক্ষেতে মাঠে পড়ে আছে খড়
পাতা কুটো ভাঙা ডিম—সাপের খোলস নীড় শীত।
এই সব উৎরায়ে ওইখানে মাঠের ভিতর
ঘুমাতেছে কয়েকটি পরিচিত লোক আজ—কেমন নিবিড়।
ওইখানে একজন শুয়ে আছে—দিনরাত দেখা হত কতো কতো দিন,
হৃদয়ের খেলা নিয়ে তার কাছে করেছি যে কতো অপরাধ।
শান্তি তবু: গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়িং
আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ।

—জীবনানন্দ দাশ, 'ধান কাটা হয়ে গেছে'।

প্রসঙ্গ ও মুডের সাদৃশ্যবহ এই দুটি বর্ণনার একটি শ্রেষ্ঠ গদ্য ও অন্যটি শ্রেষ্ঠ কাব্যের দৃষ্টান্ত। কিন্তু শেষোক্ত অংশে যে-অমোঘ অনির্দিষ্টতা আছে তাকে সারসংকলনে নির্জীব করা যাবে না, প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে বললেও ব্যাখ্যা করার অনুজ্ঞা জারি চলবে না। অর্থাৎ জীবনানন্দ এসে কবিতাকে গদ্য থেকে সরিয়ে এনে তার স্বাধিকারে অধিষ্ঠাত্রী করে দিলেন।

কিন্তু যাঁদের আমরা চল্লিশের কবি বলে জানি তাঁরা, জীবনানন্দ সম্পর্কে দুর্মর আকর্ষণ তাঁদের যতই প্রবৃত্তিনিহিত হোক না কেন, বিবৃতির অমোঘ মোহ এড়াতে চান নি। কেন না, অরুণকুমার সরকারের মতো পাঠকপ্রিয় কবির সেই পর্বের রচনার দিকে তাকালেই চোখে পড়ে, তাঁদের দোলকের স্পৃষ্ট অন্য প্রান্তবিন্দুটির নাম বাক্‌পটু সুধীন্দ্রনাথ। এঁরা জানতেন, অবক্ষয়ের মধ্যেও কিছু মূল্যবোধের কথা অশোভন নয়। আর মূল্যবোধের থেকে বিচ্যুত সময়ের দূরত্বের পরিমাপ করাও নিঃসন্দেহে এথিক্‌সের এলাকা। সে দিক থেকে সমর সেন এবং তাঁর অন্যান্য অনেক অনুব্রতীর কবিতাই এক ধরনের ছদ্মবেশী নৈতিকতায় আক্রান্ত। স্যাটায়ারধর্মিতা এরই একটি আত্মক্ষয়ী লক্ষণ। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই পদ্ধতিটি এড়িয়ে গিয়েছেন আরো বহির্বৃত স্বাস্থ্যময় অভীপ্সায়। এই প্রসঙ্গে স্বতঃসিদ্ধের মতো এটি আমাদের বিদিত, সে যুগে উচ্চারিত তাঁর 'বসন্ত সত্যিই আসবে। কী দরকার এসে'—প্রভৃতি নিরুক্তির মুখ বৃহত্তর পাঠক/শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকেই তুলে ধরা। মনে রাখতে হবে,

স্বভাবের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রধর্মা রোম্যান্টিক কবিরা—অরুণ ভট্টাচার্য ও অন্যান্য—সমবেত শ্রোতা-পাঠকের কথা মনে রেখে পথে নেমে পড়ে 'কবিতা পড়ুন' আন্দোলন মাতিয়ে দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম কবিসম্মেলনে এঁদের দায়িত্বই ছিল সর্বাগ্রে। এরই মধ্যে আমরা পেয়ে গিয়েছিলাম বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিবেকার্ত কবিকে, যিনি কোনো বহির্ঘটনা উপলক্ষেই থেমে থাকতে জানেন না। অন্য মেরুর কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও স্বপ্নপ্রয়াণে আশ্রিত নন, তাঁকেও ভাবায় চতুষ্পার্শ্বের দুর্যোগ, কলমের মুখে জুগিয়ে দেয় লোকধন্য বচন, আর সে হিসেবে তাঁকেও অনেক ক্ষেত্রে 'টপিক্যাল' বলতে অসুবিধে নেই। এ'দের কাছ থেকে সরে গিয়েছিলেন মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় রাম বসু সিদ্ধেশ্বর সেন-প্রমুখ মার্কসবাদী কবি—যাঁদেব সঙ্গে সুভাষ-কর্ষিত মার্কসবাদের পার্থক্য দুস্তর—এবং তাঁরাও, স্বভাবতই, জনগণেব দিকে তাকিয়েই সূক্তিচর্যা করেছেন। এই দুই ধারাব সমন্বয় অরুণ মিত্র। অবশ্য তাঁর উদ্বর্তনও সম্পন্নতর হয়েছে পরবর্তী পঞ্চাশের পর্বান্তরে।

পঞ্চাশের কবিরা অবশ্য প্রথমে থেকেই সমস্ত প্রথাধার্য ক্যাটিগরিগুলি পাশ কাটিয়ে গেলেন। বিষয়বস্তু বা উপলক্ষের অভাব ছিল না। যেমন ধরা যাক 'ঈশ্বর'। ঈশ্বরকে নিয়েই কি এই কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল ?

ঈশ্বর তোমার মতো আমিও নন্দিত।

—আলোক সরকার।

ব্লেকের মতো জানলা খুলে মুখ দেখব ঈশ্বরের।

—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

এ দুটি উক্তি ভুল করে সমধর্মী দুই কবির ঈশ্বরস্তোত্রের অংশ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু, এক, এই সমস্ত সংলাপের সঙ্গে পূর্বনির্ণীত কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাসের সামান্যতম সংস্রব ছিল না। এবং দ্বিতীয়ত, এই ধরনের সংলাপে ছিল স্বাধীনতামুগ্ধ কবিস্বভাবের দাবি। এই কবিরা খুঁজেছিলেন বিশ্বাস, কিন্তু কোনোরকম মানসিক স্বাধীনতা জলাঞ্জলি দিয়ে নয়। এঁরা নিরীক্ষাভীরু ছিলেন না। সম্ভবত তার ফলেই বিশ্বাস এবং স্বাধীনতার রেষারেষি এসেছিল এঁদের কবিতার আঙ্গিকে এবং বহিরঙ্গে। এঁদের পূর্বসূরিদের মধ্যে অনেকেই কবিতা লিখেছিলেন 'এই' অথবা 'ওই' তত্ত্ব নিয়ে। কিন্তু 'কৃত্তিবাস' অথবা 'শতভিষা'-কবিপত্রের সঙ্গে জড়িত এই কবিরা শুরু করে দিযেছিলেন অ-তাত্ত্বিক (non-ideational) কবিতা লিখতে। এঁদের সামনে কারুকার্যখচিত স্তম্ভের মতো যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের বৃহদংশই রবীন্দ্র-বিরোধিতার পথে গিয়েও অনেক বেশি ছক-বাঁধা আইডিয়ার সড়কে সন্তর্পণে ফিরে এসেছিলেন। এই কবিরাই আধুনিক বাঙলা

কবিতার ইতিহাসে প্রথম 'কবিতা বাতলে দেবে না মানে, সে শুধু হয়ে উঠতে থাকবে' (আর্চিবল্ড ম্যাক্‌লিশ)—ধারণার কাছাকাছি থেকে কবিতা রচনা করতে চেয়েছেন। কবির সঙ্গে জায়মান কবিতার বিবর্তমান সম্পর্কই এখানে ছিল সাধ্য শর্ত। এই মহতী অনিশ্চিতির প্রসাদগুণেই আমরা পেয়েছি উৎপলকুমার বসু শঙ্খ ঘোষ ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো কয়েকজন কবিকে। এঁদের কারো কবিতায় বিশ্বাসের ঘাটতি নেই, যদি কোনো অভাব থেকে থাকে তা হল গোঁড়া তাত্ত্বিক প্রত্যয়ের। কোনো একটি 'ব্যক্তিত্বে'র ছাঁচে কবিতাকে ঢালাই করেন নি বলেই এঁরা অনেক দিন পর্যন্ত এগিয়েছেন।

এই পালাবদলের একটি আনুষঙ্গ প্রেরণা এমন কি পূর্বাচার্যদের উপরেও দুর্লক্ষ্য নয়। তাঁরাও আধুনিকতার অন্বেষণে এই পর্ব থেকেই অনেক নমনীয় হয়ে উঠেছেন, তাঁদের বাণীরচনায় এসেছে অনির্দেশ্যতার এষণা। পঞ্চাশের পরবর্তী একাধিক কবি-গোষ্ঠী এই নন্দনতত্ত্বকে ভাঙবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁদের কবিতাও অনেক ক্ষেত্রেই নন্দিত হয়েছে এই অপীড়িত মুক্তিবোধে।

ব্যক্তিক চেতনার পরিণত প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকতার সংজ্ঞা-সন্ধানও এই মুহূর্তে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। অন্তত ১১৭০ খৃষ্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত নিরন্তর সকল যুগের কবিদল নিজেদের আধুনিক বলে অভিহিত করেছেন। ইতিমধ্যে যুগচেতনা কিংবা যূথচেতনাই আধুনিকতা—এই ধারণা চূড়ান্তভাবে ভেঙে নানা সময়ে কির্কেগার্ড, চেস্টরটন কি হেনরি জেম্‌সের মতো বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের মানুষ 'নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্ব'কে সেই অভিধায় বিধৃত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> বৃক্ষ সে তো আধুনিক পুষ্প সে-ই অতি পুরাতন,
> আদিম প্রাণের বার্তা সে-ই আনে করিয়া বহন।

আবার, 'Modern poetry is every poem, whether written last year or five centuries ago, that has meaning for us still'—বলতে গিয়ে সেসিল ডে ল্যুইস একই চিন্তা আরেক স্বরে আবৃত্তি করেছেন। শিলার, ভালেরি, এমন কি ক্রোচেও হয়তো—প্রায় সকলেই বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে অতত্ত্বলাঞ্ছিত ছুটির প্রহরে খেলার কথা আমাদের বলেছেন। খেলাচ্ছলেই আমাদের কবিরা আজ আয়ুযাপনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

আধুনিক বাঙলা কবিতার আলোচিত তিন পর্বে কোন্ কোন্ লক্ষণ আপেক্ষিক সম্বন্ধে সক্রিয় হয়ে উঠেছে, সেটি বোঝাতে গিয়ে গ্রাফিক নক্শার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এখানে এই স্থলে আমরা কয়েকটি প্রতীক ব্যবহার করব :

গ গ্রাহকসত্তা (Receptor)
স১ সংকট (Crisis)
স২ স্রষ্টা (Creator)
আ আলম্বনবিভাব ('Objective Correlative')
প প্রকল্প (Programme)
স৩ সাধারণীকরণ (Communication)

এখানে একটি পঞ্চায়তনিক পরিসর কল্পনা করা যেতে পারে। অক্ষ অক১ (OX_1), অক২ (OX_2), অক৩ (OX_3), অক৪ (OX_4), অক৫ (OX_5) একটি সৃজনী প্রক্রিয়া ও পরিণামী সাধারণীকরণ সূচিত করে।

১ চতুর্থ দশকের কবি

সংকট লয়ের সূচনা করেছে। স্রষ্টা গ্রাহকসত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছেন। স্রষ্টা খুঁজে নিচ্ছেন তাঁর উপযোগী আলম্বনবিভাব এবং সংকট ও গ্রাহক-সম্পর্কিত চৈতন্য থেকে একটি প্রকল্প নির্ধারণ করছেন। সাধারণীকরণ এই লক্ষণপুঞ্জের পারম্পর ও পারম্পরসম্বন্ধের উপরেই নির্ভর করছে। সুতরাং অক১, অক২, অক৩, অক৪, অক৫ যথাক্রমে উপস্থিত করছে স১, গ, স২, আ, প। দ্র' নক্শা ১. (তিন অংশে রেখায়িত)।

২ পঞ্চম দশকের কবি

এখানে গ্রাহকসত্তাই মুখ্য ভূমিকা পরিগ্রহ করছে। সুতরাং গ অক১-অক্ষ অধিকার করে আছে। এর পরেই গুরুত্ব পেয়েছে প। দ্র' নক্শা ২. (তিন অংশে রেখায়িত)। পর্যায়ক্রম : গ, প, স২, আ, স১ নিরূপণ করছে স৩।

৩ ষষ্ঠ দশকের কবি

এই পর্বে স২ প্রধান ভূমিকায় বৃত। দ্র' নক্শা ৩. (তিন অংশে রেখায়িত)। পর্যায়ক্রম : স২, স১, আ, প, গ নিরূপণ করছে স৩

উপস্থাপিত তিন পর্বের পঞ্চমাত্রিক তুলনা :

ক. স^{১}, গ, স^{২}, আ, প > স^{৩}

খ. গ, প, স^{২}, আ, স^{১} > স^{৩}

গ. স^{২}, স^{১}, আ, প, গ > স^{৩}

২
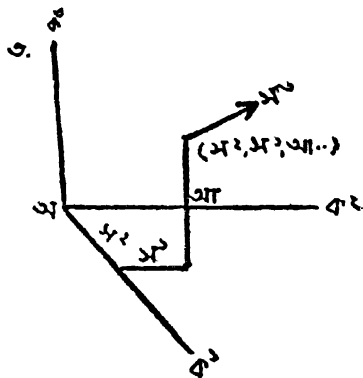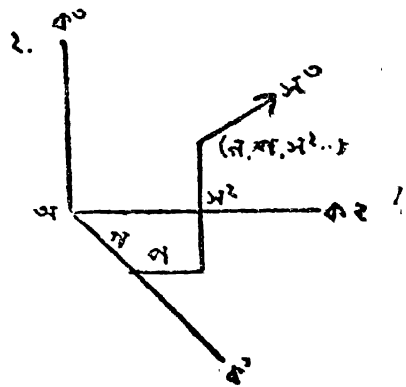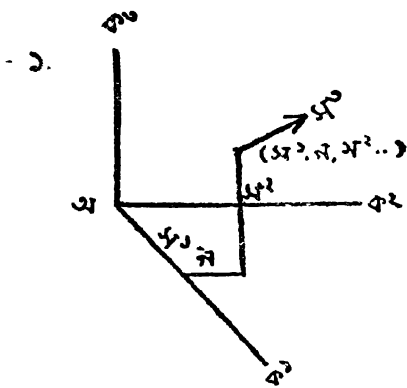
রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাঙলা কবিতা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্তত বিশ বছর পরে বঙ্গদর্শন পত্রিকার পৃষ্ঠায় মহামহোপাধ্যা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে বইকে নতুন বাঙলা কবিতার উৎসস্থল বলে ঘোষণা করেছিলেন স্মরণীয়, সেই 'তিলোত্তমাসম্ভব' প্রকাশমুহূর্তেই 'অভিনব কাব্য' এই শ্লাঘা সহ মুদ্রিত হয়েছিল। 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশিত হবার পরে কবিপ্রতিভার অভিনবত্বে বঙ্গীয় বুধবর্গের সংশয় আরো নিরসন হয়েছিল, 'আপনা হইতে একটি নূতন সাহিত্য বাঙলা ভাষায় আবিষ্কৃত হইল'—বিদ্যোৎসাহিনী সভার এই প্রশস্তি, সন্দেহ নেই ঐতিহাসিক স্বীকৃতি হিসেবেও উল্লেখযোগ্য। এই কবি-সংবর্ধনার তিনমাসকালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন।

আরও মাসতিনের মধ্যে জনৈক 'চিন্তাতরঙ্গিনী'র কবি ভারতচন্দ্রের উত্তরাধিকার তুলে নিতে সসঙ্কোচে এগিয়ে এলেন। ছাব্বিশ বছর বয়স্ক সত্যিকার একজন বি. এ. যাঁর উপর প্রায় পরক্ষণে 'মেঘনাদবধ' দ্বিতীয় সংস্করণের ভাষ্য ও ভূমিকা লেখার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। মধুসূদনের মৃত্যুতে নবীনচন্দ্র সেন 'শূন্য হল আজি বঙ্গকবিসিংহাসন' বলে যে খেদ করেছিলেন তাও পোশাকী মনে হয় তখনকার সাহিত্যকর্ণধারের মন্তব্যে, 'মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক', অন্যত্র 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'কে গীতিকবিতার পর্যায়ভুক্ত করলেও হেমচন্দ্রই ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে গীতি কবিতার আদর্শ, এবং 'হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গমাতার ক্রোড় সুকবিশূন্য বলিয়া আমরা কখন রোদন করিব না'—এই সিদ্ধান্ত লিখে পার্শ্ব-পাঠকের পক্ষপাতকেও বোধ করি তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

বস্তুত প্রথমবয়সে রবীন্দ্রনাথও হেমচন্দ্রকে জানতেন উজ্জ্বলতম কবিপ্রতিভা, বাল্যরচনায় যাঁর প্রভাব তিনি বারণ করতে পারেন নি।' 'কড়ি ও কোমলে'র জন্য ১৩৪৬ পৌষে লেখা মন্তব্যে দেখতে পাওয়া যায় এই স্বীকৃতি: 'তখন হেম বাঁড়ুজ্জে এবং নবীন সেন ছাড়া এমন কোনো দেশপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন না যাঁরা নূতন কবিদের কোনো একটা কাব্যরীতির বাঁধা পথে চালনা করতে পারতেন।' তিনিও যে সম্পূর্ণ তাঁদের ভুলে ছিলেন না তার নজির মেলে ১২৮৯ ভাদ্রের পুরোনো লেখায়। ভারতী পত্রিকার এই সেই প্রথম 'মেঘনাদবধ কাব্য' সমালোচনা: কবি হিসেবে মধুসূদনের অকৃতি দেখাতে হেমচন্দ্রের তুলনাই তখন তাঁর সবচেয়ে কার্যকরী মনে হয়েছিল।

হয়তো নবীন সেনও তাঁকে কিছু দিয়েছিলেন, ক্রমশ, যেমন 'প্রভাস' অষ্টম সর্গের বিশ্বমানবতা, 'অবকাশরঞ্জিনীর' কোনো কবিতা থেকে 'বিদায় অভিশাপ'এ দেবযানীর স্মৃতিমন্থর ভাষা, অথবা 'কুরুক্ষেত্র' দ্বাদশ সর্গে বৈরাগ্যবিমুখ, জীবনাশ্রয়ী মুক্তিসাধনার আভাস যা বিশেষ করে রবীন্দ্রীয়, ইত্যাদি,—কারো কারো এইরকম অভিমত। তবু যেন হেমচন্দ্রেরই কাছ থেকে পেয়েছেন তিনি কবিতার রাজদণ্ড, তাঁর মধ্যবয়সেও যতুনাথ সরকার 'দুই রকম কবি' বোঝাতে রবীন্দ্রনাথের বিপরীতে হেমচন্দ্রকেই নির্বাচন করে নিয়েছিলেন, এবং সেই আলোচনাও যতদূর শ্রেণীসচেতন তার চাইতে কালানুক্রমিক; 'হেমচন্দ্র কত সামাজিক, রবীন্দ্র কত একক' এই কথা লিখে উভয়ের যে বিষমতা তিনি প্রতিপাদন করেছিলেন তা আসলে প্রথা আর নব্যতার ব্যবধান। আত্ম-বিষাদ বৃত এই একাকিত্ব নিয়েই রবীন্দ্রনাথ পূর্বসূরির বরণমাল্য জিতেছিলেন, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র সেই পূর্বসূরি। তারও আগে কালীপ্রসন্ন ঘোষ 'উদয়োন্মুখ কবি'র পরিচয় লিখতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'তাঁহার সমগ্র কবিতাতেই একটুকু অপূর্ব ও অনন্যসাধারণ নূতনত্ব আছে'। কালীপ্রসন্নের ভাষায়, এই নতুনত্ব 'জ্যোৎস্নাশীল, সরল, কোমল ও মধুর' এবং 'অপরিস্ফুট সৌন্দর্যে' মণ্ডিত, রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচয়-মতে 'অন্তরের রহস্যের মধ্যে' নিহিত এই নতুনত্বের মূল। অর্থাৎ অস্ফুটতা, বা রহস্যময়তা, অর্থহারা সুরের সংক্রাম বা গীতলতা, আত্মঅনুগতির একধরনের অ-পূর্ব আধ্যাত্মিকতা হল সেই নতুনত্ব; আর ক'বছর পরে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বাঙলা সাহিত্যে নব্য-রোম্যান্টিক আন্দোলনের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথকে পুরোভাগে রেখে কীর্তিত করেছিলেন সেই নতুনত্বকে, যার বীজরূপ আবার রবীন্দ্রনাথ নিজেই সোচ্ছ্বাসে নিরূপণ করে গেছেন বিহারীলাল চক্রবর্তীর মধ্যে। কিন্তু বিহারীলালের পরিচিতি তাঁর নিজের যুগেও তত ছিল না। অতএব এই নতুনত্বের প্রথম ভাস্ দেখতে পাওয়া গেল নব্যতর কবিরই মুখে। বলা বাহুল্য, এই রবীন্দ্রীয় নতুনত্বে হেমচন্দ্র স্বস্তি বোধ করেন নি, নবীনচন্দ্র বিরাগ দেখিয়েছেন, আর নব্য-তন্ত্রের সেই উজান স্রোতের মুখে দাঁড়িয়ে আরো অনেক দিন রবীন্দ্রনাথকে বিব্রত থাকতে হয়েছে আত্মপ্রতিষ্ঠায়। অন্তত যতদিন না 'আনন্দ বিদায়' বিপর্যস্ত হয় এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রচ্ছন্ন হয়ে পড়েন।

দ্বিজেন্দ্রলাল এক দিকে রবীন্দ্রনাথেরও পরেকার আধুনিকতা বহন করে এনেছিলেন। সুসামাজিক মেজাজ, আর আলগা গদ্যপ্রবণ ছন্দে এক ধরনের গার্হস্থ্য প্রত্যক্ষ তৈরি হয়েছিল তাঁর কবিতায়। 'ইহা নূতনতায় ঝলমল করিতেছে'—'মন্দ্র' কাব্যের উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথেরই এই স্বীকার। তবু অন্তরত তিনি যে পূর্ব প্রথার—হেম-নবীনেরই ধারাবাহী, রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর তিরস্কারে যে উপরন্তু ছদ্মবঙ্কিমী সাহিত্যনীতিই ফুটে ওঠে তা ঢাকা থাকে না। 'দ্বিজেন্দ্রলাল নানা দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকারী'—এই

তথ্য শশাঙ্কমোহন সেনের চোখে প্রতিভাত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের অভিযোগ ছিল রবীন্দ্রকাব্যের অহঙ্কার অস্পষ্টতা বিশেষত দুর্নীতির বিরুদ্ধে—যে দুর্নীতি-কলঙ্ক লেগেছিল বঙ্কিমচন্দ্রকেও। পরে একদিন রবীন্দ্রনাথকেও দেখি বর্ম মানছেন এই শ্রেয়োভাবনাকে; তখন তিনি বৃহস্পতি। তখনো, দ্বিজেন্দ্রলালের পরে বিপিনচন্দ্র পাল-প্রমুখেরা নতুন আরেক অভিযোগ সংযোগ করেছেন অবাস্তবতার। খানিক আধুনিক বটে এই সূত্র, কিন্তু বিপিনচন্দ্রের কণ্ঠস্বরে সেই নবীনতা ছিল না; 'বৈষ্ণব কবিদিগের সাধনায় একটা বস্তুতন্ত্রতা ছিল, আমাদের এই নবীন যুগের প্রমুক্ত সাধনায় সে বস্তুতন্ত্রতা নাই'—এই 'বস্তুতন্ত্র' অনুজাত আধুনিকদের 'বাস্তবতা' নয় যদিও, 'উর্ণনাভ যেমন আপনার ভিতর হইতে তন্তু বাহির করিয়া অদ্ভুত জাল বিস্তার করে, রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ আপনার অন্তর হইতেই অনেক সময় ভাবের ও রসের তন্তুসকল বাহির করিয়া আপনার অদ্ভুত কাব্যসকল রচনা করিয়াছেন'—বিপিনচন্দ্রের এই 'অদ্ভুত' শব্দটিতে পরবর্তী কালপর্যায়ের প্রশ্নাভা পড়েছে।

সেই পরবর্তীকাল, এসে ঢুকেছে রবীন্দ্রনাথের রাজসম্মানের প্রায় পিছন পিছন—প্রায় প্রথম মহাযুদ্ধের মতো। পথ ছিল উঁচাই—হয়তো বা সবুজপত্র অবধি। 'বলাকা'র যে যৌবনবন্দনা, এবং প্রবীণ-নিগঞ্জনা: 'ওরা জীবন আঁকড়ে ধরে মরণ-সাধন সাধবে'—তাতে তাঁর আবার স্থান হয়ে ওঠে বিদ্রোহী আধুনিকতার পুরোভাগে। কিন্তু তখন তিনি নিজেই সুবিহিত প্রথা।

তা হলে আত্ম-সমর্থনের এই সওয়াল? কেমন তবে সেই আত্ম-স্বরূপ? মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থাবলী'র জন্য লেখা প্রবেশক-কয়টির মধ্যে দেখা যায় কবির সেই অকম্প্র আত্মপরিচয়। মোহিতচন্দ্রের ভূমিকায় যেন সেই বিশ্বাসেরই সহজতর গদ্যান্তর—

> যাহা যথার্থ কবিতা, দি ব্য ক ল্প না যাহাকে জন্ম দিয়াছে, অকৃত্রিম ছন্দঃ-সৌন্দর্য তাহাকে বাহিরে ভূষিত করে এবং ভাবের গভীরতা তাহাকে অন্তরে পরিপূর্ণ করিয়া থাকে। তাহার আনন্দ কল্যাণকে আবাহন করে এবং সৌন্দর্যে তাহা জগতের নিত্যসুন্দর অনির্বচনীয় পদার্থসমূহের সমতুল হয়। যিনি জীবনের একটি সামান্যতম সত্যকে পরিস্ফুট ও সুন্দর করিয়া তুলিতে পারেন তিনি কবি, কিন্তু উচ্চতর কবি তিনি—যাঁহার কবিতায় স ম গ্র জী ব নে র সু গ ম্ভী র বি জ য় গী তি শ্রু ত হয়। ...এইখানেই রবীন্দ্রবাবুর কৃতিত্ব।

'দিব্য কল্পনা' বা 'সমগ্রজীবনে'র তাৎপর্য বুঝতে পড়ে নিতে হয় প্রায় সমসময়ে লেখা কবির জবানি, বা পিঠোপিঠি অজিতকুমার চক্রবর্তীর রবীন্দ্রকাব্যগ্রন্থপাঠের ভূমিকা। এতদিনে তবে প্রত্নপিতামহগণের দিব্যদৃষ্টির উত্তরাধিকার অনুমান হয়েছে

তাঁর, জানতে পেয়েছেন সমগ্র বিশ্বজগতের প্রকাশশক্তি কবিকে উপলক্ষ করে বাণীরূপে ব্যক্ত করছে আপনাকে। 'তাঁহার প্রকৃতি বার বার প্রবৃত্তির ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করিয়া তাহাকে বিশ্বের মধ্যে, সমগ্রের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে'—'বিশ্ববোধ' ও 'সর্বানুভূতি'—রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের এই যে দুটি যুগ্মতার কথা অজিতকুমার বলেছেন, তাও তাঁরই পরিভাষা ধার করে। অজিতকুমারের আলোচনা রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত হয় প্রবাসীতে, ১৩১৮ সালে।

পর পর আত্মপরিচয় লেখার উৎসাহেও—যেন অত্যন্ত সহেতু—কবি ধরা দিয়েছিলেন। ১৯০৪এ 'বঙ্গভাষার লেখকে'র, ১৯১০ সালে পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে, ১৯১২য় যুগপৎ 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছিন্নপত্র'—জীবনের বাইরে-ভিতরের অন্যোন্যপূরক যে ছবিতে ভেসে আছে অতিমর্ত্য ধ্রুবের ধ্রুপদী, সেই সময়ের বিশ্বাবর্তের মাঝখানে সেও যেন এক হারানো আশ্বাস।

১৯১২য় ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' বেরোল কবি ইয়েটসের ভূমিকা-সহ। 'দেখছ না, ঈশ্বরে নিমগ্ন হয়ে আছে মানুষটা!'—ইয়েট্‌স লিখেছিলেন স্টার্জ ম্যুরকে। আরো নির্ধারণ করে রোটেনস্টাইনকে লিখেছিলেন ফ্রান্সেস কর্নফোর্ড: এই কবিকে দেখে এতদিনে তিনি কল্পনা করতে পারছেন কেমন ছিল শান্ত শক্তিমান খৃষ্টের রূপ। টি. এস. এস.-এর সমালোচক এই লেখা পড়তে দেখলেন তাঁর কানে বাজছে খৃষ্টীয় পরমগীতের অনুরণন। আর এখানে, ১৯১৩য় সদ্য-সম্মানিত কবিতার পরিচয় লিখতে রমাপ্রসাদ চন্দ লিখলেন, 'রবীন্দ্রনাথের গীতকাব্য অধিকাংশই মন্ত্রসাহিত্য; আধুনিক যুগের ঋষির দৃষ্ট নব-মন্ত্র-সংহিতা'। ততদিনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আচার্য হিসেবে এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের আসন স্থির হয়ে গেছে।

২

এরই মধ্যে শুরু হল প্রথম মহাযুদ্ধ। যথাবিহিত, যুদ্ধের সংবাদ যখন এল তাঁর কাছে, এল তা প্রলয়-আভাস বয়ে। তার মধ্যে দেখতে পেলেন তিনি রক্তবর্ণে লেখা পাপের প্রকাণ্ড মূর্তি। কূটনীতিক অব্যবস্থা নয়, তার মধ্যে দেখতে পেলেন তিনি দ্যৌস্পিতার রোষ, অন্যায়দলনকারী রুদ্রের রূপ।

> আজ পৃথিবীর প্রলয়দাহের রুদ্র আলোকে, পিতা, তুমি দাঁড়িয়ে আছ। প্রলয়-হাহাকারের ঊর্ধ্বে স্তূপাকার পাপকে দগ্ধ করে সেই দহনদীপ্তিতে তুমি প্রকাশ পাচ্ছ···
>
> —৯ ভাদ্র ১৩২১, 'শান্তিনিকেতন'।

মানুষী নাগালের মধ্যেও কিছু আর নয় এখন,

> কোনো রাজমন্ত্রী কূটকৌশলজাল বিস্তার করে যে সে আগুন নেভাতে পারবে তা নয়···
>
> —২০ শ্রাবণ ১৩২১, 'শান্তিনিকেতন'।

শান্তিনিকেতন-মন্দিরের উপাসনায় সমগ্র মানবজাতির কবিপুরোহিত হয়ে তিনি বিশ্ববিধাতার প্রসন্নতা প্রার্থনা করলেন :

> মরছে মানুষ, বাঁচাও তাঁকে।···বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। বিশ্বপাপের যে মূর্তি আজ রক্তবর্ণে দেখা দিয়েছে সেই বিশ্বপাপকে দূর করো। মা মা হিংসীঃ। বিনাশ থেকে রক্ষা করো।
>
> —মা মা হিংসীঃ, 'শান্তিনিকেতন'।

যাঁরা ছিলেন যুদ্ধেরই মধ্যে তাঁদেরও অনেকে এর ভিতর বৃহৎ বিশ্ববিধান প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ ছিলেন কবি। চার্লস সর্লি-র মতো তিক্ত তরুণ যিনি দেখেছিলেন 'the blind fight the blind', আর কিছু নয়। আর যাঁরা অর্থহীন এই নারকীয়তায় সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন যুদ্ধের ও যুদ্ধব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে, তাঁরা এই যুদ্ধের উত্তরার্ধের কবিশহীদ। উইলফ্রেড ওয়েন কিংবা সিগফ্রিড সসুন। বাঙালি পল্টনও যুদ্ধে গিয়েছিল। কোনো হাবিলদার-কবির ভাষা যদি মিলত, কাছ থেকে দেখতে পাওয়া যেত এই যুদ্ধকে। যুদ্ধের থেকে শরীরী দূরত্বে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তখন ছিলেন নিজের পূর্ণতায় নিরূঢ়।

তবু, দুটি সত্য গোচর হয়েছিল তাঁর এর মধ্যে। এই বিরাট মৃত্যুযজ্ঞ উপলক্ষ করে তিনি দেখেছিলেন অপ্রত্যক্ষ দেবতার আবির্ভাব। এবং অনুভব করেছিলেন, 'মৃত্যু-দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন।' এর মধ্যে তিনি ভরসা পেয়েছিলেন নতুন সত্য-জীবনের, এবং নতুন শুভ-পৃথিবীর

> ধূলার 'পরে স্বর্গ তোমায় গড়তে হবে।
> বিনা অস্ত্র বিনা সহায় লড়তে হবে।
>
> 'গীতালি' ৩ সংখ্যক গান, ৪ ভাদ্র ১৩২১।

> বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
> এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা।
> স্বর্গ কি হবে না কেনা।
>
> 'বলাকা' ৩৭ সংখ্যক কবিতা, ২৩ কার্তিক ১৩২২।

এক বছরের ক্রমে দেখা যায় শুধু ঈষৎ-প্রশ্ন তাঁকে ছুঁয়েছে।

স্বর্গ থাক যেখানেই, যৌবনের রাজপতাকা তুলে নিলেন কবি ; পৌষের পাতাঝরা

তপোবনে মেলা হল 'ফাল্গুনী'র বসন্ত-নাট, স্থান নিয়ে দাঁড়ালেন তার নবযৌবনের দলের প্রধানতম যুবকটির মধ্যে।

অনুমান হয়েছিল এই নবযৌবনের দলেরই মতো অবিকল এক কবিকুঞ্জ পল্লবিত হয়ে উঠেছে তাঁকে ঘিরে? তাঁর নিজেরই রচিত? তাঁকে নিজেদের মধ্যে বেষ্টন করে রাখতে ব্যাপৃত? যতীন্দ্রমোহন বাগচী লিখেছেন:

বসেছিলাম পায়ের কাছে, ভেবেছিলাম মনে,
একটা কিছু চেয়ে নেব সেবায় আরাধনে।

সেবা-আরাধনায় তাঁরা রবীন্দ্রনাথকেই যাচ্ঞা করে নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে। দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শ্রীচরণে' উৎসর্গ করেছিলেন কবিতা। এক যুগ পরে সুধীন্দ্রনাথ, আরো পরে অমিয়চন্দ্র-বিষ্ণু দে-ও তা করেছিলেন। কিন্তু চিত্তলক্ষণের দিক দিয়ে দুয়ের মধ্যে আরো যুগের ব্যবধান। এঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথের বাইরে কিছু ছিল না—না বিষয়, না উচ্চারণ। পুরোনো দিনের কথা স্মরণ করে কালিদাস রায় লিখেছেন:

মালাকার ফুল ফোটায় না—সে ফোটা ফুলে মালা গাঁথে। এই মাল্যশিল্পের কি কোনো মূল্য নেই?

—শারদীয়া যুগান্তর ১৩৭০।

চয়ন করা 'ফোটা-ফুলে'র মাল্যশিল্প—এই তাঁদের কবিতা, এর চেয়ে ঠিক পরিচয় তার আর কী বা হতে পারে।

১৯১৮য় দেখি ক বি - র চেয়ে গু রু দে ব - এর দিকটিতে বেশি হয়ে পড়েছে ভার, ছোট আশ্রম-প্রাঙ্গণে সমারোহে ভিত পড়েছে বিশ্বভারতীর। আর ১৯১৯ সালেই প্রতিষ্ঠিত হল এঁদের সাহিত্য-সংস্থা—'রবিমণ্ডলী'। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যিনি এর আগে প্রায় সমস্ত রবীন্দ্র-সংবর্ধনার প্রশস্তি লিখেছিলেন, তাঁর দেওয়া নাম। রবীন্দ্রনাথের মাথায় তখন সোনার শিরস্ক—সর্ব দিকে গুরু, কিন্তু ততক্ষণে বাঙলা কবিতার তৃতীয় দশক রবীন্দ্রাতিগ নতুন আরেক নবীনতার জন্য উৎসুক হয়ে পড়েছে। দেখা দিয়েছেন অঘোরপন্থী মোহিতলাল, যাঁকে নবীন আধুনিকেরা মাথায় তুলে নিয়েছেন 'আধুনিকোত্তম' বলে, উন্মাদক প্রলয়োল্লাস নিয়ে দেখা দিয়েছেন নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রমোহন বাগচীর আবিষ্কৃত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ঘোষণা করেছেন 'কবি নহি আমি কবি নহি তথাকথিত'। কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতি, পরিচয়, তারপর পূর্বাশা, প্রকাশ হয়েছে ক্রমে ক্রমে। শনিবারের চিঠি দাঁড়িয়েছে নতুন সনাতনীদের মুখপত্র হয়ে। বাঙলা কবিতার চতুর্থ দশক সূচিত হয়েছে 'কাব্যের মুক্তি'র ফতোয়া নিয়ে। সুধীন্দ্রনাথ গাঢ় রেখায় লিখেছেন পঙ্গুত্ব থেকে আমাদের কবিতার

পরিত্রাণের পথ :

> সে যদি বাঁচতে চায়, তার ধ্বংসাবশিষ্ট পৈতৃক প্রাসাদের অন্তঃপুরে বসে রূপকথার রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখা কাব্যের আর চলবে না, তাকে বেরিয়ে আসতে হবে, পোকায় খাওয়া শিরোপা, মরচে পড়া সাঁজোয়া, রজ্জুসার জয়মাল্য ফেলে তাকে বেরিয়ে আসতে হবে হাটের মাঝে, যেখানে পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ, দেব-দানব সমস্বরে জটলা পাকাতে ব্যস্ত।

—কাব্যের মুক্তি, ১৯৩০, 'স্বগত'।

দেখা দিয়েছেন রবীন্দ্রাতিগ নতুনতার প্রসিদ্ধ অপরাপরেরা। রবীন্দ্রনাথকে মুখোমুখি প্রতিবাদ করে ও যত্নে ব্যবহার করে একে একে তাঁরা নিজেদের আসন চিহ্নিত করে নিয়েছেন।

এই হল দিনান্ত-'পূরবী'র পশ্চাৎভূমি। 'সোনার তরী'র যুগে গুণী বরজলালের গল্পে এই যে দুটি লাইন ছিল: 'বরজ করজোড়ে কহিল, 'প্রভু', মোদের সভা হল ভঙ্গ। / এখন আসিয়াছে নূতন লোক, ধরায় নব নব রঙ্গ'—'পূরবী'র একটি কবিতায় সেই অভিমান

ফিরিয়া যেয়ো না শোনো শোনো
সূর্য অস্ত যায় নি এখনো···

—শেষ বসন্ত।

আরেকটিতে যেন আকূতি, পুনরুজ্জীবনের—

হে নূতন,
হ'ক তব জাগরণ
ভস্ম হতে দীপ্ত হুতাশন।

—পঁচিশে বৈশাখ।

পাশাপাশি গদ্যের পরিসরেও এক বিচিত্র সংশয়—স্বপ্রমাণের, বিপক্ষ-খণ্ডনের—যেন প্রতিক্রিয়া। স্পর্ধিত যৌবনের যিনি চারণ নতুন সাম্প্রত কেন তাঁর প্রসন্নতা পেল না! তার বেআব্রু শস্তা অহংকারকে যে তিনি মেনে নিতে পারলেন না, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাষ্যে এই সেই প্রতিবাদের রূপ—

> তাঁহার সাহিত্যধর্ম প্রবন্ধের শেষ দিকটার ভাষাও যেমন তীক্ষ্ণ, শ্লেষও তেমনি নিষ্ঠুর। তিরস্কার করিবার অধিকার একমাত্র তাঁহারই আছে, এ কথা কেহই অস্বীকার করে না, কিন্তু সত্যই কি আধুনিক বাঙলা সাহিত্য রাস্তার ধুলা পাঁক করিয়া তুলিয়া পরস্পরের গায়ে নিক্ষেপ করাটাকে সাহিত্য-সাধনা জ্ঞান করিয়াছে? হয়ত, কখন কোথাও ভুল হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত আধুনিক সাহিত্যের

প্রতি এত বড় দণ্ডই কি সুবিচার হইয়াছে ?

—সাহিত্যের রীতি ও নীতি, 'স্বদেশ ও সাহিত্য'।

অবশ্যই ক্ষণিকের এই অস্থিরতা। অচিরে অমিতর হাতে স্বকৃত খারিজ হয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ,

আমাদের মণিভূষণ চশমার ঝলক লাগিয়ে প্রশ্ন করলে, 'সাহিত্য থেকে লয়াল্‌টি উঠিয়ে দিতে চান ?'

'একেবারেই।…'

বলা বাহুল্য, নবীনদের কাছে উত্তেজকভাবে তৃপ্তিকর লেগেছিল ঐ 'শেষের কবিতা'।

১৩৩৩ চৈত্রের লেখা এই চার লাইন স্বীকারোক্তি উদ্ধার করি—

সব লেখা লুপ্ত হয়, বারম্বার লিখিবার তরে
নূতন কালের বর্ণে। জীর্ণ তোর অক্ষরে অক্ষরে
কেন পট রেখেছিস পূর্ণ করি ? হয়েছে সময়
নবীনের তুলিকারে পথ ছেড়ে দিতে।…

কালি-কলম ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা মুখপত্রের পুনর্মুদ্রিত। ঐ সংখ্যাতেই একই লেখা-পত্রিকার থেকে উৎকলিত আরো একটি বীরবলী পরিপূরক

নূতন লেখকেরা পুরানো লেখকদের বাতিল না করে দিলে সাহিত্যের নবরীতির সৃষ্টি করতে পারবে না।

স্মরণীয়, উদ্ধৃতি দুটি কল্লোল-পত্রিকারও ১৩৩৪-এর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যায় পর পর পুনরুদ্ধৃত হয়।

'নূতন লেখকেরা' পুরোনোকে কতখানি বাতিল করতে পারলেন সে পরের কথা, কিন্তু 'নূতন কালের বর্ণবিন্দু'গুলিকে আচার্যের ভূমি থেকে প্রত্যুদ্গমন করে নিতে তাঁর দাঁড়াতে হল, 'ক্রমোয়েল'-নাট্যের বিপ্লবী কবি নব্য-রোমান্সের স্রষ্টাকে যে ভাবে স্বাগত জানিয়েছিলেন, যেন সেই ভাবে। নজরুলকে উৎসর্গ করলেন 'বসন্ত'। মুগ্ধতা জানালেন মোহিতলালের কাব্যের অকৃত্রিম পৌরুষে, যে মোহিতলালের উগ্র দেহবাদ তাঁকেই আঘাত দিতে, যে মোহিতলাল 'মোহমুদ্গর'-এ কঠিন ভৎর্সনা করেছিলেন কবিবাসবকে: 'কতদিন ভুলাইবে মর্ত্যজনে বিলাইয়া মোহন আসব।—হে কবি-বাসব ?'—এই ভাষায়। সুধীন্দ্রনাথের 'স্বগত'-আলোচনায় স্বীকার করলেন দুজনার দ্বিচারিত্র: তাঁর নিজের লেখায় যেমন কল্পনা ও শ্রেয়োবুদ্ধির ভূমিকা, সুধীন্দ্রনাথের তেমনই 'মুখ্য আনন্দ মননে'। বিভেদ যে আদৌ অসেতু সুধীন্দ্রনাথ নিজেই তা আভাস করেছিলেন আগেভাগে—

যুগধর্মে দীক্ষাগ্রহণ তার [আধুনিক বাঙালি কবির] অবশ্যকর্তব্য। এ কথা ন'

মেনে তার উপায় নেই যে প্রত্যেক সৎকবির রচনাই তার দেশ ও কালের মুকুর, এবং রবীন্দ্রসাহিত্যে যে দেশ ও কালের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাদের সঙ্গে আজকালকার পরিচয় এত অল্প যে উভয়ের যোগফলকে যদি পরীর রাজ্য বলা যায় তা হলে বিস্ময়প্রকাশ অনুচিত।

—সূর্যাবর্ত, 'কুলায় ও কালপুরুষ'।

সেই পরী-রাজ্য থেকেই তা হলে অভিনন্দিত করতে পারলেন 'চেতন স্যাকরা'র তির্যকবাচী কবিকে—কেবল স্বাতন্ত্র্যের কারণে, যে অমিয়চন্দ্র আবার এক সময়ে তাঁর সঙ্গে আধুনিক পৃথিবীর সম্বন্ধ-সূত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার স্বকীয় বিশিষ্টতায় সানন্দ অনুমোদন জানিয়েও লিখলেন

তোমার 'প্রথমা'র কবিতাগুলি আগুনে ঢালাই করা হাতুড়ি পিটানো কবিতা—এদের মধ্যে পরুষ অদৃষ্টের অগ্নিস্রাব জমে গিয়েছে। জীবনের যে ভূভাগে মরুর অধিকার পাকা হয় নি, যেখানে ফুল ফোটে, ফল ফলে, সেখানেও কবি বাঁশি বাজাবার বায়না পেয়েছে এ কথা মনে রেখো—কেবল দুন্দুভি বাজাবার পালা তার নয়।

—প্রেমেন্দ্র মিত্রকে লেখা পত্র, পূর্বাশা, রবীন্দ্র-সংখ্যা ১৯৪১।

বাঁশ আর এই দুন্দুভি—শুধু প্রবণতায় তো নয়, সময়ের তফাতেও ব্যবহিত। প্রথম আত্মপরিচয় লেখার সময়ে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন তাঁরই বেণুরন্ধ্রপথে বাজছে তাঁর জীবনদেবতার বাঁশি। তারপর নিজেই একদিন তিনি পেলেন সেই বাঁশি-বাজানোর বরাত। 'কাব্যগ্রন্থাবলী'র এক প্রবেশমুখে সেই দায়িত্বের কথা রয়েছে—

হে রাজন্, তুমি আমারে
বাঁশি বাজাবার দিয়েছ যে ভার
তোমার সিংহদুয়ারে—
ভুলি নাই তাহা ভুলি নাই;

—'উৎসর্গ' ১৯।

'পূরবী'-প্রদোষে সেই স্মৃতি পুনর্বার

ছায়াতে তিনিও সাথে ফেরেন নিঃশব্দ পদচারে।
বাঁশির উত্তর তাঁর আমার বাঁশিতে শুনিবারে।

'পরিশেষে' তা আরো অতীত দিনের প্রসঙ্গ

আমি শুধু বাঁশরীতে ভরিয়াছি প্রাণের নিঃশ্বাস,
বিচিত্রের সুরগুলি গ্রন্থিবারে করেছি প্রয়াস...

'স্বপন-পসারী'র প্রথম ও নাম-কবিতায় মোহিতলাল তালিকা দিয়েছেন পসরা-

সম্ভারের, যার সবশেষে আছে একটি 'বাঁশের বাঁশি'—তাঁর নিজের জন্য। কিন্তু সেই বাঁশি বাজাবার সাধ্য তাঁর নেই। শুধু তাঁরই নেই বললে ভুল হবে। সমস্ত রবীন্দ্রোত্তরদের হাত থেকেই স্খলিত হয়ে গেছে সেই সাধ্য। যেন সত্যিই ঋতুবদল হয়ে গেছে। বদলে বন্দনীয় হয়ে উঠেছে এখন যা-কিছু অরৈবিক। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের লেখা প্রকাশের প্রথম দিকে সেই লেখকই প্রশংসনীয় ছিলেন যিনি রবীন্দ্রনাথের 'মতো' লিখতেন না। যতীন্দ্রনাথ তীর্থিক হন নি, ছিলেন নিরুপায় মরুচারী। সেই মরুচারিতার মধ্যেই তখন উঠেছে কাব্যের সঙ্গত ফসল। শুধু জীবনে নয়, কিংবা জীবনের সর্বত্র বলে কাব্যেরও সকল ভূভাগে মরুর অধিকার তখন পাকা হয়ে গেছে। রোমাঞ্চও নেই এই ঊষরতাতে যেমন ছিল

চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।

ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি, জীবন-স্রোত আকাশে ঢালি···

—দুরন্ত আশা, 'মানসী'।

যখন লিখেছিলেন। রিক্ত, নিস্তারহারা ঊষরতা—

কোথায় লুকাবে ধু-ধু করে মরুভূমি;

ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া মরে গেছে পদতলে।

—উটপাখী, 'ক্রন্দসী'।

নিরন্তহরিৎ রিয়্যালিটির উপর এসে দাঁড়িয়েছে বাঙলা কবিতার নবীন আধুনিকতা, আর রবীন্দ্রনাথেরই মুখে দেখতে হয় অরবীন্দ্রোচিত এই ক্লান্তি

কালের নৈবেদ্যে লাগে যে-সকল আধুনিক ফুল,

আমার বাগানে ফোটে না সে।

কিছুদিন আগেও যিনি ঈর্ষণীয় সপ্রতিভ নব্যতন্ত্রী, তিনিই হঠাৎ হয়ে পড়লেন আধুনিকতার পরিপন্থী – অনেকটা ফুটে ওঠে উপান্ত্য ভিক্তর উগো-র তুলনা যাঁর সঙ্গে বিরোধ ও সাদৃশ্য প্রমাণ করে তাঁর প্রথম সমালোচকেরা—ভূদেব মুখোপাধ্যায় বা প্রিয়নাথ সেন তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন।

৩

রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ছিল একটি নদীর উৎপ্রেক্ষা, তাই দিয়েই তিনি বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছিলেন। বরাবর সিধে চলে না নদী, মাঝে মাঝেই সে বাঁক নেয়, আর সেই গতি-পরিবর্তনের মধ্যে কালের কথা ততটা নেই যতটা আছে ভাবের কথা, 'এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।' ইংরেজি রোম্যান্টিক যুগের আধুনিকতার সঙ্গে

তার গোত্র বাঁধা ছিল, পরবর্তী ইংরেজ আধুনিকদের লেখাতেই সেই পুরোনো আধুনিক আদল আবছা হয়ে গেছে। অতএব সেই মুহূর্তে মধ্য-ভিক্টোরিয় যুগেই বরং তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন নির্ভর। 'ভিক্টোরিয়া যুগে গীতিকবিতার রাজা আমাদের রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার পথ সম্পূর্ণ নূতন।'—একজন হারাণচন্দ্র রক্ষিতের অনতিউল্লেখ্য একখানি বই 'ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গলা সাহিত্যে'ও ব্যঞ্জনারহিত এই ইতিহাসটুকু ছিল।

পরবর্তী আধুনিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন চিত্তবিকার। তার তুলনায় বরং সহজ সরল চীনে কবিতায় তার তৃপ্তি হয়েছিল। আর এই মর্জি বা ভাবকে এক ধরনের নিঃসক্ত আধুনিকতারই সমান বলে তাঁর মনে হয়েছিল এবং তথাকথিত আধুনিকদের তুলনায় সেই পুরানো পদই বেশি আধুনিক লেগেছিল তাঁর। দুটি কথা তাঁকে উদ্ভাবন করতে হয়েছিল নিজের বিশ্বাসের স্বপক্ষে—'আধুনিক' আর 'শাশ্বতভাবে আধুনিক'—প্রাচ্য শিল্পের প্রশান্তিতে তিনি ঈপ্সিত আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলেন।

তথাকথিত আধুনিকেরা এসেছিলেন আরেক রাস্তায়। জীবনানন্দ দাশ সবিনয়ে বর্ণনা করেছেন—

> তাঁর প্রকৃত কাব্যলোকে সমাজ-ও-ইতিহাস চেতনা একটা নির্ধারিত সীমায় এসে তারপর মন্থর হয়ে গেছে। আধুনিকের কবিতা সেই কিনারার থেকে সূত্র তুলে নিয়ে যে ধরনের সমাজ ও ঐতিহ্যবোধের আশ্রয় গ্রহণ করেছে তার পরিচয় রবীন্দ্র-কাব্যে পাওয়া যায় না বললে উক্তি অসঙ্গত হবে, কারণ রবীন্দ্রকাব্য বিরাট সমুদ্রের মতো—কিন্তু তাঁর শেষ জীবনের কবিতায়ও—'পুনশ্চ' 'রোগশয্যায়' 'আরোগ্য' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থেও এই জিনিস রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান স্মরণীয় বিষয় নয় বলে কবি এর দিকে সম্পূর্ণ মনঃক্ষেপ করতে উদাসীন এবং এর প্রকাশ তাঁর কাব্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বাক্ষর থেকে বঞ্চিত। এইখানেই কোনো কোনো আধুনিকদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অমিল। দৃষ্টিভঙ্গির এই ব্যতিরেকী গতির জন্যে আধুনিক বাঙলা কবিতার চিন্তা ও ভাষা রবীন্দ্রকাব্যের থেকে পৃথক্ পথে চলতে শুরু করেছে।
>
> —রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাঙলা কবিতা, 'কবিতার কথা'।

মানসিকতার দুই বিপরীত মেরু, নতুবা যে 'বলাকা'র কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ স্বকৃত অচলায়তন ভেঙে বেরিয়ে এসে পুনর্ণব হয়ে উঠেছিলেন, তাকেও কেন 'ভাবের দুর্গম দুর্গে' আশ্রয় নেওয়ার দায়ে অভিযুক্ত করলেন মোহিতলাল, কেন সুধীন্দ্রনাথ বা সমস্বরে বলে উঠলেন

> দুর্ভাগ্যবশত জগৎ কেবল ভাবের উপাদান নির্মিত নয়, তাতে বস্তুর দৌরাত্ম্যই সর্বব্যাপী। এই রুক্ষ, অভব্য বস্তুতন্ত্রের পটভূমিতে 'বলাকা'র গম্ভীর শালীনতা

কেমন যেন ব্যর্থ ঠেকে।

—ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ, 'স্বগত' ১ম সং. পৃ ৭৩।

শুধু বস্তুতন্ত্রেরই দাবি নয়, আরো সহেতু অবিশ্বাস। এবারে তাঁর উত্তরসাধকদের কাছে নিষ্তাপ গণিত হলেন রবীন্দ্রনাথ। যদিও এই নবীনদের মৃত্যুমোহে 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র রেশ লেগে ছিল, প্রলয়োল্লাসেও চাপা ছিল না স্বপ্নোত্থ নির্ঝরের দূর কণ্ঠ এবং যদিও এঁদের অনেকেরই অনেক ঋণ স্বয়ম্প্রকাশ হয়ে ছিল রবীন্দ্রবাগ্‌ধারার কাছে।

প্রথম প্রতিবাদ বোধ হয় রবীন্দ্রকাব্যের কবিপুরুষের বিরুদ্ধে, যিনি অভিজাত বিভূতিমান গরিমাময়। রবীন্দ্রনাথ, সম্ভবত পুরোনো বিশ্বাসমতো, ঈশ্বরকে কবিমহিমায় এবং কবিকে দিব্যসাধনায় ব্রতী করেছিলেন। প্রথমতম মুহূর্তেই 'কবিকাহিনী'র নায়ক :

নিশার আঁধার কোলে জগৎ যখন
দিবসের পরিশ্রমে পড়িত ঘুমায়ে
তখন সে কবি উঠি তুষারমণ্ডিত
সমুচ্চ পর্বতশিরে গাইত একাকী
প্রকৃতিবন্দনাগান মেঘের মাঝারে।

বিহঙ্গ যত উঁচুতে উড়তে পারে না সেই পর্বতশিখরে কবি বিচরণ করতেন নিঃসঙ্গ, 'প্রশান্ত আকৃতি তার মনে হত হিমাদ্রির অধিষ্ঠাতৃদেব!' অবশেষে

এক দিন হিমাদ্রির নিশীথ বায়ুতে
কবির অন্তিম শ্বাস গেল মিশাইয়া!
হিমাদ্রি হইল তার সমাধি মন্দির···

ষোল বছর বয়সে লেখা পরিণত-রবীন্দ্রনাথের এই আত্মপ্রতিকৃতি। অভ্র-স্পর্শী এই ব্যক্তিটিকে নবীনেরা দেখেছিলেন অবিশ্বাসে। বুঝতে দেরি হয় নি, পর্বতপ্রতিম এই গরিমার সঙ্গে তাঁদের অসেতু অন্তর। তাঁরা সমতল মানুষ, তাঁদের কবি আলোড়িত স্বকালচেতনায় :

সে সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক
চেয়েছিল ;—হাঙরের ঢেউয়ে খেয়েছিল লুটোপুটি।

—সমারূঢ়, 'সাতটি তারার তিমির'।

এই আলোড়নকেই হয়তো অচিন্ত্যকুমার 'কল্লোলের যৌবন-চাঞ্চল্য" বলে বোঝাতে চেয়েছেন। বরং তাঁরা রবীন্দ্রনাথের স্রস্ত-বিশৃঙ্খল অংশমুহূর্তে প্রেরণা ও আশ্বাস পেয়েছিলেন—বেদুইন রূপে, 'ক্ষণিকা'র মাতালমূর্তিতে। যে রবীন্দ্রনাথকে মোহিতলাল শিবাজী-উৎসবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন—'নূতন সামচ্ছন্দের উদ্গাতা রূপে', তাঁকে ভোলবার

তাঁর উপায় ছিল না। কিন্তু মোহিতলাল ঠাঁই পেলেন আরব্যতায়, তাঁর নায়ক মূর্ত হয়ে উঠল নাদির শাহের মধ্যে। আবার শোপেনহাওয়েরকে দেখে তাঁর মনে হল—'কেমন আত্মীয় তুমি বুঝি না যে তবু ভাসি নয়নাশ্রুজলে', তিনি আরেক পারে কূল পেয়ে গেলেন। দেখা গেল নজরুলের কবিকে—প্রবল সমাজবিপ্লবী, যতীন্দ্রনাথের কবি মরুপরিচর ও বাচাল, প্রেমেন্দ্র মিত্রের গণতন্ত্রের প্রবক্তা, বুদ্ধদেবের কবি প্রবৃত্তির হাতে বন্দী, সুধীন্দ্রনাথ নিয়তির হাতে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য লক্ষ্য করেছেন, কল্লোল অঙ্গীকার করেছিল লিরিকের উদ্দামতা আর ইংরেজি কবিতার রোম্যান্টিক মনোভাব। উদ্দামতা—এই নিশ্চয় নবীনদের প্রাঁথমিক বিদ্রোহের সুপরিচয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথেরও তো প্রাক্‌-রবীন্দ্র উষাকাল ছিল, সেখানে এই দ্রোহ দেখি। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র—

বিদ্রোহী এ হৃদয় আমার
জগৎ করিছে ছারখার।
গ্রাসিছে চাঁদের কায়া ফেলিছে আঁধার ছায়া
সুবিশাল রাহুর আকার।

—সংগ্রাম-সঙ্গীত।

উন্মাদ রোম্যান্টিসিজমের এই যে ঘুর—যা মুহুর্মুহু ভেঙে তোলপাড় করছে নিজেকে—

প্রাণের মর্মের কাছে
একটি যে ভাঙা বাদ্য আছে
দুই হাতে তুলে নে রে, সবলে বাজায়ে দে রে
নিতান্ত উন্মাদ-সম ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্।
ভাঙে তো ভাঙিবে বাদ্য, ছেঁড়ে তো ছিঁড়িবে তন্ত্রী—
নে রে তবে তুলে নে রে, সবলে বাজায়ে দে রে
নিতান্ত উন্মাদ-সম ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্।

—দুঃখ-আবাহন।

আর তার এই যে গদ্য-সমান্তর :

আমরা মানুষেরা কতকগুলি কালো কালো অসন্তোষের বিন্দু, ক্ষুধার্ত পিপীলিকার মতো জগতকে চার দিক হইতে ছাঁকিয়া ধরিয়াছি, উষাকে, জ্যোৎস্নাকে, গানের শব্দকে দংশন করিতেছি···

—আত্মসংসর্গ, 'বিবিধ প্রসঙ্গ'।

এ কি অন্তঃপ্রতিকৃতি মধুসূদনের? এই দুঃশীল উদ্দামতা গোড়ায় প্রত্যাহার করেই কি রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বোপার্জিত শুভবুদ্ধিকে জয়যুক্ত করতে চান নি? অথচ সেই

এই স্বচ্ছ উপদেশিকার কাছাকাছি : সমুদ্রকে যেমন মানায় প্রশান্তি, তেমনই মানায় সৌন্দর্যকেও। কীট্সের এটি সচেতন স্মৃতি না হতে পারে। তবে, আবেগতাড়িত রোম্যান্টিকেরা অনেকেই শমিত সুষমার সনাতন পরামর্শ পেয়েছেন এই ঐতিহ্যবাদীর কাছে তাতে ভুল নেই।

লাওকুন-ভাস্কর্যের শিল্পিত যন্ত্রণার পরিচয় দিতে গিয়ে ভিঙ্কেলমান বলেছিলেন, ক্ষুভিত শারীরবৃত্তি এখানে শিল্পীর সমাহিত সত্তায় প্রশান্ত সৌন্দর্যের জনয়িতা হয়ে উঠেছে। পুরোনো গ্রীকেদের মধ্যে ছিল এই এক-ব্যক্তির মধ্যে শিল্পিতা-প্রজ্ঞার সমাহার। দৃষ্টান্তস্বরূপে তাঁদেরই সৃষ্টির মধ্যে পাওয়া যায় সরলতা, শান্ত বৈভব। গ্যেটে উপকৃত হয়েছিলেন ভিঙ্কেলমানের পর্যবেক্ষণের পরিচিত হয়ে। কিন্তু ভের্টরের পরিণাম লেখবার আগে পড়লে হয়তো পরিহার করতে পারতেন লেসিঙ-এর অভিযোগ, বা রোম্যান্টিকতা সম্বন্ধে তাঁর পরেকার তিক্ততা। পরের রোম্যান্টিকেরা যে আত্মসর্বস্বতা থেকে দর্শনপরতায় ঝুঁকেছিলেন, তার পিছনে সে কি তাঁর ছায়া? অত দূর না গিয়েও, এমন কি যে কবি দুর্দম অনুভবের অতিবেল স্বতোউচ্ছ্বাস কাব্যপ্রবর্তনার মূল বলে জ্ঞান করেছিলেন, তাঁরই কাছ থেকে কবিতা যে সমাহিত প্রশান্তির মধ্যে সমাহৃত চিত্তোদ্বেজনা—emotion recollected in tranquility, এই সিদ্ধান্ত মেলে। এ যেন বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথেরই অনুভব, আমাদের মনে হয়। 'সৌন্দর্য আমাদের প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া আনিয়াছে' বা 'যথার্থ সৌন্দর্য সমাহিত সাধকের কাছেই প্রত্যক্ষ'—এই প্রাপ্তি যেন সনাতন আমাদের ধ্যানপ্রাপ্য শিল্প-সুষমারই রিক্থ। ঐতিহ্যগত এই মুক্তি তিনি টের পেয়েছিলেন এক পা বিচলিত হবার আগেই, 'এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে নিস্তব্ধ তাহার জলরাশি'—কম্প্রহীন সেই 'অনন্ত জীবনে'র অনুমানে নিজেকে খুঁড়ে আনতে পেরেছিলেন আত্মবিবর থেকে : 'দেখিব না আর নিজেরই স্বপন বসিয়া ঘরের কোণে'—জগৎফুলের কীট, কীটের অধম কীট, নিজেরই অভ্যাসে গ্রস্ত আঁধার ছায়া—তাকে তিনি ডেকে নিতে পেরেছিলেন আবিশ্ব কিরণমণ্ডলে

আজিকে বারেক ভ্রমরের মতো
বাহির হইয়া আয়।

আহ্বানসঙ্গীত, 'প্রভাতসঙ্গীত'।

এইখান থেকেই উত্তরণ হল যাকে রবীন্দ্রপ্রস্থান বলে জানি সেই পবাদর্শনের প্রবাল দ্বীপে। 'এ চিরজীবন তাই আর কিছু কাজ নাই, রচি শুধু অসীমের সীমা'—কেবল অনন্তকে রূপাপিত করবার ব্রত, আর কিছু নয়, কেবল পূর্ণ সৌন্দর্যের অভিমুখিতা। আগেরটি জার্মান রোম্যান্টিক ভাবনা-আদর্শের—শেলিঙ-এর এক প্রস্তাবনার মতো

অবিকল, দ্বিতীয়টি উপনিষদ-বৈষ্ণবীপুরাণ-প্রতীচ্য রোম্যান্টিকদের আফলাতুনী আদর্শের রাবীন্দ্র-সংমিশ্রণ।

স্পষ্ট উদ্দেশ পেলেন এক শান্তিনিকেতনের—যেমন বিশ্রুত হার্মিটেজটি রুশোর: 'প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি'। বিহারীলালকে বিব্রত করেছিল যে পাষাণ কলকাতা, সেই নগরকলুষের আঁচ মুছতে খুঁজে পেলেন চরাচরব্যাপী অনাঘ্রাত নিসর্গ: 'বোলপুরের মতো এমন সুগভীর শান্তি এবং বিরাম আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যেত না'—এই রাঢ় বাঙলা, আরেক দিকে নদী-হার পরা উত্তর-মধ্য বাঙলার গ্রামভূমি—'ছিন্নপত্রে'র প্রত্যক্ষতাভীরু জীবনীর সুকুমারী নায়িকা আঁকলেন সেই বিশল্যকারিণী মৃন্ময়ীকে—নগরবাসী কবি ছাড়া গ্রামীণ মানুষের সে পাওয়ার নয়।

'ভের্টরে'র আত্মনাশা গ্রন্থকার আরোগ্যপত্রী লিখতে পেরেছিলেন 'ভিলহেল্‌ম মাইস্টার'এ, বিশ্বাসের বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে। জগৎবন্ধনে বৃত হয়ে তবেই সেই জগতের স্বাভিপ্রায়ী রূপ দেওয়া যায়, এই বিশ্বাস নিয়ে রবীন্দ্রনাথও ফিরেছিলেন সমাজমণ্ডলীতে। যে বহুপ্রসারী জনমিলনের প্রবণতা শিলার দেখতে পেয়েছিলেন গ্যেটের স্বভাবে, সেই অন্তরঙ্গ সামাজিকতার ধর্ম রবীন্দ্রনাথেরও বাল্যরচনার মধ্যেই স্বীকৃত হয়েছিল। 'জগতের বিরোধী হওয়াও যা, নিজের বিরোধী হওয়াও তা'—এই উপলব্ধি 'ধর্ম' নামে আদিরচনার বিষয়, প্রকাশ চৈত্র ১২৯০। 'ভালো করে পড়িব এ জগতের লেখা'—এই সংকল্প 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' প্রকাশিত, ১২৯১ সালে। তারপর, কালো ফোঁটার মতো জগৎফুলের কাটকে পুণ্যজাগরণ এসে আশ্লেষ করল এক অলৌকিক প্রভাত-উৎসবে। তাঁর হৃদয় গেল খুলে, সারা জগতের শত শত হাস্যমুখ মানুষ বাহু বিস্তার করে এসে তাঁকে মীলিত করে তুলল। 'খাসমহলের দরজা'র মুখের লেখাটিই হল: 'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।' রচনাবলী-সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন, এই কথাই 'পরবর্তী আমার কাব্যের অন্তরে অন্তরে বার বার প্রবাহিত হয়েছে।'

এই সেই শুভযোগ ঘটল তাঁর জীবনে। জমিদারি দেখাশোনার উপলক্ষ করে একটি বাস হল তাঁর নদীর উপরে, বজরাতে। ক্রমে নিজেই রূপকথার মতো হয়ে উঠলেন তিনি নদীর ধারা, ছোটগল্পমালার মানুষী গ্রাম্য দু-পাড়ে দু হাত ভর করে ভেসে চলেছে নদী—আপাতসরল লেখাটির উল্লেখ করি এইখানে: 'নদী'। স্বপ্নভঙ্গের পরে নির্ঝরিণীর প্রবাহ নেমে এসেছে দু-পাড় টানা 'মাটির দেশে'

হেথা যেথায় মোদের বাড়ি
নদী আসিল দুয়ারে তারি···

মেয়েরা জল নিয়ে যাচ্ছে নেয়ে উঠে, ছেলেরা সাঁতার কাটছে, জেলে জাল ফেলে আছে, সারি গাইছে নৌকোর দাঁড়িরা, সার সার পুরোনো শিবালয়—কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে

দু বেলাতে, মাঠ ভর্তি কলাই শর্ষে আর ধান—রৌদ্র বেড়ে উঠছে চাষার গলার গান ডুবিয়ে, নিবিড় আখবনে শালিক চরছে একা একা, একটু এগোতেই কলরব সহকারে গাছপালাপল্লীর মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে মানুষের স্রোত—'বাস্তবিক এরা যেন আমার একটি দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক'। শহরে জাগ্রত হয়ে ছিল এক দেশব্রত। গ্রামের পাশে মিলে তাঁর জন্য বিস্তার করে দিল উভতীরের সামাজিক পুনর্বাসন।

ফলে অনায়াস হল বোদলেয়ারের মর্বিডিটি থেকে গ্যেটের স্বাস্থ্যশ্রী, বোদলেয়ার মর্বিডিটির প্রতীক, গ্যেটে স্বাস্থ্যের—লিখেছেন টি. এস. এলিয়ট। যে শিল্প মধুসূদনের কাছে নিরুপায় তরণী, শেষ অবধি ঠেলে দিয়েছিল তাঁকে বারদরিয়ায়, সে হয়ে উঠল সোনার তরী, নিরুদ্দেশ যাত্রাও বিহিত হয়ে উঠল লক্ষ্যাগ্র সঙ্কেতে, ক্রমশ, 'ক্ষণিকা'র নিরুদ্দেশের পথিক 'বলাকা'র পথে পেলেন ধ্রুবলোকের লক্ষ্য।

এই স্বাস্থ্য নবীনদের স্বাভাবিক ঠেকে নি। 'রবি-মণ্ডলী'র কবিরাও জানতেন, কবি-প্রবর্তনার জন্য প্রয়োজন 'মোটের উপর সুখেরই মাত্রা'র আধিক্য। কিন্তু মোহিতলাল দেখেছিলেন, 'অন্তরে যার অসুখ অপার, সেই জন হয় কবি।' তাঁর অপার্থিব শিল্পলাবণ্যের মুখোমুখি অচিন্ত্যকুমার লিখেছিলেন, 'বেবাক বুকেতে কাদা পচিয়াছে, পড়েছে চাকার দাগ…'। তাঁর লেখার নৈপুণ্য কৃত্রিম লেগেছিল বলে বিষ্ণু দে আগেভাগে বলে নিয়েছিলেন, 'হেথা নাই সুশোভন রূপদক্ষ রবীন্দ্রঠাকুর'। তাঁর পল্লীপ্রয়াণ পলায়নী মনে হয়েছিল বলে এই কবি 'নগরের ভিড, ব্যর্থ দিনের জ্বালা', আরো পরে সমর সেন 'মহানগরীর বিবর্ণ দিন ও আলকাতরার মতো রাত্রি'র কথা লিখতে বসেছিলেন সবিস্তারে। 'ঘূর্ণচক্র জনতাসংঘের মহা-আসঙ্গ' রবীন্দ্রনাথেরও অভিজ্ঞতায় ছিল, হয়তো এত বড 'দুষ্টশ্বাস জনতা-আঁধার' সে নয়, কিন্তু তখনই ডেকে নিল তাঁকে কৌতুকময়ী জীবনদেবতার আহ্বান: 'কেন রাখিলে না সবার জগতে জনতার মাঝখানে?' এই আকুতি আবরণ করে ভেসে উঠল জনরবরিক্ত সিন্ধুতীরের এক গুহানগরী—অবিকল 'স্বপ্নরচিত-মতো' অজানা পুরী—কনকশিকলে সোনার প্রদীপ থরে থরে, কনকরজতরতন জড়ানো যবনিজাল, মণিপালঙ্কের দুধারি উড়ছে গন্ধধূপ —রূপকথা-বালাদিকার জগৎ। সেই সঙ্গে আরো প্রাচীনতর এক নিসর্গবিসার, যে 'প্রাচীন পৃথিবীতে কেবল সৌন্দর্য এবং মানুষের হৃদয়ের জিনিসগুলো কিছুতেই পুরোনো হয় না।'

এই প্রাচীন পৃথিবী কি আড়াল হয়ে গিয়েছিল নবীনদের জন্মের আগেই? সবচেয়ে স্পর্শজাগর, জীবনানন্দ, লিখেছেন, 'আমরা পাই নি এসে পৃথিবীর প্রথম যৌবন', তারপর: 'একটি পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের আগে', আরো: 'সময় কীটের মতো কুরে খায় আমাদের দেশ।' কী করে স্বজন মানবেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে?

তাঁদের দৃষ্টান্ত বরং রইলেন মধুসূদন—তদগতির অত শাসন-আয়োজনেও সুযত হয় নি যাঁর আত্মরাগ। সৌন্দর্য যাঁকে অবিকাশে ডুবিয়েছিল। 'কল্লোল-প্রবর্তিত বোহিমীয় হাবভাব'ও সহজে উৎস পায় পূর্বজ এই কবির কাছে, যাঁকে 'নির্বীজ' রায় লিখে বুদ্ধদেব বসু আসলে রবীন্দ্রনাথেরই আক্ষরিক প্রতিধ্বনি করেছেন। রবীন্দ্রোক্তিটি এই :

> তিনি যে ফল ফলালেন তাতে বীজ ধরল না। তাঁর লেখা সন্ততিহীন হল। উপযুক্ত বংশাবলী সৃষ্টি করল না।
>
> —সাহিত্যরূপ, 'সাহিত্যের পথে'।

ঋণ স্বীকার দেখি সুধীন্দ্রনাথের কাছ থেকে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বা মোহিতলাল মজুমদারের পক্ষপাতের তুলনায় সে স্বীকৃতি মূল্যবান। হয়তো তা প্রকরণের দিক চেয়ে, কিন্তু বিষ্ণু দে যখন লেখেন

> তাঁর [রবীন্দ্রনাথের] নক্ষত্রবিহারী প্রতিভা বাঙলার রসালো মাটিতে মানুষ আমাদের প্রাত্যহিক বাস্তবতায় বিরাজমান থেকেও বহু উর্ধ্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সেখানে মধুসূদন বা দীনবন্ধু বরং আমাদের চেনা অগ্রজ।
>
> বাঙলা সাহিত্যে প্রগতি, 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ'।

যোগসূত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ কি তবে পাশে সরে দাঁড়িয়েছিলেন স্বাভাবিক ইতিহাসপ্রবাহিনীর? হয়তো। যে ভাবে তাঁরও আগে মধুসূদনের থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। যে ভাবে বিরুদ্ধ আবর্তের মুখে মধুসূদনের মতো উজ্জ্বল পরাজয়ে ভেসে না গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের আস্তিক্য গড়তে বসেছিল প্রাকার ও সুগৃহ।

'কল্পনা' কাব্যের গোড়াতে দুঃসময়ের প্রান্তসীমানায় 'নিবিড় তিমির আঁকা' এক দিশাহারা উষার আভাস দেখা যায়। সেই নতুন উদয়টি প্রত্ন সৌভাগ্যের বরাভয় দিয়ে সম্ভব করে তুলতে বসলেন রবীন্দ্রনাথ। হৃদয়পীড়ায় প্রসূত যে গীতিকাব্য ছিল তাঁর বালকবয়সের, তাকে শমিত-দমিত করে পেলেন সত্য ধর্ম : 'মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট।' ব্যক্তিসীমানা ছাড়াতেই জানতে পারলেন বিশ্বমানবচিত্তের দায়ভাগ। সঙ্গসন্নিধির বর্তিকটুকুও পাওয়া গেল :

> বহুকাল আগে 'কড়ি ও কোমলে'র একটি কবিতায় যে লিখেছিলুম—'মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই' তার মানে হচ্ছে, এই মানুষ যেখানে অমর সেইখানেই বাঁচতে চাই।

অতএব জনসংবেদনধন্য অকৃতার্থ নাটকী নায়ক হয়ে ওঠা হয়ে উঠল না আর, বাঙলা রেনেশাঁসের 'সমগ্রমানবী'য় আদর্শ, আর দিকে নবজীবনোৎসুক দেশকালের 'বিশ্বকর্মা'র সামাজিক দায়—সেই সমাজকৃত্যেও যদি বা জন্মাল তিক্ততা : 'আমি চাই নে হতে

নববঙ্গে নবযুগের চালক' কিংবা 'লোকালয়ে আমি লাগিব না কোনো কাজে'—তখনো রইল বিশ্ব-ভারতী—যত্র বিশ্ব ভবত্যেকনীড়ম্।

> বঙ্কিম যে যুগ প্রবর্তন করেছেন আমার বাস সে যুগেই। সেই যুগকে তার সৃষ্টির উপকরণ যোগানো এ-পর্যন্ত আমার কাজ ছিল।
>
> পঞ্চাশোর্ধ্বম, 'সাহিত্যের পথে'।

পরিণত বয়সের এই আত্মপরিচয় আরো তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে অতঃপর।

৪

রবীন্দ্রনাথের এই স্বীকারোক্তির উপরপিঠটি সামাজিক, কিন্তু তলায় একটু কাব্যতন্ত্রও রয়েছে। বলা যায়, নন্দনতত্ত্বের দিক দিয়ে, বঙ্কিমচন্দ্র অবধি দোষমুক্ত গুণযুক্ত অলঙ্কারশোভিত রসঘন বাক্য কাব্যের মর্যাদা পেয়ে আসছিল, রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে প্রবর্তন করলেন ধ্বনিপ্রস্থানের। বা তারও বেশি। বিশ্বনাথের বিধান অস্বীকার করে মধুসূদন যার সূত্রপাত করেছিলেন বাঙলা সাহিত্যকে সেই বিশ্বসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে যথার্থ প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। হয়তো, 'কবি ধর্মের একজন প্রধান সহায়' বঙ্কিম-কথিত এই 'ধর্ম' রবীন্দ্রনাথের হাতে অর্থপ্রসার পেয়েছে। 'যথার্থ যে মঙ্গল প্রয়োজন সাধনের উর্ধ্বেও তাহার একটা অহেতুক আকর্ষণ আছে'— মাঙ্গল্যকেও তিনি দিয়েছেন এই অতীন্দ্রিয়। কিন্তু শুধু নান্দনিক দিক দিয়েও 'যাহারা কুকাব্য প্রণয়ন করিয়া পরের চিত্ত কলুষিত করে তাহারা তস্করাদির ন্যায় মনুষ্যজাতির শত্রু'—বঙ্কিমী এই শর্তের উপর তাঁর আন্তরিক অসমর্থন ছিল বলে মনে হয় না। 'চিত্তবিকারজাত' আধুনিকতা—যাকে এক সময় তিনি 'ল্যাঙট-পরা গুলিপাকানো ধুলোমাখা আধুনিকতা' নাম দিয়েছিলেন—হয়তো তাকে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো করে বলতে পারলেই খুশি হতেন, শেষ অবধিও এই যে তার বর্ণনা করেছেন:

> Its expressions are grimaces like the cactus of the desert which lacks modesty in its distortions and peace in its thorns in whose attitude an aggressive discourtesy bristles up, suggesting a forced pride of poverty···
>
> 'The Religion of an Artist' পৃ. ২০

বঙ্কিমের চেয়ে কি এ কম?

বোঝা যায় অনপনেয় সামাজিকতার কারণেই এই দায়। তাঁকে সেই কাব্যের পক্ষপাতী হতে হল যে কাব্য বক্ররহিতরূপে মহৎ। যদিও জীবদ্দশাতেই মহৎ

কাব্যকে কূল ভেঙে নেমে আসতে দেখতে হয়েছিল তাঁকে; তাতেই যেন আরো রক্ষণশীলতা। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে। কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য—চিত্তশুদ্ধি', তাঁর হাতে এই 'চিত্তশুদ্ধি'রই আরো স্নানমার্জনা। তার কারণ 'নীতি' শব্দটি নবীনদের অভিধানে আর স্বমহিম ছিল না, অর্থচ্যুতি হয়েছিল 'সুন্দরে'রও। 'সুন্দরী সে প্রকৃতিরে জানি আমি মিথ্যা সনাতনী/ সত্যেরে চাহি না তবু সুন্দরের করি উপাসনা' মিথ্যা-সুন্দরের এই সমবায় কিভাবে আত্মস্থ হবে সুন্দর যাঁর 'প্রত্যক্ষ দেবতা' ('ছিন্নপত্রাবলী' ১৯৭)। এই আরক্ষা অতএব: 'সত্যের যথার্থ উপলব্ধিমাত্রেই আনন্দ, তাহাই চরম সৌন্দর্য' ('সাহিত্য' পৃ. ৮৫)। সনাতন আর্যোক্তি, হয়তো বা এই মুহূর্তেরও।

সত্য-সুন্দরের উপলক্ষে কীট্‌সের প্রসিদ্ধ কাব্যবাণীটি নানা সময়ে সাক্ষ্য মেনেছেন রবীন্দ্রনাথ। যেমন

১. আধুনিক কবি বলিয়াছেন: Truth is beauty, beauty truth—আমাদের শুভ্রবসনা কমলালয়া দেবী সরস্বতী একাধারে Truth এবং Beauty মূর্তিমতী।

'সাহিত্য' পৃ. ৫১।

২. এই কথাটা যে দিন প্রথম স্পষ্ট করে মনে এল সে দিন কবি কীট্‌সের বাণী মনে পড়ল—Truth is Beauty

'সাহিত্যের পথে' পৃ. ৯৮।

৩. এইরকম সংশয়ের সময় কবির বাণী মনে পড়ে—Truth is beauty অর্থাৎ সত্যই সৌন্দর্য।…শেষ কথা হচ্ছে: Truth is beauty।

'সাহিত্যের স্বরূপ' পৃ. ৫, পৃ ৮।

উদ্ধৃতিতে ঝোঁক ঈষৎ অন্যত্র। যথাযথ উদ্ধৃতিও আছে, যেমন 'সাধনা'য়

This is the ultimate object of our existence, that we ever know that beauty is truth, truth beauty ··

দি রিয়ালিজেশন অফ বিউটি, 'সাধনা' পৃ. ১৪১।

মূল পংক্তিদুটি হল

Beauty is Truth, Truth Beauty—that is all
Ye know on earth, and all ye need to know.

এবং আসলে এর প্রথম অংশটিই যে তাঁর অভিপ্রায় তা ফুটেছে চিঠির জবানিতে

What the imagination siezes as beauty must be truth.

২২ নভেম্বর ১৮১৭য় লেখা পত্র।

সুন্দর যাঁর পরমা কাষ্ঠা 'সত্যই সৌন্দর্য'—এই অন্যার্থী ইঙ্গিত কি তাঁর? এই অবস্থ

চিহ্নিত রবীন্দ্রবিশ্বাস : 'সত্যের যথার্থ উপলব্ধিমাত্রেই আনন্দ, তাহাই চরম সৌন্দর্য' (সৌন্দর্যবোধ, 'সাহিত্য')। এলিয়টও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন 'গ্রীশন আর্ন' পড়ে। এই উক্তি কবির আত্মপরিচায়ক ? না গ্রীক ভৃঙ্গারটির বলা নাট্যসংলাপ ?

তবে এর চেয়ে উল্লেখ্য হল, কীট্সের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাধর্ম্যের অল্পই অবকাশ। 'কীট্স্-এর Ode to Grecian Urn কাব্যটি ব্যবহারের অতীত, সুতরাং সুন্দর হওয়াই তার পক্ষে যথেষ্ট'—এই মন্তব্যে বোঝা যায় কেবল সুন্দর হওয়াই রবীন্দ্রকাব্যের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কীট্স্ কবিতাকে যে ভাবে নিহিত হৃদয়ের অভিব্যক্তি বলে বুঝতেন সেই নিছক ব্যক্তি-পারবশ্যকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনতিযৌবনেই প্রত্যাহার করে এসেছিলেন, যেমন গ্যেটে। আর এই ব্যক্তিহৃদয়ে নীতি-তত্ত্বের ছোপ লেগেছে বলে কোলরিজ শেলি ওয়ার্ডসোয়র্থ কাউকে কীট্স্ অনুমোদন করতে পারেন নি। তবু এতবার যে তাঁকে মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের সে কি তাঁর দর্শন-তত্ত্বটি শুদ্ধ-কবির অনুমোদন করিয়ে নিতে ?[২] 'স্বপ্ন ও সত্য' আত্মজীবনীতে গ্যেটে কাব্য-সৌন্দর্যের মধ্যে নীতি-তত্ত্বের সন্ধানীদের তিরস্কার করেছেন, আবার তরুণ মাইস্টার বলেছেন, কবি হবেন আচার্য বা ঋষির তুল্য, দেব-মানবের সখা।

এত শুধু এইটুকু বিশেষ করে বলতে যে শুদ্ধ শিল্পের দিক থেকেও সৌন্দর্য-সর্বস্বতায় রবীন্দ্রনাথের কত দূর অনির্ভর ছিল। যতই বলুন অন্যফলনিরপেক্ষ তাঁর লেখা, হিন্দু শিল্পদৃষ্টিতে ধর্ম ও কাব্যের যে সমার্থ অভিজ্ঞতা তাই মিশে ছিল তাঁর রক্তে। শিল্পী হিসেবে তাঁকেও দেখি গোড়াতেই বিশ্বস্রষ্টার শিবমাঙ্গল্যের বরপ্রার্থী। 'মঙ্গলমূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণস্বরূপ'—এই 'মঙ্গল' আসলে অধ্যাত্মের চেয়েও সামাজিক নৈতিক শুভ।

আধুনিক পরিভাষাতেও ব্যাখ্যা হয় এই চিত্তবৃত্তির। প্রথম বিবেকী আধুনিকেরা সাহিত্য ও জীবনের অন্যোন্যনির্ভর চেয়েছিলেন এবং সুন্দরের সর্বাশ্লেষী সামাজিক রূপ দেখতে পেয়েছিলেন। ফ্রিডরিখ শ্লেগেল বহুপ্রসারী জাতীয় জীবনের চিত্তনির্যাস বলে সাহিত্যের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, পরেকার অনেকেরই তা মনোমতো, গ্যেটে-কোলরিজও তাতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'সহিত' শব্দ থেকে নিষ্পন্ন করেছেন সাহিত্য-বিষয়, সাহিত্যের এই সহিতত্ব কেবল জাতির ভূগোলপ্রসারী নয়, কালের আগুপিছু-বিস্তারও তার মধ্যে আছে।

আদি জার্মান রোম্যান্টিকদের—মরমী নব্য-প্লেটনিস্ট শেলিঙ বা তাঁর জ্যেষ্ঠ অনুসারী নোভালিসের অনেক ভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঐক্য দেখতে পাওয়া যায়। এঁরাও শিল্পের পিছনে বিশ্বস্রষ্টার ইচ্ছা দেখেছিলেন, নোভালিস কবিকে বর্ণনা করেছিলেন

২. কীট্সের লেখাও অবশ্য সর্বতত্ত্বরিক্ত জাদুকরী সুন্দর মাত্র নয়, সে নিয়েও কম আলোচনা হয় নি।

সেই বিধাতার পরিচয়, বা কবিপুরোহিত বলে। শেলিও বলতেন, শিল্প হল অরূপ-সাধনা। তাঁর মতে নন্দনদৃষ্টি শীলিত প্রজ্ঞার প্রাপ্য, সত্য ও মঙ্গল একমাত্র সুন্দরের মধ্যেই একত্র সমাহৃত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথকে শেষ দিকে বারবার বলতে শুনি: 'আমি তত্ত্বজ্ঞানী গুরু বা নেতা নই' এবং 'মানবকে গম্য স্থানে চালাবার দাবি রাখি নে' তাইতে বোঝা যায় তাঁরও ভূমিকা।

আসলে বরাবরই তাঁর লেখা স্পষ্ট সত্যের, স্পষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখী। ব্যক্তি-সমাজের সংস্কর্তা, এবং সুনির্দেশিকা। 'এর চেয়ে গম্ভীর আমি হতে পারব্ না' বললেও সে লেখা সত্যব্রত ছেড়ে একবারও নামতে রাজি এমন নয়।.

আর এই দিকেও নবীন আধুনিকদের সঙ্গে তাঁর মনান্তর। হয়তো নবীন কবিদের স্কন্ধে জাতীয়-সামাজিক কোনো বড় দায় ছিল না, তাঁরা নিশ্চিন্তে জড়ো হয়ে ছিলেন তাই কলাকৈবল্যের যৌথশিবিরে। আর রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবীর কাছে যেতে হয়েছে ভারতীয়তার প্রতিনিধি হয়ে, যুদ্ধে-টেকনোলজিতে রোগার্ত প্রতীচী তাঁর কাছ থেকে পেলেন রোমা রোলাঁ-কথিত সেই 'vast tranquil metaphysic of India'। তরুণ মার্কিন কবি তাঁর পদতলে বসে নিজেকে দেখতে পেলেন অশ্ম-লগুডধারী বর্বর বলে। রবীন্দ্রপদাবলীর অনন্ত প্রশান্তিতে বহু-মুগ্ধতা প্রকাশ করার পরও এজরা পাউণ্ড লিখেছেন, স্বজাতির পররাষ্ট্র-দফতরের কর্তব্য অতি বিচক্ষণ ভাবে সম্পাদন করেছেন এই কবি। তা হলে সে শুধু কবিতার করণীয় নয়।

কবিতার প্রভাবও কম ছিল না। 'গীতাঞ্জলি'র কবিতা পড়ে প্রবীণ স্টপফোর্ড ব্রুক হেনরি ভন-এর লাইন উদ্ধৃত করে লিখেছিলেন: কবিতায় পরিপূর্ণ এই লেখা—'bright shoots of evarlastingness'—and I am often carried away into the infinite with a whirling pleasure'। আর তরুণ ইয়েট্‌স্ প্রথম বারেই গ্রস্ত হয়েছিলেন 'গীতাঞ্জলি' পড়ে: এই কবিতার ভাবনায় এমন এক জগৎ রয়েছে যার স্বপ্ন আমি দেখেছি সারা জীবন। ইয়েট্‌সের আধুনিক কবিতা সংকলনে রবীন্দ্রনাথের যে সাতটি কবিতা গৃহীত হয়েছে তার একটি 'In The Dusky Path of a Dream', এই কি সেই স্বপ্ন? 'দি রোজ' কাব্যের 'যে লোকটি পরীরাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিল,'[৩]-কবিতার অজেয় দূরের যে স্বপ্ন? স্বপ্ন থেকে রূঢ় সত্যের ভেতরে নেমে এসেছিলেন কবি ইয়েট্‌স্। অনতিকালমধ্যে।

ইয়েট্‌সের কাব্যের পালাবদলের মূলে রবীন্দ্রনাথের কিছু প্রভাব আছে। কবির জবানি তুলেছেন রিচার্ড এলম্যান যেখানে ইয়েট্‌স্ স্বীকার করেছেন ১৯১২ সাল

৩. কবিতাটির প্রথম পাঠের বিশেষ করে উল্লেখ করি, পরবর্তী সংস্কার নয়।

থেকে তাঁর রক্তে আলোড়ন তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯১৪য় প্রকাশিত 'রেস্‌পনসিবিলিটিজ্' কাব্য এবং তার 'এ কোট' নামে 'ছন্দোবদ্ধ ম্যানিফেস্টো' 'গীতাঞ্জলি'রই একটি গানের অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত। তবু 'গীতাঞ্জলি'র পাশে 'এ কোটে'র রীতিপারুষ্য এই বিশ্বাসকে একটু ব্যাহত করে। আর যখন জানা যায় এই সময়েই গ্রীয়র্সন-সম্পাদিত ডান্-এর কবিতার বই তাঁর হাতে এবং পাশ থেকে এজরা পাউণ্ডের নব্যতার প্রবর্তনা, তখন ইয়েট্‌সের ভাবাবেগ-রেটরিক-রিক্ত আধুনিক প্রতীকবাদের মনে হয় সহজতর উৎস পাওয়া গেল।

স্বপ্নভঙ্গ হবার পর ইয়েট্‌স্ স্মৃতি নির্ভর না করে নেমে এলেন হাওয়ার তাণ্ডবে। পরে নিলেন চার্লস-বন্দলের নতুন মুখোশ, প্রতিবাদী আত্ম-বৈপরীত্য। 'উইণ্ড অ্যামঙ দি রীড্‌সে'র কবিকে দেখতে হয় **'A cursing beggar with a merry face, / A bundle of rags upon a crutch'**—আত্মপরিহাস করছেন, যেন কেবলই যেতে না হয় বাতাসের ঠেলায় ঠেলায়: *'Beggar to beggar cried, being frenzy struck,/* **'And make my soul before my pate is bare.' / 'And get a comfortable wife and house / To rid me of the devil in my shoes,'** ক্রমে দেখা গেল কেল্টিক উপকথার ভূ-সংস্থান ঢেকে অন্য দেশকাল তাঁর লেখাতে, এলিয়টী পতিত দেশের রুক্ষতা এই কবিতায়

> **Things fall apart ; the centre cannot hold ;**
> **Mere anarchy is loosed upon the world,**
> **The blood dimmed tide is loosed, and everywhere**
> **The *ceremony* of innocence is drowned…**
> **—The Second Coming, 'Michael Robartes and the Dancer.'**

'Ceremony' : পুরোনো ঐতিহ্যায়ত শালীন সংস্কৃতির এই হল পারিভাষিক শব্দটি ইয়েট্‌সের। সে যদি ডুবল, পুরোনো ঘরের মানুষটি কোথায় দাঁড়াবেন এই নিরর্থ সময়ের ? 'দি টাওয়ারে'র শুরুর এই প্রশ্ন :

> **What shall I do with this absurdity**

'হে হৃদয়, বিক্ষত হৃদয়—' অর্থহীন সময়টি কবি দেখছেন এই তিক্ত নিরাশ্বাস চোখে,

> **this caricature,**
> **Decrepit age that has been tied to me**
> **As to a dog's tail ?**

জীবনানন্দ এইভাবে দেখেছিলেন ক্ষয়-ধরা মুহূর্তটি। অদ্ভুত এক আঁধারের বিলোল ভিড়ের ভেতর অসহায় কবির স্পন্দন বহন করে দেখি দাঁড়িয়ে আছেন। এই

জীবনানন্দই বলেছেন, এই এক শতদীর্ণ সময়ের মধ্যে 'অন্তত যারা আধুনিক বিশিষ্ট বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথকে তারা বিস্পষ্ট সম্ভ্রমে প্রণাম জানিয়ে মালার্মে ও পল ভার্লেন, র্যাঁসার ও ইয়েট্‌স্ ও এলিয়ট-এর সদর্থক বা নঞর্থক মননবিচিত্রতার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।' দাঁড়াল সহায় খুঁজতে, সহজ বুদ্ধিতে। ভারতীয় স্বস্থতা বা বাঙালি হিতবাদে আর সঙ্কুলান হল না। দেখি বুদ্ধদেব বসু বৃহৎ-বোদলেয়ার তর্জমা করতে ব্যাপৃত, বিষ্ণু দে এলিয়ট থেকে শুরু করে আবিশ্ব সমানধর্মাদের, মার্সার্মের কবচ ধরে সুধীন্দ্রনাথ, আরো কবিরা বেরিয়ে পড়েছেন সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত ঢুঁড়তে। একা কুম্ভ রক্ষা করতে দাঁড়িয়ে আছেন নকল বুঁদিগড়। Ceremony। জন্মজন্মান্তরের ঘর ছেড়ে কালস্রোতে ভেসে যাওয়া সহজ যিনি ভ্রূণ থেকে বেড়ে উঠেছেন তার মধ্যে? 'নকল' শব্দটি শিষ্ট নয়, ঠিকও নয়; বলতে চান, যা গত কালের। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কাছে চিঠিতে যে আত্মবিশ্লেষণ করেছিলেন: 'বৈষ্ণব সাহিত্য এবং উপনিষদ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈরি করিয়াছে। নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন যেমন মেশে তেমনি করিয়াই তাহারা মিশিয়াছে'—এর থেকে বেরোবার যে আর উপায় নেই এই তার গৌরবটুকু মনে হতে পারে অভিমানের মতো। তারপরেও এই কথাও মুখ ফুটে বলতে দেখি, 'কবি যদি ক্লান্ত মনে এমন কথা মনে করে যে, কবিত্বের চিরকালের বিষয়গুলি আধুনিক কালে পুরোনো হয়ে গেছে তা হলে বুঝব আধুনিক কালটাই হয়েছে বৃদ্ধ ও রসহীন।'

৫

শেষজীবনের এক কাব্যগ্রন্থ থেকে উৎসর্গলিপিটি উদ্ধার করি

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

কল্যাণীয়েষু

> বয়সে তোমাকে অনেক দূরে পেরিয়ে এসেছি, তবু তোমাদের কালের সঙ্গে আমার যোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে, এমনতরো অস্বীকৃতির সংশয়বাক্য তোমার কাছ থেকে শুনি নি। তাই আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ করবে আশা করে এই বই তোমার হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম। তুমি আধুনিক সাহিত্যের সাধনক্ষেত্র থেকে একে গ্রহণ করো।

প্রায় ন-বছর আগের 'তন্বী'র গৌরচন্দ্রিকার সঙ্গে এই উপহারের ভাষার সম্বন্ধ ধরা পড়ে। আরো চোখে পড়ে উপহৃত এই কবিতাগুচ্ছে অল্পবয়সের রূপকথার উঁকিঝুঁকি—যেন অনুচ্চ স্মৃতিযাপন করছে অলস পদপংক্তি। শেষ দিকের সব কবিতাই তো মূলত

'স্মৃতিরে আকার দিয়ে আঁকা', পুরোনো ছিন্নপত্রের ভাষাতে 'in deep delved earth ঠাণ্ডা করে রেখে দেওয়া সেই সব পুরোনো স্মৃতির বোতল'

পেরিয়ে মেয়াদ বাঁচে তবু যে সব সময়হারা
স্বপ্নে ছাড়া সান্ত্বনা আর কোথায় পাবে তারা।

সময়হারা, 'আকাশপ্রদীপ'।

কৌতুক করেই বলতে হয় যেমন কৌতুক করে অমিত রায়ের এই বিবৃতি

তাঁর রচনারেখা তাঁরই হাতের অক্ষরের মতো—গোল বা তরঙ্গরেখা, গোলাপ বা নারীর মুখ বা চাঁদের ধরনে। ওটা প্রিমিটিভ, প্রকৃতির হাতের অক্ষরের মক্‌শো-করা।

শুধু স্বযাপিত স্মৃতির মমতা নয়। পুরোনো, প্রাকৃতিক, মিমেটিক। তার বদলে নতুন কবির কাছে অমিতর দাবি 'কড়া লাইনের, খাড়া লাইনের রচনা—তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো; ফুলের মতো নয়; বিদ্যুতের রেখার মতো, ন্যুরালজিয়ার ব্যথার মতো···। এও কৌতুক, 'আমি জনগণের প্রচণ্ড কৌতুক'—নিবারণ চক্রবর্তীর পুরোনোনিসূদন আবির্ভাবে 'উচ্চকিত, আতঙ্কিত' 'রবি ঠাকুরের দল সেদিন চুপ করে গেল'—এতটাই কৌতুক, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন, 'এমন কি অত্যাধুনিক বাঙলা সাহিত্যও যে তাঁকে অল্পবিস্তর প্রভাবিত করে নি এ কথা খুব জোর গলায় বলা শক্ত', তা মনে হয় এই বিবরণের নিহিত প্রতিক্রিয়ার দিকে নজর করলে। এই বিপরীতে গিয়ে দাঁড়াবার ইচ্ছা কালচল হবার খাতিরেই স্বাভাবিক, মারিও প্রাজ্ যে-সন্ধিৎসায় উগোর শেষ দিকের লেখায় বোদলেয়ারের প্রতিধ্বনি খুঁজে পেয়েছিলেন সেই শ্রমে রবীন্দ্রপদাবলীতেও অনুজাতদের ছায়া হয়তো মিলতেও পারে, কিন্তু তার চেয়ে সম্ভবপর বক্তব্য বলেছেন বুদ্ধদেব বসু, নবীনদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যাঁর চোখে ধরেছিল রবীন্দ্রনাথের পরিণত ও আধুনিক মূর্তি: 'তাঁর শেষ পর্যায়ের রচনার ধারা আমাদের কাব্যে নানা ভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে'—আধুনিক বাঙলা কবিতার সংকলন করতে প্রবেশমুখে রবীন্দ্রনাথকেই তিনি প্রথম আসনটি পেতে দিয়েছিলেন।

'লিপিকা'ই বুদ্ধদেবের চোখে রবীন্দ্রনাথের সেই নবকলেবর, 'যে বইতে 'মানসী' থেকে 'বলাকা' পর্যন্ত এক জন্ম শেষ করে রবীন্দ্রনাথ নতুন করে জন্মেছিলেন। 'আধুনিক বাঙলা কবিতা'র প্রথম কবিতা 'সন্ধ্যা ও প্রভাত'—আর যা না থাক, সেখানে গদ্যে তোলা হয়েছে ছন্দের ঝঙ্কার। গদ্যছন্দের মহত্তম পরিচয় তা যুগচ্ছন্দ। এক সময় বুদ্ধদেব আপ্লুত হয়েছিলেন এই যুগোপযোগী কাব্যবাহনের উদ্ভাবনায়, তার চেয়েও তার উপরে রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাতে। এই হয়তো তাঁর বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথের যুগবর্তিতার সবচেয়ে বড় স্বীকার।

শুধু 'লিপিকা' নয়, পরের আরো যে চারখানি বইয়ে তিনি যুগচ্ছন্দের লেখক,

তারও কোথাও কিন্তু রবীন্দ্রাতিগতা সুলভ নয়। প্রস্তাব আছে বটে : 'আজ পালা সাঙ্গ করবার বেলায় দেখি কখন অসাক্ষাতে গদ্যে-পদ্যে রফানিষ্পত্তি চলছে। যাবার আগে তাদের রাজিনামায় আমিও একটা সই দিয়েছি। এক কালের খাতিরে অন্য কালকে অস্বীকার করা যায় না।' কিন্তু সেই অন্য কাল যে তার কোথায়, খুঁজতে হয়। গদ্যছন্দে প্রসঙ্গ তাঁর স্মৃতি, বা শৈশব। যুগ নয় যদি। বলেন—

জটলা-পাকানোর যুগ এটা।
কবিতাকে পাঠকের অভিসারে যেতে হয়
পটলডাঙার অম্নিবাসে চড়ে।

সে অভিযোগ। সব ছাপিয়ে বরং এই ধ্রুপদী নিঃসক্তি—

সকলের নয় যে আঘাত
ধোরো না সবার চোখে।

আর, প্রায় সর্বত্র, বিষাদমধুর গল্প, নয় তো অতিকায় এক অবসর : 'আমার ছুটি চারিদিকে ধু ধু করছে ধান-কেটে-নেওয়া ক্ষেতের মতো।'

যেন পুরোনো মধুর সব গল্পকে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে আধুনিক সাজ বা পুরোনো নিজেকেই। যখন 'গীতাঞ্জলি' তর্জমা করেছিলেন ইংরেজি গদ্যে—শাশ্বত সৌন্দর্যকে কালযোগ্য এই সাজে সাজিয়ে দেওয়ার কথাই কি মনে ছিল? সর্বোপরি, নিজেই জানতেন তাঁর 'কণ্ঠস্বরে গদ্যে রঙ ধরে পদ্যের।'

তবু, গদ্যছন্দই যদি হয় কাব্যের মুক্তির শেষতম, সেই উদ্ভাবনা কি তাঁর? তাতেও কি তাঁকে ব্যাহত করেন নি তিনি নিজেই? রবীন্দ্রপূর্ব-কাব্যভাষা আরো সুডৌল হয়েছে বটে তাঁর হাতে। কিন্তু বেপরোয়া মাইকেলী অমিত্রাক্ষরকে তিনিও ভব্য করে তুলেছেন, দেখা যায় 'নিষ্ফল কামনা'র স্বরচিত দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও মুক্তক-এর দাবি আত্মস্থ করতে তাঁর সময় লেগেছে। 'লিপিকা'র গদ্যছন্দকেও দেখা যায় কথিকার ছদ্মবেশে, দ্বিতীয় ছলনা তার প্রসঙ্গ। 'বিষয়ই যদি প্রথার গণ্ডি ছাড়াতে পারলে না তবে ছন্দের জীবন্মুক্তি কি অসার্থক নয়?'—সুধীন্দ্রনাথের এই অভিযোগ প্রায় অখণ্ডনীয়, কিন্তু তার উপরেও প্রশ্ন থাকে, ছন্দের এইটুকু নিতেও কি তাঁর অনেক দ্বিধা ছিল না? 'শেষ সপ্তকে'র অতৃপ্তিপূরণ দেখতে পাওয়া যায় একই গদ্যিকার ছন্দোবদ্ধ রূপান্তরের মধ্যে। 'পুনশ্চ'র অনেক লেখা সোজাসুজিই সরল ছন্দিত মুক্তক।

গদ্যের ভূমিকা ছিল বঙ্কিমচন্দ্রেও। 'গদ্য পদ্য বা কবিতা পুস্তকে'র তিনটি গদ্যকবিতার কৈফিয়তে তিনি যে ঐতিহাসিক ভূমিকা করেছিলেন আবারও তা স্মরণ করা যায়

> এক্ষণে যে রীতি প্রচলিত আছে যে কবিতা পদ্যেই লিখিত হইবে, তাহা সঙ্গত কিনা, আমার সন্দেহ আছে। ভরসা করি, অনেকেই জানেন যে, কেবল পদ্যই

কাব্য নহে। আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী। বিষয় বিশেষে পদ্য কাব্যের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থানে গদ্যের ব্যবহারই ভালো।

বিষয়বিশেষে গদ্যের ব্যবহারই নিশ্চয় সঙ্গত। কালভেদে কবিতার বিষয়ও হয়ে পড়ে ব্যাপকতর—তাকে ছড়িয়ে পড়তে হয়, তাকে নেমে আসতে হয় 'মধ্যবিত্তমদির জগতে'। যদি কালের সাক্ষী হতে চান তো কালের প্রবণতাও গ্রাহ্য না করে উপায় থাকে না কবির। কিন্তু কে বলবে কাব্যবিবাদী এই কালের অসার সাক্ষ্য লিখতে মন ছিল রবীন্দ্রনাথের? বিপিনচন্দ্রদের প্রতিধ্বনি না করেও প্রশ্ন জাগে, কোনোদিন গৃহস্থপাড়ায় নামিয়ে নিতে চেয়েছিলেন কি তিনি কবিতাকে? বা নিজেকে?

শেষ দিকে টুকরো অসম্বৃত গার্হস্থ্য কোথাও আছে, কিন্তু সে লেখা রীতিগতভাবেও দু-ভাগে গাঁথা: তথ্যচিত্র পূর্ব-ভাগে, দ্বিতীয়াংশে কবির চিহ্নিত নিজস্ব। উল্লেখ করি:

রাস্তার ওপারে
বাড়িগুলো ঘেঁষাঘেঁষি সারে সারে।···
যা-খুশি প্রসঙ্গ নিয়ে
ইনিয়ে-বিনিয়ে
নানা কণ্ঠে বকে যায় কলস্বরে।···
কথা-কাটাকাটি চলে গলাগলি চলিতে চলিতে।···
একই সুরে দম দিয়ে বার বার
গ্রামোফোনে চেষ্টা চলে থিয়েটারি গান শিখিবার।
কোথাও কুকুরছানা ঘেউ-ঘেউ আদরের ডাকে
চমক লাগায় বাড়িটাকে।
শিশু কাঁদে মেঝে মাথা হানি,
সাথে চলে গৃহিণীর অসহিষ্ণু তীব্র ধমকানি।
তাস-পিটোনির শব্দ, নিয়ে জিত হার
থেকে থেকে বিষম চিৎকার।···
হেথা দ্বার বন্ধ হয় হোথা দ্বার খোলে,
দড়িতে গামছা ধুতি ফর্‌ফর্‌ শব্দ করি ঝোলে।
অনির্দিষ্ট ধ্বনি চারি পাশে···
সিঁড়িতে আসিতে যেতে
রাত্রিদিন পথ স্যাঁতসেঁতে।

বেলা হলে ওঠে ঝন্‌ঝনি
বাসন-মাজার ধ্বনি।
বেড়ি হাতা খুন্তি রান্নাঘরে
ঘরকরনার সুরে ঝংকার জাগায় পরস্পরে।···

কবি আছেন স্পষ্ট ব্যবধানে, রাস্তার এপার থেকে দেখছেন—'ওইখানে ঘনীভূত জনতার বিচিত্র তুচ্ছতা', আর জানছেন মনে মনে

আপনার উচ্চতট হতে
নামিতে পারে না সে যে সমস্তের ঘোলা গঙ্গাস্রোতে।

ঘোলা-জলের এই সমস্তের বাস্তবিকতার সামনে তাঁর ব্রাহ্মণ্য আরো মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, বলতে দ্বিধা করেন না,

দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা···
সেথায় উত্তরী ফেলি পরি বর্ম···

পঞ্চাশ বছর বয়সে কবি লিখেছিলেন, 'সাহিত্যে আজ পর্যন্ত আমি যাহা দিবার যোগ্য মনে করিয়াছি তাহাই দিয়াছি, লোকে যাহা দাবি করিয়াছে তাহাই যোগাইতে চেষ্টা করি নাই।' সত্তর পার হয়ে আঁকলেন লোকলিপ্ত দুটি উজ্জ্বল গলির ছবি, ছোটবেলার বেলফুল-হাঁকা স্বপ্নছায়া-গলি নয়—কিন্তু সেখানেও এই শৈলি। একটি 'পুনশ্চ'র কিনু গোয়ালার গলি :

গলিটার কোণে কোণে
জমে ওঠে পচে ওঠে
আমের খোসা ও আঁঠি, কাঁঠালের ভূতি,
মাছের কান্‌কা
মরা বেড়ালের ছানা,
ছাইপাঁশ আরো কত কী যে।

আরেকটি 'পুনশ্চ'র গলিরই প্রতিলিপি, 'সানাই' কাব্যের 'অনসূয়া'। কঙ্কাল তথ্য কবি ঢেকে দিয়েছেন প্রথম সুযোগেই

মাঝে মাঝে সুর জেগে ওঠে
এ গলির বীভৎস বাতাসে···
হঠাৎ সন্ধ্যায়
সিন্ধু-বারোয়াঁায় লাগে তান···
তখনি মুহূর্তে ধরা পড়ে
এ গলিটা ঘোর মিছে···

বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে
ছেঁড়াছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে
এক বৈকুণ্ঠের দিকে···

এ লেখা গদ্য-কবিতা নয়। বলা যায়, গদ্যায়ত কবিতা। কিন্তু তাঁর শুদ্ধতম গদ্য-কবিতারও আদিগন্ত মধুরা এক পল্লী, বা প্রকৃতি—নির্বিশেষ, নিঃসাময়িক। আর ঐ রাজিনামার ব্যাপারটিও প্রক্ষিপ্ত। নয়তো তার পরেই আবার কেন ছেলেমানুষি ছড়া। আবার ফিরে-যাওয়া অভ্যস্ত সাধনায়। কেন গৃহস্থপাড়ার ভাষাতেও সেই অনাদিকালের বিরহবেদনা।

ছন্দ নয়, ক্বচিৎ সম্প্রতিস্পর্শী হয়ে উঠতে চেয়েছে তাঁর উপকরণ, এবং তারই সূত্রে ভাষা, বা চিত্র।

১. আবার সে ওই মাইক্রোব-ওড়া পথে
চলিব মোটর-রথে।

২. হাইড্রলিক জাঁতায়-পেষা কাব্যপিণ্ড
বাদলের কালো ছায়া
স্যাঁতসেঁতে ঘরটায় ঢুকে
কলে-পড়া জন্তুর মতন
মূর্ছায় অসাড়।

৩. এ প্রাণ, রাতের রেলগাড়ি,
দিল পাড়ি—

৪. যেতেই হবে।
দিনটা যেন খোঁড়া পায়ের মতো
ব্যাণ্ডেজেতে বাঁধা।

৫. ছেঁড়া মোজা শেলাই করার এল যুগান্তর

ক্বচিৎ এই ছেঁড়া তুচ্ছতা

৬. আনন্দবাজার হতে সংবাদ-উচ্ছিষ্ট ঘেঁটে ঘেঁটে
ছুটির মধ্যাহ্নবেলা বিষম বিতর্কে যায় কেটে।

সিনেমা-নটীর ছবি নিয়ে দুই দলে
রূপের তুলনা-দ্বন্দ্ব চলে…

৭. কাঁঠালের ভুতি-পচা, আমানি, মাছের যত আঁশ,
রান্নাঘরের পাঁশ,
মরা বিড়ালের দেহ, পেঁকো নর্দমায়
বীভৎস মাছির দল ঐকতান-বাদন জমায়।
শেষরাত্রে মাতাল বাসায়
স্ত্রীকে মারে, গালি দেয়, গদ্‌গদ ভাষায়,
ঘুমভাঙা পাশের বাড়িতে
পাড়াপ্রতিবেশী থাকে হুঙ্কার ছাড়িতে।
ভদ্রতার বোধ যায় চলে
মনে হয় নরহত্যা পাপ নয় বলে।

মানুষ-মৃত্তিকার পরিচয় যে তাঁর কত আবছা ছিল, নব্য কবিতায় একটু রাখলেই তা চোখে পড়ে

বিড়ি-ধরানো, পান-চিবোনো, মাদুরে-
চ্যাপটানো প্রাণ।

অমিয় চক্রবর্তী।

চারিধারে সরীসৃপ ধূর্ত নাগরিক
অর্থকামস্বর্গ-ছিদ্র খোঁজে ঘুরে ফিরে।

বিষ্ণু দে।

হাইড্র্যান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল…

জীবনানন্দ দাশ।

শীতের আকাশে অন্ধকার ঝুলছে শুয়োরের চামড়ার মতো,
গলিতে গলিতে কেরোসিনের তীব্র গন্ধ,

সময় সেন।

তবু, জনসন্নিধির আধুনিক ইচ্ছাটিকে কবি মান্য করতে চেয়েছিলেন। 'পটলডাঙার পাঁচালী' কেন, 'পথের পাঁচালী'ও তো তাঁর অভিজ্ঞতার নয়। জনশ্রুতি-অনুমানে বানিয়েছিলেন 'চার অধ্যায়ে'র গলি, সে সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য: 'তার অস্তিত্ব আর যেখানেই থাক, কলকাতা শহরে নেই'। কবিত্বের এই আধুনিক অবলম্বনটি তাঁর স্বস্তির হয় নি।

আধুনিকতার প্রাপ্যেও কি পুরো সায় ছিল? আশ্চর্য লাগে, যন্ত্রসভ্যতার বাইসিকেলটিকেও তাঁর মনে হয়েছিল নিসর্গসঙ্গতির বাইরে, দ্র 'আত্মপরিচয়' ৫। যে উড়োজাহাজটি তখনকার মানববিজয়ের চমকপ্রদ, তার বর্ণনা :

আকাশের সাথে অমিল প্রচার করি
কর্কশস্বরে গর্জন করে
বাতাসেরে জর্জরি।

এর চেয়েও উল্লেখযোগ্য 'পুনশ্চ'র একটি কবিতা : 'অবস্থানে'। কবিতাটির বিষয় একটি চামেলির লতা। সংশয়হীন অবোধ চামেলির অজস্রফুলগৌরবিত কোমল সবুজ ডগাটি গিয়ে ঠেকেছে বিজলিবাতির লোহার তারে তারে, বুঝতে পারে নি যে ওরা জাত আলাদা।

কোথাও কিছু বিরোধ ছিল না,
মৌমাছিদের আনাগোনায়
উঠত কেঁপে শিউলিতলার ছায়া।
ঘুঘুর ডাকে দুই প্রহরে
বেলা হত আলস্যে শিথিল ··

সেই ভরা শরতের দিনে সূর্য-ডোবার সময় যখন মেঘে মেঘে নানা রঙের খেয়াল তখনই হঠাৎ এল বিজলিবাতির অনুচরের দল

চোখ রাঙালো চামেলিটার স্পর্ধা দেখে—
শুষ্ক শূন্য আধুনিকের রূঢ় আয়োজনের 'পরে
নিত্যকালের লীলামধুর নিষ্প্রয়োজন অনধিকার
হাত বাড়াল কেন।

আধুনিক বিজ্ঞানের হাতে সহজা নিসর্গের এই অপঘাত কবি লিখেছেন শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি-নাট্যের কুশলতা দিয়ে।

শিল্পবিস্তারের স্পর্বিত পদক্ষেপে শুধু বিশ্বপ্রকৃতি কুণ্ঠিত নয়, মানুষের আত্মাও। শান্তিনিকেতন তারই হাত থেকে কবির স্বীকৃত আত্মরক্ষা। নগর বেষ্টন করে ফেলেছে শিল্প, পা বাড়িয়েছে নগর ছাড়িয়ে, এই তীক্ষ্ণ কবির ভাষা

ওদিকে ধানের কল দিগন্তে কালিমাধূম্র হাত
ঊর্ধ্বে তুলি, কলঙ্কিত করিছে প্রভাত।
ধান-পচানির গন্ধে
বাতাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
মিশাইছে বিষ।

'বিষ' না থাকলে তীক্ষ্ণতা হয়তো টের পাওয়া যেত না। এর পাশে

মিলের ধোঁয়ায় ঢাকা শরতের নীল নভস্তল

এই আধুনিক কবিকণ্ঠও অনেক নম্র।

এই আধুনিক বেষ্টনীর থেকেই জন্ম লাভ করেছে আধুনিক কবিতা। দোষ কবিতার নয়, দোষ সময়ের। তবু 'অধুনাতনের স্পর্ধা নিয়ে পুরাতনের মানহানি করতে' এসেছে সে, সেই তিক্ততা শতমুখে বলেও যায় না। 'আধুনিক কাব্যে'র আলোচনায় লিখেছেন, 'এই আধুনিক পয়সাটার দাম কম, কিন্তু জোর বেশি, আর এ খুব স্পষ্ট টং করে বেজে ওঠে হালের সুরে।' কবিতাতেও আছে তার কিছু পরিহাস। যেমন 'আকাশপ্রদীপে'

ঘুরে ফিরে অবজ্ঞায় গেল চলে ;
এ ঘরে সকলি ব্যর্থ আরসুলার খোঁজ নেই বলে।

আরো আগে, 'পুনশ্চ'য়

কোনোদিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি কি পেরেছি লিখতে···

তিন মাস আগে লেখা 'আধুনিক কাব্য' আলোচনা থেকে খানিকটা পড়ে নিতে হয়

একজন কবি···বলছেন, 'আমি সবার চেয়ে বড় হাসিয়ে, সূর্যের চেয়ে বড়, ওক গাছের চেয়ে, ব্যাঙের চেয়ে, অ্যাপলো দেবতার চেয়ে।' Than the frog and Apollo—এটা হল ভাঙা কাঁচ। পাছে কেউ মনে করে, কবি মিঠে করে সাজিয়ে কথা কইছে। ব্যাঙ না বলে যদি বলা হত সমুদ্র তা হলে এখনকার যুগ আপত্তি করে বলতে পারত, ওটা দস্তুরমতো কবিয়ানা। হতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি উল্‌টো ছাঁদের দস্তুরমতো কবিয়ানা হল ঐ ব্যাঙের কথা। অর্থাৎ, ওটা সহজ কলমের লেখা নয়, গায়ে পড়ে পা মাড়িয়ে দেওয়া। এইটেই হালের কায়দা।

এই 'হালের কায়দা' নিয়ে 'শেষের কবিতা'য় যা করা হয়েছে তা আপাত-serious, 'সে'-বইয়ে পরিহাসটিকে নিরাবৃত করে দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ, বা পরিহাস, চেনা যায়, যেন আরোগ্যেরই প্রক্রিয়া, আত্ম-পরীবাদটিকে লঘু করে তোলা তার উদ্দেশ্য। পরীবাদ, বা অবসাদ, কবিকে ছুঁয়েছিল 'পরিশেষে'রও আগে, সম্ভবত 'পূরবী'-পর্ব থেকে। 'পূরবী'-পূর্ব কবিতা ছিল আরক্ত-স্বর্ণাভ —লক্ষ্য করেছেন এক ভাষ্যকার, 'পূরবী'তে সেই লাল ও সোনালির বদলে বসেছে শাদা আর নীল রঙ। এই বর্ণবিপর্যয় অন্য দিকেও চোখে পড়ে। এই কবিতাগ্রন্থের বিস্তার জুড়ে 'রক্তপথ শুষ্ক মাঠ' 'শূন্য অঙ্গন', 'শুষ্ক জবা' 'ঝরাকুসুম'

'শূন্য তরী' 'শ্রীহীন শূন্য ঘরে সঙ্গহীন জীবন' 'তৃষিত অন্তরের ক্লান্তি' 'সঙ্গশূন্য সায়াহ্নের বৈরাগ্যনিশ্বাস' ফিরে ফিরে আসে। আর-সব ফুলের মধ্য থেকে প্রধান হয়ে উঠতে চায় অনাদৃত আকন্দ, স্মৃতিমত্ত জুঁই। শুধু তাই নয়। এর আগে কবির সঙ্গে সৌহার্দ্য ছিল সমারোহময় বসন্তবর্ষার, আর এখানে অধিকাংশ গ্রাস করে আছে হিমহাওয়াকাঁপা কুয়াশা-নিরালোক ফুরিয়ে যাওয়া শীত। যেন আসন্ন-শেষ ছায়া ফেলেছে পথে, যেন আগ্রাসী তিমির থেকে আর অব্যাহতি নেই। উপমাতেও সেই ক্লান্ত অবক্ষয়। বিশেষ করে 'পরিশেষে'র উল্লেখ করে বুদ্ধদেব বসু একাধিকবার বলেছিলেন, এই বই থেকেই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আধুনিক শৈলী ও আধুনিক প্রসঙ্গ অবারিত হয়েছে। 'পরিশেষ' কাব্য বিশ্লেষণ করে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন তার অন্ধকার বর্ণলেপ: 'রাত্রির ভাবানুষঙ্গে আগত শব্দরাজি, কৃষ্ণবর্ণ এবং অন্ধকারবাচক শব্দচিত্রের যেন যথাতথাই সাক্ষাৎ মেলে পরিশেষ কাব্যগ্রন্থে।' এবং 'এ রাত্রি নক্ষত্র-খচিত বা জ্যোৎস্নাপুলকিত কাব্যখ্যাত রাত্রি নয়। খেয়ার অরূপসাধনার দুঃখরাতের রাজা আসবেন সেই ঝড়ের রাত্রিও নয়। এ রাত্রির একমাত্র পরিচয় এ মসীকৃষ্ণ। এ যেন কতকটা হতাশাব্যঞ্জক।' বস্তুত 'পরিশেষে' যে 'গোধূলির ধূসর প্রহর' 'দিশাহারা নিশা' 'গন্ধরাজের সারে জমা শুকনো পাতার দৈন্য' 'নৈরাশ্যনিশীথ' 'শূন্যে শূন্যে হতাশ বাতাস'

প্রতারণার ছুরি
পাঁজর কেটে করে চুরি
সরল বিশ্বাস;

'বোবা দুঃখের ভার' 'ভাগ্যের ভ্রূকুটি' 'সোঁদালের ডালের ডগায় কুঁকড়ে যাওয়া পোকাধরা পাতা' 'কীটের দংশন' ইত্যাদি বাক্যাংশ ছড়িয়ে আছে, তার মধ্যে শুধুই অপূরণ হতাশা। দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া যাক 'আতঙ্ক' কবিতাটি—

'অনির্দিষ্ট শঙ্কা' এবং 'নৈরাশ্যের অলীক অত্যুক্তি যেন পেঁচার চিৎকার' এই কবিতার অন্যতম সার্থক উক্তি। কবিতার বিষয়বস্তু একটি ধসে যাওয়া পুরোনো বাড়ি। কিন্তু এই পুরোনো বাড়ি আসলে তিরিশের সঙ্কটাপন্ন কালেরই ছায়া।

পুরোনো ধস্ লাগা বাড়িটির মধ্যে দেশকালের সঙ্কট আঁকা হয়েছে, না তাঁর নিজেরই ক্ষয়, তাতে সংশয় আছে। কিন্তু অশুভের এই যে কালো 'পরিশেষে' দেখা গেল

দুষ্টগ্রহ সেজে ভয়
কালো চিহ্নে মুখভঙ্গি করে।
কাঁটা-আগাছার মতো
অমঙ্গল নাম নিয়ে
আতঙ্কের জঙ্গল উঠেছে।

এত বড অন্ধকার তাঁর লেখায় এর আগে এসেছে কি না সন্দেহ। এমন কি 'সোনার তরী'র শেষ কবিতায়: 'অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া / দুলিছে যেন।' এই যে পংক্তি তুলে প্রমথনাথ বিশী বলেছিলেন 'এ মনোভাব রবীন্দ্রসাহিত্যে আগেও নাই, পরেও নাই' তাও এতখানি অশুভ নয়। তবু অন্ধকারই নয় 'পরিশেষে'ও। দীর্ণ 'পূরবী'-প্রদোষেও যেমন জেনেছিলেন 'সূর্যকিরণ শিশুর মতন ভরিতে চায়'—তেমনই 'পরিশেষে'র নিরাশনিশীথেও 'প্রভাতকিরণপায়ী' তাঁর কবিপুরুষ। ঐ হতাশারও মধ্যে লেখা এই জ্যোৎস্না

শিরীষবন নতুন-পাতা-ছাওয়া
মর্মরিয়া কহিল 'গাহো গাহো।'
মধুমালতীগন্ধে-ভরা হাওয়া
দিয়েছে উৎসাহ।
পূর্ণিমাতে জোয়ারে উছলিয়া
নদীর জল ছলছলিয়া উঠে।
কামিনী ঝরে বাতাসে বিচলিয়া
ঘাসের 'পরে লুটে।

আর, হতাশা ছিন্ন করে পুনর্জাগরিত এই তাঁর চৈতন্য

আবার জাগিনু আমি।
রাত্রি হল ক্ষয়।
পাপড়ি মেলিল বিশ্ব।

'পরিশেষে'ও ফের আনুষ্ঠানিক বসন্ত-উৎসব—জীবনমরণের মিলিত খঞ্জনির তালে। যেমন 'মহুয়া'র আনুষ্ঠানিক শৃঙ্গার। অন্ধকার থেকে বিশ্বাসের ভূমিতে উঠে দাঁড়ানোর এই ব্যাকুলতা—বা প্রক্রিয়া—এ কেবল 'পরিশেষে'রও নয়। প্রথম জীবনের 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো সেই তো তোমার আলো'—অন্ত্য-পর্বেরও ঋত: 'রক্তের অক্ষরে দেখিলাম / আপনার রূপ, / চিনিলাম অন্ধকারে / আঘাতে আঘাতে / বেদনায় বেদনায়; / সত্য যে কঠিন, / কঠিনেরে ভালোবাসিলাম।' এ যদি হয় কবিহৃদয়ের আভ্যন্তর, বহির্বাচ্য উদ্ধৃত করি 'নৈবেদ্য' থেকে—দয়াহীন সভ্যতানাগিনীর উদ্যত দংশন নিয়ে এল যখন বিংশ শতাব্দী, কবি সংকল্প পড়লেন,

এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়জাল
এই পুঞ্জপুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল,
মৃত আবর্জনা।...

আবার, পুঞ্জিত জড়ের সঞ্চয় নিয়ে বিংশ শতক যখন প্রায়-প্রৌঢ়

উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ আলো—
নিম্নে নিবিড় অতিবর্বর কালো
ভূমিগর্ভের রাতে—
ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন···

তখনো তাঁর শরণ কল্যাণশক্তির কাছে, অস্খলিত—

বেদমন্ত্রের ছন্দে আমার মন বললে—
মধুময় এই পার্থিব ধূলি।

অমিয়চন্দ্রকে একবার জানিয়েছিলেন, 'তুমি জানো আমার অনেক কবিতা দুর্যোগের ফসল।' কিন্তু 'সকল জীবের দিনের আলো আমারে লয় ডাকি'—এই ভাগ্যেরও দেখি ক্ষান্তি নেই, তিমিরের বাঁকে বাঁকে দেখি পড়ে চলেছেন তিমিরনাশন মন্ত্র—আর কবিতা তো বলতে গেলে তাই—তিমিরনাশন সূক্ত—এ কালেই যেন তা বিস্মরণ হয়ে গেছে কবিদের। ইনোসেন্সের ব্লেক অভিজ্ঞতার তাপে পুড়ে বলে উঠলেন 'I in my selfhood am that Satan, I am that Evil one, কিংবা দ্বিতীয় ইয়েট্স পরে নিলেন এই পরুষ মুখোশ: Myself must I remake / Till I am Timon or Lear / Or that William Blake—এই বাম পথই কি পরিণাম? 'অক্ষয়বট, জানি আমায় দেয় নি শরণ'—সুধীন্দ্রনাথের এই নাস্তিক্য, বা দেখা যায় জীবনানন্দের নিরুপায় এই তিমিরবিলাসিতা—

তিমিরহননে তবু অগ্রসর হ'য়ে
আমরা কি তিমিরবিলাসী?
আমরা তো তিমিরবিনাশী
হতে চাই।

স্যাটানিজ্‌ম্ হল পাছদুয়োর দিয়ে খৃষ্টীয়তার অন্দরে ঢোকবার প্রয়াস, এলিয়ট বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথের আরেক কবচ অজর শিশুবয়স। দান্তের মতন তাঁর কবিতা—বাল্যপ্রেমের বিজয়গাথা, 'পুরোনো সেই কিশোর প্রেমের করুণ ব্যাকুলতা'। সময়ের দাগ লাগে না, ওয়ার্ডসোয়র্থের: 'Heaven lies about us in our infancy', বৈষ্ণবকবিদের সেই মাধুর্যরসৈকসিন্ধু কৈশোর; 'শুধু শিশু বোঝে মোরে': 'পূরবী'র এই স্বীকৃতি তো আছেই, তা ছাড়াও যখনই সংশয় তাঁর মুখের ওপর, দেখি তিনি চোখ

মেলতে চাইছেন শৈশবনিসর্গের স্থবিশ্বাসে, সরাসরি লিখছেন ছোটদের লেখা—পত্নীবিয়োগের পর 'শিশু'র কবিতা, আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে 'শিশু ভোলানাথ'—'নরকে এক ঋতু' নয়, 'ন্যুইয়র্কে কবি' নয়—লোরকা হাক্সলি তুআমেল কারোর মতো নয়, 'রক্তকরবী'র কিশোর-নন্দিনীর কুসুমকেশরস্থকুমার এক ছত্র আরক্ত প্রথমবয়সী ভালোবাসা—যক্ষপুরীর অবরুদ্ধ শিলাপাঁচিলের ফাট ধরে তার বিকাশ।

আর গান। সেও আরেক অক্ষর নির্ভরতা। একবার অনতিবয়সী এক মাস্টারমশাই তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি নিশ্চয় যে ঈশ্বর আছেন? রবীন্দ্রনাথ বললেন, না। তবে নতুন কোনো গানের স্থর যখন প্রাণে লাগে তাঁকে টের পাই। 'গান যখন সম্পূর্ণ জাগে মনের মধ্যে, তখন চিত্ত অমরাবতীতে গিয়ে পৌছয়'—শেষ বয়সে লিখছেন অমিয়চন্দ্রকে, 'এখনো দুটো পাকা ঠিকানা পেয়েছি আমার বানপ্রস্থের—গান আর ছবি।'

রোম্যান্টিক আন্দোলনের বড় জয় হয়েছিল সংগীতেই। এই ইতিহাস-পর্বে দেখি কবিতা-গানের অন্যোন্যতা যেন দ্বিধাহীন। কবিমানসের তুলনা বলে 'ঈয়োলিয়ান লায়ার' নামে যে রোম্যান্টিক খেলনাটিকে বেছে নিয়েছিলেন নোভালিস, বা শেলি, বিরূপ শ্রোতৃমণ্ডলীর মাঝ থেকে একজন আবিষ্ট বোদলেয়ারকে বিশাল দিগ্বলয় আর বিপুল মায়াবিচ্ছুরণ ভরা অনন্তের রাজ্যে তুলে নিয়েছিল যে হ্বাগনারী গীতবস্তু, তা এই অন্যোন্যতার দৃষ্টান্ত, রোম্যান্টিক চিত্তের সাধ ও সাধ্যের সাক্ষ্য। বিশ্বস্পন্দ অনুরণিত করবার রবীন্দ্রবীণাটিই কি কম? 'অনির্বচনীয় বিশ্বরস' যাঁর বাঞ্ছা, যাঁর কাব্যভূমির বচনীয়তাকে বেষ্টন করে বায়ুমণ্ডলের মতো গানের অনির্বচনীয়, তাঁরই দৃষ্টান্তে বুঝতে সহজ হয় ভূবদ্ধ রোম্যান্টিকদের কাছে ঐশী মাত্রার মতো ওই বিচ্ছুরণময় গীতাভা: নিগড়ভাঙা মুক্তি ও দিশাহীনতার পরমা আশ্রয়। দেখি, গ্রস্ত সমকাল যখন পিঠে, সেই দুর্দিনেও কিসে নিশ্চিন্ত নির্ভর

> দুর্যোগ আসি টানে যবে ফাঁসি কর্মে পড়ায় গ্রন্থি,
> মন্থর দিন পাথেয়বিহীন দীর্ঘ পথের পন্থী;
> নির্দয়তম নিন্দার হাস, নির্মমতম দৈব
> শূন্যে শূন্যে হতাশ বাতাস ফুকারে 'নৈব নৈব'—
> হঠাৎ তখন কহে মোর মন, 'মিথ্যে, এ সব মিথ্যে,
> প্রাণে যদি রয় গান অক্ষয় স্থর যদি রয় চিত্তে।'

দুর্দিনে, 'পরিশেষ'।

গান তো কেবল স্থরের বিন্যাস বা সমষ্টি নয়—তার মধ্যে মানবিক জাগতিক 'অনুভাব' উর্মিত করে সংগীতের যুক্তিনিধান করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

শুধু মার্গ-দিশি বা বিদেশী-লৌকিক সুরের জোড়কলম নয়, গানের মধ্যে আরো অনেক গীতাতিরিক্ত বিষয় : 'সংগীত আর কিছু নয়—সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ করা'—অর্থাৎ কবিতাগত নানা মানববৈচিত্র্য। এই একটি কারণই নীট্‌শের তিরস্কারের যোগ্য হতে পারত, হ্বাগনারের দিগ্বিজয়েরও মূলসূত্র। কিন্তু আমাদের কাছে তার চেয়ে বড় তথ্য হল, গানের অতীন্দ্রিয় অপরোক্ষে ভর করল তাঁর কবিতাতে। কবিতায় পাশাপাশি সহাবস্থান করে পরিস্থিতি আর তার প্রকাশ—ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মতো। গানে ক্রিয়াকে আদৌ অনুক্ত রেখে তার প্রকাশ সম্ভব। কথা দিয়ে চারপাড় বেঁধে গানকে তিনি কবিতার পরমাত্মীয় করে তুলতে চাইলেন। শুধু অচিহ্নিত মনোবেদনায় সে নিষ্কাষিত হল না, বেরিয়ে এল চেনাজানা মানবভাষা পরে। শুধু অনির্বচনীয় আভাসিত হল না, সেই সুরের ভেতরে ভেতরে বর্ষারৌদ্রময় দৃশ্য ও চিহ্নিত মনস্তাপ ব্যক্ত হয়ে পড়ল।[৪] শ্রবণসুভগ শব্দের শিঞ্জন জমে উঠল সেই পদাবলীতে।

রবীন্দ্রোত্তর গীতলেখকেরা গান ছেপে তার উপরে বসিয়েছেন কবিতার শিরোনাম, কেউ তা কবিতা বলে নেয় নি—অতুলপ্রসাদ বা অজয় ভট্টাচার্য যিনি হোন। রবীন্দ্রোত্তর কবিরা গান লেখেন নি। নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন—সে থিয়েটারি গান। বিষ্ণু দে জানিয়েছিলেন,

> জানি সব সাধ শিল্প সব সাধনাই
> সাধ্যের সন্ধান করে গানে গানে।

লিখেছিলেন 'টপ্পা-ঠুংরি'। বুদ্ধদেব বসু সাধ করেছিলেন :

> তাই গান,
> বানাতেই হবে গান, বাস্তবের স্বাস্থ্যে ফিরে যেতে।

সুধীন্দ্রনাথ বেঁধেছিলেন সঘন-বিশদ অর্কেস্ট্রা। কিন্তু গানের কবচকুণ্ডল আধুনিক কবিদের কাছ থেকে চলে গেল। যে গান ছিল আদি ইতিহাস থেকে বাঙলাদেশের মর্মবাণী তা হাফ-আখড়াইয়ের থেকেও আরো ভাগ হতে হতে নেমে এল সিনেমা-রেকর্ডের গান হয়ে। বাঙলা গান থেকে কবির লেখনী সুদূর হয়ে গেল।

৭

এই লেখার সরহদ্দ কবিতা, তবু, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবিকেও বলেছেন রেখার কাব্য—যার রেখা আর কাব্য দুই কবিতার থেকে আলাদা। কবিতায় যিনি সনাতন দ্বিধান্বিত,

৪. 'গানে আমি রচনা করেছি শ্যামা, রচনা করেছি চণ্ডালিকা। তার বিষয়টা বিশুদ্ধ স্বপ্নবস্তু নয়। তীব্র তার সুখদুঃখ তার ভালোমন্দ। তার বাস্তবতা অকৃত্রিম এবং নিবিড়।' অমিয় চক্রবর্তীকে চিঠি, ১৪.২.১৯৩৯।

দায়িত্বনত, সাধারণ মানুষের থেকে অনেক দূরের, কবিতা থেকে নেমে দাঁড়ালে? চারু-বিনোদিনীকে কোথায় রাখা 'নৈবেদ্য'র পাশে? আর মহেন্দ্রের সেই রিপু?—'যেন পশুশালার দরজা খুলে দেওয়া হল, বেরিয়ে পড়ল হিংস্র ঘটনাগুলো অসংযত হয়ে'।

এই দু-চারিত্র আরো দেখি। 'বলাকা'য়-'চতুরঙ্গে'। শব্দময়ী অপ্সররমণী স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করে ডাক দিয়ে গেল যখন অন্যতর দূরতর অন্বিষ্টে, তখনই: শচীশের 'মনে হইল সেই আদিম জন্তুটা আমাকে তার লালাসিক্ত কবলের মধ্যে পুরিয়াছে, আমার আর কোনোদিকে বাহির হইবার পথ নাই।' ব্যক্ত করে বলেছেন, 'সাইকলজির অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বের মহলে কুলুপ দেওয়া ঘর। নিষিদ্ধ দরজা না খোলাই ভালো…', তবু মক্ষিরানীর থেকে সোহিনী অবধি, নীরজার প্রেতিনী-কঙ্কাল, 'নকল দেবীর কৃত্রিম সাজে'র নিচেকার মেয়েমানুষ—যেন নব্যতা আর অবচেতনে জোড় দেওয়া। সমালোচক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে যে রহস্য করেছিলেন: 'ভাবে বোধ হল তাঁর বিশ্বাস আমার গদ্যে আমার পদ্যের চেয়ে ঢের বেশি কবিত্ব পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ পায় এবং সেইটেই তাঁর মতে স্বাভাবিক।' কবিতা আর স্বাভাবিকতার সেই দ্বিধা শেষ দিকে যেন গদ্য-পদ্যের চাইতে লেখা আর ছবির ভেতরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। জন্ম-রোম্যান্টিকতা, চিরকালের 'মহৎ' 'বড়' 'ভালো' 'আনন্দ' ও 'বিশ্বাসে'র নস্টালজিয়া লেখায় আর তত্ত্বে যত তীব্র, তত যেন 'অচিন্তার অতল থেকে' ভেসে উঠে পর্দা সরিয়ে বের হয়ে আসছে 'মনোলোকের অবচেতন স্তরে যে আগুন চাপা ছিল', 'চৈতন্য-অন্তঃপুরের রেখারূপের জাদু-নর্তকীরা'—গূঢ়, অর্ধোক্তিবক্রিম কৃষ্ণা ভামিনীর দল, টলমল স্যুররিয়ালিস্ট ছবির জগৎ, 'যাই বলি না কেন বর্তমান যুগধর্মের প্রেরণাকে অতিক্রম করা আমার পক্ষে অসম্ভব'—এই স্বীকৃতিটুকুও তার পিঠে। 'The poetry reveals nothing of the poet's personality, though it establishes his status. But the painting is an intimacy comparable to the publication of private correspondence.'—কুমারস্বামী বলেছিলেন। সদ্য-জীবন স্পন্দিত বলেও বটে এই স্বাভাবিকতা।

'এখনকার…অবচেতনতত্ত্বে-পাওয়া কবিতা'—সেও তাঁর খুবই জানা ছিল, 'অবচেতনী কল্পনার অসংলগ্নতার আঙ্গিক' ব্যবহার করে লেখা। কিন্তু 'শ্রীমান সজনীকান্তকে' 'সাহিত্যে অবচেতন চিত্তের সৃষ্টি' বলে যে ছবি ও কবিতা উপহার দিলেন তার কবিতাটি 'অদ্ভুত স্বপ্নের বানানো' হলেও কতখানি 'অবচেতনতত্ত্বে-পাওয়া' তা নিষ্পাদনযোগ্য।

বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের আধুনিক মূর্তি দেখেছিলেন 'শেষের কবিতায়': 'সে যে আমাদের চেয়েও ঢের বেশি আধুনিক'। দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতায়।

ডারুয়িনকে জানতেন, বের্গসনের সূত্র তাঁর প্রসিদ্ধ কবিতার থেকে উদ্ধার করেছেন ভাষ্যকারেরা, সাক্ষাৎ পরিচিত হয়েছিলেন বহুতর দর্শনবিজ্ঞানীর, ফ্রয়েড বা য়ুং তাঁর জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ দুই সমকালীনকেও নিশ্চয় জানতেন—ফ্রয়েডের 'স্বপ্ন নির্ণয়' ১৯০০ এবং য়ুং-এর 'অবচেতন' ১৯১৭ সালের বই। ফ্রয়েডের দৃষ্টান্তে 'মেটাফিজিক্স্‌কে মেটাসাইকলজিতে' বদলে নিতে চান নি বাক্যবন্ধে—'যা অস্বাস্থ্য, যা বিকার, যা মুদ্রাদোষ তা সাইকলজির বিষয়, তা কবিতার নয়' এই জ্ঞানে। আত্ম-স্বরূপের খোঁজে, নিজের পুরোনো প্রোথিত অতীতকে জানবার আকাঙ্ক্ষায় বংশ-সমাজলতার অবচেতন খুঁজে ব্যক্তি-যৌথ ও অনন্ত জীবনের যোগসূত্র মিলোতে ইয়েট্‌স্‌ কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন চিকিৎসাশাস্ত্রীদের আধুনিক মনোবিকলনবিদ্যা, কিছু যুক্তি আছে তার 'এ ভিশনে'ও। ১৯২১এ জয়েসের 'ইউলিসিস' আলোচনার সূত্রে এলিয়ট লিখেছিলেন, 'সাইকলজি এথনোলজি এবং 'দি গোল্ডেন বাউ' এই তিনের সমবায়ে অনেক কিছু এখন সাধ্য হয়েছে, কয়েক বছর আগেও যা অসম্ভব ছিল।' এই সাধ্য-সাধনের প্রসঙ্গ রবীন্দ্রোত্তরদের। সুধীন্দ্রনাথ রক্তে জেনেছিলেন 'প্রাক্‌পুরাণিক পশু'র উপস্থিতি, বিষ্ণু দে লোকবৃত্তের অনুষঙ্গে তাঁর লেখাকে বলেছিলেন 'আমার কুটিরশিল্প লেখা', জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে পুনরুদ্ধৃত দেখি আদিমানুষের কৌম চিত্তবৃত্তি :

ডেকে নেবো আইবুড়ো পাড়াগাঁর মেয়েদের সব ;
মাঠের নিস্তেজ রোদে নাচ হবে···

সঞ্জীবচন্দ্রের উদ্বেজনা নয়, এর সঙ্গে মিল যেন ইয়েট্‌সের **'Dancing to a frenzied drum'**—মাদল আর নাচে মেলানো নতুন-সাধনীয় ব্রতাচারের।

'ছন্দ আশ্চর্য হবার উপায় নেই যদি তার মধ্য দিয়ে কাব্যের আশ্চর্য ভাব ছন্দিত না হয়ে থাকে'—অমিয় চক্রবর্তী। আবারও যখন বলছেন, 'সামান্য একটা কথা—রিক্‌শওয়ালা—কবিতায় ব্যবহার করতে হলে প্রাচীন ছন্দের ঘনঘোর কাঠামোতে কুলোয় না,' কিংবা বিষ্ণু দে যাকে বলেছেন 'কথ্য উচ্চারণের পক্ষে উপযুক্ত প্রাত্যহিক', সেই প্রাত্যহিকের উপর দাঁড়িয়ে কবিরা নুইয়ে আনতে চেয়েছিলেন যাঁকে 'ন্যুইয়র্কের ষাটতলা বাড়ির চাইতেও উঁচু' বলে দেখেছিলেন তখনো। অমিয় চক্রবর্তীর চোখে উর্বশী এক-পেনি লোভী রাস্তার মেয়ে, সমর সেনের উর্বশী ক্লান্ত মধ্যবিত্ত চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের বিষণ্ণমুখ মেয়েরা, বিষ্ণু দে-র উর্বশী পৌরাণিকা, কিন্তু, 'চিত্রা'র উর্বশীর তুলনায় তিনি যুগান্তরে অবস্থিতা। কীট্‌সের 'ওড অন মেলাঙ্কলি'তে যে পের্সিফোনে-প্রসার্পিনাকে লেখা হয়েছে পাউণ্ডের 'ক্যান্টোজ'এ কবির লক্ষ্যসাধিনী রূপে তাঁর যত দূর মর্মান্তরণ, হয়তো তা আরো কতক দূর গিয়ে পেতে হয় সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'উর্বর উর্বশী'তে। কিন্তু এই আধুনিকতা রবীন্দ্রকাব্যে পাবার নয়। সেই কারণে কি

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বুদ্ধদেব 'অ্যান একার অফ গ্রীন গ্রাস'এ রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার সীমা নির্দেশ করেছেন আন্ত-এজরা পাউণ্ড অবধি? তার পরে নয়? **'The range of his *verse technique* will carry us from Wyatt and Surrey, across Spenser, Marlowe, Dryden, Shelley and Swinburne, right up to the early Ezra Pound'.**

জটিলতা পরিহার করে বরং বলি সোজা তুলনা :

অনন্ত এ আকাশের কোলে
টলমল মেঘের মাঝার
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে কবিতা আমার।
যবে আমি আসিব হেথায়
মন্ত্র পড়ি ডাকিব তোমায়।

গান আরম্ভ, 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'।

শহরের বুকে পাঁচতলায়
নেব সখী এক ছোট্ট ফ্ল্যাট!
ট্রাম বাস ভিড় নিত্য যায়
উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে দোঁহায়
ভিড়েতে থেকেও কী নিরালায়
গোলমাল যেন গায়ের ম্যাট্!
শহরের বুকে পাঁচতলায়
মধুচক্র সে ছোট্ট ফ্ল্যাট!

কবিকিশোর, 'চোরাবালি'।

'মানসী'-র গ্রামবধূ এই নব্যা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ে এসে, 'পদাতিকে'র 'বধূ' কবিতায় :

গলির মোড়ে বেলা যে প'ড়ে এলো
পুরোনো সুর ফেরিওলার ডাকে,
দূরে বেতার বিছায় কোন মায়া
গ্যাসের আলো-জ্বালা এ-দিনশেষে,
কাছেই পথে জলের কলে, সখা
কলসি কাঁখে চলছি মৃদু চালে
হঠাৎ গ্রাম হৃদয়ে দিলো হানা
পড়লো মনে, খাসা জীবন সেথা।

'খাসা জীবন সেথা'—পূর্বসূরির বক্র বৈদগ্ধ্যের বদলে সহজ এই তিরস্কার। মিণি লিলি লিসি ডলু বুলা, কিংবা ঈষদ্ভাবে কলঙ্ক-কঙ্কণ পরা ন্যাকামিসুনিপুণা অজিত দত্তের 'মিস্' —তার তিরস্কার পাবো রবীন্দ্রনাথেই : 'ছন্দোহারা কবিদের ব্যঙ্গহাসি বিহসিত প্রিয়া'। মহাসাগরের নামহীন কূলে কূলে, অজানা নদীগিরিমেরুকান্তারের ভূগোলসতৃষ্ণ, অথবা বহুজনপ্রসারাতুর, প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই আত্মপরিচয় : 'আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের, মুটে মজুরের, / আমি কবি যত ইতরের', সেও প্রতিহত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের দুটি স্বীকৃতিতে :

১. বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি…
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।

২. মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।

১০ সংখ্যক, 'জন্মদিনে'।

তথ্যোক্তিসরল ঐ আভিযাত্রিকতা—কাব্যাধিষ্ঠান পাওয়াও নয় অমিয় চক্রবর্তীর মতো, যেন আরো চোখে পড়ে। এর পরে খুঁজতে হয় অজিত দত্তের কিংবা আরো পরের কবিদের 'ভুখা মিছিল' বা 'কাস্তে'—এদের বা কতদূর দাবি-পূর্বাভাস পড়েছিল রবীন্দ্রনাথে।

রবীন্দ্রজীবনের শেষ দিকে প্রবল হয়েছিল প্রগতি-বিপ্লবের ডাক। নজরুলের 'বিদ্রোহী'-'সাম্যবাদে'র উন্মাদনা নয়, দর্শনগর্ভ—কিছু সমর সেনের মার্ক্‌স্‌বাদ, অরুণ মিত্রের 'লাল ইস্তাহার' : 'ভোঁতা হয়ে গেছে পুরোনো কথার ধার। / যুগান্ত উৎকর্ণ : এখনি পড়ো / নতুন ইস্তাহার' বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'নির্ভীক মিছিল শুধু পুরোভাগে পেতে চায় নির্ভুল গায়েন', ইত্যাদি : এর মধ্যে যে নতুন পথ তাতে স্পন্দিত হবার প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের তখন আর ছিল না। তাঁর স্পর্শ বর্জন করে সমাজের কোনো কৃত্য চলত না বলে এঁরাও অধিকার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' বা ১০ সংখ্যক 'আরোগ্য'। তবু, প্রধানত যে-চোখে দেখেছিলেন তার ঈষৎ ভাষা :

ভারতবর্ষে বুর্জোয়া সভ্যতার প্রগতিক ফলাফলের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ।

সমর সেন : 'বাংলা কবিতা'। কবিতা, বৈশাখ ১৩৪৪।

এই রৌদ্রদগ্ধ, ধূলিরুক্ষ, নিষ্ঠুর পৃথিবীতে ব্যথাক্লিষ্ট, জীর্ণবক্ষ গণদেবতার মুক্তিসংগ্রামে রবীন্দ্রসাহিত্য অবান্তর।

হীরালাল দাশগুপ্ত : 'এই যে সাম্প্রতিক সাহিত্য'। নতুন পত্র, আশ্বিন ১৩৪৬

বিংশ শতাব্দীতেও যে প্রতিভা মানুষকে এমন কৌশলে, এমন ভাবে প্রলুব্ধ

প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রেতপুরীতে নিয়ে গিয়ে ভুলিয়ে রাখতে পারে, সে প্রতিভা সহস্রবার নমস্য ; যুগের বিচার যা-ই হোক না কেন।

বিনয় ঘোষ : 'বাংলা সমালোচনা'। নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা, ডিসেম্বর১৯৪০
এঁদের কাছেও রবীন্দ্রনাথকে প্রমাণ করতে বুদ্ধদেব বসু 'পুনশ্চ' থেকে যে সব কবিতায় সাধারণের উল্লেখ—বস্তিজীবন, শাক-তোলা গরিব মেয়ে, পৃথিবীর মাটি-লিপ্ত কলকলনাদী জনতা—তার তালিকা তুলে লিখেছিলেন, 'প্রগতিবাদীরা খুশি হবেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা আইভরি-টাওয়ারের বাসিন্দা বলে জানেন, তাঁরা পরম ভ্রান্ত।' 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র ভূমিকায় হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের এই পরম সমর্থন :

এখনও রবীন্দ্রনাথ যখন হঠাৎ দেখে ফেলেন যে সৌন্দর্যের কল্পরাজ্যে আকবর বাদশা আর হরিপদ কেরাণীর মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই, তখন মনে হয় যে শুধু ভাষায় নয়, ভাবেও আর্ষপ্রয়োগের অধিকার তাঁর আছে।

আর্ষপ্রয়োগের তুলনায় ঠিকতর সঙ্গতিতেই হয়তো বা তাঁর গ্রহণযোগ্যতা, ভবানী সেনের একটি শেষদিককার মূল্যায়নে তাই মনে হয় : 'মানবসভ্যতার এই সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথ প্রগতির শিবিরেই তাঁর নিজস্থান নির্বাচিত করেছিলেন…'। নীলরতন সেন সম্পাদিত একখানি রবীন্দ্রশতবার্ষিক সংকলনের এই সুবিচার। তবু, জীবননীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, কাব্যনীতি কোনটিতে তিনি প্রগতিবাদীর তুলনায় কী রকম, এ আর এখন তত আলোচ্য বোধ হয় না, এই পরিসরে তো নয়ই।

৮

রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ 'জন্মদিনে'। বেরোবার পর রবীন্দ্রোত্তরগণের কুলীন মুখপত্র 'পরিচয়' সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ বাঙলাদেশের প্রবীণতম ও কনিষ্ঠতম সাহিত্যিক।…গত ২৪শে বৈশাখ প্রকাশিত 'জন্মদিনে' বোধ হয় বাঙলাদেশের আধুনিকতম কাব্যগ্রন্থ।' প্রশস্তি, তবু রবীন্দ্রপরবর্তীরা রবীন্দ্রোত্তরতার দৃষ্টান্ত যে রবীন্দ্রনাথের কলম থেকেই দেখতে ব্যগ্র ছিলেন তখনো, তাতেও ভুল নেই। কেবল রবীন্দ্রনিমগ্ন বুদ্ধদেব নন, রবীন্দ্রপ্রত্যাহারী বিষ্ণু দে-ও :

সে কথা তো জানি তোমাতে আমার মুক্তি নেই ;
তবু বারে বারে তোমারই উঠানে যাওয়া আসা।

মনে হয় যৌথ স্বীকার রবীন্দ্রোত্তর কবিদের।

আজ এখন মনে হয় রবীন্দ্রোত্তর কবিদের কতখানি অপচয় কেবল রবীন্দ্রাতিক্রমণের চেষ্টাতে। পুঞ্জ-রবীন্দ্রোপকরণের মধ্যে আপ্লুত থেকে তাকে ভাঙবার আপ্রাণপ্রয়াসে,

সৃষ্টি প্রতিবদ্ধ করে কেবলই উদ্বিগ্ন প্রতিবাদ লিখে লিখে। রবীন্দ্রনাথ আদিগন্ত ঐতিহ্যে ব্যাপমান বলে কবিতাকে তাঁদের সাজাতে চাওয়া প্রয়াসাহৃত বিদেশী পরিভাষায়, তার পরিচিততম দৃষ্টান্তও বোধ করি বিষ্ণু দে-র লেখাতেই দেখতে পাওয়া সোজা—নিদেন 'ওয়েস্টল্যাণ্ড' আর 'ক্যাণ্টোজ' সুমুখে করে খসড়া করতে বসেছেন এবং ত্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথকে: 'যে কবির কবিত্ব পরের চেহারা ধার করে বেড়ায় সত্যকার আধুনিক হওয়া কি তার কর্ম?'

সবটাই নেতি নয় নিশ্চয়। সুধীন্দ্রের 'যাথার্থ্যের সূক্ষ্মবোধ'-ভরা 'মনন-সাহিত্য' আর তাঁর উত্তরকালের বিশ্বাবর্ত, অমিয় চক্রবর্তীর যৌগিক কবিতাপদ্ধতির রসায়ন এবং উত্তরকালের লিরিক, এমন কি বিষ্ণু দে-র আপাত-puzzle আধুনিক জটিলতা। আপাতঅগোচর, অনুচ্চ এক ছত্র সদ্যকালীন রবীন্দ্রাতিগতা দেখি জীবনানন্দের কৈশোরক 'ঝরা পালকে'র লেখাতেই। পংক্তি-'বলাকা'র থেকে ভ্রষ্ট বকশিশু 'অতি দূর তারকার কামনায়' নেচে উড়ে ভেসে চলেছিল পবনপদবীতে—

> দূরে—দূরে—আরো দূরে—আরো দূরে চলিলাম উড়ে,
> নিঃসহায় মানুষের শিশু একা—অনন্তের শুক্ল অন্তঃপুরে
> অসীমের আঁচলের তলে

কিন্তু 'বলাকা'র মানসতীর্থ আচ্ছন্ন করে তাকে ফিরিয়ে নিতে এল 'পৃথিবীর প্রেতচোখ' —'ভ্রূণভ্রষ্ট সন্তানের তরে / মাটি-মা ছুটিয়া এল বুকফাটা মিনতির ভরে',—'গর্ভিণীর ক্ষোভে' দাঁড়াল সে, কবিকে টানতে লাগল তীব্র মাটি, প্রাকৃত আত্মীয়পরম্পরা, নিজের পুরোনো প্রত্নের দুশ্ছেদ্য গ্রন্থির টান, নতুন গর্ভধারণের লোভী সেই মৃত্তিকা-জননীর জরায়ু—দূর ঐশী নীলিমার চেয়ে আরো গূঢ়নিবিড় সে টান, কবি অনুভব করলেন:

> সদ্য-প্রসূতির মতো অন্ধকার বসুন্ধরা আবরি আমারে

শব্দধ্বনিহীন, প্রায় অগোচর-অসংশয় এই আমাদের প্রথম উত্তররবীন্দ্র আধুনিকতা।

৩

প্রধানত তিরিশের কবি ও রবীন্দ্রনাথ

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

সাহিত্যক্ষেত্রে সন্তান নাকি সর্বত্রই জনিতার ঋণ অস্বীকার করতে উৎসুক। কিন্তু তিরিশের সেই 'ভয়ানক শিশু' যখন কোনো এক সভায় ঘোষণা করেছিলেন 'রবীন্দ্রযুগ গত হয়েছে', তখন পিতাকে খর্ব করার কোনো উদ্দেশ্যই তাঁর ছিল না। পিতা দুঃখিত হয়েছিলেন সত্য। তবে, অবস্থা ও আবহ বিবেচনা করলে তদানীন্তন সেই অসার উক্তিও তত আপত্তিকর ঠেকে না আর। ফরাসী সমালোচক লেগুই তাঁর বৃহৎ ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে এই চমকপ্রদ মন্তব্য করেছিলেন যে, মৌলিকতার সচেতন প্রয়াস বন্ধ্যাত্বেরই নামান্তর মাত্র। সূত্রটি যে অকাট্য নয় রবীন্দ্রসমসাময়িক একরাশ বিহ্বল রচনার দিকে তাকালে সেটা সহজেই বোঝা যায়। তিরিশের আন্দোলন বাঙলা সাহিত্যে ফলপ্রসূ হয়েছে নিঃসন্দেহে; তার প্রয়োজনীয়তা আজ সবার কাছেই স্পষ্ট। কিন্তু তিন দশক বাদে ফের সেই ধুয়ো তুলবার বিন্দুমাত্রও যুক্তি নেই। আমাদের হয়ে যুদ্ধ তাঁরাই জয় করে গিয়েছিলেন তাঁদের রক্ত ও ঘর্মের বিনিময়ে। সারাৎসারিক রবীন্দ্রনাথের আবেদন চিরন্তন।

গৌণ কবিদের কথা বাদ দিই, তিরিশের প্রধান কবিরা প্রায় প্রত্যেকেই রবীন্দ্র-সাহিত্যভাণ্ডার লুঠ করেছেন দু হাতে। প্রতিক্রিয়া এবং আত্মসমর্পণ এই দুয়ের সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই তাঁরা অগ্রসর হয়েছেন। আর তাই আমরা দেখতে পাই অজস্র চিঠিপত্র ও নানা প্রবন্ধে অকুণ্ঠ ভক্তিনিবেদন। আবার কবিতা-গল্পে-উপন্যাসে ধ্বজা তুলে, প্রবল হইচই করে, বিদ্রোহ। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর দুটি কবিতায় এই দুই প্রবণতার সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। একদিকে: 'আমি তো ছিলাম ঘুমে / তুমি মোর শির চুমে / গুঞ্জরিলে কী উদাত্ত মহামন্ত্র মোর কানে কানে', অন্য দিকে: 'সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্রঠাকুর, / আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো / যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে'। নতুন পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োজন সব যুগেই আছে; বিদ্রোহের উত্তেজনা জাগিয়ে না তুললে প্রচলিত ধারা থেকে—বিশেষত সেই ধারা যখন রবীন্দ্রনাথের মতো কবির হাতে, ঠিক সৃষ্ট না হলেও, পরোৎকর্ষপ্রাপ্ত—মোহের জাল কেটে বেরিয়ে আসা কঠিন হত। আজ ঠাণ্ডা মাথায়, নিরপেক্ষভাবে, তিরিশের সেই যুদ্ধের ফলাফল বিচারের সময়। যে দুজন প্রধান কবির মধ্যে সবচেয়ে বেশি লক্ষ্যণীয় রাবীন্দ্রিক শব্দ ও ছন্দের পুনর্বয়ন তাঁদের দিয়েই শুরু করা যাক আমাদের এই আলোচনা।

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যসংগ্রহ 'তন্বী' থেকে 'দশমী' পর্যন্ত সর্বত্রই রবীন্দ্রপ্রভাব সোচ্চার এবং সন্দেহাতীত। অবশ্য তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তন্বী'তে যা প্রকট ও স্বীকৃত আত্মসমর্পন, পরবর্তীকালে তাকে অতিক্রম করে তিনি তাঁর নিজস্ব একটি কাব্যমাধ্যম নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাঁর বক্তব্যও হয়ে উঠেছিল সম্পূর্ণরূপে আধুনিক। আশার পরিবর্তে এক অগাধ, গভীর, সর্বব্যাপী 'ভবিতব্যভারাতুর' নৈরাশ্য, এক অনিকেত, নিরালম্ব, ত্রিশঙ্কুসুলভ মনোভাব। কিন্তু এই আধুনিক মানসতা, যখন তিনি সবচেয়ে স্বনির্ভর—কাব্যজীবনের শেষ পর্যায়েও, অনেক সময়ই ব্যক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ছন্দে ও ভাষায়, চিত্রকল্পে। 'অর্কেষ্ট্রা' থেকেই আমরা লক্ষ্য করি সুধীন্দ্রনাথের সাবালকত্ব, রবীন্দ্রকাব্যের সোনার আঁচল থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনভাবে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়ানোর চেষ্টা। কিন্তু বিষ্ণু দে ও বুদ্ধদেব বসুর মতোই বার বার তাঁকেও জাদু করেছে সেই মোহময় অবিস্মরণীয় সুর, যা তাঁদের রক্তের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল শৈশবেই। কাজেই প্রথম থেকেই সুধীন্দ্রনাথের প্রতিটি কাব্যগ্রন্থে একই বা ভিন্ন কবিতায় পাশাপাশি দুটি রীতির উপস্থিতি : কখনো তারা পরস্পর সখ্যসূত্রে আবদ্ধ, কখনো তাদের ভঙ্গি বিপ্রতীপ ও যুধ্যমান। ক্ষণিক, শাশ্বত, অমৃত, অজানা, অনাদি, অরূপ, অনামা, অলখ, লোর, বিকচ, অচিন, হিয়া ইত্যাদি রাবীন্দ্রিক ও পদ্য-শব্দ, অনুপ্রাস, এমন কি রাবীন্দ্রিক ভাবেরও ছড়াছড়ি তাঁর কবিতায় শেষ দিন পর্যন্ত। যে দুটি কাব্যগ্রন্থে—'সংবর্ত' ও 'দশমী'—ভাব ও প্রকরণে সুধীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি ব্যক্তিত্বময়, সেখানেও রবীন্দ্রনাথকে সজ্ঞানে গ্রহণ করেছেন অনেক সময়েই। এমন কি কোনো কোনো কবিতায় কটু সত্যকেও তিনমাত্রার সংগীতময় ছন্দে প্রকাশ করেছেন অসমসাহসে :

> বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী।
> অনুমানে শুরু, সমাধা অনিশ্চয়ে,
> জীবন পীড়িত প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে :
> তথাচ পাব না আমি আপনার দেখা কি ?

প্রতীক্ষা, 'দশমী'।

অবশ্যই শেষ চরণে 'প্রতিভার টান' সমস্ত প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করে আমাদের চমকিত ও আলোড়িত করে তোলে। 'নৌকাডুবি' কবিতায় অতল নৈরাশ্য ও সার্বিক বিলয়ের চিন্তার মধ্যেও আকস্মিক রাবীন্দ্রিক ভাষার আবির্ভাব সৃষ্টি করে চমৎকার এক বৈপরীত্য :

> খালি গোলাঘরে সারা, ভাঙা হাটে শুরু,
> পায়ে-চলা পথে কে একাকী ?

দু চোখে সোনার স্বপ্ন ; পসরার ফাঁকি আর বাকী
সহসা অশুরু ॥

'শুরু' ও 'সারা'র এই বিরোধাভাস ও অনুপ্রাস আজও আমাদের প্রাত্যহিক গার্হস্থ্য-ভাষার অন্তর্গত। অবশ্যই রাবীন্দ্রিক ছন্দের কাঠামোকে রেখেই তাকে অতিক্রম করেছেন কবি অপূর্বদক্ষতায় নিচের এই ঈষৎ আমোদমিশ্রিত পংক্তিগুলিতে :

জ্যোতির্গামী কিন্তু সেই তমসও,
তারার ফেনা উৎসারিত ক্রমশ ;
মৌনে পড়ে তীর্থামৃত লোমশও,
স্বয়ংবর প্রমা।

নষ্ট নীড়, 'দশমী'।

যদিও 'তন্বী' সুধীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ, মনে রাখা দরকার, ১৩৩৭এ 'রবীন্দ্র-বিদ্রোহ' শুরু হয়ে গিয়েছে, জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতাগুলির রচনা সমাপ্ত এবং সুধীন্দ্রনাথের বয়স তখন ২৯, অর্থাৎ যথেষ্ট সাবালকত্বের বয়েস। সুতরাং 'তন্বী'র (১৩৩৭) উৎসর্গ-পত্রটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং আজকের যে কোনো তরুণ কবির পক্ষে বোধ হয় কৌতুকের বিষয় :

উৎসর্গ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীচরণে
অর্ঘ্য
ঋণশোধের জন্য নয় ঋণস্বীকারের জন্য

কিন্তু এই কবিই রবীন্দ্রশতবর্ষ উপলক্ষে রচিত একটি ইংরেজি প্রবন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য করতে একটুও ইতস্তত করেন নি :

'Very few of his poems attained that organization which is the mark of an extended metaphor. Even the veriest Bengali should think dispassionately before insisting on his inclusion in the first category of the word's poets. For us, however, he remains a supreme writer.'

পাশাপাশি উদ্ধৃত করি রবীন্দ্রনাথকে লিখিত সুধীন্দ্রনাথের একটি চিঠি, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪০এ লেখা, দেশ-সংখ্যায়, সাহিত্য মুদ্রিত, ১৩৭৯ :

'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র প্রসঙ্গে আমি যে-মত ব্যক্ত করেছিলুম, তা উল্লেখযোগ্য। তাতে আমি বলতে চেয়েছিলুম যে আপনি কেবল শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম নন, আপনি বিশ্বসাহিত্যে অদ্বিতীয়...'

মাত্র কুড়ি-একুশ বছরের ব্যবধানে রৈবিক[১]-প্রতিভা সম্বন্ধে কি নির্মোহ হয়েছিলেন এই কবি? এমনও হতে পারে রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে তাঁর ব্যক্তিত্বের যে জাদু পরবর্তী প্রবংশকে সম্মোহিত করে রেখেছিল সেটা দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না যে, তিরিশের কবিরা রবীন্দ্রনাথকে লিখিত অজস্র চিঠিপত্রে ও প্রবন্ধে দীর্ঘদিন ধরে যে অচলা ভক্তি ও শ্রদ্ধার পরিচয় রেখে গিয়েছেন—যা অনেক সময়ে লীলায়িত লিরিক বা দেবতার স্তবের মতো শোনায়—তা ছিল নিছক রাজানুগ্রহ লাভের চেষ্টা। উল্লেখযোগ্য সমস্ত কবিই কোনো গ্রন্থ রচনা করে রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর মতামত ভিক্ষা করে। কেউ কেউ তাঁকে গ্রন্থ উৎসর্গ করে ধন্য হয়েছেন—আর দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করেছেন একটু চিরকুটের জন্য। যদি কখনো কোনো প্রশংসাপত্র জুটে গিয়েছে কবির কাছ থেকে—আর এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মুক্তহস্ত—তবে তাঁদের উল্লাসের সীমা থাকত না। সুধীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'কবিযশঃপ্রার্থীদের প্রতি আপনার অপার করুণা।' আর কবিসূর্য কা ভাবে ভক্তদের সহাস্য ঈক্ষণ করতেন, যদিও তাঁর আসন তাঁরা বার বার কাঁপিয়ে দিতেন বিদ্রোহের উত্তেজনায়, অসতর্ক মন্তব্যে, তারও পরিচয় আছে তাঁর চিঠিতে: 'তোমার কবিতা যেখান থেকেই গয়না নিক্ না, রূপ তো তারই—নিজের চেহারা বন্ধক রেখে সে কিছুই ধার নেয় নি।...জনশ্রুতি কী বলচে? দুর্মুখের বার্তা শোনা যায় কি?... একটা বিষয়ে এ বইয়ে [তন্বী] তোমার স্বকীয়তা দেখলুম—বানান-ভুলগুলো গেল কোথায়?' এই যেখানে ছিল ভক্ত-ভগবান সম্পর্ক, ভক্তদের দিক থেকে সাময়িক বিরোধিতা-সত্ত্বেও প্রিয়, অন্তরঙ্গ এবং সশ্রদ্ধ, তখন মাত্র দু-তিন দশকের মধ্যে কী এমন ঘটল যাতে সেই 'শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম' তাঁদের কাছে পরিণত হলেন 'দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি'তে? এর একটি মাত্র ব্যাখ্যাই সম্ভব: রবীন্দ্রনাথের প্রতি পাশ্চাত্য পৃথিবীর পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি, যার পরিচয় আমরা পাই য়েটস্ ও এজরা পাউণ্ডের প্রকীর্ণ মন্তব্যে।

সুধীন্দ্রনাথের মতোই বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণ গ্রহণ করেছেন অবিরলভাবে, অজস্র। 'রূপান্তর' ও 'দ্রৌপদীর শাড়ি' কাব্যগ্রন্থে কবি অকপটভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন রাবীন্দ্রিক ছন্দ ও শব্দ, যদিও তৎসত্ত্বেও একটি নতুন স্বাদ আছে অনেক কবিতায় নিঃসন্দেহে। এ দুটি বই সম্মুখে রেখে আমাদের মনে পড়ে যায় বুদ্ধদেবের সেই উক্তি: 'রবীন্দ্রনাথের সুর একবার যার মর্মে প্রবেশ করেছে চিরকালের মতো অন্য মানুষ হয়ে গেছে সে।' আরো: 'একটা কথা, যেহেতু 'অমৃতবাজার' সেটাকে হেডলাইনে বিঁধে খেলিয়েছিল এবং তা নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডাও মন্দ হয় নি, এখনো আমাকে কৌতুকের

১. তিরিশের শব্দ। ব্যাকরণদুষ্ট।

কণ্ডূয়ন জোগায় মাঝে-মাঝে। 'The age of the Rabindranath is over'—শুনেছি রবীন্দ্রনাথও ব্যথিত হয়েছিলেন কথাটা শুনে: তিনি কি জানতেন না ঘোষণাকারীর এক দণ্ড রবীন্দ্রনাথ বিনা চলে না?' এই কবিই যৌবনে রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' থেকে পাগলের মতো কবিতা আবৃত্তি করতেন, যার প্রভাব ফুটে উঠে ১৯৪৮ সালেও 'দ্রৌপদীর শাড়ির' 'কোনো মৃতার প্রতি' কবিতায়:

আমায় খেপিয়েছিলো যেই কবিতার বইগুলো
সেই প্রথম ফাগুনে,
তাদের ভুলে ছিলেম বলেই তারা নয় ধুলো।
তারা আজো জড়ায় প্রাণে, পোড়ায় প্রেমের আগুনে।

পূরবীর স্মরণে, 'এক পয়সায় একটি'।

বুদ্ধদেব বসুর কাছে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন—তাঁরই ভাষায়, 'দেবতার মতো'। 'আপনার কাছ থেকে আমি ভাষা পেয়েছি'—চিঠি, ৩০. ৯. ৩৩, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮১। রবীন্দ্রভক্তি কত দূর যে পৌছেছিল তার প্রমাণ পাই ২রা জুন, ১৯৪১এর একটি চিঠিতে—চিঠিটি তিনি শেষ করেছেন শুধু প্রণাম নয়, 'শতকোটি প্রণাম' জানিয়ে। এ উচ্ছ্বাস বুদ্ধদেবেরই চরিত্রানুগ এবং তাঁর মতো বিদ্রোহী ও পাশ্চাত্যভাবাপন্ন কবিকেও আমরা যখন দেখি ভক্তিতে লুটিয়ে পড়তে তখন আমাদের ওষ্ঠ ঈষৎ হাস্যরেখান্বিত হয়ে ওঠে বইকি।

তিরিশের কবিদের পরিণত কাব্যেও অবচেতনে-সুপ্ত রবীন্দ্রস্মৃতি হঠাৎ আলোয় উঠে আসে কোনো এক চকিত মুহূর্তে। শুধু তাই নয়, ছন্দে যে পরীক্ষাই তাঁরা করুন না কেন, সমস্ত চেষ্টাই পূর্বসূরির আবিষ্কারকে ভিত্তি করেই অগ্রসর—এমনকি তিন-দুই-তিন বা তিন-পাঁচের পর্ব, যার সম্বন্ধে সুধীন্দ্রনাথ আপত্তি জানিয়েছিলেন কবিকে একটি চিঠিতে, যা মাইকেলের 'মাৎসর্য-বিষ-দশন'-এ পূর্বাভাসিত এবং যার বিশিষ্ট ব্যবহার বুদ্ধদেব বসুর 'যে আঁধার আলোর অধিক'এ তাক লাগিয়ে দিয়েছিল আমাদের একদিন, এও আমরা রবীন্দ্রকাব্যে আগেই দেখতে পেয়েছিলাম। বস্তুত আধুনিক বাঙলা কবিতায় নানাভাবেই সক্রিয় রবীন্দ্রনাথের দান। যাকে আমরা নতুন চেতনা বলি তারও চিহ্ন পাই তাঁর জীবনের শেষের দিকের কাব্যে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সেই উজ্জ্বল সত্য-শিব-সুন্দরের মঞ্জিলেও অল্প ফাটল ধরিয়েছিল, এবং মৃত্যুর কিছু পূর্বে রোগাক্রান্ত যন্ত্রণা-পীড়িত দেহে তাঁর ঔপনিষদ বিশ্বাসে, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, শান্তি ও শিবের প্রত্যয়ের উপরে এসে পড়েছিল সংশয়-শকুনের কালো ছায়া। কিন্তু সেটা ছিল মৌহূর্তিক, সঞ্চরণশীল, সহজেই তিনি ফিরে পেয়েছিলেন তাঁর আজন্ম-পোষিত বিশ্বাস। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ও অর্জিত—বার বার দুঃখের নিকষে, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতায়

পরীক্ষিত। তাঁর বৈশ্বিকচেতনার (Cosmic Consciousness) বিশেষ অভাবে এ দেশের ও পাশ্চাত্যের আধুনিক কবিতার একটি বড় অংশ ক্ষুদ্র, খণ্ডিত ও নিঃশ্বাস-রোধকারী; কিন্তু মিথ্যা বা অসার্থক নয়। বর্তমান সময়ের আধুনিকদের উপাস্য অস্তিত্ববাদের বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা, 'নিক্ষিপ্ততা' ও সার্বিক বিলয় থেকে এই প্রতীতি কত দূরে, কত পৃথক্। দুঃখ অলীক, জীবন অতুলনীয়, ঈশ্বর আছেন, আমি আছি—এই কথাগুলি রবীন্দ্রনাথ এতবার ও এত সুন্দরভাবে তাঁর অসংখ্য গানে ও কবিতায় বলেছেন যে তাঁর দৃষ্টি সম্বন্ধে কোনো দোলাচলেই পাঠককে আর পড়তে হয় না। সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতায় রাবীন্দ্রিক মনঃস্বভাবের নজির ইতস্তত ছড়ানো আছে। 'যে আঁধার আলোর অধিক' থেকে বুদ্ধদেব বসুর চেতনায় অবশ্য উল্লেখযোগ্য বদল ঘটেছে—তাঁর 'মরচে-পড়া পেরেকের গান'এর কিছু কবিতায় অস্তিত্ববাদের স্পর্শ অনুভব করা যায়—কিন্তু অমিয় চক্রবর্তী তাঁর রাবীন্দ্রিক স্বভাবে আজও অটল। বস্তুত সেটাই তাঁর নিজস্ব জীবনদর্শন হয়ে উঠেছে। এবং বুদ্ধদেব বসুর ক্ষেত্রে তাঁর পরিবর্তিত জীবনবীক্ষা কতটা তাঁর জীবনের সঙ্গে মৌল সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত, কতটা বা অধ্যয়ন ও কালানুচারিতার ফল সেটা বিশেষভাবে বিচার করে দেখা প্রয়োজন। বুদ্ধদেব বসু যখন লেখেন, 'তবু জীবনের বিজয়ী মাধুরী / কমবে না একতিলও' বা বা 'আহা, সুন্দর এ পৃথিবী, এ জীবন, / বিনামূল্যেই অমূল্যতম দান' এবং অমিয় চক্রবর্তী: 'আলোর গন্ধে ছুঁয়ে তার ঐ ভুবন ভরে রাখুক, / আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে ধুলোর রেণু মাখুক,' কিংবা 'তার বদলে পেলে — / সমস্ত ঐ স্তব্ধ পুকুর / নীল-বাঁধানো স্বচ্ছ মুকুর / আলোয় ভরা জল'—তখন সন্দেহ থাকে না, যে-সূর্যাস্ত তিরিশের কবিরা দেখেছিলেন তা জাগরস্বপ্ন বা অমূলপ্রত্যক্ষ-মাত্র—ফলত সে-সূর্য তিরিশ, চল্লিশ বা পঞ্চাশেও মধ্যগগনের কিছু নিচেই দেদীপ্যমান। বুদ্ধদেব বসুর মুখে 'ঈশ্বর' শব্দটি গভীর ও তীব্র আবেগের মুহূর্তে অনায়াসে চলে আসে, এটা কতদূর ইংরাজী বাচন-ভঙ্গি অনুযায়ী উচ্চারণ বা বাক্যালংকার, কিংবা কতদূর আন্তরিক বিশ্বাসপ্রসূত বলা কঠিন, তবে তাঁর কবিতায় অনেক দিন পর্যন্ত জীবনের প্রতি রাবীন্দ্রিক বিশ্বাস, স্থিতিবোধ ও আবেগের প্রণিপাত লক্ষ্য করা যায়:

> আমার প্রেম রেখে এলেম
> ঈশ্বরের হাতে।

এই দুটি পংক্তি 'যে আঁধার আলোর অধিকে'র 'সমর্পণ' কবিতার থেকে উদ্ধৃত। এই কাব্যগ্রন্থে বুদ্ধদেব প্রথম সহজের পরিবর্তে দুরূহের সাধনার কথা বলেছেন, এবং আধুনিক পাশ্চাত্যরীতির সার্থকতম রূপায়ণ সম্ভবত এই প্রথম আমরা দেখতে পেলুম তাঁর কবিতায়—সেই গুরু সংক্ষিপ্তি ও আত্মসচেতনভাবে কুঁদে-তোলা প্রতিটি চিন্তা; অথচ

এ সময়েও যখন পোল ভালেরি, মালার্মে, বোদলেয়ার, রিলকে তাঁর মন জুড়ে আছে, তিনি রবীন্দ্রকাব্যের সুর ও স্মৃতি—মায় প্রেম-এলেম-এর অন্ত্যানুপ্রাস—দূরে সরিয়ে রাখতে পারছেন না। দুর্ধর্ষ পঞ্চাশের কবিতাতেও আমাদের বিস্মিত করে বার-বার ছলকে ওঠে 'ঈশ্বর-ঈশ্বরী' এই দুটি শব্দ; মনে হয় এটা বুদ্ধদেব বসুর মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকারের ফল। এমন কি বোদলেয়ারের একটি বিখ্যাত কবিতার অনুবাদ করতে গিয়েও বুদ্ধদেব অনুষঙ্গকে এড়িয়ে যেতে পারেন নি :

প্রিয়তমা, সুন্দরীতমারে—
যে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার—
অমৃতের দিব্য প্রতিমারে,
অমৃতেরে করি নমস্কার!

অমিয় চক্রবর্তী ও জীবনানন্দ দাশ উভয়ের কাছেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 'লোকোত্তর পুরুষ'। অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের একান্ত-সচিব হিসেবে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন, এবং দীর্ঘদিন রবীন্দ্রবাতাস গায়ে মেখে খুব সহজেই রাবীন্দ্রিক মেজাজ তাঁর মধ্যে সংক্রামিত হয়েছিল, প্রকরণের আশ্চর্য নতুনত্ব সত্ত্বেও—বস্তুত এত নতুনত্ব আধুনিক আর কোনো বাঙালি কবির কাব্যেই দেখা যায় না। তাঁর অনেক কবিতাতেই শান্তি, কল্যাণ ও প্রসন্নতার স্পর্শ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের মতো নারীর কল্যাণী-মূর্তিকেই তিনি ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন, তাঁর সেবাপরায়ণ দুই হাতের জয়গান করেছেন কবিতায়। 'মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর / পোড়ো বাড়িটার / ঐ ভাঙা দরজাটা। / মেলাবেন'। এখানে পর পর দুটি পূর্ণ যতির সাহায্যে তাঁর বিশ্বাসের দৃঢ়তা চমৎকার পরিস্ফুট। তাঁর অত্যন্ত সুন্দর 'বৃষ্টি' কবিতার স্মৃতি বাঙলা কাব্যে অনুরূপ অনেক কবিতা ও পংক্তির উৎস—কিন্তু 'যাই ভিজে ঘাসে-ঘাসে বাগানের নিবিড় পল্লবে'—প্রকৃতির আনন্দরসের এই অভিসিঞ্চন আমরা রবীন্দ্রকাব্যে অনেক আগেই পেয়েছি। 'গলিতে, তোমাদের অতীব নোংরা গলিতে, / সোনার স্যাকরা, রুপোর রূপকার, এই নর্দমার দোকান দেহলিতে / ধ্যান বানাই। এই আমার উত্তর। / ড্রেন, ধুলো, মাছি, মশা, ঘেয়ো কুত্তোর'—এখানেও কি আমাদের মনে পড়ে যায় না সেই বিশ্রুত কিনু গোয়ালার গলিকে? দীর্ঘদিন বিদেশবাসের ফলে অমিয় চক্রবর্তীর পরবর্তী কাব্যে অবশ্য বিষয়ের নতুনত্ব—এক ধরনের বিদেশীয়ানা—খুব স্পষ্ট, কিন্তু তাঁর মূলত-রাবীন্দ্রিক দৃষ্টির কোনো হেরফের ঘটে নি।

এমন কি যে জীবনানন্দ দাশ তিরিশের সবচেয়ে মৌলিক, সবচেয়ে স্বয়ংপ্রভ ও আত্মপ্রতিষ্ঠিত কবি, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখলে তাঁর কাব্যেও রাবীন্দ্রিক চেতনা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কল্লোল-যুগের প্রধান-অপ্রধান অন্যান্য কবির মতোই তিনিও রবীন্দ্রনাথকে

কাব্যগ্রন্থ প্রেরণ করে অপেক্ষা করেছেন 'স্নেহাশিসে'র জন্য : দ্র° দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৯৭৫। 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা' প্রবন্ধে জীবনানন্দ অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করে গেছেন বয়োজ্যেষ্ঠ কবির উদ্দেশে :

> তবুও বাংলার মাটিতে রবীন্দ্রনাথের যুগে এসে যারা ভাবাবেগ ও রোমাণ্টসিজ্‌মকে সংহত করে কবিতার ভিতরে তীর্থিকের মতো তপঃশক্তি অথবা হোরেসের রীতি অথবা নিজেদের হৃদয়ের ঈষদঙ্কুরিত অন্য এক সংহতি আনতে চায় তারা তাকিয়ে দেখে উপরে-নিচে-সম্মুখে রবীন্দ্রকাব্যের অনপনেয় ছায়ায় তাদের স্বাবলম্বনের বিবর্তন চলেছে।…উনবিংশ শতকের ইয়োরোপীয় প্রতীকী কবি কিংবা তাঁদের ইংরেজ-কবিশিষ্যদের কাব্য-আকৃতির চেয়ে তা [রবীন্দ্রকাব্য] যেমন নিরাময় তেমনি মূল্যবান…

আমি এখানে 'নিরাময়' শব্দটিকে লক্ষ্য করতে বলি। যদিও জীবনানন্দের কবিতায় মানুষ ও প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা মূর্ত হয়েছে রক্তের অক্ষরে এবং নিসর্গের প্রশান্ত পরিমণ্ডল হঠাৎ মানুষের হাতের দোনলায় ছিন্নভিন্ন—তবু তাঁর রচনাতেও রাবীন্দ্রিক আত্মা সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়াশীল। এই কবির জীবনবীক্ষা, সুসমঞ্জসভাবে না হলেও, আসলে নেতিবাচক নয়; অন্তত এক ধরনের আস্তিক্যের ক্রমিক উন্মীলন তাঁর কবিতার তন্নিষ্ঠ পাঠকের চোখকে এড়িয়ে যেতে পারে না। তাঁর কবিতায় 'আছে' ক্রিয়াপদটির পৌনঃপুনিকতা এবং অনেক ক্ষেত্রেই অন্ত্যমিলে তার উপস্থিতি নিশ্চয়ই তাৎপর্যপূর্ণ। অপিচ তাঁর একটি কবিতার নাম : 'আছে'।

বস্তুত জীবনের শেষের দিকে জীবনানন্দ দাশ চলেছিলেন সেই স্থিতির দিকে—স্থিরতর রূপ বা বলয়ের দিকে—যা তাঁর আমরণ অন্বিষ্ট। কখনো ম্যাথু আর্নল্ডের মতোই প্রকৃতির মধ্যে সেই স্থিরতরকে—কখনো একটি নারীর মধ্যে শ্রেয়কে—অনুভব করে, এই দুইয়ের মধ্যে শান্তি খুঁজে পেয়েছেন। 'রক্তাক্ত হৃদয় / হরিতের কাছে এসে শিখবে অক্ষয় গুঞ্জরণ'। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে যে গভীর মর্ত্যপ্রেম, ইতিবাচক প্রত্যয়, উদয় ও অস্তের জয়ধ্বনি, নিসর্গের শান্তিকল্যাণ রূপ, উদ্ভিজ্জজীবনরস আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা ও ইন্দ্রিয়বোধের ক্ষমতা, তা মুখ্যত রাবীন্দ্রিক :

> ১. বিকেল বলেছে এই নদীটিকে : 'শান্ত হতে হবে'—
> অকূল সুপুরিবন স্থির জলে ছায়া ফেলে
> এক মাইল শান্তি কল্যাণ
> হয়ে আছে।
>
> 'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে

চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয় ;
জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয় ।

৩. শুনেছি কিন্নরকণ্ঠ, দেবদারু গাছে,
দেখেছি অমৃতসূর্য আছে ।

৪. একটি পাখির গান কী রকম ভালো ।

মাটি-পৃথিবীর টানে, মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি,
না এলেই ভালো হত অনুভব করে,
এসে যে গভীরতর লাভ হল সে-সব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে…

৫. ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো-এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে ।

'মাটি-পৃথিবীর টান', ক্রিয়াপদের অন্ত্যমিল বা ছোট একটি বিশেষণ 'ভালো', শান্তি, কল্যাণ, স্থির প্রভৃতি শব্দের উপরে জোর, 'আছে' ক্রিয়াপদের পর পূর্ণবিরামচিহ্ন—সিংদরজা দিয়ে না হলেও এই সমস্ত প্রায়-অলক্ষ্য দরজা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সূক্ষ্মশরীরে জীবনানন্দের কবিতায় অনুপ্রবেশ করেছেন। এ ছাড়া নিখিল, অনাদি, অমৃত, হরিৎ প্রভৃতি শব্দ তিনি অগ্রজের কাছেই শিখেছেন—শিখেছেন জন্ম-জন্মান্তরের দিকে কল্পনাকে প্রসারিত করে দিয়ে রহস্যময়তা সৃষ্টি করে পাঠককে রোমাঞ্চিত করার কৌশল। 'মহিলা' শব্দটি জীবনানন্দের আবিষ্কার ; কিন্তু 'নারী' শব্দ এবং নারী-সম্বন্ধে মনোভাব রবীন্দ্রনাথের কাছেই তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সর্বশেষ উদ্ধৃতিটিতে জীবন-ক্লান্তি ও অন্ধকারের বাসনা নিজস্বতা দিয়েছে সত্য, কিন্তু ঘাসের সঙ্গে একাত্মতার ইচ্ছা এবং সমগ্র কবিতায় যে প্রাকৃতিক প্রাণরস আস্বাদনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আনন্দ তা রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকারের অন্তর্গত। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, যে ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিপর্যয়কে আধুনিক কাব্যরীতির একটি প্রধান লক্ষণ বলে মনে করা হয়, রবীন্দ্রনাথ 'সুরের আগুন', 'আলোর বাঁশি' প্রভৃতি চিত্রকল্পে বহুপূর্বেই তার সন্ধান করেছিলেন। বস্তুত জীবনানন্দ দাশের বিশ্রুত 'ডানায় রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল' রাবীন্দ্রিক ভঙ্গির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়েরই ফল। রবীন্দ্রনাথের মতোই জীবনানন্দ বার বার নারীর স্তুতিগান করেছেন তাঁর কবিতায়। 'সময়ের শতকের মৃত্যু হলে তবু / দাঁড়িয়ে রয়েছে

শ্রেয়তর বেলাভূমি'

তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল, সূর্য মানে আলো,
এখনো নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো'।

'স্নিগ্ধ'-বিশেষণটি জীবনানন্দের বিশেষ প্রিয়, এবং এই কবিতাটির তিনটি স্তবকে তিন বার তার উপস্থিতি—প্রতি স্তবকে একবার। অর্থাৎ জীবনানন্দ নারী সম্বন্ধে স্নিগ্ধতা, শুশ্রূষা, শ্রেয়—এই সমস্ত শব্দে চিন্তা করেই আবেগে আপ্লুত হতেন। কিন্তু 'কত রাধিকা ফুরালো' : এ কি কোনো কবির কথা? তা ছাড়া নদী শুধু শুশ্রূষাই নয়, তার একটি কীর্তিনাশা রূপও আছে। রাধিকারা জীবনে ও কাব্যে কখনোই ফুরায় না, কল্যাণী মেয়েদের মতো তারাও অজরা ও মৃত্যুহীন। আমার মনে হয় জীবনানন্দের জীবন-সম্বন্ধে সমস্ত ভাবনার কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে নারী ও প্রকৃতির স্নিগ্ধ ও শ্রেয়সী মূর্তি। কত আবেগে, নামে, অফুরন্ত ভাবে তিনি নারীকে ডেকেছেন তাঁর কবিতায় সেটা দেখবার মতো বিষয়। বস্তুত জীবনানন্দ যিনি প্রেম-অপ্রেম এই সুন্দর যৌগিক শব্দটি সৃষ্টি করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের মতোই প্রেমের গৌরবকীর্তনে অক্লান্ত :

সেই ইচ্ছা সঙ্ঘ নয় শক্তি নয় কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়,
আরো আলো : মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।

এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা
সত্য ; তবু শেষ সত্য নয়।
কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে ;
তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়।

'সুরঞ্জনা', 'মিতভাষণ', 'সুচেতনা' : তিনটি কবিতাতেই 'মালিনী' ও 'রক্তকরবীর' স্মৃতি গভীরে সক্রিয় ছিল মনে হয়, কারণ একটি বৌদ্ধ সৌরভ বা আবহই শুধু নয়, ধর্ম, শক্তি, সুধীদের বিবর্ণতা, আলো প্রভৃতি শব্দও অনিবার্য ভাবে মনে পড়িয়ে দেয় ঐ দুটি নাটককে—যেখানে কবি প্রেমকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলেছেন, 'আলো' বলেছেন, এবং স্থান দিয়েছেন শক্তি, শাস্ত্র ও মননের অনেক উপরে। জীবনানন্দের এই তিনটি কবিতায় রাবীন্দ্রিক অনুষঙ্গ সত্ত্বেও এমন একটি সহজের সৌন্দর্য আছে যা আমাদের মুহূর্তেই তুক করে। জীবনানন্দের রীতি যে পরোৎকর্ষে পৌঁছেছে এ-সব কবিতায় তা বোঝা যায় এই থেকে যে ওপরের উদ্ধৃতিগুলিতে একটি শব্দও আমরা কোথাও পালটাতে পারি না—এমন কি 'তবে'—এই রবীন্দ্রব্যবহৃত পদ্য-শব্দ কিম্বা 'মানুষ' বা তাঁর আবিষ্কৃত 'মানুষী'কেও না। 'জন্যে', 'মানব', 'মানবী' প্রভৃতি বিকল্প এখানে বসাতে গেলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে ক্রোচের উক্তি ও উপলব্ধির অভেদ-তত্ত্ব কত অভ্রান্ত। বস্তুত এই

কবিতাগুলিতে 'সাথে', 'তরে', 'হতেছে' প্রভৃতি কাব্যিক শব্দ ও অন্ত্যমিলের বিশিষ্ট দুর্বলতা সত্ত্বেও আছ-দেখেছ; এসেছি-বুঝেছি; আলো-ভালো—বাক্যবিন্যাসে এমন একটি শিল্পিত সরলতা আছে, শব্দে এমন একটি অনিবার্যতা, এমন একটি সোজা একাগ্র ভঙ্গি, কথ্যছন্দ ও গদ্যছন্দের অনায়াস মিশ্রণ, যার তুলনা আমরা বিশেষ করে পাই রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য গানে, ১৩০৭এ প্রকাশিত 'ক্ষণিকা'য় এবং একেবারে শেষের দিকের কিছু কবিতায়। সাধু ও কথ্য ক্রিয়াপদ, পদ্য, সাহিত্যিক এবং আটপৌরে শব্দের নিপুণ বুনোট, পংক্তির শেষে ক্রিয়াপদ, বিপর্যয়হীন ঋজু বাক্যগঠন এ-সবই রবীন্দ্রনাথ ১৩০৭ বা তার আগেই আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যে যা স্বাভাবিক—এত স্বাভাবিক যে লক্ষ্য করে না দেখলে কারো নজরেই পড়ে না—জীবনানন্দে তা-ই বিশেষ একটি কৌশল, এবং বিশিষ্ট স্বাদ-গন্ধের অধিকারী। জীবনানন্দ যখন লেখেন 'কী কথা তাহার সাথে? তার সাথে!' তখন মুহূর্তেই আমাদের মন কেড়ে নেন সাধু সর্বনামের আকস্মিকতায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন 'আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচজনে / আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা', তখন যে অপার বিস্ময় ও পুলকে হৃদয় ভরে ওঠে তার তুলনা কোথায়? এখানে 'তাহার' সরল-স্বাভাবিকভাবে এসেছে এবং তুলনায় অনেক বেশি তুকমন্ত্রময়। তবে জীবনানন্দ যে ভাবে কাব্যধর্মী ও প্রথাসিদ্ধ শব্দের পাশে গ্রাম্য, এমনকি অমার্জিত শব্দ প্রয়োগ করে আকস্মিক সংঘর্ষের সৃষ্টি করেন এবং কাব্যময়তা একশোগুণ বাড়িয়ে তোলেন সেটা তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্ভাবন। রবীন্দ্রনাথেও মৌখিক শব্দের বৈসাদৃশ্যহেতু একটি পংক্তি কাব্যগুণে সমানই ঋদ্ধ হয়ে ওঠে নিঃসন্দেহে, কিন্তু এখানে আমরা পাই সংঘর্ষের পরিবর্তে সম্পূর্ণ সমন্বয় ও সামঞ্জস্য।

সর্বব্যাপী সৌর প্রভাব থেকে মুক্তি পান নি বিষ্ণু দে-ও—এমনকি যে-পর্যায়ে তিনি মার্ক্সীয় তত্ত্বে অনুপ্রেরিত হয়ে কবিতা লিখেছেন, তখনও। 'চোরাবালি'তে এজরা পাউণ্ড ও এলিয়টের কৌশল গ্রহণ করে রবীন্দ্রকবিতার পংক্তি বা শব্দ উদ্ধৃত করেছেন এমন ভাবে যাতে বিদগ্ধ সমালোচক অতুল গুপ্ত মন্তব্য করেছিলেন[২], 'শোনায় যেন বিশুদ্ধ ইয়ার্কি'—

> কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধা-বনে।
> এদিকে আর পঁচিশ মিনিট—
> ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর।

ইয়ার্কি দূরে থাক, এ ধরনের উদ্ধৃতি প্রকৃতপক্ষে উৎস-কবিতার অন্তর্গূঢ় সৌন্দর্য ও ব্যঞ্জনার

২. কবিতা, বিশেষ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৭।

উদ্‌ঘাটন; আমাদের স্মৃতিতে যে-আলোড়নের সৃষ্টি হয় ও যে-আনন্দের উদ্দীপনা ঘটে তাতেই তার সার্থকতা।

সে তরু এ-হৃদয় তুমি যে তরুমূলে
বসেছ ফুলসাজে, ছায়ায় দাও বাসা
দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফুলে
জোগায় কথা তাই সোনালি নদীকূলে।

'তরুমূলে' থেকে 'ফুলসাজে' পর্যন্ত অংশ কবি অবিকল তুলে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'একদা তুমি, প্রিয়ে' গানটি থেকে। কিন্তু পাঠকমাত্রই জানেন বিষ্ণু দে-র 'ভিলানেল' কবিতায় এই পংক্তি ক'টি পড়ে কী রকম শিউরে উঠতে হয়। না, এ অনুকরণ নয়, পুনরাবিষ্কার।

বিষ্ণু দে যখন ইতিহাসদেবতা, ভবিষ্যৎ মানবসমাজ, তার উজ্জ্বল স্বপ্ন বা বিপ্লবকে নারীরূপে কল্পনা করে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেন তখন সেখানেও আমরা রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর ও জীবনদেবতা-বিষয়ক কবিতাগুলির অনুরূপ অর্থদ্বৈত অনুভব করে পুলকিত হই। অর্থাৎ এ সমস্ত কবিতাকে অনেক ক্ষেত্রেই মানব-মানবীর প্রেম-সম্পর্কের আলোকে পড়া যায়। বিষ্ণু দে-র বিপ্লবী বীরের আগমনস্বপ্ন 'পাঁচ প্রহর' কবিতায় রূপ নেয়। 'চণ্ডালিকা' ও 'খেয়া'র একটি প্রসিদ্ধ কবিতার স্মৃতির অনুরণনে তাঁর নবসূর্যোদয়ের প্রত্যাশা রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক প্রতীক্ষার সমতুল।

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, তিরিশের দ্বিতীয়ার্ধ ও চল্লিশের থেকে বাঙালি কবিদের মধ্যে যে বামাবর্ত-প্রবণতা তার অব্যবহিত প্রেরণা হয়তো মার্ক্সীয় সমাজ-দর্শন এবং মায়াকভ্‌স্কি, এলুয়ার, আরাগঁ প্রভৃতি কবিগোষ্ঠী, কিন্তু চাষি, শ্রমিক, অচ্ছুৎ, অন্ত্যজ ও শোষিত জনগণের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে গভীর সমবেদনা, যে শ্রদ্ধা, সেই উদার মানবিকতা থেকে তাঁরা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এ চিন্তা কি একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো? বুর্জোয়া বলে চিহ্নিত এই কবি কিন্তু 'রাশিয়ার চিঠি' লিখেছিলেন ১৯৩১এ এবং তারও অনেক আগে লিখেছিলেন 'অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু' বা 'মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে'। অবশ্যই শ্রেণী-সংগ্রাম, মিছিল, বিপ্লব, কলকারখানার শ্রমিকদের কথা আমরা তাঁর কবিতায় পাই না, বা সামান্যই পাই, কিন্তু যখন দেখি শ্রমিক-কিষাণ বা সোনার ভবিষ্যতের কথা বলতে গিয়েও বামপন্থী কবিরা সকলেই বুর্জোয়া কবির ভাষাই শুধু নয়, সেই স্বপ্নবিলাসেরও আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন আমরা চমৎকৃত না হয়ে পারি না। একটি নরম স্বপ্ন, বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাল্পনিক আনন্দ, উৎপীড়িত ও শোষিতের জন্য আন্তরিক মমতা প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমাজচেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে, এবং কর্ম ও ঘর্মের রাবীন্দ্রিক অনুপ্রাস তাঁর প্রিয় হলেও কবিতায়

কোনো কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে তিনি পরাঙ্মুখ। যে-কবি এক নিঃশ্বাসে কামারের সঙ্গে হাতুড়ি পেটাচ্ছেন, অজানা নদীপথে জোয়ারের মুখে গুণ টানছেন, পাহাড়ে কাটছেন সুড়ঙ্গ, উচ্ছেদ করছেন অরণ্য, খোয়া ভাঙছেন, খাল কাটছেন, পথ বানাচ্ছেন, তিনি মুখে 'স্বপ্নের সময় নেই' বললেও আসলে স্বপ্নই দেখছেন—কর্ম স্পষ্টই তাঁর অভীষ্ট নয়। এ-জাতীয় কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'নিমেষ তরে ইচ্ছা করে / বিকট উল্লাসে / সকল টুটে যাইতে ছুটে / জীবন-উচ্ছ্বাসে' প্রভৃতির দূরত্ব এক ধনুও নয়। এই নালিশ এক শ্রেণীর পাঠকের ছিল জীবনানন্দ দাশের বিরুদ্ধেও; কবির আশুচেতন মন 'সাতটি তারার তিমিরে' এই ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করেছিল কিন্তু সামাজিক বিপ্লবের পক্ষে প্রচারের পরিবর্তে সেখানে আমরা পাই বৈবিক ধরনে 'শুভ্র মানবিকতার ভোরে'র আমন্ত্রণ, আর এই অমার্ক্সীয় মন্তব্য : 'সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ'। এই শুভনাস্তিক বস্তুবাদী যুগেও ভালোবাসাকে তিনি একমাত্র পরিত্রাণ মনে করে গানের আবেগে ছন্দান্বিত করেন তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস : 'সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে —এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে'। এ পথেই পৃথিবীর মুক্তি হবে কি হবে না এ তর্ক আপাতত মুলতুবি রেখে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করি তিরিশের আকাশের আরও তিন নক্ষত্রের দিকে : অজিত দত্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, হেমচন্দ্র বাগচী। এ ছাড়াও এই দশকেরই অন্তর্গত মণীশ ঘটক, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রভৃতি। এঁরা কেউই রবীন্দ্রসঞ্চার এড়াতে পারেন নি খুব স্বাভাবিক কারণে। 'ছিন্নপত্রের' নিসর্গ-বর্ণনার সঙ্গে সাদৃশ্য সত্ত্বেও হেমচন্দ্র বাগচীর গদ্যছন্দের কবিতাগুলির একটি বিশিষ্ট আস্বাদ আছে। সংসারের কোলাহলে উৎপীড়িত একটি চিত্ত প্রকৃতির মধ্যে আশ্রয় ও শান্তি খুঁজছে—এই ভাবটি, ও একটি মৃদু বিষণ্ণ সুর, এই কবিতাগুলিতে স্পষ্ট। আশ্চর্য, এই কবির দিকে আজ আমাদের কোনো মনোযোগ নেই। উল্লিখিত কবিকুলের অতিরিক্ত আরো কিছু কবি আছেন—যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুনীলচন্দ্র সরকার, অরুণ মিত্র, অশোকবিজয় রাহা ও বিমলচন্দ্র ঘোষ। জন্ম-তারিখের বিচারে এঁরা তিরিশের দশকেই পড়েন, কিন্তু এঁদের কবিতা চল্লিশের লক্ষণাক্রান্ত বলে এখানে আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

রবীন্দ্রনাথকে এড়াতে গিয়ে পাশ্চাত্য সাহিত্যের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিরিশের কবিরা এবং এই উপায়ে সফলও হয়েছিলেন বাঙলা সাহিত্যে নতুন একটি কাব্যধারার প্রবর্তন করতে। কিন্তু টান-উল্টো টানের ফলে যে শক্তি এসেছিল তাঁদের কবিতায়, দুঃখের বিষয় তার অভাবে, এবং প্রধানত তিরিশের কবিদের কাছে নাড়া বাঁধার ফলে চল্লিশের কবিতার একটি বৃহৎ অংশ—বিশেষত দক্ষিণাবর্ত কবিগোষ্ঠীর—তুলনায় অনেক নিষ্প্রভ ও মৌলপ্রেরণারহিত। এই কারণে তাঁদের কবিতায় রবীন্দ্রপ্রভাব ও তিরিশের প্রভাব

পাশাপাশি বিরাজ করছে, এবং অনেক সময়ই রবীন্দ্রকাব্যের স্মৃতি সঞ্চারিত হয় প্রত্যক্ষভাবে নয়, তিরিশের কবিদের মাধ্যমে। এই সময়ে বামাবর্ত-কবিতাই বরং অনেক বেশি প্রাণবন্ত। সমর সেনের প্রথম দিকে বেশ কিছু নিখুঁত, সুন্দর কবিতায় রজনীগন্ধা, রক্তকরবী, হলুদ রঙের চাঁদ প্রভৃতি প্রতীক ও চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রসৌরভ বিকীর্ণ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি মার্কসীয় দর্শন গ্রহণ করে রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে প্রায়-মুক্ত হতে পেরেছিলেন। তিরিশের কোনো কোনো কবির মতোই সুকান্ত ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথকে কবিতা লিখে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এবং তাঁর স্মৃতির 'উজ্জ্বল উপস্থিতি' স্বীকার করেছেন। চল্লিশের কবিদের মধ্যে—ছন্দ বাদ দিলে—সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপর রবীন্দ্রপ্রভাব সবচেয়ে কম, কিন্তু 'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থে মাত্র তেইশ-চব্বিশটি কবিতায় অন্তত ন-দশবার চাঁদ দেখলুম। 'চাঁদ' সম্ভবত তাঁর কাব্যে বুর্জোয়া কল্পনাবিলাস ও পুরোনো কাব্যধারার প্রতীক, যার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু আক্রমণ করাই উদ্দেশ্য হলেও, ফল হয়েছে উল্‌টো। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ এক ধরনের ব্যাজস্তুতি, কারণ এখানে বিদ্রূপ আছে ওপরের স্তরে, গভীরে আছে মুগ্ধতা। 'চোখ বুঁজে কোনো কোকিলের দিকে ফেরাবো কান' : কোকিল-প্রেমিককে পরিহাস সত্ত্বেও পাঠককে কিন্তু বেশি মুগ্ধ করেছে ঐ চমকপ্রদ কোকিলটি। অর্থাৎ রবীন্দ্রভক্তি বিপ্রতীপ ঢঙেও দেখা দিতে পারে। সাত-পাঁচ ছন্দকে উল্‌টে পাঁচ-সাত করে রবীন্দ্রনাথের 'বধূ' কবিতাটির একটি সুশ্রী প্যারডি লিখেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়—না, ঠিক প্যারডি বলব না কারণ রবীন্দ্রনাথকে উপহাস, বা নিছক মজা তাঁর লক্ষ্য নয়; গভীরে তাঁর উদ্দেশ্য অন্য। অবশ্য এ সমস্ত অভ্যাস ছাড়িয়ে তিনি পরবর্তীকালে কঠোর বিপ্লবের কবিতাও লিখেছেন—কিন্তু সেগুলি কত দূর কবিতা? কবিতা লিখে কবিতাবিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করেছেন সুকান্ত ভট্টাচার্য যে কবিতাটিতে সেখানেও উপমেয় 'পূর্ণিমা চাঁদ' যেন 'ঝলসানো রুটি'র চেয়ে প্রধান হয়ে ওঠে পাঠকের মনে। রবীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র প্রতিধ্বনি শোনা যায় মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও রাম বসুর কবিতায়। এ সময়ের আরও দুজন কবি দিনেশ দাশ ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিতায় দক্ষিণ ও বাম দুই প্রবণতার মধ্যে দোল খেয়েছেন। দিনেশ দাশ 'কাস্তে'র মতো সুন্দর একটি কবিতা লিখে পরিচিত হয়েছিলেন রাতারাতি। অবশ্য এঁরা দুজনেই রাবীন্দ্রিক রীতির কবিতাও লিখেছেন; এবং বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তিরিশের কবিদেরও অম্লানবদনে সেই সঙ্গে রেখে স্পষ্ট করেছেন চল্লিশের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতপ্রস্তাবে একটিমাত্র আদর্শের প্রতি হিংস্র আসক্তির অভাবে এঁরা দুজনেই মনস্থির করতে পারেন নি; এবং এঁদের কবিতায় বিপ্লবের প্রেরণার চেয়ে ভাবালুতাই প্রধান হয়ে ওঠে। 'নিয়ে ভিড় ভ্রষ্ট নীড় মৌনমূক ভুখ-মিছিল' : বলা বাহুল্য, এই ছন্দে 'ভুখ-

মিছিল' দাঁড়াতে পারে নি ; ছন্দের দোলায় কবির বিষয় এখানে বিস্মৃত। প্রকৃত বিপ্লবী কবিতা কিন্তু লেখা হচ্ছে আরো এক দশক পরে—পঞ্চাশের কবি মণিভূষণ ভট্টাচার্যের শক্তিশালী কলমে। একটি বা একাধিক চিত্রকল্পের মাধ্যমে (কখনো একটি কাহিনীর আভাস হয়ে ওঠে সব মিলিয়ে অখণ্ড এক চিত্রকল্প) বিপ্লবের বাণীকে যত দূর সম্ভব জনসাধারণের ভাষায় পৌঁছে দেওয়া জনসাধারণের কাছে।

পঞ্চাশের দশকে আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি এক উল্লেখযোগ্য রাবীন্দ্রিক কবিগোষ্ঠীর আবির্ভাব, যাঁরা রাবীন্দ্রিক সম্পদের সুষ্ঠু নিয়োগ করেছেন তিরিশের কবিদের মতোই, কিন্তু নিঃসঙ্কোচে—বিদ্রোহ বা বিরোধিতাজনিত কোনো আততিতে পীড়িত না হয়ে। অবশ্য জীবনানন্দের স্মৃতি পঞ্চাশের প্রধানদের কবিতাতেও স্বভাবতই ছাপ রেখেছে ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও রবিভক্তদের মৌল প্রেরণা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে এ রকম গভীর, অন্তরঙ্গ ও জীবন্ত পরিচয় পঞ্চাশের অন্য কবিদের মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু যে কবি লিখেছিলেন 'রবীন্দ্ররচনাবলী লুটোয় পাপোশে', তিনি বোধ হয় জানতেন না যে তিনি যখন ঈশ্বরীর কাছে নতজানু তখন সমস্ত নাটকীয়তা সত্ত্বেও নারী ও প্রেমের প্রতি রাবীন্দ্রিক পবিত্রতাবোধ ও আত্মসমর্পণের ভাবই বিভাসিত হয়ে উঠছে তাঁর কবিতার দর্পণে। পঞ্চাশের থেকে সত্তরের মধ্যে সাধারণভাবে রাবীন্দ্রিক প্রতিধ্বনি ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে সত্য, এর একটি কারণ এই সময়ে জীবনানন্দ দাশের অভ্যুত্থান ও অসাধারণ জনপ্রিয়তা এবং তাঁর ব্যাপক ও গভীর প্রভাব। কেউ কেউ জীবনানন্দের শব্দের পুনরাবৃত্তিতে ক্লান্তিকর ; এবং বর্তমান প্রজন্মে (generation) এমন কবিদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে যাঁরা পাঠ্যপুস্তকের বাইরে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাও পড়েন নি, বা অল্প কবিতাই পড়েছেন। তবু আমি এই প্রবন্ধ লিখতে লিখতে, নমুনাপরীক্ষার রীতিতে, দুটি কাব্যগ্রন্থ লটারির মতো দৈবাৎ তুলে নিয়েছি : একটি প্রণবেন্দু দাশগুপ্তর 'নিজস্ব ঘুড়ির প্রতি', অন্যটি দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেবল দেখেছে শিয়রলতা', এবং কোনো চিন্তা না করেই পাতা ওলটাতে ওলটাতে দুটি বইয়ের দুটি জায়গায় আমার দৃষ্টি আটকে গিয়েছে :

ক. মরি মরি ! / এই যদি সুন্দর ভুবন, তবে কেন সবাই ঘুমিয়ে···

খ. রক্তকরবীর ডালে অনঙ্গের মণিক্যমঞ্জুষা / একদিন হঠাৎ ছড়িয়ে গেল।

কখন, কোথায়, এইভাবে অঙ্কুরের মতো জেগে উঠবেন রবীন্দ্রনাথ—কেউ কি জানে ?[৩] তবুও পঞ্চাশের অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয় কবিদের তুলনায় অপূর্ববস্তুনির্মাণ-ক্ষমতা এ-দুজনের কারোই একটুও কম নয়। আমি আমার বুক্-শেল্ফ্ থেকে আরো কিছু

৩. এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রপ্রভাব ও রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকার প্রভৃতি বলতে আমি শুধু তাঁর বিশেষ সৃষ্টি নয়, সেই কাব্যধারাকেও বুঝেছি, এ দেশে যার চরমোৎকর্ষ ঐ কবি।

কাব্যগ্রন্থ ও পত্রিকা একই নিয়মে টেনে বার করে নিয়ে পঞ্চাশ বা তারও পরের কবিতা আশ্চর্য হয়ে দেখছি এঁরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো মুহূর্তে কম বা বেশি রবীন্দ্রস্পৃষ্ট। ভবিষ্যতের কবিতায় এই কবি এখনো অনেক অনেক যুগ পর্যন্ত যে অনুভাব সঞ্চার করবেন তা হয়তো হবে এর চেয়েও গূঢ়, দুর্নিরীক্ষ্য, আণুবীক্ষণিক; কিন্তু বীজাণুকে চোখে দেখা যায় না বলেই তার সর্বব্যাপী উপস্থিতিকে অস্বীকার করবে কোন বাতুল? এই সূত্রে এ-মন্তব্যও সমীচীন যে সাম্প্রতিক কবিতার বড় একটি অংশ রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্য থেকে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন। এবং ন্যায়ের খাতিরে বলা উচিত, সেই তুলনাহীন স্বরাট্ বিশাল প্রতিভাকেও আধুনিক লেখকেরা প্রভাবিত করেছিলেন তাঁর কাব্যজীবনের শেষের দিকে—বিশেষত বিংশ শতাব্দীর বাস্তব জীবন থেকে শব্দচয়নে, পদ্যছন্দের কবিতাকে কথ্যছন্দের কাছাকাছি নিয়ে আসার চেষ্টায় এবং সংক্ষিপ্ত ঋজুতার সন্ধানে।

তিরিশের কবিরা রবীন্দ্রঋণের সদ্ব্যবহার করেছিলেন প্রধানত দুই উপায়ে: এক, রাবীন্দ্রিক ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিকে তাঁরা রূপায়িত করেছিলেন আধুনিক শৈলিতে। এবং দুই, আধুনিক চিন্তা ও দর্শনকে তাঁরা মূর্ত করেছিলেন রাবীন্দ্রিক ভঙ্গি, শব্দ, ছন্দ বা ঐ ছন্দের অনাবিষ্কৃত নানা রূপের সঙ্গে স্বকীয় ভঙ্গি ও ভাষা মিশিয়ে। আজকের কবিরা এ রকমভাবে উইল্-বলে প্রাপ্ত সম্পত্তির বিনিয়োগ করবেন না নিশ্চয়ই; কিন্তু তাঁদের হাতের কাছেই যে সোনার ভাণ্ডার, তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বা সে সম্বন্ধে অনবহিত থাকাও নিতান্ত অবিবেচনার কাজ। রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও ভালোবাসার সংযোগ প্রত্যেক কবিযশঃপ্রার্থীরই আজও আবশ্যিক কর্তব্য। কবি নিজেও দেশী ঐতিহ্যকে আশ্রয় করেই স্বীয় প্রতিভাবলে হয়ে উঠেছিলেন এক ভাস্বর পুরুষ। তবে বর্তমান সময়ে আমরা কবিদের যে ভাবগতিক দেখছি তা আদৌ সুলক্ষণ নয়। এ যেন ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে দরজা-জানলা বন্ধ করে বাতাসকে বহিষ্করণ। কিন্তু বাতাস তো আছে, সর্বত্র আছে, এবং থাকবেই।

৪

সন্ধিক্ষণের কবিতা

অলোক রায়

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যখন তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম দেন 'সন্ধিক্ষণ' (১৯০৫), তখন জাতীয় জীবনে সন্ধিক্ষণের তাৎপর্য অতিক্রম করে তা বাঙলা কাব্যধারারও সন্ধিক্ষণ সূচিত করে। সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সবিতা' প্রকাশিত হয়েছে ১৯০০ সালে, বর্তমান শতাব্দীর সূচনামুহূর্তে। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়েছে ১৯২২ সালে, মৃত্যু-পরবর্তী গ্রন্থের হিসাব নিলে ১৯২৩ ও ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে 'বেলা শেষের গান' ও 'বিদায় আরতি'। মোটের উপর তাই বিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছর সত্যেন্দ্রনাথের কাল, এই সময় তাঁর সতীর্থ-সহযোগী কবি ছিলেন করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও কালিদাস রায়। সাধারণভাবে এই কবিপঞ্চককে রবীন্দ্র-বৃত্তের কবি বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় এই ধরনের শ্রেণীনির্দেশের হয়তো উপযোগিতা আছে, শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে সব কিছু বিচারের প্রবণতাও অনুধাবনযোগ্য —কিন্তু কবি বা কাব্যের পরিচয় এ ভাবে মেলে না। অন্য দিকে 'কল্লোলে'র সময় থেকে সচরাচর আধুনিক কবিতার জন্ম ধরা হয় বলেই প্রাক্-'কল্লোল' কবিরা অনাধুনিক বলে পরিগণিত হন। 'কল্লোলে'র প্রকাশ ১৯২৩ সালে, সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে। যুগবিভাগের পক্ষে বেশ সুবিধাজনক— এ দিক থেকেও বিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছর তথাকথিত 'পুরোনো' কবিদের রাজত্বকাল।

অবশ্য কবিদের এই নতুন-পুরোনো শ্রেণীভাগ নিতান্ত সাল-তারিখের নিরিখে অসঙ্গত ও অসম্ভব। 'কল্লোল' পত্রিকায় বিজয়চন্দ্র মজুমদার, কুসুমকুমারী দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, রাধাচরণ চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুধীরকুমার চৌধুরী, হেমেন্দ্রলাল রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, জসীমউদ্দিন, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দত্ত প্রভৃতিও কবিতা লিখেছেন, যাঁরা অনেকেই ছিলেন শতাব্দীর প্রথমপাদের বাঙলা কাব্যধারার অনুবর্তী। অন্য দিকে 'কল্লোল' পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছে সত্যেন্দ্র-প্রশস্তি (ভাদ্র ১৩৩২)। আসলে তখনও সত্যেন্দ্রনাথ বা তাঁর সহযোগী কবিরা অপাংক্তেয় বিবেচিত হন নি, বরং 'কল্লোলী'য়-কবিদের উপর সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল অপ্রতিরোধ্য। ১৯২২ সালে নজরুল ইসলামের কবিতায় সত্যেন্দ্রানুসরণ খুবই স্পষ্ট—

অধর নিস্‌পিস্‌
নধর কিস্‌মিস্‌
রাতুল তুলতুল্‌ কপোল—
ঝর্‌লো ফুলকুল,
কর্‌লো গুল্‌ভুল
বাতুল বুল্‌বুল্‌ চপল।

'বদন-চন্দ্রমা', প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২৯।

ঐ নীল-গগনের নয়ন-পাতায়
নামল কাজল-কালো মায়া;
বনের ফাঁকে চমকে বেড়ায়
তারি সজল আলো-ছায়া॥
ঐ তমাল-তালের বুকের কাছে
ব্যথিত কে দাঁড়িয়ে আছে—
দাঁড়িয়ে আছে,
ভেজা পাতায় ঐ কাঁপে তার
আদুল ঢল ঢল কায়া।

'স্তব্ধ বাদল', প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৯।

শুধু নজরুল ইসলাম নন, তরুণ জীবনানন্দ দাশ বা বুদ্ধদেব বসুও অন্তত সাময়িক ভাবে সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছেন, এমন কি আরো পরবর্তী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের কবিতায় সাময়িক ও রাজনৈতিক বিষয়ের ছন্দাশ্রয়ী প্রকাশও সত্যেন্দ্রনাথকে স্মরণ করিয়ে দেয়: সত্যেন্দ্রনাথের 'ধর্মঘট' ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'উনত্রিশে জুলাই' কবিতা মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।

তা হলে ধারাবাহিকতা স্বীকার করতে হচ্ছে। কিন্তু বিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছর যাঁরা কবিতা লিখেছেন, তাঁরা কি সকলেই 'রবীন্দ্রনাথের 'মতো' হতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথেই হারিয়ে গেলেন'? অবশ্য এক হিসাবে রবীন্দ্রপ্রভাব ছিল অপ্রতিরোধ্য; সে কালের কবিরা রবীন্দ্রনাথের বড় কাছাকাছি ছিলেন, এ কথাও সত্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরে দ্বিতীয়-রবীন্দ্রনাথ যেমন অসম্ভব, তেমনি রবীন্দ্রনাথের ভাব-ভাষা-ছন্দের অনুসরণও এ কালে স্বাভাবিক। এ দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তিরিশের, এমন কি চল্লিশের দশকের কবিদের রচনাতেও দেখা যাবে। বুদ্ধদেব বসু, যিনি মনে করেন 'রবীন্দ্রনাথ পড়া থাকলে, আজকের দিনে সত্যেন্দ্রনাথের আর প্রয়োজন হয় না', তাঁর কবিতার একটা বড় অংশ সম্বন্ধেও হয়তো অনুরূপ মন্তব্য করা সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করতে চাওয়া অবশ্য দোষের নয়, অনেকেই সে চেষ্টা করেছেন, যেমন শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রিয়ম্বদা দেবী, সুখরঞ্জন রায়, রমণীমোহন ঘোষ, ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী, গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। সাহিত্যের ইতিহাসে এঁদের স্থান হলেও বাঙলা কাব্যের গতিপরিবর্তনে বা প্রভাববিস্তারে এঁদের ভূমিকা নগণ্য। বুদ্ধদেবের অভিযোগ এই কবিদের সম্বন্ধে কিছুটা গ্রাহ্য হতে পারে, কিন্তু এঁদের সম্বন্ধেও এমন কথা বলা অন্যায় হবে যে কথা সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'ইনি খাঁটি কবি কি না সেইটেই হলো আসল কথা। সত্যেন্দ্রনাথে এই খাঁটিত্বটাই পাওয়া যায় না।' আসলে কবিতাবিচারে এই 'খাঁটিত্বে'র প্রসঙ্গ উঠলেই বিপদ, কারণ 'খাঁটি তৈল বা খাঁটি ঘৃতে'র মতো 'খাঁটি কবিত্বে'র বিচার চলে না। সেখানে পক্ষপাত আসে; কোনো কারণে কারো রচনা ভালো না লাগলেই তার পিঠে 'অকবি' ছাপ মেরে দেওয়াও সুবুদ্ধির পরিচয় নয়। কবিতার ভালো-মন্দ বিচারের একাধিক মানদণ্ড ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, যুগরুচি ও ব্যক্তিরুচির প্রভাবও সেখানে স্মরণীয়। এ অবস্থায় আলোচ্য কবিদের রচনা আজকের দিনে আমাদের তেমন আকর্ষণ করে না বলেই তাঁদের কাব্যপ্রয়াসকে ব্যর্থ বলা যায় না।

অন্য দিকে করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন, সত্যেন্দ্রনাথ, কুমুদরঞ্জন ও কালিদাস শুধু সাহিত্যের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য নয়, স্বতন্ত্র কবিব্যক্তিত্ব হিসাবেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। বাঙলা কাব্যধারার এক সন্ধিক্ষণের কবি বলতে পারি তাঁদের। রবীন্দ্রযুগে তাঁরা কবিতাচর্চা করেছেন বটে, কিন্তু রবিরশ্মিকে প্রতিফলিত করাই তাঁদের একমাত্র কবিকর্ম ছিল না। হয়তো স্পষ্ট বা সুচিহ্নিত নয়, কিন্তু একটা স্বতন্ত্র কাব্যাদর্শ এই কবিদেরও ছিল। কোনো সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথের মতোই প্রেম ও নিসর্গপ্রকৃতি, ইতিহাস ও পুরাণ, স্বদেশ ও সমাজ, ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বে বিশ্বাস, অর্থাৎ রোম্যান্টিক কবিতার প্রচলিত বিষয়বস্তুই এঁদের কবিতার অবলম্বন। আর, রবীন্দ্রনাথের পরে তাঁর উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত ছন্দ ও কবিভাষার ব্যবহার না করেও কারো রেহাই নেই। ফলে যদি কখনো বিচ্ছিন্নভাবে এঁদের রচনা রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতিধ্বনির মতো শোনায় তার জন্য এঁদের দোষ দেওয়া যায় না। সচেতনভাবেও এঁরা কখনও রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছেন—বিশেষভাবে যাঁরা তাঁর নিকট-সান্নিধ্য পেয়েছেন, যেমন যতীন্দ্রমোহন ও সত্যেন্দ্রনাথ। কিন্তু একটা বিরোধ ছিল, যাকে স্ববিরোধও বলতে পারি—মুখে ও লেখায় বার বার রবীন্দ্র-প্রশস্তি রচনা, কিন্তু নিজেদের কবিতায় স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ। দৃষ্টান্ত হিসাবে কালিদাস রায়ের পরিণত বয়সের আত্মবিশ্লেষণ স্মরণ করতে পারি :

গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে শুরু করেছিলাম যাত্রা, কিন্তু তাঁর চলার পথে আগাতে পারি

নি। তাঁর পদাঙ্ক-পরম্পরা খুঁজেও পাই নি। জানি না তিনি তাঁর পদাঙ্ক মুছে মুছে চলে গিয়েছেন কি না। তবে তিনি যে বলেছিলেন—একতারাতে একটি যে তার আপন মনে সেইটি বাজা, সেই একতারা বাজাতে বাজাতে এত দূর এগিয়ে এসেছি—যুগযাত্রার পথে নয়, জীবনের যাত্রার পথে।...আমি জানি রচনারীতির বৈশিষ্ট্যই কবির আসল বৈশিষ্ট্য। কারো, এমন কি কবিগুরুর রচনারীতিরও আমি জ্ঞাতসারে অনুসরণ করি নি—জানি না রচনারীতির বৈশিষ্ট্য আমার কিছু আছে কি না।[১]

অবশ্য কেউ এমন কথা বলতে পারেন, কালিদাস রায় জ্ঞাতসারে না হলেও অজ্ঞাতসারে কবিগুরুর 'অনুকরণ' করেছেন, এবং অনুকারক হিসাবে তিনি ব্যর্থ। কিন্তু কালিদাস রায়ের কাব্যজগৎকে কোনো অর্থেই রাবীন্দ্রিক কাব্যজগৎ বলা যায় না, এবং যদি কালিদাসের কথাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করি তা হলে রবীন্দ্রনাথের কালিদাস-প্রশস্তিকেও সেইভাবেই গ্রহণ করতে হবে—'তোমার কবিতা বাঙলা দেশের মাটির মতোই স্নিগ্ধ ও শ্যামল। বাঙলা দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসায় তোমার মনটি কানায়-কানায় ভরা—সেই ভালোবাসার উচ্ছ্বলিত ধারায় তোমার কাব্য-কানন সরস হইয়া কোথাও বা মেদুর, কোথাও বা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাঙলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।'[২] ভালোলাগা-মন্দলাগার কথা বাদ দিলে, এ কথা স্বীকার করতেই হবে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়লে 'বাঙলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জের কথা মনে পড়ে না। অন্য দিকে কালিদাস, যতীন্দ্রমোহন, সত্যেন্দ্রনাথ, এমন কি করুণানিধানও তাঁদের জীবনের প্রধান অংশটি কাটিয়েছেন শহরে; তাঁদের কবিতাতেও, বিশেষত কলিদাসের কবিতায় শহরজীবনের কথা এসেছে বারবার। কাজেই 'পল্লী-কবি' ছাপ মেরে তাঁদের দূরে সরিয়ে রাখাও অসমীচীন। আর সে দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও শহরজীবনের স্থান খুব বেশি নয়। আসলে গ্রাম ও শহর নয়, এমনকি বর্ণনীয বিষয়ও নয়—কবিব বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিই বিচার্য। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই কবিদের সাদৃশ্য যেমন চোখে পড়ে, তেমনি তাঁদের সমবেত এবং কখনো স্বতন্ত্র কাব্যশৈলি ও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় উনিশ শতকের শেষ দশকে কবিতা লেখা শুরু করেন,

১. গ্রন্থকারের নিবেদন, 'সন্ধ্যামণি' ১৩৬৫।
২. ১১ কার্তিক, ১৩২৪।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বঙ্গমঙ্গল' প্রকাশিত হয় ১৯০১ সালে। সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য 'সবিতা'র মতোই করুণানিধানের প্রথম কাব্যগ্রন্থেও স্বদেশপ্রেমের সুর প্রাধান্য পেয়েছে। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের আগে এ ধরনের স্বদেশপ্রেমের কবিতা সুলভ ছিল না। তরুণ করুণানিধানের কণ্ঠে তখনই শোনা গেছে—

মরা নদী ভরে গেছে আজিকার বানে
কে তিষ্ঠিবে বলো এই দুর্নিবার টানে।
থর থর করতলে ধরিয়াছি হাল
তুলে দে মেঘের কোলে নির্ভরের পাল।

কিছুটা অপ্রত্যাশিত মনে হলেও, সন্ধিক্ষণকে তিনি তখনই প্রত্যক্ষ করেছেন—

আসিয়াছে দুঃসময়, বড় দুঃসময়—
স্তম্ভিত হইয়া আছে আসন্ন প্রলয়।

এবং দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠেছেন—'আমরা সবাই মায়ের সন্তান।' 'বঙ্গমঙ্গলে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময় (১৩১২), সেখানে নতুন কবিতা সংযোজনে ও পুরোনো কবিতার রূপান্তরে কবির স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যোগ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কাজেই করুণানিধানকে শুধু রূপমুগ্ধ স্বপ্ন-পথিক বলে পরবর্তী বাঙলা কাব্যান্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখলে অন্যায় হবে।

আধুনিক কালে আমরা কবির involvement বা commitment এর কথা বলি। শতাব্দীর সূচনায় বাঙালি কবিরা সে দিক থেকে জাতীয় জীবন ও সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং বিশেষ মতামত পোষণে ও প্রকাশে বিরত ছিলেন না। স্বদেশ বা সমাজ-চেতনার স্বরূপ নিয়ে অবশ্যই তর্ক থাকতে পারে, কিন্তু এই কবিদের আন্তরিকতা বা প্রত্যয় সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। সত্যেন্দ্রনাথকে আমরা লালপরী-নীলপরীর কবি বলে জানলেও, তিনি কিন্তু কখনোই গণবিক্ষোভ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেন নি। বিপ্লবীদের আত্মোৎসর্গ বা গান্ধীজির আহ্বান তাঁকে বিভিন্ন সময় বিচলিত করেছে, এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে অন্তত তিনি রবীন্দ্রানুসারী নন, সে কথা সকলকে মানতে হবে। লক্ষণীয় যে, সত্যেন্দ্রনাথ মধ্যবিত্তসুলভ সাবধানী মনোভাব বা কলাকৈবল্যবাদী কাব্যসংস্কার অগ্রাহ্য করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের দিনে তিনি যেমন ঘোষণা করেছিলেন—

যে খুসি টিটকারি দিক
অন্তরে বুঝেছি ঠিক—
এ কেবল নহেক হুজুগ ;
সন্ধিক্ষণ আজি বঙ্গে, এল নবযুগ !

তেমনি অসহযোগ-আন্দোলনের দিনেও তিনি বলতে পেরেছেন—

ও রে মূঢ় তুই আজকে কেবল ফিরিস নে ছল খুঁজে
খুঁটিনাটি বোল কবে কি বলেছে তাহারি উতোর যুঝে
গোকুল শ্রেয় কি শ্রেয় খানাকুল—সে কলহ আজ রেখে
ভারত জুড়ে যে জীবন জোয়ার নে রে তুই তাই দেখে।

১৯১০ সালে সংবাদপত্র-নিয়ন্ত্রণের যে নতুন আইন ঘোষিত হল, তাতে যে কোনো রচনাই 'বিদ্রোহাত্মক ও আপত্তিকর' বলে নির্দেশ করা সম্ভব ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়। এই সময় সত্যেন্দ্রনাথ পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে কতকগুলি রূপক-কবিতা লেখেন, যার মর্মার্থ দেশবাসীর অজ্ঞাত ছিল না—'কয়াধু', 'স্কন্ধধাত্রী', 'ভীমজননী', 'অরুন্ধতী', 'গিরিরাণী' প্রভৃতি—এগুলি পড়বার সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন অনুরূপ ফরাসী 'প্রতিরোধে'র কবিতা-নাটকের কথা মনে পড়ে। সে সময় এগুলি লেখা কম সাহসের কাজ ছিল না। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যখন সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লেখেন 'He was a fiery Nationalist, almost a revolutionary,' তখন তা শুধু ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে নয়, কবিজীবন সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। সে যুগে চরমপন্থী দলের দিকেই তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি ছিল—ব্যঙ্গ-কবিতা 'নরম-গরম সংবাদ' সত্যেন্দ্রকাব্যধারায় কোনো ব্যতিক্রম নয়।

৩

রবীন্দ্রকাব্যের বৈচিত্র্য ও বিস্তারের কথা মনে রেখেও স্বীকার করতে হয়, তাঁর কাব্য মূলত অন্তর্মুখী। রাজনৈতিক আন্দোলনে কখনো উত্তেজনা বোধ করলেও, বা সামাজিক অন্যায় ও মিথ্যাচার তাঁকে পীড়িত করলেও, কবিতা লেখার সময় বাইরের জগতের উত্তেজনা ও কলরব তিনি পরিহার করতে চাইতেন। কিন্তু রবীন্দ্রযুগের কবিরা এ দিক থেকে প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিদের মতো সমাজসচেতন, এমন কি বিংশ শতাব্দীর বিপ্লবীচিন্তাচেতনারও প্রকাশ ঘটে তাঁদের রচনায়। অবশ্যই স্ববিরোধ ছিল, কিন্তু মনে হয় বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে যোগ এঁদের কবিতায় বিষয় ও বিষয়ীর সম্পর্ক অনেকটা বদলে দিতে সক্ষম হয়েছে। নিগ্রো কবির লেখা কবিতা, লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের রচনা, বিপ্লবোত্তর রুশ সাহিত্যের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের পরিচয় হয়তো অন্য ভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ-প্রমুখ বাঙালি কবিদের অনেক সময় মধ্যবিত্ত সংস্কার ও স্বার্থচালিত কবি বলে নির্দেশ করা হয়, কিন্তু পরবর্তী কালের কবিরা কি সকলেই মধ্যবিত্ত মানসিকতা পরিহার করতে সক্ষম হয়েছেন? অন্য দিকে 'বিষয়বস্তু'র জন্য

কোনো কবির প্রশংসা বা নিন্দা নিরর্থক, তাও জানি। তবু যুদ্ধবর্ণনাসঙ্কুল মহাকাব্য না লেখার জন্য বিহারীলাল প্রশংসা পান, রবীন্দ্রকাব্যের বিষয়গত অভিনবত্বও এক সময় চমক সৃষ্টি করে। সে দিক থেকে সত্যেন্দ্রনাথের একেবারে প্রথমজীবনের কবিতায় গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান বাদলরাম হালওয়াইর ধর্মঘটের অবতারণা, বারাঙ্গনাকে স্বাগত জ্ঞাপন, কিংবা 'সাম্য-সাম' রচনা খুবই অসামান্য ঘটনা মনে করার কারণ আছে। ১৩১৩ সালে কিংবা তার আগে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

জগতে এসেছে নূতন মন্ত্র বন্ধন ভয়-হারী,
সাম্যের মহাসঙ্গীত নব গাহ মিলি' নরনারী।…
মানি না গির্জা, মঠ, মন্দির, কল্কি, পেগম্বর
দেবতা মোদের সাম্য-দেবতা অন্তরে তাঁর ঘর ;

পরবর্তী কালে নজরুল ইসলামের একাধিক কবিতায় যে সাম্যবাদী চিন্তা-চেতনার প্রকাশ দেখা যায়, তাকে তাই পূর্বপ্রস্তুতিহীন মনে করতে পারি না—

গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান…
কোথা চেঙ্গিস , গজনী মামুদ, কোথায় কালাপাহাড় ?
ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা-দেওয়া দ্বার।

সত্যেন্দ্রনাথের 'কুস্থানাদপি' কবিতারই প্রতিধ্বনি শোনা যাবে নজরুলের 'বারাঙ্গনা' কবিতায়—

শোনো মানুষের বাণী,
জন্মের পর মানব জাতির থাকে নাক' কোনো গ্লানি।
পাপ করিয়াছি বলিয়া কি নাই পুণ্যেরও অধিকার ?
শত পাপ করি হয় নি ক্ষুণ্ণ দেবত্ব দেবতার।

রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ' কাব্যে 'শুচি', 'প্রথম পূজা'র মতো কবিতা লিখেছেন, কিন্তু তার বহু দিন আগে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন 'দেবতার স্থান'। সত্যেন্দ্রনাথের 'শূদ্র' বা 'মেথর' কবিতার কথাও আমাদের প্রসঙ্গত মনে পড়বে। সত্যেন্দ্রনাথ-প্রমুখ কবিদের সমাজ-চেতনা তাঁদের আদর্শবাদের প্রকাশ হতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব খুঁজে লাভ নেই। এক দিকে অত্যাচারিত মানুষের প্রতি সমবেদনা ও দুঃখী-দুর্গত-জনের প্রতি মমত্ব, অন্য দিকে অত্যাচারীর প্রতি ঘৃণা ও সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এঁদের কবিতার প্রধান বিষয় ও অনুপ্রেরণা। ভক্ত কবি কুমুদরঞ্জনও তাই লেখেন—

আকাশস্পর্শী স্পর্ধা যাদের যারা ঘোর জড়বাদী,

লুণ্ঠিত ধনে কায়েমী স্বত্বে সেজে থাকে বনিয়াদী।
তাহাদের কেশ করিয়া আকর্ষণ,
জাগায় বক্ষে বিবেকের দংশন
যায় তাহাদের ধ্বংসের বীজবপনযজ্ঞ সাধি'।

'কেয়াফুলে'র কবি যতীন্দ্রমোহনকে লিখতে হয়—

শ্রমিকের ফাটছে পিলে ধনিকের বুটের ঘায়ে,
বণিকের বংশ বাড়ে তেতলা প্রাসাদ-ছায়ে;
কে খাটে, কেই বা খাটায়? কে বা কাল খেলায় কাটায়।
যে বোনে গায়ের কাপড়, সে মরে আদুল গায়ে।

এবং মনে রাখতে হবে এই কবিতাগুলি এঁদের রচনাধারায় কোনো ব্যতিক্রম নয়। এই ধারাই পরবর্তী কালে যথার্থ সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনায় পরিশোধিত ও পরিপুষ্ট হয়ে আধুনিক বাঙলা কবিতার জন্ম দিয়েছে।

৪

রবীন্দ্রযুগের কবিদের সম্বন্ধে প্রধান অভিযোগ—ভগবদ্‌ভক্তির প্রাবল্য তাঁদের রচনাকে সুদূরতা দিয়েছে; ভগবৎবিশ্বাস থেকেই তাঁদের রচনায় এসেছে এক ধরনের প্রত্যয় ও প্রসন্নতা। অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও, বিশেষত 'গীতাঞ্জলি'-পর্বের রচনায় ঈশ্বরাকূতি প্রবল। সুতরাং রবীন্দ্রযুগের কবিরা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করেছেন। কিন্তু প্রথমেই মনে রাখা ভালো, ভক্তিমূলক কবিতারচনায় রবীন্দ্রযুগের সব কবির সমান আগ্রহ ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথ বালকবয়সে নিজেকে না কি 'নাস্তিক' বলতেন, অবশ্য যথার্থ নাস্তিকতার পরিচয় সত্যেন্দ্রনাথ বা তাঁর সমকালের কবিদের রচনায় কোথাও পাওয়া যাবে না। তবে সত্যেন্দ্রনাথের সহস্রাধিক কবিতার মধ্যে ভক্তিমূলক কবিতার সংখ্যা সত্যই কম। বরং এক ধরনের সংশয়বাদের সাক্ষাৎ মেলে সত্যেন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রমোহনের কবিতায়। সত্যেন্দ্রনাথ লেখেন—

গ্রহণ-দিনের গহন ছায়ায় গাহন করি'
গগনে উঠিছে শঙ্কার সুর ভুবন ভরি'!
রাহুর গরাসে হিরণ কিরণ হইল সারা,
হায় হায় করে আলোর পিয়াসী নয়নতারা।

যে দিকে তাকাই কেবলই যে ছাই পড়িছে ঝরি'।

ক্লান্ত পরান, দিনমান শুধু ভাবিয়া মরি ;
'কি হবে গো !'—কারে সুধাইব, হায়, পাই না ভাবি,
মধ্য-সাগরে ছিদ্র-তরণী যায় যে নাবি !

স্থির-নিশ্চিত মৃত্যুর মত আসিছে ঘিরে,
নিশ্বাস হরি' দৃষ্টি আবরি ঘন তিমিরে ;
কোথা সাদা পাল ? কই তরী তব ? হে কাণ্ডারী !
লোনা জলে এ কি মিছে মিশে গেল নয়ন-বারি !

এখানে 'কাণ্ডারী'র উল্লেখ থাকা সত্বেও তাকে ঠিক 'রাবীন্দ্রিক' মনে হয় না। বরং 'ভব-কাণ্ডারী' সম্বন্ধে আমাদের চিরাচরিত ধারণারই সমর্থন খোঁজে।

কিন্তু করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন ও কালিদাস নিঃসন্দেহে ভক্ত কবি। তাঁদের কাব্যভাণ্ডারের একটা বড অংশের প্রধান অবলম্বন ভগবদ্‌ভক্তি। বিশেষত শেষ জীবনে করুণানিধান যেমন 'গীতায়ন'-'গীতারঞ্জন' রচনা করেছেন, তেমনি অন্য কবিরাও হরিনামসংকীর্তনে আগ্রহী হয়েছেন। কালিদাস রায় কুমুদরঞ্জনের কবিতা সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন সে কথা তাঁদের তিনজন সম্বন্ধেই সত্য—'এই যুগের বিচারে কুমুদরঞ্জনের একটি অপরাধ তিনি ভক্ত কবি। ভক্তি বস্তুটি এ যুগে উপহাস্য।' তারপর তিনি ভক্তিমূলক কবিতার সমর্থনে অনেক বাক্যব্যয় করেছেন। কিন্তু তর্ক করে তো কবিতা ভালো-লাগানো যায় না। এঁদের কবিতা আধুনিক পাঠকের ভালো-না-লাগার কারণ 'ভক্তি'র আতিশয্য নয়—রবীন্দ্রনাথের 'পূজা'-পর্যায়ের গান বা 'গীতাঞ্জলি'-পর্বের কবিতা আজও 'উপহাস্য' নয়। ভালো-না-লাগার কারণ স্বতন্ত্র, কিন্তু এখানেই রবীন্দ্র-প্রভাবের প্রসঙ্গটি পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। রবীন্দ্রযুগের কবিতায় ঈশ্বরাকুতির যে সুর প্রাধান্য পেয়েছে তা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে 'পড়ে-পাওয়া-ধন' নয়। ভক্তিমূলক কবিতার ঐতিহ্য বাঙলা দেশে সুপ্রাচীন। কালিদাস রায়ের 'নন্দবিদায়' কিংবা 'পাদমেকং ন গচ্ছামি' এক সময় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, তার কারণ নিশ্চয় রবীন্দ্রানুসরণ নয়। এই সময়ের কবিরা স্বতন্ত্র একটি ভাবাদর্শ ও কাব্যাদর্শ গ্রহণ করেছেন বলেই তাঁরা জনপ্রিয় হয়েছিলেন। সেই আদর্শ আজ আমাদের ভালো লাগে না। কিন্তু স্বীকার করতে হয়, বাঙলা দেশের মাটির সঙ্গে তার যোগ সুনিবিড়। বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত সংগীত, কবিগান, যাত্রা-পাঁচালী করুণানিধান-কালিদাস-কুমুদরঞ্জনের কবিতার অন্যতম ভাবপ্রেরণা। কুমুদরঞ্জন তাঁর কবিজীবনের ইতিহাস বর্ণনাকালে জানিয়েছেন—

আমি পাঠ্যপুস্তকের কবিতা ছাড়া তখন [বালক বয়সে] আর কোন কবিতার

খবরই জানিতাম না। পল্লীগ্রামে যাত্রা, বাউল, ফকিরদের গীত ও রাখালদের গানই আমার প্রিয় ছিল।...রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে দেরিতে পরিচয় হয়। তার আগে বৈষ্ণব কবিদের কবিতা পড়িতাম, চক্ষু জলে ভরিয়া যাইত। কীর্তনগান প্রথম যেদিন শুনি—আমার মনে হইল ভগবান ঠিক এই সুরেই বাঁশি বাজাইতেন। তাহারি কিছু মধুরতা কীর্তন গান আত্মসাৎ করিয়াছে।...আমি ভক্তমাল, চৈতন্যচরিতামৃত, পদকল্পতরু ভক্তির সহিত পড়ি ও অত্যন্ত ভালবাসি। দাশরথি রায়ের পাঁচালী ভাল লাগে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশ ও জীবনী পড়ি—ভগবানকে দেখিতে পাওয়া যায় এই ধারণা আমার বাল্যাবধি ছিল, রামকৃষ্ণের কথায় সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে—একটা বড় অভয়ের বাণী, আশার আলো, আশ্বাসের কথা সেখানে পাইয়াছি।

রবীন্দ্রকাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব নিয়ে গবেষণা-গ্রন্থ রচিত হয় সত্য, কিন্তু "রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবসাদৃশ্য বাহ্য; অন্তস্তত্ত্বে তিনি বৈষ্ণব-অসদৃশ 'রবীন্দ্রনাথ'। বৈষ্ণব মাধুর্যবাদী, রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যবাদী এবং এই সৌন্দর্যবাদ আবার ঐশ্বর্যবাদে সমাহিত · তাঁহার ভগবান রসের নহে, ভাবের।"[১] রবীন্দ্রনাথ তাই 'বৈষ্ণব কবির গাঁথা প্রেম-উপহার'এ যে-তাৎপর্য খোঁজেন তা করুণানিধানের 'বৈষ্ণব কবি'র কল্পনার সঙ্গে মেলে না—

> রাধা হয়ে বিরহের শাঙন রজনী
> জাগিয়াছ একাকিনী পল গণি' গণি',
> ফিরিয়াছ কেঁদে কেঁদে যমুনার কূলে
> না হেরি' তমাল-নীলে তমালেরি মূলে।

কুমুদরঞ্জন শুধু মুখেই বলেন না, 'বৈষ্ণব কবিদের কবিতায় আমি সব রসই পাইয়াছি। ভগবান্ 'রসো বৈ সঃ' এটা যেন জানিতে পারিয়াছি।' তাঁর কবিতাতেও সেই রসের সাধনাই প্রকাশ পেয়েছে—

> মোদের হরি বংশীধারী, মোদের হরি মাখনচোরা,
> যুগল রূপের উপাসী যে, পিপাসী সে রসের মোরা।
> স্মরণে তাঁর পরশ-মধু, নামে ঝরে পীযূষধারা,
> মুগ্ধ মোদের মানস-বধূ, পেযে তাঁহার গীতের সাড়া।
> কোথায় কুরুক্ষেত্রে কোথা পাঞ্চজন্য যেথায় বাজে,
> গাণ্ডীবে ভীম টংকারেতে দলে দলে সৈন্য সাজে,

১. তারাপদ চক্রবর্তী।

আমরা তাহার ধার ধারি নে, খুঁজি কোথা তমাল-ছায়ে,
মিশেছে রাই কনকলতা কল্পতরু শ্যামের গায়ে।

স্পষ্টই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের ভক্তিসাধনাকে বাঙালি কবিরা গ্রহণ করেন নি। রবীন্দ্রনাথ বলবেন 'যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে, / মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে / ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা / উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল ফেন ভক্তিমদ-ধারা / নাহি চাহি নাথ!' কিন্তু করুণানিধান-কুমুদরঞ্জন-কালিদাস সেই 'ভাবোন্মাদমত্ততা' একান্ত কাম্য বিবেচনা করেছেন, তাঁরা বলেন—

নারি আনন্দ প্রকাশ করিতে নিজে
মুখে খেলে জ্যোতি নয়ন উঠে যে ভিজে,
শিহরে পুলক রোমাঞ্চ কলেবর।[৪]

৫

আসলে নিসর্গপ্রকৃতি বা নরনারীর প্রেম, ভগবদ্‌ভক্তি বা সমাজমনস্কতা যেমন কোনো বিশেষ দেশকালের সম্পত্তি নয়, তেমনি কোনো বিশেষ ব্যক্তির উত্তরাধিকারও নয়। রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রযুগের কবিদের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল, কিন্তু একমাত্র প্রকাশশৈলীর ক্ষেত্রে তাঁদের উপর রবীন্দ্রপ্রভাব নির্দেশ করা সম্ভব। সেখানেও সে প্রভাব সর্বাঙ্গীণ বা সচেতন বলা যায় না। মধ্যযুগীয় এবং উনিশ শতকীয় বাঙলা কাব্যের ভাষা-ছন্দের প্রতিও তাঁদের সমধিক আকর্ষণ ছিল। কোনো দেশের কোনো কাব্যধারাই পূর্বতন কাব্য-ঐতিহ্য অস্বীকার করে অগ্রসর হয় না। অন্য দিকে এর মধ্যে 'খাঁটি বাঙালিয়ানা'র উত্তেজনাও কাজ করেছিল।

রবীন্দ্রযুগের কবিরা কখনো সচেষ্টভাবে রবীন্দ্র-কবি-ভাষা ও ছন্দ ব্যবহার করলেও, তাঁদের রচনার একটা বড় অংশ লোকায়ত-ঐতিহ্য পুষ্ট। তাই এঁদের রচনায় ছন্দের শিথিলতা বা ভাষার গ্রাম্যতা অনেক সময়ে একালের পাঠককে আহত করে। বুদ্ধদেব বসুর মতো কেউ এই কারণেই এঁদের 'স্বভাবকবি' আখ্যা দিয়ে অপাংক্তেয় জ্ঞানে দূরে সরিয়ে রাখেন, এবং মন্তব্য করেন: 'তাঁদের লেখায় দেখা দিলো সেই ফেনিলতা, সেই অসহায়, অসংবৃত উচ্ছ্বাস, যা 'স্বভাবকবি'র কুললক্ষণ; —শৈথিল্যকে স্বতঃস্ফূর্তি ব'লে, আর তন্দ্রালুতাকে তন্ময়তা ব'লে ভুল করলেন তাঁরা।' বলা বাহুল্য এই ধরনের সরলীকরণ রবীন্দ্রযুগের কবিপঞ্চককে বুঝতে আদৌ সহায়তা করে না, আর সত্যেন্দ্রনাথ বা যতীন্দ্রমোহনের মতো কবি সম্বন্ধে কথাগুলি আদৌ প্রযোজ্যও নয়।

৪. কুমুদরঞ্জন মল্লিক।

সাহিত্যে সরলতা এবং স্বতঃস্ফূর্ততা বেশি দামি; না চাতুর্য এবং কৃত্রিমতা বেশি জরুরি—এ নিয়ে তত্ত্বগত আলোচনা আপাতত অবান্তর। আধুনিক কবিতা অবশ্যই সরলতা এবং স্বতঃস্ফূর্ততাকে প্রথম দিকে তেমন গুরুত্ব দেয় নি, এবং তার ঐতিহাসিক কারণও আছে। কিন্তু কবিতা যদি কাগজের ফুল না হয়, তা হলে তাকে মাটি থেকে প্রাণরস আহরণ করতে হবে। এ দিক থেকে বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতির শিকড়ের সঙ্গে রবীন্দ্রযুগের কবিতার বিচ্ছেদ ঘটে নি। হয়তো পল্লীগ্রামের সঙ্গে যোগ ও দেশজসংস্কার-নির্ভরতা এ ব্যাপারে কবিদের সাহায্য করেছিল। কবিভাষাও সেখানে খুব সহজেই মুখের ভাষার কাছাকাছি আসতে পেরেছে। মধু-হেম-নবীনের তৈরি-করা-কবিভাষার তুলনায় তাকে সারল্যের নামান্তর মনে হলেও, কাব্যবিচারে ব্যর্থ বলা যায় না। কুমুদরঞ্জন তাই সহজে লেখেন—'দু'দণ্ডেরি আলাপই খুব / বাজিয়ে যাব গাবগুবাগুব / অকূলের কোন কেঁদুলিতে করবো গিয়ে পারণ গো।' কিংবা 'গুন্‌গুনানির উনঘুনানি আর ছিল না কাজ রে।' এ গান অবশ্যই সে কালের রাজসভা বা এ কালের কফি হাউসের জন্য লেখা নয়—'দীনপল্লীর মেঠো গান তোর কে শুনিবে রাজসভাতে?' কিন্তু হাট-মাঠ-বাটের ভাষা আধুনিক কবিকেও অন্য ভাবে আকর্ষণ করে।

যতীন্দ্রমোহন বা সত্যেন্দ্রনাথ ঠিক পল্লী-কবি না হলেও লোকায়ত কাব্যসংস্কার রক্ষা করেছেন, বিশেষত বাঙলা ভাষার নিজস্ব বাগ্‌বিধির ব্যবহারে। প্রত্যেক ভাষা যেমন অনুবাদ-অনুকরণের মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধি লাভ করে, তেমনি দেশজ শব্দভাণ্ডার ও প্রয়োগ-বিধিকে রক্ষা ও পরিপুষ্ট করে। এখানেও কবির শিল্পবোধ কাজ করে, কারণ ভাষার পরিচ্ছন্নতা ও সৌষ্ঠব রক্ষা করা কবিরই কাজ। যতীন্দ্রমোহন কেবল বিষয়বৈচিত্র্যের জন্য জেলের ছেলে, জেলের মেয়ে, চাষার মেয়ে, মালোর মেয়ে, অন্ধ বধূ বা কাজলাদিদিকে নিয়ে কবিতা লেখেন না, নিজস্ব কবিভাষা সৃষ্টির প্রয়োজনেই এখানে পল্লী-ঘেঁষা বিষয় কবিতায় ব্যবহৃত হয়। 'পায়ের তলায় নরম ঠেক্‌ল কি! / আস্তে একটু চল্‌ না, ঠাকুরঝি—ও মা, এ যে ঝরা-বকুল!—নয়?' কিংবা 'বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই— / মা গো, আমার শোলোক-বলা কাজলা-দিদি কই?'—এমন ভাষা ও ভঙ্গি কারো অনুকরণ নয়, অথচ এর অভিনবত্ব চট্ করে ধরাও যায় না। সত্যেন্দ্রনাথ পণ্ডিত কবি, এই খ্যাতি তথ্যভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও, লক্ষণীয়, বাঙলা ভাষার দেশজ শব্দভাণ্ডার ও বাগ্‌বিধির ব্যবহারেও তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সংস্কৃত-ভাষা-সাহিত্য চর্চায় তাঁর আগ্রহ ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি লোকায়ত কাব্য-ঐতিহ্য সম্বন্ধে সমান সচেতন ছিলেন। ফলে পুরোনো কাব্যধারার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের যথার্থ বিচ্ছেদ ঘটে নি, বরং পুরোনো কাব্যধারার সঙ্গে যোগেই তা নতুন তাৎপর্য লাভে সক্ষম হয়েছে। শুধু ভাষা-ব্যবহারে নয়, পাঁচালি-ছন্দের আধুনিক রূপান্তরেও তাঁর সচেতন প্রয়াস দেখা যায়। 'বাউলের সুরে'

তিনি কখনো লেখেন—'কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা— / ফিঙে গাছে গাছে নাচে ?' কিংবা 'পাল্কীর গানে' খুব সহজেই ব্যবহার করেন 'আদুল গায়ে', 'উড়ছে ঝতক ভন্‌ভনিয়ে', 'গরুর বাথান—গোয়ালখানা', 'মট্‌কা থেকে', 'ন্যাংটা খোকা, 'মাথায় পুঁটে', 'দিচ্ছে চালে পোয়ালগুছি', 'ফ্যান্‌সা ভাতে'র মতো শব্দ। 'কাব্যের অধিকার' বাড়াবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল অনেক দিন, সেই গদ্যছন্দে 'পুনশ্চ' লেখার কাল পর্যন্ত। কিন্তু তার অনেক দিন আগেই পদ্যছন্দে আমরা ময়রা মুদি, হাটুরে, বাসন-মাজা বহুড়ী, দোকানঘরের গুরুমশাই, ল্যাম্পো-হাতে লক্‌ড়ি-ঘাড়ে ডাকপেয়াদার সাক্ষাৎ পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথ এখানে অন্তত উত্তমর্ণ নন ; রবীন্দ্রযুগের কবিরা সচেতনভাবেই মুখের ভাষা ও কবিতার ভাষাকে মেলাতে চেয়েছেন ; এবং আধুনিক কবিরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সত্যেন্দ্রনাথ-প্রমুখ কবিদের অনুসরণ করেছেন।

৬

রবীন্দ্রযুগের প্রত্যেক কবির স্বাতন্ত্র্য আলাদা ভাবে দৃষ্টান্তসহ দেখাবার অবকাশ এখানে নেই। কিন্তু আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আশা করি এটুকু অন্তত স্পষ্ট হয়েছে, শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছরের প্রধান পাঁচজন কবি একটি স্বতন্ত্র কাব্যাদর্শের সন্ধান করেছেন, যেখানে লোকায়ত সংস্কার এবং রোম্যান্টিক ভাবনার সম্মিলন-চেষ্টা ছিল। রবীন্দ্রপ্রভাবও কখনো কাজ করেছে, কিন্তু সেটাই এ যুগের কবিদের বা কাব্যধারার প্রধান পরিচয় নয়। বরং বলা যায়, অতীত ও ভবিষ্যতের সন্ধিক্ষণে এঁদের অবস্থান, এক ধরনের 'তিক্ত দ্বিধায়' এঁরা সীমাবদ্ধ—সে জন্য তাঁদের সাফল্য প্রশ্নাতীত না হলেও, প্রচেষ্টার ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনস্বীকার্য। এবং এই দিক থেকেই আধুনিক বাঙলা কবিতার ইতিহাসে সন্ধিক্ষণের কবিরা বিশেষ মনোযোগ দাবি করতে পারেন।

৫

তিরিশের কবিতা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

আজকের দিনে বাঙলা কবিতার যে অংশ টিকে আধুনিক বাঙলা কবিতা বলা হয়ে থাকে তার শুরু 'কল্লোল'এর যুগে, যখন একটি তরুণ কবিগোষ্ঠী রবীন্দ্রকাব্য ও রবীন্দ্রকাব্যের প্রভাবপুষ্ট কবিতার থেকে স্বতন্ত্র ধরনের কাব্যসৃষ্টিতে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সে সময় তাঁর মহিমায় পরিপূর্ণ রূপে অধিষ্ঠিত এবং সমসাময়িক ও অনুগামী কবিসম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই তাঁর অভূতপূর্ব ঐশ্বর্যের দীপ্তিতে অভিভূত। সে সময় মূল্য-বিচারের পরিবর্তে বন্দনা-গানের আতিশয্যই স্বাভাবিক, মূল্যায়নের স্থলে মুগ্ধতা, এবং স্বাতন্ত্র্যরক্ষার পরিবর্তে অনন্য প্রতিভার বিরল জোয়ার-স্রোতে আত্মনিমজ্জন। রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের এই অমোঘ ও অনিবার্য পরিণাম প্রত্যক্ষ করেই 'কল্লোল'যুগের নবীন কবিরা এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে রবিপ্রতিভার সর্বব্যাপ্ত প্রভাবের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে না পারলে আধুনিক বাঙলা কবিতাও শুধু রবীন্দ্রকাব্যের প্রতিধ্বনি হয়ে দাঁড়াবে, স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতার জগৎ সৃষ্টি করতে পারবে না। অথচ তখনকার দিনে বিষয়টি যে সহজ ব্যাপার নয় এ বিষয়ে তরুণ কবিগোষ্ঠীও সচেতন ছিলেন। এক দিকে রবিঠাকুরের কবিতার দুর্নিবার আকর্ষণ, অন্য দিকে ভিন্নতর বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের সাহায্যে সমসাময়িক কালের উপযোগী কাব্যরচনার আকাঙ্ক্ষা, এই ভিন্নমুখী সংঘাতে তরুণ কবির উদ্যোগে বেশ জটিলতা দেখা দিয়েছিল। এই পটভূমিকায় আবির্ভূত হলেন নজরুল ইসলাম যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মোহিতলাল মজুমদার। এঁদের কবিতা যে তখনকার মতো পাঠকসমাজকে সচকিত করে তুলেছিল তার কারণ নজরুলের বিদ্রোহ, যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ এবং মোহিতলালের দেহবাদী উচ্চারণ তৎকালীন প্রবহমান পদলালিত্যে তীব্র, বেদনাকঠিন, প্রশ্নজর্জর সুরের নতুন এক আবহ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ভক্ত, শিষ্যস্থানীয় কবিদের মধ্যে এই সময় সবচেয়ে উল্লেখ্য ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রবহমান বাঙলা কবিতায় যিনি সঞ্চারিত করেছিলেন নানা ছন্দের দোলা, দিয়েছিলেন বাঙালির সংসারের, বাঙলা দেশের নানা টুকিটাকির খবর। কাব্যরচনার বিবিধ উপকরণ সংগ্রহের জন্যে তাঁকে দুর্গম দর্শনের শরণাপন্ন হতে হয় নি, কি কোনো প্রাণান্তকর প্রয়াসের মুখোমুখি হতে হয় নি। বাঙলা দেশের, বাঙালি সংসারের সাধারণ পরিবেশের মধ্যেই কাব্যরচনার প্রচুর উপাদান তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন এবং তারই ফলে সম্ভব হয়েছিল 'পাল্কী চলে'

'দূরের পাল্লা', 'ইলশে গুঁড়ি', 'ছেলের দল'-ইত্যাদি কবিতার সৃষ্টি। তা ছাড়া, সমসাময়িকতাকে কাব্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখারও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। কি রাষ্ট্রীয়, কি সামাজিক কি মানবিক নানা ঘটনাও যে তাঁর স্পর্শক্ষম কবিপ্রাণে সাড়া জাগিয়েছিল তার প্রমাণ 'গান্ধিজী', 'নষ্কর কুণ্ডু', 'জাতির পাঁতি', 'মেথর' এবং আরো বেশ কিছু কবিতায় রয়েছে। সব সময় গভীরতাসন্ধানী না হলেও সুভাবিত কবিতাগুচ্ছ সত্যেন্দ্রনাথ অজস্র লিখেছেন যার মূলে অব্যাহত তাঁর অনন্য ছন্দকুশলতা। সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রানুসারী অন্যান্য কবিদের, যেমন যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় বা কুমুদরঞ্জন মল্লিকের রচনায় সামন্ততান্ত্রিক গ্রামবাঙলার ছবি সুস্পষ্ট। গ্রামবাঙলার সমাজচিত্র ও নিসর্গচিত্র এক সময় বিশেষ আকর্ষণযোগ্য মনে হলেও শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ-করা পরবর্তী কালের তরুণ কবি ও কাব্য-পাঠককে আর মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারছিল না; স্বভাবে, প্রকরণে ও মেজাজে একটু স্বতন্ত্র বলেই এই সময় নজরুল-যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলাল তরুণ কবিদের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের পাশাপাশি যতীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে অবশ্যই মনে হবে চড়া গলার কবি। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় অন্তর্জ্বালা নেই, অতিবিপ্লবী ঘোষণা নেই; পক্ষান্তরে, শেষোক্ত দু-জন কবির কবিতায় শ্লেষ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আধিক্য, সমাজচেতনার তীব্রতা। রবীন্দ্রনাথের পরিপূর্ণ সুখদায়িনী কাব্যের পরিমণ্ডলে নিশ্বাস টেনেও এই দু-জন কবি মেনে নিতে পারলেন না যে ঈশ্বরের পৃথিবীতে সবই সুন্দর ভাবে চলছে। ফলত রবীন্দ্রকাব্যের নমনীয় গীতিনির্ঝর ও রূপলাবণ্যরেখা এবং সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার ক্ষোভহীন স্নিগ্ধতার পরিপূরক হিসেবেই সে কালের পাঠক যতীন্দ্রনাথ-নজরুলের উঁচু গলার সংস্কারমুক্ত বক্তব্যে সচকিত হয়েছিলেন। এই সময় থেকেই যতীন্দ্রনাথের শ্লেষমিশ্রিত উচ্চারণ ও নজরুলের বিদ্রোহদীপ্ত ঘোষণা অনিবার্যভাবেই বাঙলা কবিতার তৎকালীন পাঠককে আকর্ষণ করেছিল। 'চামেলী তুই বল, কোথা থেকে নিয়ে এলি রূপের পরিমল!' সত্যেন্দ্রনাথের এই উক্তির পাশাপাশি যতীন্দ্রনাথের 'মনে কোরো ভাই মোরা চাষা নই, চাষার ব্যারিষ্টার!' কিংবা নজরুলের 'চির অবনত তুলিয়াছে আজ গগনে উচ্চ শির। / বান্দা আজিকে বন্ধন ছেদি ভেঙেছে কারাপ্রাচীর' বিশেষ তাৎপর্যময়। রবীন্দ্রকাব্যের মূল নির্ঝরের অনুসরণে তাঁর অনুগমনকারী কবিগোষ্ঠী শান্ত, সমাহিত গীতিকবিতার যে মসৃণ ধারা প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন সে দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কাব্যপাঠককে তাকাতে হল সমস্যাকীর্ণ প্রতিবাদমুখর নতুন কবিতার দিকে। এই প্রথম ধারণা করা সম্ভব হল যে রবীন্দ্রকাব্যধারার সর্বত্রসঞ্চারী প্রভাবের মধ্যে থেকেও সমকালীন কাব্যে

স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয় বিন্যাসের রূপ ও রীতির প্রবর্তন সম্ভব। নজরুল-যতীন্দ্রনাথ বাঙলা কবিতার ইতিহাসে এই কারণেই স্মর্তব্য। এঁদের কবিতায় পাওয়া গেল নতুন সুর, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি, নতুন জীবনাদর্শের প্রতিফলন। সত্যেন্দ্রনাথ মেথরকে বন্ধু বলে সম্বোধন করেছিলেন, যতীন্দ্রনাথ চাষীকে ভাই বলে যেন হৃদয়ের কাছে টেনে নিলেন, আর সবচেয়ে অবাক করলেন নজরুল—বারাঙ্গনাকে মাতৃ-সম্বোধন করে। সত্যেন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদ নেই, 'কালো আর ধলো বাহিরে কেবল ভিতরে সকলি সমান রাঙা'। তাঁর এই উক্তি অধুনা ইস্কুলপাঠ্য বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকলেও পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে নতুন সমাজব্যবস্থার রূপক হিসেবে সহজেই অভিনন্দিত হয়েছিল। এ দিকে যতীন্দ্রনাথ উপস্থিত করলেন দুঃখবাদ, সমকালীন কাব্যে প্রকৃতিবিলাসের যে আধিক্য ঘটেছিল তাকে সরাসরি বর্জন করে মানবসমাজে যারা সামান্যজন অথচ যাদের পরিশ্রম ও কায়িক ক্লেশ সমগ্র সমাজব্যবস্থার ভিত্তিমূল—তাদের অন্তর্জ্বালাকে স্পষ্টতর করে তুললেন তাঁর অনেক কবিতায়। 'বজ্রে যে-জনা মরে, / নবঘন-শ্যাম-শোভার তারিফ সে-বংশে কে বা করে?' এই জিজ্ঞাসা যতীন্দ্রনাথেরই। 'বন্ধু, বন্ধু, হে কবিবন্ধু, উপমার ফাঁস গুনি' / আসল কথাটা চাপা দিতে ভাই কাব্যের জাল বুনি।' কবিতা যাদের কাছে গড্ডলিকাস্রোতে ভেসে-যাওয়া বিলাসমাত্র, যতীন্দ্রনাথের এই উক্তি তাদের সচকিত করে তুলেছিল। কিন্তু সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনে দুঃখবাদের দিনলিপিই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন বিদ্রোহের, বিপ্লবের। আর যেন ঠিক সে-কারণেই এই সময় এলেন নজরুল, তাঁর বিদ্রোহাত্মক বাণী নিয়ে। যতীন্দ্রনাথের তুলনায় অনেক পরিমাণেই উচ্চকণ্ঠ কিন্তু প্রায়-অমোঘ উচ্চারণে নজরুল জয় করলেন পাঠকহৃদয়কে। 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর / ওই নূতনের কেতন ওড়ে কাল-কালবোশেখীর ঝড়।' কিংবা 'বল বীর, চির উন্নত মম শির' এই ঘোষণাকে অপূর্ব কাব্যঝঙ্কারে তিনি প্রকাশ করলেন তাঁর কবিতায়। তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠল জীর্ণ সংস্কারের শৃঙ্খলভাঙার স্বপ্ন। 'আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন' কিংবা 'আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন' এই ধরনের উক্তি তখনকার বাঙলা কবিতার ভাবালুতা ও মৃদু গুঞ্জনধ্বনিকে স্তব্ধ করে যেন আহ্বান জানাল অনমনীয় পৌরুষের, তারুণ্যের বিজয়বার্তা ঘোষিত হল দিকে দিকে।

২

কিন্তু বিষয়বস্তুতে নবত্ব এলেও আঙ্গিকের কলাকৌশলে তখন পর্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ

রূপান্তর দৃষ্টিগোচর হয় নি। ছন্দপ্রকরণের তেমন সংহতি ও সিদ্ধি তখন পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছিল না। শব্দপ্রয়োগ ও প্রকাশভঙ্গিতে আরো সতর্ক বিন্যাসের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। পরবর্তী কালের তরুণতর কবিগোষ্ঠী চাইলেন প্রচলিত কবিতার ভাবপ্রবণতা ও উচ্ছ্বাসপ্রবণতাকে বর্জন করতে। বাঙলা কবিতায় তাঁরা আনতে চাইলেন ভাবসংহতি, সতর্ক পদান্বয়, চিত্রকল্পের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ। এই সময় এলেন মোহিতলাল মজুমদার, বাঙলা কাব্যের রীতি ও প্রকৃতির গোড়া ধরে তিনিই প্রথম নাড়া দিলেন। মোহিতলালের কবিতার ভাবসংহতি ও অনমনীয় পৌরুষই তখন তরুণতর কবিদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। 'সত্য শুধু কামনাই মিথ্যা চির মরণ-পিপাসা' এই উক্তিতে শুধু জোরই ছিল না, জগৎ ও জীবনকে দেখার এমন একটা নতুন ভঙ্গি ছিল যার স্বতন্ত্র মূল্য স্বীকার না করে উপায় ছিল না। শুধু বক্তব্যের দিক থেকে স্পর্ধিত ও সবল বলেই নয়, সুদৃঢ় গঠনকৌশল, সুসংবদ্ধ কবিকল্পনা ও সংহত কাব্যকলার জন্যই মোহিতলালের কবিতাকে বরণ করে নিয়েছিল 'কল্লোলে'র তরুণ সমাজ। তাঁর কবিতায় যৌবনবন্দনা নতুন সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করেছিল; সুস্থ ও সবল মানুষের সম্ভোগক্ষমতার তেজস্ক্রিয়তা উন্মোচিত হল তাঁর কবিতায়। শহরের পরিবেশে লালিত, তরুণ মধ্যবিত্ত কবি ও কাব্যপাঠক সমকালীন বাঙলা কবিতার ক্ষেত্রে অবরোধের অর্গল ভাঙার স্বপ্ন দেখছিলেন, সে-স্বপ্ন যেন অনেকটাই বাস্তবায়িত হয়েছিল মোহিতলালের কবিতায়। মোহিতলালের কবিতার প্রথম পর্যায়ে দেবেন্দ্রনাথ সেন ও সত্যেন দত্তের কিছু-কিছু প্রভাব থাকলেও সে-প্রভাব উপেক্ষণীয়। দেবেন্দ্রনাথের সনেট পাঠে তিনি অল্পবয়সে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দেবেন্দ্র-মঙ্গলে'র ১২ নং সনেট দ্রষ্টব্য। সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদকর্ম ও বাঙলা কবিতায় আরবী-ফারসী শব্দের কৌশলী ব্যবহারকেও তিনি দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু যেখানে মোহিতলালের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত সেখানে তিনি প্রায়-একক ও অদ্বিতীয়। রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যসৃষ্টির পাশাপাশি মোহিতলালের বাস্তবানুগ বলিষ্ঠ দেহবাদ তখনকার দিনে লক্ষ্য করবার মতো এবং 'কল্লোল'যুগ প্রসঙ্গে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত যখন বলেন: 'যজনযাজনের পাঠ আমরা তাঁর কাছ থেকেই প্রথম নিয়েছিলাম। আধুনিকতা যে-অর্থে বলিষ্ঠতা, সত্যভাষিতা ও সংস্কাররাহিত্য তা আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম তাঁর কবিতায়' তখন মোহিতলালের কবিতার এই নির্মম জীবনমুখিতার দিকেই পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ স্বাভাবিক। 'কল্লোল'যুগেরই অন্যতম শক্তিমান কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র অন্যত্র লিখেছেন: 'মোহিতলালের বলিষ্ঠ বেগের উৎস কোনো বাহ্যিক বিপর্যয়ের মধ্যে নেই। তা আরো অনেক গভীর। আমাদের জীবনবোধের তীব্রতা থেকেই তা উৎসারিত। যে বেগ অক্ষম হাতে শুধু উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছ্বাসে অপব্যয়িত হতে পারত, মোহিতলালের হাতে তা

এমন একটি সুতীব্র অথচ শাসিত স্বাতন্ত্র্য পেয়েছে, কাব্যরীতি ও প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন সত্ত্বেও যার মূল্য আজও অস্বীকার করবার উপায় নেই।...শুধু বেগের দিক থেকে নয়, বক্তব্য ও বলার ভঙ্গির দিক দিয়েও মোহিতলালের বৈশিষ্ট্য প্রথম থেকেই সুপরিস্ফুট। ইন্দ্রিয়গোচর অনুভূতির বাইরে কাব্যের উপাদান সংগ্রহে তিনি সহজে সম্মত নন, কিন্তু সেই মৃত্তিকাশ্রয়ী অনুভূতির এমন তীব্র তপ্ত গাঢ় স্বাদ এমন সুনিপুণ হাতে কেউ বুঝি পরিবেশন করেন নি।'[1] ...যৌবন-বন্দনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রকাব্যে বরাবরই স্নিগ্ধতা ও লাবণ্যের সম্মোহিনী শক্তিকে ক্রিয়াশীল হতে দেখা যায়; পক্ষান্তরে মোহিতলালের যৌবনবন্দনায় নিঃসন্দেহে জীবনের প্রতি, মানবিক কামনা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি এক সুতীব্র বেদনামন্থিত সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। 'স্বপন পসারী'তে পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক কোনো কোনো কবির প্রভাব থাকলেও এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'অঘোরপন্থী' কিংবা 'নাদিরশাহের জাগরণ' কবিতায় মোহিতলালের কবিস্বভাব সুপরিস্ফুট। 'বিস্মরণী' কাব্যগ্রন্থে এই কবিকৃতি স্পষ্টতর এবং উজ্জ্বলতর। এবং বর্তমান প্রবন্ধকারের বিবেচনায় 'পান্থ' নামের চিত্তহারী কবিতাটিতে তাঁর কবি-প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা সর্বতোভাবেই উপস্থিত। 'দেহে তোর প্রাণ আছে? তবে কেন ওরে ভীরু নিত্য-উপবাসী/চির-মৃত্যু-মোক্ষ-অভিলাষী?' কবিতার এই প্রদীপ্ত ভঙ্গি তখনকার দিনে বলতে পারা যায় একেবারেই নতুন। এবং তরুণতর কবিগোষ্ঠী এই সুর এই বাক্‌ভঙ্গির আকর্ষণেই তাঁকে অনুপ্রেরণার উৎসস্থল রূপে বরণ করতে কুণ্ঠিত হলেন না। এক দিকে তান্ত্রিক সাধনার ভোগবাদ এবং অন্য দিকে স্পর্শক্ষম যৌবন-চেতনার প্রাণধর্মী রূপরস মোহিতলালের কবিতাকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাঁর কবিতার ছন্দোবন্ধনী, স্তবক-বিন্যাস এবং মিলের ব্যবহার স্মরণযোগ্য কবিকৃতির সাক্ষ্য। শোপেনহাওয়ারের নারী-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মোহিতলাল যেমন দৃঢ়কণ্ঠ, অন্য দিকে তেমনি ক্ষণিকবাদী মোক্ষবাদীদের ছলনাময় যুক্তির বিরুদ্ধেও তাঁর ঘোষণা বজ্রের মতোই সুকঠিন। তাঁর যে-কয়েকটি কবিতা 'কল্লোল'যুগে তরুণমনকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছিল তার অন্যতম: 'অঘোর-পন্থী' (রচনাকাল ১৯১৭), 'মোহমুদ্গর' (রচনাকাল ১৩২৯), 'পান্থ' (রচনাকাল ১৩৩২), 'স্মর-গরল' (১৩৩৩), নারীস্তোত্র (১৯১৭)। আধুনিক বাঙলা কবিতার ইতিহাসে এই কবিতাগুলোর সংযোজন নিঃসন্দেহেই স্মরণীয়। 'কল্লোল'যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় একজন কবির ভাষায়: 'এক দিকে যেমন ধোঁয়াটে ভাবের অস্পষ্টতা তাঁর অসহ্য, আরেক দিকে এই জীবনের তীব্র তৃষ্ণাও উচ্ছ্বাসের তরলতায় প্রকাশ করার তিনি বিরোধী। তাঁর কবিতায় প্রচণ্ড

---

১. প্রেমেন্দ্র মিত্র: 'মোহিতলাল মজুমদারের সুনির্বাচিত কবিতা' ১৩৬৩, ভূমিকা।

আবেগও দৃঢ় অকম্পিত রেখায় রূপায়িত। তাঁর কাব্যে তাই ভাস্কর্যের কঠিন সূক্ষ্ম সুষমা, স্থাপত্যের মহান অটল গাম্ভীর্য।'[২] 'কল্লোল'যুগের তৎকালীন একজন শক্তিমান তরুণ কবির উত্তরকালের এই মূল্যায়ন থেকেই 'কল্লোল'যুগের তরুণ কবিদের উপর মোহিতলালের প্রভাব সম্পর্কে একটি সুষ্ঠু ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব। তরুণ কবিদের কেউই তাঁর কবিতার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হন নি (কাব্যরচনার ক্ষেত্রে), কিন্তু এক সময় তাঁরা মোহিতলালের কবিতায় তাঁদের বহু আকাঙ্ক্ষিত নতুনতর কাব্য-বিন্যাসের উপাদানসমূহ খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর সনেট, স্পেন্সরীয় স্তবকে রচিত দীর্ঘ কবিতা, উদাহরণত উল্লেখ্য। উত্তরকালে কবি অজিত দত্ত স্পেন্সরীয় স্তবকে দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছেন, তাঁর 'মালতী ঘুমায়' ('কুসুমের মাস') কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে যদিও প্রসঙ্গে, উপকরণে ও মেজাজে এই দুই কবির মধ্যে কোনো মিল নেই। এখনকার দিনে মোহিতলালের শব্দসম্ভারকে পুরাতনই মনে হবে। শুধু তাই নয়, শব্দগুলোকে আলাদা ভাবে বিচার করলে তখনকার দিনের পক্ষেও ঐ সব শব্দ তেমন আকর্ষক বিবেচিত হবে কি না সন্দেহ। কিন্তু মোহিতলাল অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন তাঁর অনন্যসাধারণ কবিত্বশক্তির দ্বারা। ছন্দে ও ধ্বনিতে তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন আদ্যন্ত নিখুঁত কবিতা। এই সব পুরাতন শব্দের সাহায্যেই তিনি কখনো সৃষ্টি করেছিলেন গীতিকাব্যের ঝংকৃত নির্ঝর, কখনো বা আগাগোড়া দৃঢ়বদ্ধ ধ্রুপদী কবিতা। 'যে সুর ফুরায়ে গেছে, ফিরিবে না কভু এ ভুবনে, / আজিকার গানে তার কিছু দিব—আমি সেই কবি' ('কবিধাত্রী')। মোহিতলালের কবিতা পড়বার সময় কবির নিজের এই উক্তি আজকের দিনের কাব্যপাঠকের মনে রাখা প্রয়োজন হয়তো।

৩

'কল্লোল'যুগের শুরু থেকেই আধুনিক বাঙলা কবিতারও শুরু, এ কথা আগে বলা হয়েছে। বাঙালি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত তরুণ কবিগোষ্ঠী কবিতা সম্পর্কে তখন থেকেই নতুন ও স্বতন্ত্র ধ্যানধারণায় উদ্বুদ্ধ হতে চেয়েছিলেন। সমাজচিন্তার দিক থেকেও তখন একটা নতুন পর্বের সূচনা হয়েছিল। সোভিয়েট সমাজবিপ্লবের সাফল্যের পর মানুষ ও মানবসমাজ সম্পর্কে নতুন চেতনা সঞ্চারিত হল। এই সময়ই যুদ্ধোত্তর য়ুরোপীয় লেখকদের রচনাবলী পাঠে বাঙালি তরুণ লেখক নতুন ভাবে উদ্বুদ্ধ হলেন।

২. প্রেমেন্দ্র মিত্র : 'মোহিতলাল মজুমদারের সুনির্বাচিত কবিতা' ১৩৬৩, ভূমিকা।

মধ্যেই প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর সুবিন্যস্ত অলঙ্কারবর্জিত সংহত বাক্‌ভঙ্গিযুক্ত কবিতা লিখে কাব্যপাঠককে আকর্ষণ করেছিলেন। নজরুলের বিদ্রোহ, যতীন্দ্রনাথের বিদ্রূপ এবং মোহিতলালের দেহবাদী উচ্চারণ পাঠকসমাজকে সচকিত করবার পরেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের বেদনাসঞ্জাত ক্ষুব্ধ মনোলোকের বিদ্যুৎবিকাশ তাদের অভিভূত করেছিল। 'প্রথমা' কাব্যগ্রন্থের 'মানুষের মানে চাই' কবিতাটিতেই তাঁর জীবনজিজ্ঞাসার মূল আবেদন বিধৃত। 'আমায় ঘিরে জীবনের স্রোত বয় এবং আমি সেই স্রোতের স্পর্শ হৃদয়ে সানন্দে অনুভব করি।' এই হল তাঁর কবিতার বক্তব্য। দুর্দিন ঘনিয়ে এলেও কবি মনে করেন শপথ রক্ষা হবে। যেহেতু 'প্রিয়ার দৃষ্টি আছে সম্বল, আছে বন্ধুর প্রেম, কত জননীর অযাচিত স্নেহ।' অতএব কবিকে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয়: 'বিদ্রোহ আমি করব না, জীবনকে আমি তিক্তমুখে অভিশাপ দেব না, যে শেষ নিশ্বাসটি পৃথিবীকে দিয়ে যাব তাতে বিষ থাকবে না, থাকবে শুধু চিরকালের নব সূর্যোদয়ের জন্যে চিরন্তন প্রণতি, ভ্রূণ ভবিষ্যতের জন্যে শাশ্বত আশীর্বাদ।' কিন্তু এই আদর্শবাদের ভিত্তি যেন সহসা নড়ে ওঠে কবি যখন প্রাত্যহিক সংসারের সংগ্রামরত অসহায় লোকগুলোর দিকে তাকান। মৃত্যুপথযাত্রী প্রিয়া যে-সংসারলোকে শীর্ণ শিথিল দুর্বল বাহু দিয়ে প্রেমাস্পদকে আঁকড়ে ধরতে চায়; একটি পুষ্পিত প্রশাখা প্রসারিত করবার জন্য ভাঙা দেয়ালের ফাটলে ঘাসের গুচ্ছ অনবদ্য সংগ্রামে মাতে এবং শেষ পর্যন্ত শুকিয়ে হলুদ হয়ে যায়; পথের কয়েকটি ইঁদুরছানা ধরে নির্মল শিশুর দল সরল পৈশাচিকতায় মাতে। কবি উপলব্ধি করেন সৃষ্টির মূলেই রয়েছে নির্বিকার নির্মমতা, জীবনকে ঘিরে রয়েছে বিপুল প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় জীবনবোধের এই অভিব্যক্তিই 'কল্লোল'যুগের কাব্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অবশ্য কাব্যভাবনার এই বিশেষ কেন্দ্রেই তাঁর কবিতা যে বরাবরই ন্যস্ত থেকেছে তাও বলা যায় না। কখনো বহু লোকের মিলিত অনুভবের আবেগকে, কখনো বা নিতান্ত একান্ত ব্যক্তিগত অনুভবকে তিনি কবিতার জগতে সঞ্চারিত করেছেন। 'প্রথমা'র কবিতাগুলোতে কবির স্বপ্নভাঙা প্রাণের পরম বেদনাবোধের রঞ্জনরশ্মি বিচ্ছুরিত। দিনগুলি রাতগুলি স্বপ্নের আস্বাদে নয়, কর্মের প্রেরণায় মঞ্জরিত। 'আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের; / বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই, / সময় যে হায় নাই।' কিংবা অন্যত্র 'উত্তর মেরু মোরে ডাকে ভাই, দক্ষিণ মেরু টানে, / ঝটিকার মেঘ মোরে কটাক্ষ হানে'-ইত্যাদি পংক্তিবিন্যাস অর্ধচেতন পাঠককে যেন দৃঢ়ভাবে নাড়া দিয়েছিল। এই অস্থিরতা ও বাস্তবচেতনা তাঁর উত্তরকালের কবিতায় সংহত আশ্বাস হয়ে দেখা দিয়েছে। কবিতা সে ক্ষেত্রে একান্তই ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা আর গভীর অনুভবের উচ্চারণ। তাই নীল দিনে কত বৃষ্টি, ঝড়,

অন্ধকার, মেঘের ঘনঘটার পর কবিহৃদয় সব কিছু ভুলে গিয়ে সুনীল উৎসবে মাতে এবং প্রেমাস্পদার পল্লবপ্রচ্ছন্ন চোখের সৌন্দর্য নীল দিন ও দিগন্তের সৌন্দর্যের সঙ্গে একাকার হতে দেখা যায়। তাঁর কবিতার সংহত লাবণ্যের অন্তরালে এমন একটি গতিবেগ কাজ করছে যা পাঠকচৈতন্যকে নাড়া দিয়ে গভীর গোপন এক স্তর থেকে অন্য স্তরে নিয়ে যায়। 'স্থির আমি হই না, / আমার জন্যে নয় প্রশান্তির পরিচয়'—এই উচ্চারণের যথার্থতা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় স্পষ্ট চেহারা নিয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বা নিসর্গচিত্র তাঁর কবিতায় সুস্থ জীবনাদর্শের পরিপূরক। কোনো বিশেষ ঋতুর প্রতি যেমন তাঁর পক্ষপাত দেখা যায় না (যেমন দেখা যায় জীবনানন্দ বা সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে হেমন্ত ঋতুর বর্ণনা বার বার ঘুরে ফিরে আসে।) তেমনই অল্প দু-একটি পংক্তিবিন্যাসের মাধ্যমে নিসর্গচিত্রকে অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে কাব্যপাঠকের চোখের সামনে তিনি উন্মোচিত করেন। 'নীল দিন' কবিতাটি উদাহরণত উল্লেখ্য। পক্ষান্তরে, প্রাত্যহিকতার মধ্যেও যে অসামান্যের চেতনা তরঙ্গায়িত, 'কাক ডাকে' 'পাখীদের মন'-ইত্যাদি কবিতা তার সাক্ষ্য। কাব্যিক ভাষা বর্জন করে সংহত মুখের ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে কবিতার আবেদনকে যে অব্যর্থ করে তুলতে পারা যায় এই কবিতাদুটোতে এবং অনুরূপ আরো কয়েকটি কবিতায় তার প্রমাণ রয়েছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র নিছক উদ্বেগের কবি নন। তাঁর ব্যক্তিমানস এক দিকে যেমন দুর্গম পথসন্ধানী সমুদ্রসন্ধানী, অন্য দিকে তেমনি সভ্যতার সুস্থ বিবর্তনে বিশ্বাসী। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর কবিকণ্ঠের প্রতিবাদ গর্জনে মাটি কাঁপায় না বটে, কিন্তু তা মৃদু হলেও অব্যর্থ। জীবনানন্দের নিঃসঙ্গতাবোধ কিংবা সুধীন্দ্রনাথের আশ্রয়চ্যুত নাস্তিবাদ তাঁর কবিতায় কখনো ছায়া ফেলেছে বলে মনে হয় না; অমিয় চক্রবর্তীর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হার্দ্য সুরের অনুরণন থেকেও তাঁর পৌরুষযুক্ত উচ্চারণ স্বতন্ত্র। তাঁর কবিতা প্রসঙ্গে এ ক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশের একটি মন্তব্য স্মর্তব্য: 'প্রেমেন্দ্র বাংলাকাব্যের ঐতিহ্য নামঞ্জুর করেন নি; অনেক বিচিত্র চক্রবাল থেকে কিরণ এসে সেখানে মিলেছে যদিও। সুধীন্দ্রর মতন নিরাশার কেন্দ্রে তিনি অতটা আত্মস্থ নন। সুধীন্দ্রনাথ তটভূমি খুঁজে পেয়েছেন—প্রেমেন্দ্র সমুদ্রপ্রেমিক নাবিকের মতো—অতিবেল তরঙ্গের উপর দিয়ে ভূগোল ও মানুষের ইতিহাস, ও অতিপৃথিবীর আকাশ চিনে, আধো চিনে, রৌদ্রপটবেলাভূমি সহসা লক্ষ্য করে আবার হারিয়ে ফেলে—এ জীবনকে সময়ের কাছে ঋণী রেখে, নিরন্তর সময় কাটিয়ে চলেছেন।' অথচ এই ভাবেই সম্ভব হয়েছে 'নীলকণ্ঠ' বা অনুরূপ ভাবে সফল কয়েকটি স্মরণীয় কবিতা। তাঁর এমন কয়েকটি

৪. উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য, 'কবিতার কথা', ২য় সং পৃ. ৩৭।

কবিতা সহজেই চোখে পড়বে যা আধুনিক বাঙলা কাব্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রে সুনিশ্চিতভাবেই প্রস্তরফলক রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই কবিতাগুলি কাব্য-আন্দোলনের একটি মূল ধারার রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে কাব্যপাঠকের উপলব্ধির সহায়। পদ্যকাব্যসুলভ ভাষা ও প্রকাশরীতির অলঙ্কারবহুল পারিপাট্যের বদলে উপলব্ধির নিবিড়তাময় গদ্য-ঘেঁষা রসঘন যে প্রকাশভঙ্গি ও কলাকৃতির তিনি প্রবর্তন করেছেন সমকালীন পাঠকসমাজকে ও উত্তরকালের কবিকে তা আশ্বস্ত করে।

অন্য দিকে বুদ্ধদেব বসু পরিপূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কবি এবং প্রেমের কবিতায়ই তাঁর কবিত্বশক্তির পূর্ণ পরিচয়। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পড়লেই বোঝা যায় তিরিশের যুগের শুরুতেই আধুনিক বাঙলা সাহিত্য গ্রামবাঙলার নিসর্গচেতন পরিবেশ থেকে ধীরে ধীরে সরে আসছে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার পরিবেশের দিকে। বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যের সংযোগসূত্রও এই সময় থেকেই দৃঢ় হয়ে উঠতে থাকে। 'বন্দীর বন্দনা'য় (রচনাকাল : ১৯২৬-২৯) কবি প্রথম নিজেকে আবিষ্কার করেছিলেন 'শাপভ্রষ্ট দেবশিশু' বলে এবং ভাষাবিন্যাস ও শব্দপ্রয়োগে তৎকালীন কবিতার ঐতিহ্য থেকে তেমন ভিন্ন কিছু না হলেও উচ্চারণে ও ভঙ্গিতে এমন প্রবল সংরাগ ও আবেগ সেখানে ছিল যা কাব্যপাঠককে অভিভূত করেছিল। 'অমাবস্যা-পূর্ণিমার পরিণয়ে আমি পুরোহিত।—শাপভ্রষ্ট দেবশিশু আমি!' কিংবা 'বিধাতা, জানো না তুমি কী অপার পিপাসা আমার / অমৃতের তরে' অথবা 'তোমার ত্রুটিরে আমি আপন সাধনা দিয়া করেছি শোধন, / এই গর্ব মোর…' তখনকার বাঙলা কবিতায় নবযৌবনের যেন একটি নতুন সুর সঞ্চারিত করেছিল। 'বন্দীর বন্দনা'র কবিতাবলীর দীর্ঘ স্তবকসজ্জার বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য, প্রতিটি পংক্তিতে সেখানে বন্দী যৌবনের আকণ্ঠ পিপাসা অসীম নীলিমার দিকে তাকিয়ে অমৃতের অন্বেষণে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। 'কঙ্কাবতী' কাব্যগ্রন্থে (রচনাকাল : ১৯২৯-৩২ ও ৩৪) কবিকিশোরের উচ্ছ্বাসের তীব্রতা হ্রাস পেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত প্রণয়াবেগের সংহত রূপ লক্ষণীয়। বয়স ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে বুদ্ধদেবের কবিতায় আরো অনেক প্রসঙ্গ স্বাভাবিক ভাবে এলেও প্রেমই তাঁর কবিতার সার্থকতম উপজীব্য বিষয়। 'দময়ন্তী', 'দ্রৌপদীর শাড়ী', 'শীতের প্রার্থনা বসন্তের উত্তর', 'মরচে-পড়া পেরেকের গান'-ইত্যাদি উত্তরকালের কাব্যগ্রন্থে এদিকে ওদিকে বাইরের সংসারের নানা বস্তুতে মন নিবদ্ধ হলেও অন্তর্নিহিত প্রেমের অনুরণন কখনোই একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায় নি। 'কঙ্কাবতী' ও 'দময়ন্তী'র কয়েকটি কবিতায় ইংরেজি কবিদের প্রভাব অনুভব করা যায় এবং তাঁর পরবর্তী কালের নানা কবিতায় বিশ শতকের নাগরিক মেজাজ ধরা পড়েছে। অনেক সময়ই তিনি নিঃসঙ্গ, সময়ের বিপরীতমুখী ঘটনাবলীর আবর্তে দিশেহারা, প্রত্যহের ভাবে অবসন্ন।

জীবনানন্দ শেষবয়সের কবিতায় জীবনের দিকে শিল্পকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কারণ তাঁর ধারণায় তাতেই শিল্প পরিশুদ্ধ হবে। বুদ্ধদেব জীবনকেই শিল্পের দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, যে-প্রচেষ্টার ব্যর্থতা তাঁর কবিতায় নানা প্রসঙ্গে নানা প্রতীকের মাধ্যমে পরিস্ফুট। শক্তিমান কবি হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধদেবের কবিতার মেজাজ অনেক সময় এবং বিভিন্ন পর্বে বেশ কয়েকজন বিদেশী কবি-ব্যক্তিত্বের দ্বারা আক্রান্ত। শুরুতে যেমন শেলী, কীটস, স্থইনবার্ণ; উত্তরকালে তেমনি লরেন্স, বদলেয়ার, পাস্টারনাক। ফলে, তাঁর কবিতায় ধারাবাহিক ভাবে কোনো উত্তরণ-পর্ব নেই যে রকম দেখা যায় জীবনানন্দ বা সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে। কিন্তু তাঁর কবিতায় পর্বগুলো তৎসত্ত্বেও শিক্ষিত কাব্যপাঠকসমাজকে আকর্ষণ করে কেন না প্রতি পর্বেই তিনি বিষয় ও আঙ্গিকের দিক থেকে কিছু কিছু পরীক্ষানিরীক্ষায় উদ্যোগী। প্রথম পর্বে 'বন্দীর বন্দনা', 'পৃথিবীর পথে' ও 'কঙ্কাবতী'; দ্বিতীয় পর্বে 'নতুন পাতা' ও 'দময়ন্তী'; তৃতীয় পর্বে 'দ্রৌপদীর শাড়ী', 'যে-আঁধার আলোর অধিক' এবং পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের কবিতাবলী। কাব্যসাধনার তৃতীয় পর্ব যখন চলছে তখন কয়েকবার বিদেশ ভ্রমণ করলেও আমেরিকা বা পশ্চিম য়ুরোপ তাঁর কবিতায় কোনো নতুন সৃজনশীল অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্যের দরজা খুলে দেয়নি। একান্ত ব্যক্তিগত এবং প্রায়-সংক্রামক মানসিকতা তাঁর শেষ-পর্বের কবিতায় লক্ষণীয়। 'অন্য প্রভু' কবিতায় তাঁর মানসিকতার যে-ছবি ফুটেছে পরবর্তী সময়ের কবিতাবলীতেও তার চেয়ে স্বতন্ত্র ছবি তেমন পরিস্ফুট হয় নি। বিদেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে শিকাগো থেকে ২১ মার্চ ১৯৫৪ তারিখে প্রেরিত একটি চিঠিতে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন: 'এগুলো পরিপাক ক'রে সাহিত্যের রক্তমাংসে পরিণত করা সময়সাপেক্ষ, তার জন্য দীর্ঘ অবসর চাই—দেশে ফিরে গিয়েও সে-অবসর আবার পাবো কিনা কে জানে...' এবং হয়তো এই অবসর পান নি বলেই তাঁর উত্তরকালের কবিতায় অবসাদ ও বিষাদের হাত থেকে উত্তরণ-পর্বের লক্ষণ নেই যে রকম দেখা যায় জীবনানন্দর কবিতায়। ভাষা ও ছন্দের পরীক্ষায় এক সময় বুদ্ধদেব বসু যথেষ্ট মনোযোগী হয়েছিলেন; 'দময়ন্তী' কাব্যগ্রন্থে এই পরীক্ষার নানা নিদর্শন উপস্থিত। ছন্দ-শাস্ত্র নিয়ে এই সময় তিনি নানা জিজ্ঞাসারও সূত্রপাত করেন। কিন্তু পরবর্তী কালে অধিকতর পরিণত বয়সে তাঁর নিজের রচিত কবিতাবলীতে এই ছন্দ-জিজ্ঞাসার আর তেমন কোনো সমর্থন মেলে না। ভাবতে অবাক লাগে শেষ পর্যন্ত বুদ্ধদেব বসুর কবিতা শব্দপ্রয়োগ ও ভাষাব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যেরই অনুবর্তী; শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণ স্বীকার করেই তাঁর কবিতা যেন সমর্পিত ও পরিশুদ্ধ হতে চেয়েছিল। কবিতারচনার ক্ষেত্রে নিছক পদ্যে ব্যবহৃত শব্দ, যেগুলো যৌবনে তিনি সচেতন ভাবেই বর্জন করতে চেয়েছিলেন,

প্রবীণবয়সে সেই অনভিপ্রেত শব্দ অনেক সময় তাঁর কবিতার অবয়ব ভেদ করে ঢুকে পড়েছে। এ রকম হওয়ার একটি কারণ এই যে তাঁর কবিতা নিঃসন্দেহে আবেগপ্রধান, প্রচণ্ড আবেগবাহী কবিকল্পনা কাব্যসৃষ্টির জটিল মুহূর্তে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কথিত গদ্যপদ্যের বিরোধ মিটিয়ে নেয়ার বিষয়টি সম্পর্কে আর সচেতন হবার সুযোগ পায় না। বস্তুত 'বন্দীর বন্দনা' ও 'কঙ্কাবতী'তে যে ছন্দোপ্রকরণ তাঁর আয়ত্তাধীন, কবি বুদ্ধদেবের উত্তরকালের কবিতায় তার বিস্তারের স্বতন্ত্র কোনো পর্যায় ধরা পড়ে না। অথচ বিষয়ের ব্যাপ্তিতে উত্তরকালে তাঁর কবিতা অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়েছে, নানা অভিজ্ঞতার উন্মোচন তাঁর কবিতায় সম্ভবও হয়েছে।

বুদ্ধদেবের সমসাময়িক কবি অজিত দত্ত অন্য দিকে একটি নিপুণ রোম্যান্টিক সুর সংযোজিত করেছেন তাঁর কবিতায় এবং তাঁর প্রথমদিককার দুটি কাব্যগ্রন্থ 'কুসুমের মাস' ও 'পাতালকন্যা' এ দিক থেকে উল্লেখ্য। ঐতিহ্যকে অঙ্গীকার করেই অজিত দত্ত তাঁর কবিতায় স্বাতন্ত্র্য এনেছেন; ছন্দে-মিলে-শব্দযোজনায় সাবলীল তাঁর কবিতা একটি অপস্রিয়মান যুগের সৌন্দর্যকে যেন ধরে রেখেছে। 'মালতী, তোমার মন নদীর স্রোতের মতো চঞ্চল উদ্দাম, / মালতী, সেখানে আমি আমার স্বাক্ষর রাখিলাম' কিংবা 'চন্দনের মাল্য তুমি, আমার বুকের মাঝখানে / আমাকে জড়ায়ে থাকো সারারাত নিবিড় গভীর!...' এ কালের পাঠককে গভীর অনুভবের জগতে নিয়ে যায়। স্পেন্সরীয় স্তবক নির্মাণে ('মালতী ঘুমায়') এবং সনেটরচনায় অজিত দত্ত যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা স্মরণীয়। 'পাশাবতী' বা 'পাতালকন্যা'-কবিতায় এক দিকে যেমন রূপকথার চিত্ররূপময় জগৎ উন্মোচিত, অন্য দিকে তেমনই 'নষ্ট চাঁদ' কবিতায় বাস্তব জগতের কঠিন ও স্বপ্নভঙ্গকারী রূঢ় পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা ভাবসংহত ছন্দোবিন্যাসের মাধ্যমে প্রকাশিত। উত্তরকালে অজিত দত্তর কবিতা ক্রমপরিণতির দিকে উল্লেখযোগ্য বাঁক নিতে পারে নি বটে কিন্তু প্রচলিত ছন্দ ও মিলের জগতে আধুনিক কবিতায় তিনি নিশ্চিতভাবেই স্বতন্ত্র একটি বিশিষ্ট সুর সংযোজিত করেছেন। তাঁর কয়েকটি কবিতার অনুরণন দীর্ঘকাল পাঠকমন আচ্ছন্ন করে রাখবে বলা যেতে পারে।

৫

জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে এই চারজন কবি বিষয়বস্তু, প্রকাশভঙ্গি ও ছন্দোপ্রকরণের দিক থেকে আধুনিক বাঙলা কবিতায় শুধু বৈচিত্র্যই আনেননি, কাব্যের ক্ষেত্রকেও বহুবিস্তৃত করেছেন। সঙ্গে-সঙ্গে এ কথাও অবশ্য মনে পড়বে যে, সূচনায় এঁদের কবিতা অনেক সময় দুর্বোধ্য বিবেচিত হয়েছিল।

সাধারণ কাব্যপাঠকের কাছে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা অবশ্য আক্ষরিক অর্থেই 'দুর্বোধ্য' যার কোনো-কোনো শব্দের অর্থোদ্ধারের জন্য শব্দকোষের শরণাপন্ন হতে হয়। বিষ্ণু দে-র কবিতায়ও অনুরূপ শব্দ-সমাবেশের নজির অনুপস্থিত নয়। প্রধানত এই কারণে অনেক সময় এই দু-জন কবির নাম একই সঙ্গে উচ্চারিত বা উল্লেখিত হয়ে থাকে। কিন্তু অমিয় চক্রবর্তী ও জীবনানন্দ দাশের পরবর্তী কালের কবিতায় যে-দুর্বোধ্যতা লক্ষ্য করা যায় তা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। প্রসঙ্গত কবিতার দুর্বোধ্যতা সম্পর্কে দু-একটি কথা বিচার্য। এই দুর্বোধ্যতা নানা রকমের হতে পারে। চিন্তাবৃত্তির জটিলতা অনেক সময় এর জন্য দায়ী, শেক্সপীয়রের শেষবয়সের রচনায় তার প্রমাণ রয়েছে। সাঙ্কেতিকতা বা সিম্বলিজমের দরুণও কাব্য জটিল হয়ে পড়ে যদি না তার চাবিকাঠি পাঠকের হাতে থাকে। জীবনানন্দ দাশ থেকে অনুরূপ জটিলতার দৃষ্টান্ত দেয়া সম্ভব। আবার অবাধ সঙ্গকরণ বা free associationএর ব্যবহার কবিতাকে অস্পষ্ট করে তুলতে পারে। কবি হয়তো তাঁর অবচেতন মনের পরস্পর-বিচ্ছিন্ন এমন সব ভাবনাকে রূপ দান করতে চান, যাকে অঙ্গীকার করে নেয়া পাঠকের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। বিষ্ণু দে কিংবা অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা এর দৃষ্টান্ত। প্রথম ধরনের জটিলতা আয়ত্ত করতে হলে কবিতা বা কবিতার অংশবিশেষকে বার-বার পড়া দরকার। হয়তো অর্থ ভাষার মধ্যেই নিহিত রয়েছে, সুতরাং সে-ভাষাকে নিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন করা দরকার। কবিতার জটিলতা যদি দ্বিতীয় রকমের হয় তা হলে সংকেত বা সিম্বলের স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। তৃতীয় রকমের যে অস্পষ্টতা তা কিছুতেই সম্পূর্ণ দূর হয় না এই কারণে যে, অনুরূপ স্থলে কবিতার উৎস কবির নিজের অবচেতন মন। তবে কবিবিশেষের মানসপ্রকৃতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকলে শেষোক্ত ধরনের জটিলতাকেও অনেকাংশে অতিক্রম করে কাব্যোপলব্ধির গভীরে পৌঁছানো অসম্ভব হয় না।

জীবনানন্দ দাশ আধুনিক বাঙলা কবিতার ক্ষেত্রে নির্জনতম প্রকৃতির কবি হিসেবে চিহ্নিত; কেন না তাঁর প্রথমদিককার কবিতায় নৈসর্গিক দৃশ্যসমাবেশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাঙালি কাব্যপাঠক এক অসামান্য অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। উত্তরকালের কবিতায় অবশ্য এই কবিই নাগরিক পরিবেশে নিঃসঙ্গ একক যাত্রায় নিরবধি-কালের সঙ্গী, অন্ধকার থেকে আলোকের উজ্জ্বলতায় উত্তরণের প্রত্যাশী। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৭এ, যদিও এই বইয়ের প্রায়-অধিকাংশ কবিতাই লেখা হয়েছিল 'কল্লোল' 'কালি-কলম' ও 'প্রগতি'পত্রিকার অস্তিত্বের সময়, অর্থাৎ ১৩৩০ থেকে ১৩৩৫এর সময়সীমায়। প্রকাশিত হবার সময় এই সব কবিতা বুদ্ধদেব বসু-প্রমুখ তরুণ কবিদের আকর্ষণ করলেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা'র কবিতার

মতো সঙ্গে-সঙ্গেই ব্যাপকভাবে কাব্যপাঠকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নি। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' বেরুবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই উপলব্ধি করা গেল জীবনানন্দ প্রকৃতিকে মুক্তি দিয়েছেন তাঁর কবিতায় যেখানে নৈসর্গিক পরিবেশ রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবিষয়ক সমগ্র কাব্য পড়বার পরেও পাঠকের অনুভবে সম্পূর্ণ নতুন ; বাঙলা দেশের আকাশ বাতাস রৌদ্র আলো সন্ধ্যা মাঠ নদী প্রান্তর যেন স্বতন্ত্র বহু নতুন দৃশ্যের উন্মোচন করতে থাকে। কিন্তু জীবনানন্দ কোনো মুহূর্তেই পরিতৃপ্ত কবি নন, এবং এখানেই তাঁর কবি হিসেবে শ্রেষ্ঠতা। স্বপ্নের হাতে তিনি নিজেকে ধরা দিতে চেয়েছেন কিন্তু ধরা দিতে পারেন নি। মিনারের মতো মেঘ, সোনালি চিলের ডানা, বেতের নিচে চড়ুইয়ের ডিম, নরম জলের নদীর শব্দ, গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে খড়ের চালের ছায়া, নিবিড় বটের নিচে লাল-লাল ফল, বাতাসে ঝিঁঝিঁর গন্ধ তাঁর কবিতায় আলো-অন্ধকারে তরঙ্গিত মায়াবী জগৎ সৃষ্টি করলেও সমগ্র জীবনানন্দীয় কাব্যশরীরে এই বিচিত্র জগতের অভিজ্ঞতা একটা পর্যায় বা অংশ মাত্র, জীবনের প্রতি আগ্রহ, বাঁচার জন্য আকাঙ্ক্ষা এই অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত ; কিন্তু সেই সঙ্গে মানুষের শেষ পরিণাম মৃত্যু এবং মৃত্যুজনিত আত্মবিলোপে—এই গভীরতর বেদনাসঞ্জাত অনুভূতিতেও তাঁর কাব্যলোক স্পন্দিত। এই সূত্রেই ইতিহাসবোধ জীবনানন্দর কাব্যজগৎকে সৎ ও শ্রেষ্ঠ কবিতার অঙ্গাঙ্গী করে তুলেছে ; সময় ও কাল সম্পর্কে তাঁর কবিতায় প্রবাহিত সেই চেতনা সজীবতার সাক্ষী, নিরন্তর প্রগতির নামান্তর। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' জীবনানন্দের কাব্যরচনার প্রস্তুতি-পর্ব ; এখানে তাঁর কবিতা সম্পূর্ণ নিজস্বতা অর্জন করে নি। সত্যেন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল মজুমদারের কবিতা থেকে 'ঝরা পালকে'র উচ্চারণভঙ্গি তেমন স্বতন্ত্র নয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই কাব্যগ্রন্থেই জীবনানন্দীয় বৈশিষ্ট্যের অঙ্কুর লক্ষণীয়। মাঝে মাঝে সেই সব পংক্তির হঠাৎ আলোর ঝলকানি, জীবনানন্দর পরবর্তী কালের কবিতায় যার স্বচ্ছন্দ বিন্যাস, কবিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে উন্মোচিত করেছে। 'বনের ছায়ার নিচে কার ভিজে চোখ' কিংবা 'ভিজে ঘাস—হেমন্তের হিম মাস—জোনাকির ঝাড'-ইত্যাদি 'ঝরা পালক' কাব্যগ্রন্থেই ইতস্তত দ্রষ্টব্য।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকেই জীবনানন্দের প্রকৃত পথ-পরিক্রমা শুরু। এখান থেকে তিনি চলেছেন 'মহাপৃথিবী'র পথে ; 'সাতটি তারার তিমির' এক অনন্য অনুভবকে ছড়িয়ে দিয়েছে তাঁর পরিণত বয়সের কবিতায়। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে সৌন্দর্যময় নিসর্গজগতের উজ্জ্বলতা, রসসিক্ত অনুভবের উচ্ছলতা। খাঁটি বাঙলা ভাষায়, দেশজ শব্দের সুদক্ষ ব্যবহারের ক্ষেত্রে জীবনানন্দ এই সময়ই আশ্চর্য সফলতা অর্জন করেছিলেন। 'বোধ' 'নির্জন স্বাক্ষর' 'অবসরের গান' কিংবা 'স্বপ্নের হাতে'—এই সব কবিতা আনন্দঘন স্বতঃস্ফূর্ত স্মৃতিচারণার সাক্ষী। এই সব কবিতায় রূপ পেয়েছে

স্ফূর্তি ও আনন্দময় এবং কোথাও কোথাও ঈষৎ বিষাদমিশ্রিত এমন এক নিসর্গজগৎ, বাঙলা কবিতায় যে দৃশ্য আর কখনোই এই ভাব বা ভাষা বা ভঙ্গিতে ফিরে আসবে না। বাঙলার আকাশচোঁয়ানো দিগন্তব্যাপী সৌন্দর্যচেতনা, নিসর্গদৃশ্যের প্রতিটি চিত্রপট পাঠকহৃদয়কে আচ্ছন্ন করে।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র আনন্দচেতনা 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থে পরিণত হয়েছে অভিজ্ঞানে। জীবন, সৌন্দর্য, সময়চেতনা কিংবা ইতিহাসবোধ সব মিলিয়ে একটি পরিব্যাপ্ত সমগ্রতা ক্রমশই যেন তাৎপর্যপূর্ণ অন্বেষণের পথে পাঠকচেতনাকে আকর্ষণ করে। স্পষ্টই অনুভব করা যায় 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সীমায়িত আনন্দ, প্রেম ও সৌন্দর্য-বোধের জগৎ থেকে অন্য এক ব্যাপকতর জগতে কবির উত্তরণ, যে-জগৎ আবহমান কালের ইতিহাসের অঙ্গীভূত। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কোনো কোনো কবিতায় প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় স্পষ্টতা ছিল: 'হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন / পথের পাতার মতো তুমিও তখন / আমার বুকের পরে শুয়ে রবে?' এবং এই ভঙ্গি নিঃসন্দেহেই প্রেমে অভিষিক্ত, যৌবনের আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত মানবমানবীর হৃদয়ের আবেগচেতনার স্ফুরণ ঘটায়। কিন্তু 'বনলতা সেন'-পর্যায়ের কবিতায় এই বিশেষ কেন্দ্রকে অতিক্রম করেছেন কবি, বর্তমান কাল অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যবর্তী দিগন্তরূপেই চিহ্নিত এবং সে-কারণেই বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতের সঙ্গে নাটোরের অন্তরতম সাযুজ্য চোখে পড়ে, এ কালের নারীর মুখে শ্রাবস্তীর অতীত কারুকার্য প্রত্যক্ষ করা যায়। এই পর্যায়ের কবিতাবলীর ভূমিকা অনেক পরিমাণে স্বতন্ত্র; ইতিহাসচেতনা, বিরহ, ভালোবাসা এবং সৌন্দর্যচেতনার উপাদানে সুস্থির ও সুবিন্যস্ত শিল্পপ্রস্তুতি। কবি যেন এখানে বলবার মতো উপযুক্ত কথা এবং ব্যবহার করবার মতো উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পেয়েছেন এবং ভাব ও ভাষাকে একটি সুসঙ্গত ঐক্যে অখণ্ডতা দান করেছেন। 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, / মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য' (বনলতা সেন) কিংবা 'জ্যোৎস্না-রাতে বেবিলনের রানীর ঘাড়ের ওপর / চিতার উজ্জ্বল চামড়ার / শালের মতো জ্বলজ্বল করছিল বিশাল আকাশ।' (হাওয়ার রাত) অথবা 'গভীর অন্ধকারে ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত; / আমাকে কেন জাগাতে চাও?' (অন্ধকার)—এ রকম পংক্তিবিন্যাস আধুনিক বাঙলা কবিতায় উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দেখা দিয়েছিল। 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের প্রায় সব কবিতাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী কালের রচনা। 'মহাপৃথিবী' কিংবা 'সাতটি তারার তিমিরে'র অনেক কবিতাও এই সময়ের অন্তর্গত। 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতাটি এবং 'মহাপৃথিবী'র 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' 'সিন্ধুসারস' 'হাওয়ার রাত' 'বিড়াল' 'নগ্ন নির্জন হাত' এই সময়ের মধ্যেই প্রকাশিত। 'আট বছর আগের একদিন' কিংবা 'সমারূঢ়' ছাড়া এই সব কবিতায়

কবিহৃদয়ের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে তিক্ততা কি ক্ষোভ অনুপস্থিত। ভঙ্গিতে ধ্বনিতে শিল্পশুদ্ধতায় এই কবিতাগুলো নতুন এক অভিজ্ঞতার বৃহৎ নীলিম গভীর আকাশ পাঠকের অনুভূতিতে সংলগ্ন করে রাখে। 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার সুর সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে কবি স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে দোদুল্যমান, মৃত্যু-বিদ্ধ অসফল জীবনের পরিণাম সম্পর্কে ভাবিত। 'সমারূঢ়'তে প্রকাশ পেয়েছে এ কালের শিক্ষিতসমাজ সম্পর্কে সামাজিক ব্যঙ্গ। চিন্তা ও ভাবনার দিক থেকে জীবনানন্দর কবিতা যে অগ্রসরমান এই দুটি কবিতায় তার প্রকাশ চিহ্নিত। পক্ষান্তরে 'সাতটি তারার তিমির' জীবনানন্দর কাব্যভাবনায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধকালীন পৃথিবীর রক্তক্ষয়কারী পরিবেশে কবির হৃদয়ে জেগেছিল গভীরতর জিজ্ঞাসা; এই জিজ্ঞাসা তাঁর কবিতার ভাষাকেও যেন ক্রমশই রূপান্তরিত করছিল। মানুষের হৃদয়কে কবি পেলেন না, দেখলেন স্বার্থসর্বস্ব অগভীর মানুষের সমাবেশ; লোভ, নীচতা ও ঈর্ষার ক্রমবর্ধমান চেহারা। অথচ জীবনানন্দর মতো শক্তিমান ও বিবেকবান কবির অভিজ্ঞতার জগৎ বহু-বিস্তৃত; মানুষের প্রকৃত মহিমায় তিনি বিশ্বাসী; 'নব-নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় ক'রে মানুষের চেতনার দিন' মানুষের ইতিহাসে নবীনতা এবং মানবিকতার অন্বয়ের উদ্বোধন করবে এই বোধ শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে:

'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষণ্ণ হৃদয়;
জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়।"

জীবনানন্দর কবিতায় হিন্দু দেবদেবীর প্রতীক ব্যবহার তেমন চোখে পড়ে না এটা উল্লেখ্য। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে-র কবিতায় এই ধরনের প্রতীকের ব্যবহার অনেক সুন্দর ও স্মৃতিসুখকর স্তবকের বিন্যাস ঘটিয়েছে। জীবনানন্দর কবিতায় মহাশ্বেতা নেই, পার্বতী-পরমেশ্বরের উল্লেখ নেই, আছে মানুষ-মানুষী। বরং বলা যেতে পারে প্রথম যৌবনের অনেক সুভাষিত কবিতাবলীর জন্যে তিনি ইংরেজ কবিদের অভিজ্ঞতায় আশ্বস্ত হতে চেয়েছিলেন; কীট্‌স্ ও ইয়েট্‌সের কবিতার পংক্তিবিন্যাস অনেক সময় জীবনানন্দর কাব্যভাবনার নিকটবর্তী বলতে পারা যায়। কোলরিজ বা ডি লা মেয়ার জীবনানন্দর কাব্যজগতের আলো-আঁধার সমন্বিত রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে থাকলে অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু ভিন্নতর ক্ষেত্রে উত্তরকালে জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় যে নাগরিকতার সৃষ্টি করেছেন তা তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। নাগরিক কবি হিসেবে টি এস্ এলিয়ট কোনো কোনো শক্তিমান বাঙালি কবিকে প্রভাবিত করলেও এলিয়টের নাগরিকতার সঙ্গে জীবনানন্দর নাগরিকতার পার্থক্য সুস্পষ্ট। এলিয়েটের নাগরিকতা পরিপূর্ণ বিকাশের পর অমিত উত্তমযুক্ত

অগ্রগতির শেষে সংশয়ান্বিত, উদ্বেগময় ও পতনোন্মুখ। পক্ষান্তরে জীবনানন্দর নাগরিকতার পরিবেশ যুদ্ধকালীন কলকাতা, যেখানে সামন্ততন্ত্রের চিহ্ন বিলীন হচ্ছে ক্রমশ, গড়ে উঠছে ক্রমে ক্রমে বণিক-সভ্যতা। এলিয়ট-কাব্যের মনোযোগী পাঠক হয়েও জীবনানন্দ স্বতন্ত্র। 'এই সব দিনরাত্রি' কবিতাটির কোনো-কোনো স্তবক এ প্রসঙ্গে মনে পড়বে। 'বটতলা মুচিপাড়া তালতলা জোড়াসাঁকো—আরো ঢের অব্যর্থ অন্ধকারে / যারা ফুটপাথ ধরে অথবা ট্রামের লাইন মাড়িয়ে চলেছে / তাদের আকাশ কোন্ দিকে?' নাগরিক পরিসরে জীবনানন্দর কবিতার লাবণ্য কিংবা সৌন্দর্য মনে হবে অস্তমিত, কোথায় যেন দ্বাররুদ্ধ পথের দুর্গমতা। 'সাতটি তারার তিমির'এ কবি এক নির্জনতম পরিবেশে একান্তই নিঃসঙ্গ, যেন প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিলেন। কিন্তু না, জীবনানন্দ হারিয়ে গেলেন না শেষ পর্যন্ত। তিনি ফিরে এলেন মানুষের আস্তিকতার জগতে যেখানে 'লোভ পচা উদ্ভিদ কুষ্ঠ মৃত গলিত আমিষ গন্ধ ঠেলে / সময়ের সমুদ্রকে বার বার মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে যেতে বলে।' জীবনানন্দর কবিতায় রাজনীতির সক্রিয় ভূমিকা ছিল না, তিনি সমকালীন মানুষের পরিণাম, মানুষের গন্তব্য সম্পর্কে ভাবিত হয়েছিলেন মাত্র। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র জগৎ থেকে 'সাতটি তারার তিমিরে'র জগৎ যেন এক জীবন থেকে অন্য জীবনের দিকে যাত্রা, আলোর জগৎ থেকে অন্ধকারের পথে নিরুদ্দেশ পদচারণা। প্রেম থেকে কবি এসে পৌঁছেছেন অপ্রেমের জগতে যেখানে পুরাতন মূল্যবোধ লুপ্ত অথচ মানবহৃদয়ের কাছে পৃথিবীর ভবিষ্যতের কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। জীবনানন্দ চেয়েছিলেন সুনিবিড় উদ্বোধন, অন্ধকার থেকে আবার আলোকে উত্তরণ। কবিতাকে জীবনের কাছে নিয়ে এসেছিলেন তিনি, জীবন যেন তখনো তাঁর কাছে একটি কাব্যজিজ্ঞাসা। তিনি অনুভব করেছিলেন: 'জীবনের যত কাছে কবিতা ও তার সংজ্ঞাকে নিয়ে আসতে পারা যায় তত তাকে শিল্পপ্রসাদে শুদ্ধ করা সম্ভব···।' তাঁর শেষ পর্যায়ের কবিতা এই কাব্যভাবনার সাক্ষ্য।

৬

'কল্লোলে'র যুগ থেকে নয়, বলা যেতে পারে 'পরিচয়' পত্রিকার প্রকাশকালের সময় থেকেই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বিষ্ণু দে ও অমিয় চক্রবর্তী কাব্যপাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, এই সময়কার বাঙলা কবিতা যে কোনো সময়েই একটি বিশেষ ছকে-আঁকা ব্যাপারে পরিগণিত হয় নি, একই সামাজিক পটভূমিকায় বিচরণশীল হয়েও কবিরা যে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়াশীল হতে পারেন, এই তিনজন শক্তিমান কবির রচনাবলীতেও তার সমর্থন মিলবে।

কাব্যরচনার ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথ গোড়াতে ঐতিহ্যবাদী হলেও তাঁর কবিতা ক্রমশই যেন ব্যাপক আত্মানুসন্ধানের সাক্ষ্য। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তন্বী'র মুখবন্ধে নিজেকে পূর্বগামী কবিসমাজের ছায়ানুবর্তী বলে ঘোষণা করলেও দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অর্কেস্ট্রা' থেকেই তাঁর কবিতায় আধুনিক কালের সংহত মননশীলতা লক্ষ্য করা যায়। 'তন্বী' যখন প্রথম প্রকাশিত হয় (১৩৩৭) সুধীন্দ্রনাথ তখন বয়স্ক পুরুষ; অন্তত বাঙালি কবিসমাজে উনত্রিশ বছর বয়সে অনেক কবিই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাব্যরচনায় স্বাভাবিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। জীবনানন্দ দাশ প্রেমেন্দ্র মিত্র বুদ্ধদেব বসু অজিত দত্ত তার দৃষ্টান্ত। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ অনুরূপ বয়সেও কাব্যরচনার ক্ষেত্রে উদ্যোগী শিক্ষার্থী, তাঁর ভাবজগৎ তখন পর্যন্ত উপযুক্ত কাব্যভাষা গঠনের মুখাপেক্ষী; ফলে, পঁচিশ থেকে উনত্রিশ বছর বয়সকাল অবধি সুধীন্দ্রনাথের কবিকর্ম তাঁর কাব্যজীবনের নিতান্তই একটি প্রাথমিক স্তর হিসেবে গ্রহণীয়। সে-কারণেই 'তন্বী'র ভূমিকায় কবি জানিয়েছিলেন: 'কবিতাগুলোর ওপরে স্বদেশী বিদেশী অনেক কবিই ছায়াপাত করেছেন—সব সময়ে গ্রন্থকারের সম্মতিক্রমে নয়। কেবল রবীন্দ্রনাথের ঋণ সর্বত্রই জ্ঞানকৃত।' 'তন্বী'র প্রায় পাঁচ বছর পরে প্রকাশিত 'অর্কেস্ট্রা' (১৯৩৫) সুধীন্দ্রনাথের অতিদ্রুত উত্তরণ-পর্বের সাক্ষ্য। আধুনিক মনন ও মেজাজের উপযোগী কাব্যভাবনার বিকাশ সুধীন্দ্রনাথের পক্ষে প্রায় অপরিহার্য বিবেচিত হয়েছিল। সুধীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন, প্রেরণা নামক কোনো বস্তু নয়, অভিজ্ঞতাই কাব্যের মৌল অবলম্বন এবং 'সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ব্যতিরেকেও ধরা পড়ে যে স্থূল ভাষায় আমরা যাকে অভিজ্ঞতা বলি, তাতে বেদনার বৈশিষ্ট্য আর ভাবনার সাধারণ্য প্রায় যখন সমান সমান অনুপাতে বিদ্যমান; এবং উক্তি ও উপলব্ধি যখন অবিচ্ছেদ্য, তখন অন্তত অভিজ্ঞতাপ্রধান লেখা পড়লে, বোঝা উচিত তার কতটুকু রচয়িতার নিজস্ব আর কতখানি গতানুগতিক।'

সুধীন্দ্রনাথ প্রবহমান ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করেই কবিতার রূপান্তরের পক্ষপাতী। সুতরাং মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রোত্তর কাব্যপ্রবাহে তাঁর কৌতূহল বরাবরই অব্যাহত ছিল। সেই সঙ্গে, সমসাময়িক বিশ্বসাহিত্যে কবিতার আন্দোলন ও গতি-প্রকৃতি কোন্ ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দিচ্ছে সে-সম্পর্কেও তিনি সম্যক্ অবহিত হবার চেষ্টায় ছিলেন। স্বকীয়তা প্রমাণের উপায়স্বরূপ উদ্ভট ঢঙ ও বিন্যাস সুধীন্দ্রনাথের সমর্থন পায় নি এবং তাঁর বিবেচনায় শিল্পসৃষ্টিতে অতিমাত্রিক স্বকীয়তা অপচিত হতে বাধ্য। এবং সে-কারণেই কামিংস-এর কবিতা প্রসঙ্গে বহুকাল পূর্বেই এ কথার উল্লেখ করেছিলেন যে: 'নূতনত্ব ব্যতীত দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও যেমন শক্ত, আগাগোড়া

৫. দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা। 'অর্কেস্ট্রা' ১৯৫৪।

নূতনত্বের সাহায্যে তার চৈতন্যকে জাগিয়ে রাখা তেমনই অসম্ভব; এবং শিল্প সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মাত্রকে বিশ্লেষণ করলেই প্রাচীন-অর্বাচীনের নিপুণ সংমিশ্রণ চোখে পড়বে।' ('স্বগত') বস্তুত, কাব্যভাবনার ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথ বরাবরই উক্তি ও উপলব্ধির সাযুজ্য সন্ধানে নিযুক্ত। কাব্যজগৎ নির্মাণের ক্ষেত্রে শব্দ-অপ্সরীর স্পর্শ মূল্যহীন বস্তুকেও সোনায় রূপান্তরিত করতে পারে এবং অক্ষরের অপূর্ব ঝঙ্কারেই কবিতার সার্থকতা, এ সত্য মালার্মের মতো তিনিও উপলব্ধি করেছিলেন। 'অর্কেস্ট্রা' সুধীন্দ্রনাথের পরিণত কাব্যসৃষ্টির প্রথম ফসল; সচেতন রূপকারের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। 'তন্বী'র রবীন্দ্রপ্রভাব এই কাব্যগ্রন্থে থাকলেও তার অনুরণন পাঠককে রবীন্দ্রভাবমণ্ডলে টানে না; বরং সুধীন্দ্রনাথের নিজস্ব পদ্ধতি, শব্দসমাবেশ ও শব্দযোজনার মাধ্যমে মূর্ত পংক্তিবিন্যাস নতুন দৃশ্যপট উন্মোচিত করে :

বৈদেহী বিচিত্রা আজি সংকুচিত শিশিরসন্ধ্যায়
প্রচারিল আচম্বিতে অধরার অহেতু আকুতি :
অস্তগামী সবিতার মেঘমুক্ত মাঙ্গলিক দ্যুতি
অনিত্যের দায়ভাগ রেখে গেল রজনীগন্ধায় ॥
ধূমায়িত রিক্ত মাঠ, গিরিতট হেমন্তলোহিত,
তরুণতরুণীশূন্য বনবীথি চ্যুত পত্রে ঢাকা,
শৈবালিত স্তব্ধ হ্রদ, নিশাক্রান্ত বিষণ্ন বলাকা
ম্লান চেতনারে মোর অকস্মাৎ করেছে মোহিত ॥

হেমন্ত, 'অর্কেস্ট্রা'।

সুধীন্দ্রনাথ 'অর্কেস্ট্রা'র ভূমিকায় বলেছেন : 'বাঙলা কবিতার পদলালিত্য এ-গ্রন্থে প্রত্যাখ্যাত; এবং এতে রোমান্টিক্ সৌন্দর্যবোধের ব্যবহার বিরূপ বিশ্বের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে।' স্পষ্টতই উদ্ধৃত কবিতায় হেমন্ত ঋতুর বর্ণনা জীবনানন্দ কিংবা বুদ্ধদেব বসুর হেমন্ত-জগতের চিত্ররূপ থেকে স্বতন্ত্র। 'অনিত্যের দায়ভাগ রেখে গেল রজনীগন্ধায়' এই পংক্তি যে কিরূপ পরিশ্রমী উদ্যোগের পরিণাম তার উল্লেখও অনিবার্য। অনুপ্রেরণা সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের কোনো মোহ ছিল না এবং সাবলীল রচনাকেও তিনি সন্দেহের চোখে দেখতেন। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুকে লেখা তাঁর একটি চিঠির অংশ উল্লেখ্য : 'সাধারণ পাঠকের কাছে যে কবিতা স্বচ্ছন্দ লাগে তা' প্রায়ই স্মৃতিশক্তির সাহায্যে লিখিত—অর্থাৎ, চর্বিতচর্বণের নিদর্শন, স্বকীয় উপলব্ধির সাক্ষ্য নয়।' অর্থাৎ যে উপলব্ধির নিজস্বতায় দাঁড়াতে সুধীন্দ্রনাথ বদ্ধপরিকর সেই নিজস্বতাকে তিনি অর্জন করেছিলেন নিখুঁত কারুকৃতির সহায়তায়।

পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'ক্রন্দসী' (১৩৪৪) সুধীন্দ্রনাথের কাব্যদর্শনের বিস্তৃততর পটভূমি

ও আত্মানুশীলনের গভীরতর পরিমণ্ডলের পটভূমিকায় বিচার্য। তার একেবারে শুরু থেকেই আত্মসন্তুষ্টির অভাব, পুরাতন পৃথিবী ও তার নিঃশেষিত মূল্য সম্পর্কে সচেতনতা পাই। 'উটপাখী' কবিতায় ঈষৎ হালকা মেজাজের ব্যঙ্গমিশ্রিত অনুরণন, এ রকম কবিতা সুধীন্দ্রনাথ আর লিখেছেন কি না সন্দেহ,—এবং তার পরেই 'সৃষ্টিরহস্য', 'নরক', 'প্রার্থনা' প্রভৃতি কবিতায় ক্রমাগত দুঃখবাদ ও তজ্জনিত হতাশার ক্ষরণ। বলা বাহুল্য, এই দুঃখবাদ একান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক বস্তু নয়; ব্যক্তিনিরপেক্ষ সর্বজনীন বিশ্বচেতনা এই অভিব্যক্তির পশ্চাতে নিরন্তর ক্রিয়াশীল। বিংশ দশকের বিজ্ঞানচেতন কবির এই মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপ যেমন মর্মান্তিক, তেমনই আন্তরিক। বাঙলা কাব্যসাহিত্যে মোহিতলাল ও যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ স্মরণীয়; কিন্তু তার শিকড় ভারতীয় দুঃখবাদী দর্শনের প্রবুদ্ধ ঐশ্বর্যে। সুধীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ অধিকতর আধুনিক উপাদানের আশ্রয়ভূমি; বদলেয়র মালার্মে ও ভালেরির কাব্যদর্শনের সঙ্গে পরিচয়ই এই স্বাতন্ত্র্যের অন্যতম হেতু বলা যেতে পারে। প্রসঙ্গত, সুধীন্দ্রনাথের: 'কৃত্রিম কল্পনা ত্যাগ; নিরাসক্ত অসাধ্যসাধন; অনন্তপ্রস্থান মিথ্যা; সত্য শুধু আত্মপরিক্রমা'-ইত্যাদি পংক্তিবিন্যাস মোহিতলালের: 'সত্য শুধু কামনাই মিথ্যা চির মরণ-পিপাসা' প্রভৃতি স্মরণীয় পংক্তিকেই মনে করিয়ে দেয় এবং কবিতার ক্লাসিক গঠনপদ্ধতিতেও এই দুই শক্তিমান কবির কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষণীয়। অন্যত্র কাব্যজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বদলেয়রের মতোই সুধীন্দ্রনাথেরও জিজ্ঞাসা: মহৎ বিনষ্টি ভিন্ন কি গত্যন্তর নেই? 'সৃষ্টিরহস্য' কবিতায় কবি অনুরূপ প্রশ্নের সম্মুখীন। 'কাল' কবিতায় কবির জিজ্ঞাস্য: 'কিছুরই কি নেই অব্যাহতি? / জীবনের মরুপ্রান্তে স্মরণের অখ্যাত বসতি, / তারেও করিবে ছারখার / রক্তলোভাতুর তব দিগ্বিজয়ী শকট দুর্বার / হে কাল, হে মহাকাল?'

'অগ্রজের অটল বিশ্বাস' হারিয়েছেন বলেই কবির ক্ষোভ; কবি অর্জিত বিশ্বাসে ফিরে যেতে আগ্রহী কিন্তু সে-আশাও সুদূরপরাহত। 'ভগবান, ভগবান রিক্ত নাম তুমি কি কেবলই?' এই প্রশ্নে আর্তির অনুরণন সুস্পষ্ট। 'নরক' কবিতায় কবি তাঁর শূন্যবাদী দর্শনের চিত্ররূপময় বর্ণনায় প্রায়-নিখুঁত সাফল্য অর্জন করেছেন: 'জীবনের সার কথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া, / নির্বিকারে, নির্বিবাদে সওয়া / শবের সংসর্গ আর শিবার সদ্ভাব।' এবং তার পরেই কবির সিদ্ধান্ত:

> অমেয় জগতে
> নিজস্ব নরক মোর বাঁধ ভেঙে ছড়ায়েছে আজ;
> মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ
> সংক্রমিত মড়কের কীট;
> শুকায়েছে কালস্রোত; কর্দমে মেলে না পাদপীঠ।

অতএব পরিত্রাণ নাই।
যন্ত্রণাই
জীবনে একান্ত সত্য, তারই নিরুদ্দেশে
আমাদের প্রাণযাত্রা সাঙ্গ হয় প্রত্যেক নিমেষে ॥

'ক্রন্দসী'তে সুধীন্দ্র-কাব্যের যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় 'উত্তরফাল্গুনী'র কবিতা তার পরিপূরক নয়; বরং বলা যেতে পারে 'অর্কেস্ট্রা'-পর্যায়ের কবিতার ক্রমরূপান্তর 'উত্তরফাল্গুনী'র অঙ্গীভূত। রচনাকালের দিক থেকে অবশ্য 'অর্কেস্ট্রা', 'ক্রন্দসী' ও 'উত্তরফাল্গুনী' প্রায় একসূত্রে গ্রথিত; ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ এই পাঁচ বছরের পরিসরে রচিত হয়েছিল। 'অর্কেস্ট্রা'য় যেমন, 'উত্তরফাল্গুনী'তেও তেমনি কবি ফিরে গিয়েছেন তাঁর প্রেমের জগতে, যেখানে 'উধাও মলয়ে দ্যুলোকে-ভূলোকে / মোদের প্রেমের কাহিনী কবে। / মোর অসাধ্য সাধন, মানবী, / নিশ্চয় তুমি সিদ্ধ হবে ॥'

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যচিন্তার স্বাতন্ত্র্য অবশ্য উত্তরকালের 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থেই সর্বাপেক্ষা সার্থক রূপে পরিদৃশ্যমান। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি জানালেন: 'মালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট: আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ; এবং উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দপ্রয়োগের পরীক্ষারূপেই বিবেচ্য। ছন্দে শৈথিল্যের প্রশ্রয় না দিয়ে, লঘু-গুরু, দেশী-বিদেশী, এমন কি পারিভাষিক শব্দও আচরণীয় কি না, সে অনুসন্ধানও হয়তো কোনো কোনো কবিতায় রয়েছে।' 'সংবর্ত'র রচনাকাল ১৯৩৮ থেকে ১৯৫৩। আন্তর্জাতিক জগতে এই সময়সীমার মধ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর কালের সূচনা হয়েছিল। এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে লিখিত সুধীন্দ্রনাথের কবিতাসমূহে একটি মহৎ ট্র্যাজেডির প্রস্তুতির পরিচয় বিধৃত। বস্তুত, এই কাব্যগ্রন্থই তাঁর পরিণত মনের ফসল; সমাপ্তপ্রায় বিশ্ববীক্ষার দর্পণ। এই সময়কার সমগ্র য়ুরোপ ও এশিয়ার ঘটনাবলী—স্পেনে ফ্রাঙ্কোর জয় ও গণতন্ত্রীদের পতন, হিটলার কর্তৃক পশ্চিম য়ুরোপের প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণ, সোভিয়েট ও নাৎসী জার্মানীর যুদ্ধ, ভারতবর্ষে এবং এশিয়ার অন্যত্র পরাধীন ও শোষিত জনগণের ক্লান্তিহীন মুক্তিসংগ্রাম—কবিহৃদয়ে ঢেউয়ের পর ঢেউ সৃষ্টি করেছিল। কত অল্প সময়ের মধ্যেই না পৃথিবীর ইতিহাসের দৃশ্যপট অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ও আকস্মিক ভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। প্রথম যৌবনের স্বপ্নভঙ্গের পর কবি হতাশায় ক্ষোভে ম্রিয়মান হলেও একটি বিয়োগান্ত নাটকের আদর্শবান নায়কের মতোই ধীরোদাত্ত, স্থির এবং ইতিহাসচেতনার দ্বারা আশ্বস্ত। কবি জেনেছিলেন 'স্বীয় শক্তিতে হবে যোগ দিতে শুদ্ধির তাণ্ডবে।' কিন্তু ১৯৩৯এর এই সংকল্প ১৯৪৫এ পৌঁছেও কোনো সুস্থির বিশ্বাসের আড়ালে নির্ভরতা খুঁজে পায় নি। কবি নিজেই তার বিরূপ অস্তিত্বের

বর্ণনা দিয়েছেন 'যযাতি' কবিতায় :

আমি বিংশ শতাব্দীর
সমানবয়সী ; মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে ; বীর
নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে বিপ্লবে বিপ্লবে
বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে
নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে।

আধুনিক কালের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মানুষের আদর্শগত স্বপ্নভঙ্গের কাহিনীই 'সংবর্ত'র কবিতার মুখ্য সুর এবং সেই সঙ্গে গদ্যধর্মী কবিতারচনার একটি পরীক্ষাও তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গেই এই কবিতাবলীর মধ্যে উপস্থিত করেছেন। সুধীন্দ্রনাথ মানতেন নিরাসক্তি সৎসাহিত্যের অনন্য লক্ষণ এবং তাকে আয়ত্তাধীন করাই তাঁর কাব্যচর্চার অন্যতম লক্ষ্য। তা ছাড়া, গদ্য ও পদ্যের ব্যবধান ঘোচাবার উদ্যোগও তাঁর কবিতায় স্পষ্ট চেহারা নিয়েছে ; এবং : 'বিশ বছরকাল আমি যদিও জ্ঞানত গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ চাই, তবু এখনও আমার সাধ ও সাধ্য মাঝে-মাঝে পরস্পরের বাদ সাধে।' সুধীন্দ্রনাথের প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা বেশি নয় ; ভাবতে অবাক লাগে অনুবাদ-কবিতাগুলো বাদ দিলে, প্রায় তিরিশ বছরের সময়সীমায় মাত্র একশ-তিরিশটি কবিতায় তাঁর কাব্যসৃষ্টির ফসল বিকীর্ণ। সুধীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে রচিত কবিতার সংখ্যাই বেশি ; 'তন্বী', 'অর্কেস্ট্রা', 'ক্রন্দসী' ও 'উত্তরফাল্গুনী'র প্রায় সব কবিতাই এই সময়ের (১৯২৪-৩৩) অন্তর্গত। 'সংবর্ত'র কবিতাগুলো এবং 'দশমী'র অন্তর্ভুক্ত কবিতা মিলিয়ে প্রায় ২৬টি কবিতা সম্ভবত ১৯৩৭ থেকে ১৯৫৪—এই আঠারো বছরের দীর্ঘ পরিসরে লেখা। এই সব কবিতাই তাঁর পরিণত মানসের সাক্ষ্য। বাঙলা কবিতার বহু-ব্যবহৃত শব্দাবলী এই মননপ্রধান কবি সরাসরি বর্জন করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন যে উচ্ছ্বাস সংবরণ ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কবিতারচনা প্রায় অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট কাব্যের শব্দভাণ্ডার প্রথম যৌবনে তাঁর নিজের কাব্যসৃষ্টির কাজে লাগলেও নতুন শব্দের প্রয়োগ ও নতুন ভাষা সৃষ্টিতে তাঁর প্রতিভা সর্বদাই সক্রিয় ছিল। সংস্কৃত-ঘেঁষা অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দাবলী প্রয়োগে তাঁর কবিতায় এসেছে দৃঢ়তা ও সংহতি ; কবিতাকে তিনি দূরত্ব দান করেছিলেন, যে-দূরত্ব কাব্যপাঠকের চেতনাকে নাড়া দিয়ে সতর্ক করে রাখে। নাটকীয় আবেগের উত্তাপ তাঁর অনেক কবিতায়ই ছন্দ-চাতুর্যের যোগে সার্থক শিখরে পৌঁছেছে। ড্রামাটিক-মনোলোগ বা নাটকীয় কথোপকথন তাঁর সফল কবিতার অন্যতম আকর্ষণ। 'সংবর্ত'র কোনো কোনো কবিতা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। সব মিলিয়ে কবি সুধীন্দ্রনাথ এ কালের কাব্যরচনার ক্ষেত্রে

একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ; মেধা ও মনীষা এবং সচেতন কারুকৃতি যে-ব্যক্তিত্বের অন্যতম কিংবা প্রধানতম অবলম্বন। এবং সে-কারণেই জীবনানন্দের মতো সুধীন্দ্রনাথের অনুসরণ সহজ হবে কি না সন্দেহ।

বিষ্ণু দে-র কবিতা এ কালের শিক্ষিত বাঙালি কাব্যপাঠকের কাছে একাধিক কারণে স্মরণীয়। প্রথমত, মধ্য-তিরিশ থেকে ষাট-দশক পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের সামাজিক পটভূমিকায় বাঙলা কবিতার ক্রমবর্ধমান ও ক্রমপরিণতিশীল শিল্পরূপ তাঁর কবিতায় প্রত্যক্ষ ; দ্বিতীয়ত, কাব্যপাঠকের রুচি ও প্রগতিও যেন তাঁর কাব্যের সংস্রবে পরিশীলিত ; এবং বিষ্ণু দে ঠিক সেই ধরনের কাব্যভাবনার অধিকারী যার সঞ্চারণে স্থিতধী পাঠকমাত্রেই একটি স্বতন্ত্র ও সজীব পরিমণ্ডলের সম্মুখীন হয়ে থাকেন।

'উর্বশী ও আর্টেমিস' বিষ্ণু দে-র প্রথম কাব্যগ্রন্থ হলেও স্বল্পবাক্, ভাবগম্ভীর কবিতার সংহত রূপ এই সময় থেকেই তাঁর রচনায় প্রত্যক্ষ। বিদেশী শব্দ বয়নে, বিদেশী রূপক ও উপমার ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'উর্বশী ও আর্টেমিসে'র কবিতায় বিষ্ণু দে যে প্রাথমিক উদ্যোগে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, উত্তরকালের রচনায় তাঁর সে-সাফল্য সম্পূর্ণ একটি স্বতন্ত্র কাব্যজগতের প্রবেশদ্বার উন্মোচিত করেছে। দেশী প্রতীক ও চিত্রকল্পের পাশাপাশি বিদেশী প্রতীক, উপমা ও চিত্রকল্পের যে-ব্যবহার তাঁর বহুতর কবিতার একটি প্রধান চারিত্রলক্ষণ, 'উর্বশী ও আর্টেমিস' থেকেই তার প্রস্তুতি। যখন মনে করা যায় এই গ্রন্থের অধিকাংশ রচনা ১৯২৯-৩৩এর মধ্যে রচিত তখন ওই সময়কার সাধারণ কবিতার সরল উচ্ছ্বাস ও আতিশয্যের আবহাওয়ায় বিষ্ণু দে-র স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে। 'চোরাবালি'তে (১৯২৬-৩৭ সময়সীমায় রচিত) এই সাফল্য ক্রমবর্ধমান। এক দিকে আধুনিক বাঙলা কবিতার দীর্ঘ-কালের ঐতিহ্য, অন্য দিকে সমকালীন বিদেশী কাব্য-আন্দোলনের নব নব পরীক্ষা—বিষ্ণু দে-র কবিতায় 'চোরাবালি' থেকেই এই দুই কাব্যমেজাজের সমীকরণের প্রয়াস নজরে পড়ে। 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থে ওই নামের কোনো কবিতা নেই, কিন্তু প্রথম কবিতা 'ঘোড়সওয়ার' নিয়তিবাদের বিরুদ্ধে পুরুষকারের উত্তরণ-পর্বের আকাঙ্ক্ষার অবিস্মরণীয় প্রতীক, চতুর্দিকের চোরাবালির ভয়াবহ পারিপার্শ্বিকতায় হৃদয়ের মহত্তর জাগরণের দ্যোতনায় ভাস্বর : 'জনসমুদ্রে উন্মথি কোলাহল / ললাটে তিলক টানো। / সাগরের শিরে উদ্বেল নোনাজল, / হৃদয়ে আধির চড়া। / চোরাবালি ডাকি দূরদিগন্তে / কোথায় পুরুষকার ? / হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর ! / আযোজন কাঁপে কামনার ঘোর, / অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার ?' এই গ্রন্থের 'ওফেলিয়া' এবং 'ক্রেসিডা' বিষ্ণু দে-র কাব্যের কলাকৌশল ও ধ্রুপদী অনুসন্ধিৎসার নিদর্শন যদিও কবিতাদুটির ভাবানুষঙ্গ জটিলতাবর্জিত নয়। বিষ্ণু দে-র সমাজচিন্তায় ঈষৎ শ্লেষ-বক্রোক্তি স্ফুরিত। কয়েকটি ছোট কবিতা তো রীতিমতো চটুল।

কিন্তু কোনো অবস্থায়ই কবি লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নি। 'তাঁর কাব্যে ছন্দ, মিল, উপমা, অলঙ্কার ইত্যাদির প্রয়োগ তো স্থমিত বটেই, এমন কি বিষয়মাহাত্ম্যে বা অর্থগৌরবে ভাবের স্বল্পতা তিনি কোথাও ঢাকতে চান নি, সার্বজনীন অনুভূতির ঐকান্তিক অঙ্গীকারেই সাধারণ চিত্রকল্পাদির মধ্যে প্রাণস্পন্দ জাগিয়েছেন…।' 'চোরাবালি'র ভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথের এই উক্তি পাঠকের সমর্থন লাভ করে।[৬]

অনুপ্রেরণার জন্য বিষ্ণু দে যে অনেক সময়ই বিদেশী কাব্যসাহিত্যের, বা কাব্য-ঐতিহ্যের মুখাপেক্ষী, 'চোরাবালি' থেকেই তার প্রমাণ মেলে। কাব্যসম্মত নতুন বিষয় ও ভঙ্গিকে আয়ত্ত করবার জন্য এলিয়ট কখনো দান্তে কখনো লাফর্গ কখনো অন্যান্য য়ুরোপীয় প্রতীকী কবিদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, পাউণ্ডকেও অনুরূপ উদ্দেশ্যে চীনা কবিতার শরণাপন্ন হতে দেখা যায়। ফলে 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ডে'র মতো স্মরণীয় দীর্ঘ-কবিতা এলিয়ট সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, পাউণ্ডের চীনা কবিতার স্মরণীয় অনুবাদ বৃদ্ধ বয়সে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও আধুনিক কাব্যের আলোচনায় উৎসাহিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখে-ছিলেন: 'আমাদের দেশের তরুণদের মধ্যে কাউকে কাউকে দেখেছি যাঁরা আধুনিক ইংরেজি কাব্য কেবল যে বোঝেন তা নয়, সম্ভোগও করেন। তাঁরা আমার চেয়ে আধুনিক কালের অধিকতর নিকটবর্তী বলেই য়ুরোপের আধুনিক সাহিত্য হয়তো তাঁদের কাছে দূরবর্তী নয়। সেই জন্য তাঁদের সাক্ষ্যকে আমি মূল্যবান বলেই শ্রদ্ধা করি।' অন্তত বিষ্ণু দে-র কবিতায় বিদেশী প্রভাব যে সুফলদায়ক হয়েছে, 'চোরাবালি'-পরবর্তী পর্যায়ের নানা কবিতায় তা লক্ষণীয়। যেখানে বিষ্ণু দে সফল সেখানে বিদেশী কবিতার ঐতিহ্য, পুরাতন ধ্রুপদী সাহিত্য এবং সাম্প্রতিক কাব্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফসল তাঁর করায়ত্ত এবং কাব্যপাঠকের রসাস্বাদনকে তা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রাখে।

বিষ্ণু দে-র কবিতার ভাষাবিন্যাস ও প্রয়োগনৈপুণ্য অনেকসময় প্রাঞ্জল নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর কবিতা বিষয়োচিত গুরুত্বে গম্ভীর হলেও ভাবানুষঙ্গের ক্ষেত্রে কোথায় যেন উপলব্ধির পথে বাধা আসতে থাকে। 'ওফেলিয়া' বা 'ক্রেসিডা' কবিতার পংক্তিবিন্যাস এবং স্বতন্ত্র-ভাবে পৃথক্ পৃথক্ স্তবকগুলি যদিও পরমরমণীয় তবু সমগ্র ভাবে ওই কবিতাগুলো পাঠকের প্রত্যয়কে দৃঢ়প্রোথিত করে না। সম্ভবত কবিতাকে অতিমাত্রায় নৈর্ব্যক্তিক করার প্রচেষ্টাই কবিতাদুটির এই চারিত্রলক্ষণের কারণ। গীতিকবিতার স্বভাবসুলভ স্বাচ্ছন্দ্য থেকে একটি প্রয়োজনীয় ধ্রুপদী সংহতিতে পৌঁছাবার চেষ্টাও অন্যতম কারণ হতে পারে। অন্য দিকে 'পূর্বলেখ' কাব্যগ্রন্থে কবির

৬. 'চোরাবালি', 'কুলায় ও কালপুরুষ', পৃ ৯৫।

সমাজসত্তার বিস্তৃত ও গভীর রূপ স্বতন্ত্র মর্যাদা পেয়েছে। 'বিভীষণের গান'এ

আহা! আজ যদি পুষ্পকে হানো অগ্নিবাণ
মন্থিয়া নীল অগ্রচক্রঘর্ঘরে
লুকাবো না কেউ প্রাকারচ্ছায়ায় গহ্বরে।
স্বাগত গেয়েছি স্বগতে নাচার দীর্ঘকাল,
হে বজ্রপাণি! স্বধর্মে আজ সন্দিহান।

প্রথম থেকেই কাব্যপাঠককে সামাজিক-দৈনন্দিন পারিপার্শ্বিকতার পটভূমিকায় একটি নতুন জরুরি সূচনা সম্পর্কে সচেতন করে। কথনো ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপে, কখনো সহৃদয় সামাজিক উচ্চারণে, বিভিন্ন ধরনের বিষয় ও বিষয়োচিত ছন্দের প্রবহমানতায় এই কবিতার তীক্ষ্ণতা সহজেই পাঠকচিত্ত স্পর্শ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার কলকাতায়: 'এ ঘন প্রহরে / ইশারা বিছায় পথে কোন্ ধ্রুবতারা! / উদ্‌ভ্রান্ত বিচ্ছিন্ন মন ঘুরে মরে যারা / নির্নিমেষ নির্বিকার বিরাট শহরে।' কবি স্পষ্টই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তিত। বিষ্ণু দে এলিয়ট-ভক্ত হলেও এবং এলিয়ট-কাব্যের অনেক পংক্তির রকমফের তাঁর কবিতায় অবস্থান করলেও সময়চিহ্নিত বিষয় উপযোগী অন্বেষণের ক্ষেত্রে তিনি শেষ পর্যন্ত কোনো কবির কাব্যভাবনায় নিজেকে সীমিত করে রাখেন নি। বিশ্ববীক্ষার ক্ষেত্রে এই সচেতন কবি আপন স্বাতন্ত্র্য ও স্বভাবধর্মে গোড়া থেকে বদ্ধমূল ছিলেন বলেই তাঁর কবিতা পরানুকরণের দৃষ্টান্ত হওয়ার পরিবর্তে আধুনিক বাঙলা কবিতার ভাবজগৎ ও শিল্পরূপকে স্বতন্ত্র ভাবে নিজস্ব ভঙ্গিতে ঐতিহ্যগত মর্যাদা দিতে পেরেছে। এক দিকে তাঁর কবিতা যেমন সাম্প্রতিক ও অসাময়িকের দ্বারা চিহ্নিত, অন্য দিকে তেমনই মুক্ত মহৎ জীবনানুভূতির অনুসরণে স্পন্দিত। এই কাব্যগ্রন্থে কাব্যজিজ্ঞাসা এবং কর্মপ্রেরণা একসূত্রে গ্রন্থিত এবং কবির মনে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষায় বিশ্বাস ও সমর্পণের সিদ্ধি সুদূরপ্রসারিত। মনে হবে বিষ্ণু দে-র কবিতা প্রকৃত অর্থে সমুদ্রের রোলে, ঢেউয়ের ওঠানামায়, ভারতীয় জীবন ও পরিবেশের পটভূমিকায় পরিশুদ্ধ আবেগে সঞ্জীবিত। কবি যেন এক মুহূর্তে পাঠককে নিয়ে যেতে পারেন তাঁর বিশাল উপলব্ধির সমুদ্রসৈকতে:

চলো যাই জীবনের তরঙ্গমুখর সমুদ্রসৈকতে
নীলে নীলে মুক্তিস্নানে, বালুকাবেলায়
শিশুর খেয়াল স্বচ্ছ সমুদ্রের নীলামকরতে…

বিশ্বাসে, অনুপ্রেরণায় দীপ্তিমান তাঁর কবিতায় মুহূর্তের চিত্রপটে সমস্ত ভারতবর্ষের চিত্ররূপময়তা উন্মোচিত, অনবদ্য ছন্দের বিস্তারে যেন ছবির পর ছবি; বিলম্বিত পংক্তি-বিন্যাস, অন্তত বর্তমান প্রবন্ধকারের বিবেচনায়, এলিয়টের কোরাসগুলোর ('দি রক' কাব্যনাট্য স্মর্তব্য) অনবদ্য পংক্তিবিন্যাস স্মরণ করিয়ে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশ-

বিভাগ, দাঙ্গা, শান্তির জন্তে সংগ্রাম—এই বিভিন্ন অবস্থায় দেশের ও বৃহত্তর পৃথিবীর নানা দুর্যোগে, সংকটের বহুমুখী আবর্তেও বিষ্ণু দে তাঁর বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হন নি; 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধারে'র প্রায় সব কবিতাই এই অনন্তবিশ্বাসজাত দৃঢ়তার প্রতীক। সমসাময়িক জীবন থেকে যেমন, তেমনই দেশের পুরাণ, মঙ্গলকাব্য থেকেও কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন তিনি। সমষ্টির অঙ্গীকার তাঁর কবিতায় অসামান্য মর্যাদা পেয়েছে; সেই সঙ্গে ব্যক্তির বিরল অনুভূতিতে তাঁর কবিতা স্পন্দিত। অন্য দিকে তেমনই সে-কবিতা শিল্পচেতনার সচেতন কারিগরিতে সার্থক। বলা বাহুল্য, অডেন বা স্পেণ্ডরের মতো বিষ্ণু দে কখনো স্বপ্নভঙ্গের সম্মুখীন হন নি; প্রথম যৌবনের যে-আদর্শকে অডেন, স্পেণ্ডর প্রভৃতিরা 'পরাভূত দেবতা' বলে অভিহিত করে মার্কিনী ধনতন্ত্রের লোভনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের চারদেয়ালের আরামপ্রদ পারিপার্শ্বিকতায় আশ্রয় নিয়েছিলেন সে-আদর্শবাদের অন্তর্নিহিত মূল উপাদানগুলো কাব্যরচনার পথে যে অন্তরায় নয় বাঙালি কবিদের মধ্যে অন্তত বিষ্ণু দে-র কবিতায় তার প্রভূত প্রমাণ উপস্থিত।

'সাত ভাই চম্পা'য় বিষ্ণু দে-র সমাজচেতনা ও জীবনজিজ্ঞাসা স্পষ্ট চেহারা নিয়েছে। আন্তর্জাতিক ঘটনার পটভূমিকায় লেখা '২২শে জুন ১৯৪১' বা 'খার্কভ' বা '৭ই নভেম্বর' এই সময় তাঁর কবিতাকে বিশ্বের শান্তি ও প্রতিরোধের শিবিরের নিকটবর্তী করে তুলেছিল। 'পূর্বলেখ' থেকেই হালকা চালের কবিতা তাঁর কবিতায় নতুন সজীবতা এনেছে। সারা দেশে যখন দুর্যোগ, অবস্থা অশান্ত এবং জনসাধারণ উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে বা প্রেরণার অভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় সে-সময় এই ধরনের লঘু চপল ছন্দোবিন্যাস কবির বজ্রকঠিন বক্তব্যকে হালকা মেজাজের প্রলেপ দিয়েছে। অথচ 'পূর্বলেখ'-পর্যায়ের কবিতাতেই, বিশেষত 'পদধ্বনি' কবিতাটিতে বিষ্ণু দে-র উত্তরণ-পর্ব স্মরণীয়। কলাকৌশলের দিক থেকে কবিতাটি অপূর্ব তো বটেই, বিষয়োচিত উন্মুখতায়ও জীবন্ত। কবিতার এই পটভূমি বিস্তৃততর হয়েছে 'সন্দ্বীপের চর'এ এবং এখানে কবির লক্ষ্য সম্পূর্ণতা, পরিপূর্ণতা—যে-পরিপূর্ণতা লালমোহন সেনের মৃত্যুকে সন্দ্বীপের চরে মহীয়ান করে তুলেছিল। বলতে পারা যায় কবির মানবিক কল্যাণবুদ্ধি 'সন্দ্বীপের চর'এ পরিপূর্ণ উপলব্ধিতে উজ্জ্বল; সংশয় থেকে, সংকীর্ণতা থেকে, উত্তরণের দিক থেকেও তাঁর কবিতা নব নব পরীক্ষায় ক্রমশই রসোত্তীর্ণ, দীর্ঘ কবিতায় ('জল দাও', 'পাঁচ প্রহর' ইত্যাদি) এবং ছোট ছোট কবিতায় থেকে থেকে ফিরে এসেছে নব পদচারণার অব্যাহত প্রশান্তি। 'অন্ধকারে আর' কবিতাটি একটি সার্থক কবিতা হিসেবে সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিযোগ্য। মাত্র দশ-পংক্তির পরিসরে বিষ্ণু দে কাব্যের কলাকৌশলের যে দৃষ্টান্ত রেখেছেন তা স্মরণীয়। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধারে'র 'ভিলানেল' কবিতাটি কবির পরীক্ষানিরীক্ষার অন্যতম সার্থক দৃষ্টান্ত।

'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ?' কবিতায় সহজ অভ্যস্ত কিন্তু অসার্থক জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে কবি রবীন্দ্রনাথের 'সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আশি বছরের আলো'র জন্য প্রার্থনা; এ কালের ক্ষীয়মান মানসে জীবনের স্বাধীন বিন্যাস গড়ে তোলার জন্যে উন্মুখতা। এই বইয়ের অন্য সব কবিতায় নতুন জীবন, নতুন দৃশ্যের জন্য উন্মুখতা। স্বাধীন স্বদেশে অনেকেই জীবনের শেয়ানা শিকারী—সচ্ছল, প্রবল। কিন্তু 'গৃহহীন দল প্রতিবেশী এমন কি স্বদেশীয়, তবুও ভিখারী'। সুতরাং নতুন দৃশ্য, নতুন জীবনের জন্যে উন্মুখতা স্বাভাবিক। 'মনুষ্যত্ব বড়ই কঠিন ব্রত, সূচীমুখে তার / ক্ষুরধার পথ সেই, থলিপেট ঘাড় উঁচু উটেরও যাবার।' উত্তরকালে 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ'এ এই উন্মুখতা পরিণত হয়েছে অভিজ্ঞানে, কল্যাণময় সামাজিক চিন্তা এই গ্রন্থেরও মুখ্য অবলম্বন হওয়ায় তাঁর সুপরিণত কবিমানস ও সমাজসত্তার একটি নিরুদ্বেগ প্রকাশও এ ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে।

আধুনিকতার ক্ষেত্রে আঙ্গিকে ও উচ্চারণে প্রায় গোড়া থেকেই বিশিষ্ট বলে চিহ্নিত হয়েছেন অমিয় চক্রবর্তী। সুধীন্দ্রনাথের মতো এই কবিও গোড়া থেকেই বিংশ শতকের য়ুরোপীয় ধ্যানধারণা ও চিন্তাধারায় অভ্যস্ত, সমাজ ও সভ্যতার ভাঙন সম্পর্কে ভাবিত এবং সুধীন্দ্রনাথ যে-কালে শূন্যবাদী দর্শনের আবর্তে নিমজ্জিত সে-সময় অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা আশ্বাসের গভীরতায় অনুপ্রাণিত। বস্তুত, উভয়ের কবিতায় দুটি মূল স্বতন্ত্র সুর তিরিশের দশকেই উচ্চারিত। সুধীন্দ্রনাথ যে-সময় লিখেছিলেন 'জীবনের সার কথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া', ঠিক তখনই অমিয় চক্রবর্তী 'মেলাবেন তিনি মেলাবেন' এই আশ্বাসের যৌক্তিকতা প্রকাশ করেছিলেন। 'ভগবান, ভগবান, রিক্ত নাম তুমি কি কেবলি?' কিংবা 'সত্য কেবল বাঁচা, কেবল বাঁচা / পশুর মতো মনের বালাই ঝেড়ে ফেলে বাঁচা, / বাঁচা, কেবল বাঁচা'—সুধীন্দ্রনাথের এই নাস্তিবাদী খেদোক্তির পাশাপাশি অমিয় চক্রবর্তীর শান্ত ও গভীর উচ্চারণ 'ধান করো ধান হবে, ধুলোর সংসারে এই মাটি। / তাতে যে যেমন ইচ্ছে খাটি'—জীবনের প্রতি আশ্বাসে গভীর। এই অনুভূতির ব্যাপকতাই তাঁর কবিতাকে স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা দিয়েছে। তাঁর কবিতায় সর্বদাই কাজ করছে গভীর প্রশান্তি, আশাবাদ অনুরণনে যার সৌধশিখর আলোকিত। এ প্রসঙ্গে রিচার্ড এবারহার্টের উক্তি স্মর্তব্য :

> **Poetry is a confrontation of the whole being with reality. It is a basic struggle of the soul, the mind, and the body to comprehend life; to bring order to chaos or to phenomena; and by will and insight to create communicable verbal forms for the pleasure of mankind.**

সমালোচক এখানে যে ইচ্ছা ও অন্তর্দৃষ্টির উল্লেখ করেছেন অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় কখনই তার অসদ্ভাব নেই। কবিতা রচনার মধ্যেও যে মানবাত্মার, মনের ও শরীরের দ্বন্দ্ব জীবনকে বুঝতে সাহায্য করে তাঁর বহু কবিতাই সে-উপলব্ধির সাক্ষ্য :

মন্ত্রদাতা, রাত্রি এলো, কী করে বলো সে পথ চিনি
কোথায় আশ্বাস এই গোধূলির অশান্ত প্রত্যয়ে যেখানে সংগম-জল-মাটি
হারায় অগণ্য ঢেউয়ে, পৃথিবী, কাণ্ডার, দিক-ঘের।
চূর্ণ হোক শেষ রাত্রি, না হলে প্রত্যহ বক্ষে-ঘেরা
জ্বলুক নির্মম সূর্য, যৌবনী জনতা দৃপ্ত দিবা—
আবার সংসারে যুঝি, খুঁজি সেই প্রাণ অক্ষৌহিণী ॥

'প্রত্যবায়', ঘরে-ফেরার দিন।

আঙ্গিকের দিক থেকে এই কবির কবিতা বরাবরই স্বাতন্ত্র্যসন্ধানী। শব্দচয়নে, প্রচলিত নানা শব্দের ব্যবহারে, উচ্চারণের ভঙ্গিতে এবং ধ্বনিতে তাঁর কবিতা তাঁর সমসাময়িক অনেক কবির চেয়ে আলাদা। তিরিশ-দশকের মাঝামাঝি সময়ে প্রকাশিত 'খসড়া' ও 'একমুঠো' থেকেই এই আঙ্গিকগত পরীক্ষানিরীক্ষার সূচনা এবং উত্তরকালে এই পরীক্ষার সফলতাও স্বীকৃত। সুধীন্দ্রনাথের মতো সংস্কৃতঘেঁষা শব্দ অমিয় চক্রবর্তী খুব কমই ব্যবহার করেছেন; অন্য দিকে জীবনানন্দ দাশের কবিতায় যে দেশজ ভাষা ('বিয়োবার দেরি নেই' ইত্যাদি) কিংবা বিষ্ণু দে-র রচনায় বিদেশী শব্দসমাবেশের যে দৃষ্টান্ত তার অনুরূপ কিছুই অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার অবলম্বন নয়। তাঁর কবিতার শব্দ কাব্যপাঠকের খুব অপরিচিত নয় এবং বলতে গেলে যুক্তাক্ষরবহুলতাকে এই কবি যতটা সম্ভব পরিহার করেছেন। শব্দের নিপুণ ব্যবহারে কিংবা নতুন ধরনের প্রয়োগে তাঁর কবিতার মুখশ্রী আলোকিত; কয়েকটি শব্দ, যেমন 'আলিম্পন' 'বিদ্যুতি' 'ঈশ্বরিত'— তাঁর কবিতায় নতুন ধরনের শব্দ-গঠনের দৃষ্টান্ত। তাঁর কবিতার স্তবকসজ্জাও লক্ষণীয় বৈচিত্র্যে বিশিষ্ট। উচ্চারণপদ্ধতি অনুযায়ী তিনি যেন কবিতার অঙ্গসজ্জায় উৎসাহী। কবিতার বিষয় ও মেজাজ অনুযায়ী কবিতার আঙ্গিকের অনুবর্তন (যেমন ভিন্ন ভাবে দেখা যায় জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ বা বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রে), পয়ার বা মাত্রাবৃত্তের যে অভ্যস্ত রূপ ও চালের সঙ্গে আধুনিক কাব্যপাঠকের পরিচয়, তাঁর কবিতায় তার-পুনরুক্তি বা অভিগমন বিরল। দীর্ঘ স্তবকসজ্জার পাশাপাশি ছোট-ছোট স্তবকও তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের আকর্ষণ। 'খসড়া' ও 'একমুঠো' যে-কালে আত্মপ্রকাশ করেছিল সে-সময় অমিয় চক্রবর্তীর রচনা কিছুটা দুরূহ মনে হয়েছিল, অনভ্যস্ত পাঠক তখন যেন কবিতার রসের জগতে প্রবেশের চাবিকাঠি অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। উত্তরকালে অবশ্য তাঁর কবিতায় এমন বাক্‌পদ্ধতি কি উচ্চারণভঙ্গিমা কমই খুঁজে পাওয়া যাবে যা

রসোপলব্ধির অন্তরায়। কতকগুলো শব্দকে এই শক্তিমান কবি ঈষৎ পরিবর্তিতরূপে কবিতায় ব্যবহার করেছেন, এই প্রয়োগনৈপুণ্য প্রায় শুরু থেকেই তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য :

'কিছু-না হওয়ার পক্ষে সুরের শ্রা ব ণী দিয়ে শুনি'
'বিমিশ্র সুখের স্বপ্নে কারো ব্যথা যৌ ব নী সন্ধ্যায়—'
'তুমিহীন জী ব ন তা তাতে রাঙা হয়ে বেলা নামে।'

এবং এ রকম পংক্তিবিন্যাস তাঁর প্রায় প্রতিটি কাব্যগ্রন্থেই দেখা যায়। এ ছাড়া, কয়েকটি পুরোনো শব্দ মাঝে-মাঝে তাঁর রচনায় অনুপ্রবেশ করে, যেমন, 'দিগ্বধূ' 'আকুলিয়ে' ইত্যাদি। প্রতি ক্ষেত্রেই এই ধরনের শব্দব্যবহাররীতির পরীক্ষা সফল হয়েছে এ কথা বলা যায়না বটে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অমিয় চক্রবর্তী বিরল সিদ্ধিতে পৌঁছেছেন। অন্তত শব্দ নিয়ে এই পরীক্ষা নিঃসন্দেহে তাঁর কবিতায় বৈচিত্র্য এনেছে।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি কথার উল্লেখ অনিবার্য। তাঁর কবিতা কখনোই সমসাময়িক ঘটনার তাৎপর্যকে পরিহার করে নি। বস্তুত, চল্লিশ-দশকের শুরুতে যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের সেই দারুণ দুঃসহ কয়েকটি বছরের বাঙলাদেশ তাঁর কবিতায় স্পষ্ট চেহারায় দেখা দিয়েছে এবং ক্ষুধা দুর্ভিক্ষ কি দাঙ্গার পটভূমিকায় লেখা হলেও এই কবিতাসমূহে এমন একটি গভীর অনুভূতি উচ্চারিত যার আবেদন বহুব্যাপক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমকালীন তাঁর রচনায় বাঙলাদেশের দুর্দশার ছবি বেদনার্দ্র গভীর তুলির অনবদ্য টানে রূপময় হয়েছিল :

পাথর মোড়ানো হৃদয় নগর
জন্মে না কিছু অন্ন—
এখানে তোমরা আসবে কিসের জন্য ?

বিশ্বসংসারের নানা দৃশ্য ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে কবিমন সচেতন এবং বিষয়ানুগত কাব্য-ভাষার সন্ধানী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে প্রকাশিত 'অভিজ্ঞান বসন্তে'ই কবির 'সংগতি' নামে এ কালের বহুপরিচিত কবিতাটির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটেছিল :

তোমার আমার নানা সংগ্রাম,
দেশের দশের সাধনা, সুনাম,
ক্ষুধা ও ক্ষুধার যত পরিণাম
মেলাবেন।
জীবন, জীবন-মোহ,
ভাষাহারা বুকে স্বপ্নের বিদ্রোহ—
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন।

'অভিজ্ঞান বসন্ত' অমিয় চক্রবর্তীর বহু ও বিবিধ পরীক্ষার স্তর বা অধ্যায় মাত্র, কিন্তু কবিতার বিষয় ও আঙ্গিক নিয়ে তিনি যে ক'টি পরীক্ষা করেছিলেন তাতে সাফল্য বড কম ছিল না। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতা 'অ্যাকসিডেণ্ট', এবং এই দীর্ঘ কবিতাটির স্বাতন্ত্র্য এই কবির সমগ্র কাব্যরচনার মধ্যেও অভিনব।

পরবর্তী কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের ফলে কবিতার উপাদানের দিক থেকেই শুধু নয় পটভূমি-বিস্তৃতির দিক থেকেও অমিয় চক্রবর্তীর ক্রমবর্ধমান সাফল্য লক্ষণীয়। লক্ষ্য করবার বিষয় আঙ্গিকের ওপর কবিব অধিকার—দক্ষ কারিগরির গোপন রহস্যসূত্র যেন আবিষ্কার কবেছেন তিনি। 'বৈদান্তিক' কবিতার 'প্রকাণ্ড বন প্রকাণ্ড গাছ,— / বেরিয়ে এলেই নেই' কিংবা 'শিল্প' কবিতার 'তাঁতে এনে বসালেম বুক থেকে রোদ্দুরের সুতো'—এর গভীর ব্যঞ্জনা পাঠকচিত্ত স্পর্শ করে। অন্য দিকে যেমন স্বদেশের ছবি, তেমনই বিদেশের নানা ছবিও বার বার স্পষ্ট হয়েছে তাঁর কবিতায়। যেখানেই ভ্রাম্যমান, এই জটিল যুগের বিচিত্র প্রসঙ্গ বার বার তাঁর চেতনায় হানা দিয়েছে :

বোমা-ভাঙা অবসান। শহরের বিদিক্ সোজা পথে
পদশব্দ। শূন্য পাশে গলির জগতে
চূর্ণ চূর্ণ বেলা। তারি মধ্যে ম্লান হাসিমুখ
মেয়ে জানলার কাঁচে একান্তে উৎসুক
চুল আঁচড়ায় যত্ন করে, ইটস্তূপে ছেলে শুয়ে ;
প্রাণ পুনর্বার চলে অগণ্য মৃত্যুকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে।

'ডুসেলডর্ফ', পারাপার।

বোমাভাঙা যুগের বেদনায় তিনি ব্যথিত কিন্তু তার প্রকাশে ক্রোধ বা উচ্ছ্বাস নেই ; এক ধরনের সংহত নমনীয়তায় তাঁর সৃষ্টি সর্বত্র বিচরণশীল। 'পারাপার' ও 'পালা-বদলে'র অধিকাংশ কবিতা তার দৃষ্টান্ত। অমিয় চক্রবর্তী আমেরিকায় দীর্ঘকালের প্রবাসী। সেখানকার নাগরিকদের গভীর ও জটিল সামাজিকতা তাঁকে বিস্মিত করেছে ; জীবিকা-জগন্নাথের হৈ-চৈ, অটোমবিল-স্ম্যুক্লিয়ার যুগের রুদ্ধশ্বাস ধাবমান জীবনযাত্রাকে একেবারে ভিতর থেকে অনুভব করেছেন তিনি। এই দেশের লোকদের জেনেছেন, ভালো-বেসেছেন যেমন ভালোবেসেছেন অন্যান্য বহু বিদেশী রাজ্যের অধিবাসীদের, প্রীতিতে মুগ্ধ হয়েছেন মিলিত হয়ে। 'পারাপার' 'পালাবদল' 'ঘরে-ফেরার দিন' 'হারানো অর্কিড'-কাব্যের অনেক কবিতায় তজ্জনিত তৃপ্তির প্রকাশ লক্ষণীয়। বিষ্ণু দে-র মতোই অমিয় চক্রবর্তী প্রগতির পক্ষে, শান্তির সমর্থনে এবং শোষণের বিরুদ্ধে সর্বদা জাগরূক ; হয়তো খুব উচ্চকণ্ঠ সরোষ প্রতিবাদ অনুপস্থিত, কিন্তু নিচু গলায় হলেও তাঁর কবিতায়

প্রতিবাদের স্বর অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ নয়। আফ্রিকার সাম্প্রতিক ঘটনা তাঁকে চিন্তিত করে, আমেরিকাপ্রবাসী হয়েও ভিয়েতনামে মার্কিন বর্বরতাকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ করা তিনি কর্তব্য মনে করেন। 'ঘরে-ফেরার দিন' কাব্যের 'আফ্রিকা স্বাক্ষর' 'পর্তুগীজ আঙ্গোলা'-ইত্যাদি কবিতায় উৎপীড়িত মানবিকতা সম্পর্কে তাঁর বহুভাবনার পরিচয় আছে।

অন্যত্র, খুব বিরল অবসরে, কবিদৃষ্টি সামান্য ঘটনায় যে কী পরিমাণে সঞ্চরণশীল হতে পারে 'পিঁপড়ে' কবিতাটি তার দৃষ্টান্ত। সামান্য বিষয়ে অনুভবের গভীরতার সামগ্রিক আবেদনে, এবং অবশ্যই সেই সঙ্গে শিল্পচাতুর্যেও, এই ছোট কবিতাটি একটি স্মরণীয় স্বাতন্ত্র্যের অভিব্যক্তি। এই কবিতার বিন্যাসের মধ্যে কবির মেজাজ ধরা পড়ে, পাঠকের অভিজ্ঞতায় এক নিমেষে তাঁর প্রত্যয়কে কবি সঞ্চারিত করেন। পক্ষান্তরে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় ব্যক্তিগত উচ্চারণ অনেক সময়ই সার্থক কাব্যসৃষ্টির সহায়ক। তাঁর যে-সব কবিতা বহুপঠিত তার প্রায় সবই নিতান্তই অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার এক একটি নির্ঝর। 'পারাপার' কাব্যের 'চিরদিন' 'বৃষ্টি' 'মৃত্যুবাসর' কবিতার কোনো কোনো অংশ উল্লেখ্য। অমিয় চক্রবর্তী প্রেমের কবিতা আদৌ লিখেছেন কি না সন্দেহ; 'চিরদিন' কবিতার অনুরণন হয়তো প্রকৃত প্রেমের পরিমণ্ডলের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী, কিন্তু এ রকম ব্যক্তিগত অনুভব তাঁর অন্যান্য কবিতায় পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। 'হারানো অর্কিডে'র 'ধুলোর ঘরে' কবিতায় একটি নিভৃত অনুভূতির গুঞ্জন ভাষা পেয়েছে বটে কিন্তু প্রেমের কবিতা হিসেবে তাকে চিহ্নিত করা অসম্ভব। ছোট ছোট কবিতায় অনেক সময়ই কবির নিমগ্ন অভিজ্ঞতার ছবি সুন্দর ফোটে। 'হারানো অর্কিড' এবং 'ঘরে-ফেরার দিন' এই দুটি কাব্যগ্রন্থের কোনো কোনো কবিতা এ দিক থেকে উল্লেখ করা যায়।

এই যুগের শেষের দিকে এমন আরো দু-তিনজন কবি সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন যাঁদের নামোল্লেখ করা উচিত মনে হয়। হেমচন্দ্র বাগচী ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য বেশ কয়েকটি কবিতায় স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। হেমচন্দ্রের কবিতায় লিরিক গুঞ্জরণের সঙ্গে বিষণ্ণতার আমেজ মিশ্রিত। সঞ্জয় ভট্টাচার্য ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৯এর মধ্যে নানা ধরনের ছোট ও দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন, ১৯৪৬-১৯৪৮ সময়সীমার মধ্যে লেখা 'প্রাচীন প্রাচী' কাব্যগ্রন্থের দীর্ঘ কবিতাবলীতে তিনি এশিয়া, ভারতবর্ষ এবং বাঙলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে স্মরণ করেছেন। এগুলি গদ্য কবিতা এবং বেশ কিছুটা ভারাক্রান্ত। তুলনায় তাঁর কাব্যজীবনের শেষের দিকে রচিত ছোট ছোট লিরিকগুলো সুগভীর ভাবে পাঠকচিত্ত স্পর্শ করে। অপর একজন, কবি মণীশ ঘটক, যুবনাশ্ব'-ছদ্মনামের আড়ালে এই সময়েই কয়েকটি উজ্জ্বল গদ্যকবিতা লিখেছিলেন।

৭

তিরিশের যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় কবিদের সম্পর্কে এই আলোচনা থেকে বোঝা যাবে এই কবিগোষ্ঠী কাব্যবিষয়ে নিজ নিজ ধ্যানধারণা অনুযায়ী আধুনিক বাঙলা কবিতাকে বিশ্ব-কাব্যসাহিত্যের সমীপবর্তী করতে পেরেছেন এবং এখানেই তাঁদের কাব্যচর্চার প্রধান সার্থকতা। বাঙলা কবিতার মেজাজ ও চেহারার অনেকটাই রূপান্তর ঘটেছে উত্তরকালে তবু এখনো পর্যন্ত এঁদের কবিতার পরিব্যাপ্ত ঐশ্বর্যই সর্বাগ্রে চোখে পড়ে এবং বাঙলা কবিতার ইতিহাসের একটি স্বর্ণযুগকে বার বার মনে করিয়ে দেয়।

চল্লিশের কবিতা

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

চল্লিশের কবিরা যখন লিখতে শুরু করেছিলেন, তখন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে বিশ্বযুদ্ধ চলছে। কিছু পরেই এ দেশে শুরু হল মন্বন্তর। আরো মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষ তখনো স্বাধীন হয় নি, এবং এ দেশের যুবসমাজের একটা বড় অংশ তখন স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত। বলা বাহুল্য, এই সব ঘটনার ছায়া পড়েছিল তৎকালীন বাঙলা কবিতায়, এবং বাঙলাদেশের কবিরা যেন বাধ্যতামূলক ভাবেই সমাজসচেতন হয়ে উঠছিলেন। তিরিশের কবিরা, যাঁদের কেউ কেউ পরবর্তী কালে বিশুদ্ধ কবিতার চর্চা করেছেন, তখন পরিপার্শ্বের দাবি থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারেন নি। অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে ও জীবনানন্দ দাশের তৎকালীন কবিতা পড়লে এই তথ্য প্রমাণিত হবে। এমন কি বুদ্ধদেব বসুও তখন লিখছেন 'এবার তবে ঝড়' কবিতা। চল্লিশের যে দুজন প্রধান কবি তিরিশের যুগেও কবিতা প্রকাশিত করেছেন, সেই সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রথমাবধিই সমাজসচেতন কবিতা লিখেছেন। সমর সেনের কবিতায় অবশ্য কখনো কখনো এক ধরনের রোম্যান্টিক বিষাদের স্পর্শ পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর কবিতার প্রধান চরিত্র-লক্ষণ যে সমাজসচেতন ব্যঙ্গ ও শ্লেষ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তখন থেকেই চল্লিশের কবিতায় দুটি ধারা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে: এক, সমাজ-সচেতন রাজনীতিনির্ভর কবিতা; দুই, তারই প্রতিক্রিয়ায় মূলত রোম্যান্টিক কবিতার চর্চা। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পরেই কোনো কোনো বাঙালি কবি আত্মকেন্দ্রিক, প্রায়-রোম্যান্টিক কবিতার অনুশীলন করেছিলেন। এমন কি যে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এখন সমাজসচেতন, বামপন্থী কবি বলে চিহ্নিত তিনিও তখন লিখেছেন:

> বিকেলে দিঘির জল তুলে নিতে গিয়ে
> দেখেছি মিলিয়ে
> তার সাথে কথা বলা দু-দণ্ডের উপচানো সময়
> তত ঠাণ্ডা কোনো জল নয়।
>
> তত বৃষ্টি কোনোখানে নেই
> ঝরে যা দু-চোখে তার চোখ রাখলেই;

কিংবা তার শরীরের আল্‌গোছে এতটুকু ছায়া
জানায়, হৃদয় কেন ধুয়ে যায় ভালোবাসলেই—
তখন অন্ধকারে ভেসে যেতে করি না পরোয়া।

এই তো সে এতটুকু মেয়ে, হাসে খেলে···
পৃথিবী বদ্‌লে যায় তবু তাকে একটু জড়ালে।

শুধু তিনি একা নন, নরেশ গুহ তখন লিখছেন 'কৃষ্ণচূড়া, এখনো তুমি আছো?'; অরুণকুমার সরকার জানাচ্ছেন

ভালোবাসা, তুমি সুদূর শঙ্খচিল
অনেক দূরের নীলে
আজ মনে হয় হয়তো বা নয় ভুল
হয়তো বা ডেকেছিলে;

এবং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লিখছেন 'নীল নির্জনে'র রোম্যান্টিক কবিতা। এই দ্বিতীয়োক্ত দলে আরো কয়েকজন চল্লিশের কবির নাম করা যায়—যেমন বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অরুণ ভট্টাচার্য। এই নব্য-রোম্যান্টিক কবিদের অনেকেই তখন 'দ্বন্দ্ব' পত্রিকাকে তাঁদের মুখপত্র করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথে যে-আধুনিকতার সূত্রপাত, এবং পরবর্তী চার-পাঁচ জন কবির রচনায় পরিস্ফুট, সেই প্রায়-সদ্যোজাত আধুনিকতাকে এঁরা নিজেদের কবিতায় কাজে লাগিয়েছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যরীতির যোজন পার্থক্য, কিন্তু সে পার্থক্য জীবনানন্দ ও কুমুদরঞ্জনের কাব্যাদর্শের পার্থক্যের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। চল্লিশ-দশকের অধিকাংশ উল্লেখ্য কবিই—নানান স্বভাবগত স্তরভেদ সত্ত্বেও—এই অর্থে, একটি বড় দলের অন্তর্ভুক্ত। এবং বলা চলে, এঁদের প্রায় একই সঙ্গে সুযোগ ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। সুযোগ এই যে, রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে চলার বা এড়ানোর ভান করবার অস্বস্তিকর দায়িত্ব এঁদের অংশত কমে এলো। তার মানে এই নয় যে, রবীন্দ্রপ্রভাব কিছুমাত্র অস্তমিত হয়েছিল সে-সময়ে, কিন্তু স্মর্তব্য যে পুরোবর্তী চার-পাঁচ জন কবি সেই প্রভাবকে আত্মস্থ করে ব্যবহার করতে শুরু করেছেন ইতিমধ্যে—সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রভঙ্গিকে স্বীকার করে নতুন চিন্তাবস্তু ও পুরনো বিষয়কে নতুন করে অনুভব করবার চেষ্টা করছেন, রবীন্দ্রলোকের অধিবাসী হয়েও অমিয় চক্রবর্তী আঙ্গিকের পরীক্ষায় ও বিষয় নির্বাচনে নতুনত্ব আনছেন, বিষ্ণু দে আনছেন সমাজচেতনাস্পৃষ্ট সুর্‌রিয়ালিজ্‌ম্, আর জীবনানন্দ তো প্রায় প্রথম থেকেই—অভিনব। ফলত, বাঙলা কবিতার একটা অংশ যখন মর্মত উত্তররাবীন্দ্রিক

হবার পথে চলেছে, তখন চল্লিশ-দশকের কবিরা কবিতা লিখতে শুরু করলেন। সুতরাং, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে এবং রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও আরো চার-পাঁচজন অনুসরণযোগ্য কবিকে সামনে পেলেন এঁরা। অরুণ ভট্টাচার্যের

এখানে মৃত্যুর শান্তি নেই
যদিও নিশিদ্দিন গভীর ঘুমে—
তবু তো জীবনের ক্লান্তি নেই

'চৈত্রের প্রহর', ময়ূরাক্ষী।

যে বিষ্ণু দের ('চাই না তুমি বিনা শান্তিও') ও বুদ্ধদেব বসুর ('এক বসন্তেই শূন্য তূণ') কোনো কোনো কবিতার অনুরণনে রচিত, তা যে কোনো সজাগ পাঠকেরই কানে ধরা পড়বে, এবং এই বিচ্ছিন্ন, প্রায়-উপেক্ষণীয় উদাহরণ সামনে ধরে এটুকুই শুধু বলবার চেষ্টা করছি যে একদা চল্লিশ-দশকের কোনো কোনো কবি ঠিক এই ভাবে অগ্রজের কবিতার, অন্তত পংক্তিবিশেষের, প্রতিধ্বনি করেছেন। সর্বদা করেন নি বা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে করেন নি, পূর্বোক্ত কবি একাধিক স্বকীয় কবিতা লিখেছেন এবং কোনো কোনো কবি, যেমন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যাঁর কিছু কবিতার প্রেরণা একাধারে জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে, তাঁর সম্পূর্ণ কাব্যকৃতির প্রেক্ষিতে এই প্রভাবকে প্রক্ষিপ্ত মনে হতে পারে। কিন্তু চল্লিশে যাঁরা প্রেরণাস্থল ছিলেন, সেই বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, আজকের কবিদের কাছে তাঁরাই (বিশেষত জীবনানন্দ) প্রেরণার উৎস। সেই স্থান চল্লিশের কোনো কবি অধিকার করে নিতে পারেন নি। সুতরাং যাকে সুযোগ বলছিলাম, তাকেও শেষাবধি আর সুযোগ বলা চলবে না। রবীন্দ্রপ্রভাবের সঙ্গে প্রথম যুঝবার যে কৃতিত্ব জীবনানন্দ-বিষ্ণু দে-প্রমুখ কবিদের দেয়া চলে, স্বভাবতই সেই কৃতিত্ব থেকে চল্লিশ-দশকের কবিরা বঞ্চিত হলেন। তদুপরি, কবিতার চলনবলনের যে আধুনিকতা পূর্বসূরি কয়েকজন কবি আনতে পারলেন, কিছু পরেই সেই নতুনত্ব চেনা-জানা বস্তুর মতো স্বাভাবিক মনে হল। আগের চার-পাঁচজন কবির কাছে যা ছিল স্বোপার্জিত, যন্ত্রণাদগ্ধ অভিজ্ঞতা, পরবর্তীদের হাতে তার ভূমিকা হল হাত-ফেরত সামগ্রীর মতো। দু-একজন ছাড়া, এঁদের অধিকাংশকেই 'আধুনিকতার' কোনো অগ্নিপরীক্ষা দিতে হল না বলে চল্লিশ-দশকের কবিদের বৈশিষ্ট্যের দাবি—অন্তত সামগ্রিক ভাবে—আপেক্ষিক। পক্ষান্তরে, নতুন ভাবে কবিতা লেখবার একটা মোটামুটি আঙ্গিক জানা হয়ে গেল বলে কবির সংখ্যা বাড়লো, এবং প্রায় তখন থেকেই বাঙলাদেশে কবির সংখ্যা ক্রমবিবর্ধমান।

২

চল্লিশ-দশকের কবিদের আধুনিকতার কোনো অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয় নি। আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ১৩৫৭-সালে প্রকাশিত 'সমকালীন বাংলা কবিতা'র প্রকাশক সুহৃদ রুদ্র :

> রবীন্দ্রপরবর্তী যুগে যে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা এবং নব নব পথ উদ্‌ঘাটনের তাগিদে কবিগণ সচেষ্ট ছিলেন সে-যুগ কেটে গিয়ে এখন এক প্রশান্তি এসেছে—কবি-মনে এবং কাব্যধারায়···এবং, সাহসের সঙ্গেই বলা যেতে পারে, এঁদের আনুগত্য কবিমানসের অন্তর্মুখীনতার দিকে যতটা, ততটা বর্তমান সমাজব্যবস্থার প্রকৃতিনির্ণয়ে নয়। কবিতার আবেদনে এঁরা চিরন্তন, জীবনের গভীরতাবোধে এঁরা স্থিতপ্রাজ্ঞ।

এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত কবিরা হলেন—অরুণ ভট্টাচার্য, অরুণকুমার সরকার, অশোকবিজয় রাহা, গোবিন্দ চক্রবর্তী, গৌরকিশোর ঘোষ, চিত্ত ঘোষ, জগন্নাথ চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নরেশ গুহ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, শিলাদিত্য সেন, সুকান্ত ভট্টাচার্য ও হরপ্রসাদ মিত্র। এঁদের মধ্যে অশোকবিজয় রাহা গোবিন্দ চক্রবর্তী ও বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা এখন আর বিশেষ চোখে পড়ে না, শিলাদিত্য সেনের নাম পাঠকসমাজে একেবারেই অপরিচিত, নরেন্দ্রনাথ মিত্র কথাসাহিত্যিক হিসেবেই এখন পরিচিত, গৌরকিশোর ঘোষ উপন্যাস ও সাংবাদিকতায় মনোনিবেশ করেছেন। সুকান্ত ভট্টাচার্য কিন্তু প্রথমাবধিই বামপন্থী, এবং 'সমাজব্যবস্থার প্রকৃতিনির্ণয়ে' উৎসাহী। সুতরাং সুহৃদ রুদ্রের মন্তব্য তাঁর কবিতা বিষয়ে প্রযোজ্য নয়। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং চিত্ত ঘোষ এখন সমাজসচেতন, বামপন্থী কবি হিসেবেই চিহ্নিত।

৩

চল্লিশ-দশকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি হলেন দুজন: সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সমর সেনের কথাও আমার মনে আছে, কিন্তু তাঁর কবিতা এখন প্রায় বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো পড়ে আছে, যার সঙ্গে বাঙলা কবিতার সচল অংশের যোগাযোগ খুব স্পষ্ট নয়।

মুখের ছিপছিপে, সরু কথাকে প্রায় বেতের মতো ব্যবহার করতে পারেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, এবং তাঁর উজ্জ্বল, বর্ণিত শব্দের শাণিত ব্যবহার বাঙলা কবিতায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়েছে। অন্য একটি তুলনা দেয়া চলে : তাঁর কবিতার

শব্দ ছিপ্-নৌকোর মতো কবিতাটিকে নিয়ে দৌড় দিতে পারে, কোথাও গুরুভার হয়ে পথ জুড়ে থাকে না। ইমেজিস্টদের জন্যে লেখা পাউণ্ডের সেই বিখ্যাত ফতোয়ায় এই গুণটির উল্লেখ ও সমর্থন আছে, এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনাকর্মে এই গুণটির বিবর্তন লক্ষণীয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার এই বিশেষ গুণটি নির্দেশ করলুম এ জন্যে যে হালের বাঙলা কবিতায়, অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উন্নতি সত্ত্বেও, এই বস্তুটির অভাব চোখে পড়ে। শব্দের প্রতি মোহ যে কোনো কবিরই নাড়ির দুর্বলতা, কিন্তু সেই দুর্বলতা যদি কবিতার সমগ্র শব্দসমষ্টির প্রতি সমানভাবে বর্ষিত না হয়ে একাধিক একক শব্দের ওপর ঘটে থাকে, তা হলে কবিতাটির মূল অভিঘাত বিঘ্নিত হতে বাধ্য। চলতি, মৌখিক সহজবোধ্য শব্দব্যবহারের সুবিধে এই যে কবি এই আপাত-নিস্তাপ শব্দসেজ থেকে যে কোনো অর্থ জ্বালিয়ে নিতে পারেন, এবং প্রতিটি শব্দের স্বতন্ত্র অনুষঙ্গ কবিতাটির সম্পূর্ণ অনুষঙ্গের সম্পূরক হয়ে ওঠে। নইলে এক একটি বিচ্ছিন্ন শব্দ যতই রূপময়, অনুষঙ্গাতুর হোক না কেন, শব্দবিশেষের পক্ষে যা গৌরব মনে হতে পারে পুরো কবিতাটির পক্ষে তাকেই সৌন্দর্যনাশী মনে হবে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার আরো একটি গুণ হল তাঁর মানবিকতা বা মানবিক সমবেদনা। তিনি সমাজে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চান না—তিনি চান মানুষের সঙ্গে, জনতার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকতে। 'আমার কাজ'[1] কবিতায় তাঁর সমগ্র জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে মনে হয় :

আমাকে কেউ কবি বলুক
আমি চাই না।
কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত
যেন আমি হেঁটে যাই।

আমি যেন আমার কলমটা
ট্র্যাক্টরের পাশে
নামিয়ে রেখে বলতে পারি—
এই আমার ছুটি
ভাই, আমাকে একটু আগুন দাও।

কিন্তু জনগণকল্যাণের কথা লিখলেও, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা আমাদের গভীরতম অনুভূতিকে স্পর্শ করে না। জন্ম-জীবন-মৃত্যুর যে জটিল রহস্য আমাদের অস্তিত্বে

১. 'কাল মধুমাস'।

আস্তীর্ণ হ'য়ে আছে, তার বিশেষ কোনো চিহ্ন নেই তাঁর কবিতায়। তিনি অত্যন্ত নিপুণ কবি, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি অনেকটাই ওপর-ওপর বলে মনে হয়।

'নীল নির্জনে'র নীরেন্দ্রনাথ ছিলেন মূলত রোম্যান্টিক কবি, কিন্তু নিত্যবিবর্তনশীল. তাঁর কবিতা আস্তে আস্তে বিস্তৃততর জীবনের পরিমণ্ডলকে স্পর্শ করেছে। চল্লিশ-দশকের লেখকদের মধ্যে তিনিই একমাত্র কবি, যাঁর কবিতা কখনো এক জায়গায় থেমে থাকে নি—ধাপে ধাপে সিঁড়িতে উঠে গেছে। তিনি যা বলতে চান তা খুব স্পষ্টভাবে বলতে পারেন, এবং তাঁর কণ্ঠস্বরে কোথাও দ্বিধা বা জড়িমার অবকাশ নেই। সাংবাদিকতাকে তিনি অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে স্বদে খাটাতে পারেন তাঁর কবিতায়, এবং ছন্দেই লিখুন বা গদ্যেই লিখুন, তাঁর কবিতার ফর্ম কখনো নড়বড়ে বা শিথিল বলে মনে হয় না। 'নক্ষত্র জয়ের জন্য' কবিতায় তিনি লিখেছেন :

> হুশ করে নক্ষত্রলোকে উঠে যেতে চাই।
> কিন্তু তার জন্য, মহাশয়,
> স্প্রিং-লাগানো দারুণ মজবুত একটা শব্দের দরকার।
> সেইটের ওপরে গিয়ে উঠতে হবে।

আমি বলতে চাই যে এই 'নক্ষত্রজয়ী' 'দারুণ মজবুত' শব্দ তাঁর সম্পূর্ণ করায়ত্ত। কোনো কোনো কবিতায় তিনি প্রথম স্তবকে বা প্রথম দিকে যে পংক্তিগুলো রচনা করেন, শেষার্ধে আবার তাদের পুনরুক্তি করেন এক ধরনের 'জোর' ও ব্যঞ্জনার জন্য। তাঁর এই রীতি অনেক তরুণ কবিকে প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয়।

এর পরেই আমি উল্লেখ করতে চাই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, এবং অরুণকুমার সরকারের কবিতা। আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম দিকে বিশুদ্ধ প্রেমের কবিতাও রচনা করেছেন—কিন্তু আস্তে আস্তে তাঁর কবিতা নিজের পথ খুঁজে পেয়েছে, এবং এখন তাঁকে সমাজসচেতন, বামপন্থী কবি বললে বোধহয় ভুল হবে না। অস্তিত্বের যন্ত্রণা, পরিপার্শ্বের সঙ্গে সংগ্রামের যন্ত্রণা, দুঃখী এবং অত্যাচারিতের জন্যে সহানুভূতি, এবং স্বদেশী ঐতিহ্যের সঙ্গে নাড়ির যোগ—এই কয়েকটি বিষয়সূত্র বার বার ঘুরে এসেছে তাঁর কবিতায়। তিনি অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে কবিতা লেখেন, তাঁর কবিতার কোনো অংশই বানানো বা কৃত্রিম বলে মনে হয় না, এবং তিনি যখন কোনো বিষয়ে প্রতিবাদ করেন, তখন তাকে নিরর্থক চিৎকার বলে ভ্রম হয় না। শুধু নাই নয়, প্রধানত চড়া স্বরে কবিতা লিখতে লিখতেও তিনি মাঝে মাঝে অত্যন্ত কোমলভাবে আমাদের অনুভূতিকে স্পর্শ করেন। যেমন :

> স্পর্শ করলে পুনর্জন্ম হতে পারে
> কিন্তু মাঝখানে

বাতাসের শূন্যতা, চোখের জল ঝরে
যেন শীতের হলুদ পাতা ॥

'বন্ধুর হাত'।

কিংবা 'বেহুলা' কবিতাটি :

জলে ভাসছে ওফেলিয়া
জলে ভাসছে লখিন্দর ;
গাজন যেন ডাকাতদের বিলে ;
জলে ভাসছে ওফেলিয়া
জলে ভাসছে অবাক লখিন্দর ;
কন্যা ! তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?

মণীন্দ্র রায়ও একজন বামপন্থী কবি হিসেবে চিহ্নিত, কিন্তু তাঁর অনেক কবিতার বিষয়বস্তু বিশুদ্ধ প্রেম এবং প্রেমের অনুভূতি। 'অন্য মনে' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তিনি একটি ইণ্টারভিউ-তে জানিয়েছিলেন যে তাঁর কাছে কবিতার 'কনটেণ্ট' 'ফর্মে'র চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। কবিতার ফর্ম ও কনটেণ্ট-কে আলাদা করে নিয়ে বিচার করা যায় কি না আমি জানি না, তা হলেও মণীন্দ্র রায়ের এই মন্তব্যে তাঁর কবিস্বভাবের একটি বিশেষ দিক আমাদের চোখে পড়ে। তিনি নিঃসন্দেহে বিষয়মুখী এবং বিষয়ান্বেষী কবি—তাঁর অধিকাংশ কবিতাতেই কোনো না কোনো স্পর্শগ্রাহ্য বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। জনতার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া তাঁরও কাম্য, তবে এই বিষয় নিয়ে লিখতে গিয়ে তিনি কখনো ফতোয়া রচনা করেন নি—কবিতার শর্ত সর্বাগ্রে মেনে নিয়েছেন। জনজীবনের সঙ্গে সম্মিলিত হবার কামনা খুব সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'মোহিনী আড়াল' কাব্যগ্রন্থের আট-নম্বর অণুচ্ছেদে :

নামি
মেলায় তা হলে।
হাওয়া
মানুষের।
কাঠের পুতুল, চুড়ি, পুঁতির মালায়
মানুষের খুশি।
ধুলো ;
অকারণ হাসি ;
গায়ে গা লাগিয়ে ঘোরাফেরা ;
যেন মনের সাঁতার

মানুষের ঢেউয়ে ঢেউয়ে !
এমন বিস্ময়
যেন আবিষ্কার
নিজেরই বুঝি বা : এও আমি !

অরুণকুমার সরকার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বাদের কবি। 'অন্য মনে'র যে সংখ্যাটির কথা আমি কিছু আগেই উল্লেখ করেছি, সেই সংখ্যাতেই অরুণকুমার সরকার জানিয়েছিলেন যে তাঁর কাছে কবিতার 'ফর্ম', 'কনটেণ্টে'র চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। তিনি যাই লিখুন না কেন, তাকে সুন্দর, আঁটো ফর্মে প্রকাশ করতে জানেন। শুধু তাই নয়, তাঁর কবিতায় এমন এক ধরনের স্বচ্ছন্দ সাবলীলতা ও প্রসাদগুণ বর্তমান থাকে যে তাঁর প্রতিটি কবিতাই এ জন্যে সুখপাঠ্য মনে হয়। একই কারণে, তাঁর কবিতার স্মরণযোগ্যতা খুব বেশি—অনেক কবিতাপাঠকের মুখে মুখে তাঁর কবিতার পংক্তি ঘুরে বেড়ায়। প্রেম ও প্রেমের অনুষঙ্গ তাঁর অনেক কবিতার বিষয়বস্তু। যেমন 'কোনো মেয়েকে' কবিতাটি :

তোমাকে কি দেব উপহার
স্মৃতিটুকু সকালবেলার ?
তাই নিয়ে তুমি খুশি হবে ?
হবে না ? কী আর করি তবে !
বিকেলে কেমন করে, বলো,
এনে দিই রোদ ঝলোমলো ?
তার চেয়ে আমাকেই নাও
থরথর দু'হাত বাড়াও
নিয়ে যাও তোমার সকালে,
কামরাঙা ডালিমের ডালে ॥

কিন্তু পরিপার্শ্ব সম্পর্কেও তিনি সমান সচেতন। এই প্রসঙ্গে 'চলো যাই' কবিতার একটি অংশ উল্লেখ করছি :

চোখ আছে, দৃশ্যবস্তু আছে
কিন্তু যেন আলোর অভাবে
সব কিছু তালগোল-পাকানো হাতড়ানো
কিংবা গুঁড়োগুঁড়ো
উড়োজাহাজের ট্রামের বাসের খাদ্য।

অনেকের কাছে শুনেছি যে তিনি যতটা নিপুণ কবি ততটা গভীর নন, এবং তাঁর

বিষয়-পরিসর অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই অভিযোগ, সম্ভবত, ঠিক নয়। তিনি যে-অভিজ্ঞতাকে তাঁর অনুভূতির অন্তর্গত করতে পেরেছেন, তাকেই প্রকাশ করেছেন তাঁর কবিতায়, এবং সেই প্রকাশে তাঁর কোনো ত্রুটি ঘটে নি। যে অভিজ্ঞতামণ্ডল তাঁর কাছে বিদেশী, সে-বিষয়ে তাঁর তেমন কোনো উৎসাহ নেই :

অবচেতনার বৃক্ষে অনেক পুষ্প
আমি ঘুরে মরি বাইরে
নিজেকে এড়াই পালিয়ে বেড়াই
কেন বিপরীত প্রান্তে
দক্ষিণ দিকে যখন ক্ষান্তি নেমেছে ?

নরেশ গুহ দীর্ঘদিন কবিতা লেখেন না, কিন্তু তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'দুরন্ত দুপুরে'র প্রায়-প্রতিটি কবিতাই সুখপাঠ্য। রোম্যান্টিকতা, স্বচ্ছন্দ ভাষা এবং বর্ণনার পারিপাট্য—তাঁর কবিতার প্রধান তিনটি গুণ, এবং যে স্মরণযোগ্যতার কথা অরুণকুমার সরকারের কবিতার প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলুম সেই গুণটি তাঁর কবিতা সম্পর্কেও প্রযোজ্য। 'রুমির ইচ্ছা', 'শান্তিনিকেতনে ছুটি' প্রভৃতি কবিতাগুলি এখনো কবিতাপাঠকের মুখে মুখে ঘোরে। সম্প্রতি তাঁর আরেকটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে : 'তাতার সমুদ্র ঘেরা'।

চল্লিশের আরেকজন অন্যতম প্রধান কাব্যকার রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী এখনো বহুলাংশে অবহেলিত। 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনে তাঁর কবিতা নিয়ে বুদ্ধদেব বসু রমেন্দ্রকুমারকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন—তাও প্রায় অনেক দিন হয়ে গেল। কিন্তু কবিতাপ্রচারের যে অশ্লীল ঢক্কানিনাদের ফলে এখন কবিদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই ঢাকের গর্জন থেকে শ্রী আচার্যচৌধুরী সর্বদাই দূরে ছিলেন, বা—একটু ঘুরিয়ে বলা চলে—তাঁকে দূরে রাখা হয়েছিল। তাঁর খ্যাতি আবদ্ধ আছে ছোট ছোট বৃত্তের ভেতরে, বন্ধুবান্ধবের মহলে। কিন্তু তাঁব কবিতা পড়লেই বোঝা যায় যে কী অসীম মেধা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপদক্ষতা, এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অধিকারী তিনি! তাঁর প্রতিটি কবিতাই রসোত্তীর্ণ (এ-পর্যন্ত তাঁর কোনো অপাঠ্য কবিতা আমার চোখে পড়ে নি), আমি শুধু তাঁর কবিত্বের প্রতিনিধিত্বমূলক একটি কবিতার প্রথমাংশ উদ্ধার করছি :

কত ছায়া এ-দেয়ালে, ছায়া পড়ে বুকে
নক্ষত্রের, টিকটিকির, কুসুমিত মালতীলতার,
শুধু এক ছায়া আর কোনোদিন পড়ে না দেয়ালে,
কে আকাশ ? কে বাতাস ? পৃথিবী চক্কর দেয় দিল্লির বেতার।
গন্ধ দাও, পরিবর্তমান মেঘ, শান্ত বটগাছ,
পেয়ালা-পিরিচ ওগো, অমলেটে কিছু অলৌকিক !

যাতে ফিরে যেতে পারি পিপুলের গভীর কোটরে,
বুঝে নিতে আর্দ্র দুই সম্মিলিত পাখির প্রতীক।
অথবা সবুজ এই নিসর্গের গ্রিলের নক্‌শায়
নির্জন আত্মাকে করি ফুল ফল গুপ্ত প্রক্রিয়ায়।

'ভারতীয় সূর্যাস্ত', আরশি-নগর।

রমেন্দ্রকুমারের একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'আরশি-নগর' (১৯৬১) এখন আর পাওয়া যায় না। তবে, সম্প্রতি 'পরমা'-গোষ্ঠী 'তিনজন কবি'-সিরিজে তাঁকে অন্তর্গত করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

চল্লিশ-দশকের যে দুজন কবি প্রধানত গদ্যরীতিতে কাব্যচর্চা করেন, তাঁরা হলেন অরুণ মিত্র ও লোকনাথ ভট্টাচার্য। অরুণ মিত্রের চিত্রোচ্ছল কবিতার প্রেরণা অংশত বিদেশী হলেও, এই মুহূর্তের বাঙলা কবিতায় তার প্রভাব কম নয়। তাঁর কবিতা ক্রমশই তাৎপর্যময় হয়ে উঠছে, হয়ে উঠছে মানবিক ও জীবনঘনিষ্ঠ। লোকনাথ ভট্টাচার্য নিরন্তর পরীক্ষানিরীক্ষা করছেন তাঁর কবিতায়, এবং যে গদ্য-'ফর্ম'টিকে তিনি পেয়েছেন তা সর্বাংশেই ঈর্ষণীয়। সমাজচেতনা ও স্যুর্‌রিয়ালিজ্‌ম্, এই দুই মেরুর মধ্যে টানা-পোড়েন করে তাঁর কবিতার নক্‌শা—এবং এই নক্‌শার সুন্দর কারুকাজ আমাদেব চোখে না পড়ে পারে না।

দিনেশ দাসও, এক হিসেবে, সমাজসচেতন কবি—কিন্তু তিনি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেন নিখুঁত চিত্রকল্পের সাহায্যে, এবং সেই জন্যেই অন্তত আমার কাছে তাঁর কবিতা চিরদিন আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। এই সমাজচেতনা বিমলচন্দ্র ঘোষের কবিতায় অনেক বেশি প্রবল ও উচ্চকিত—কিন্তু এই উঁচু স্বর তাঁর কবিতাকে সর্বদা ক্ষতিগ্রস্ত করে নি। এঁদেরই প্রায় সমসাময়িক সুশীল রায় অনেক কাহিনীকাব্য রচনা করে সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতায় একটি নতুন দরজা খুলে দিয়েছেন। এখনো তিনি নিরন্তর কাব্যচর্চারত, সুতরাং তাঁর কাছ থেকে আরো নতুন কিছু আমরা আশা করতে পারি। গোপাল ভৌমিকের কবিতার একটা নিজস্ব ফর্ম আছে; শুধু তাই নয়, তিনি চল্লিশ-দশকের সেই মুষ্টিমেয় কবিদের একজন যিনি কবিতায় মননশীলতার চর্চা করেছেন। অশোকবিজয় রাহার কবিতা অনেক দিন আমার চোখে পড়ে নি—কিন্তু একদা তিনি যে কবিতা লিখেছেন, তার ভিত্তিতেই তিনি বাঙলা কবিতায় টিকে যাবেন বলে মনে হয়। তাঁর 'তারা-চাষের স্বপ্ন' একটি অবিস্মরণীয় কবিতা। একই কথা সুনীলচন্দ্র সরকারের কবিতা সম্পর্কেও বলা যায়। তাঁর 'মিলিতা' কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই আকর্ষণীয়।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং জগন্নাথ চক্রবর্তী—বিশেষত শেষোক্তজন—অজস্র কবিতা লিখেছেন, এবং জগন্নাথ চক্রবর্তীর গ্রন্থের সংখ্যাও অনেক। স্মার্ট নাগরিকতার

সঙ্গে পরিপার্শ্বচেতনা সম্মিলিত হয়েছে এঁদের কবিতায়, যদিও এই দুজনেরই সম্প্রতি-রচিত কবিতার তুলনায় তাঁদের আগের কবিতা আমাকে বেশি আকর্ষণ করে। জগন্নাথ চক্রবর্তীর 'পার্কস্ট্রীটের স্ট্যাচু' কবিতাটি নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য রচনা।

কবিতার অঙ্গ থেকে চিন্তাবস্তুকে আলাদা করে নিয়ে সে বিষয়ে আলোচনা করতে যাবার বাধা আছে। তবু আমরা সাধারণ অর্থে যাকে দার্শনিক-চেতনা বলি, অর্থাৎ জীবনে মানুষের অস্তিত্ব ও ভূমিকা বিষয়ে প্রশ্নাতুরতা, চল্লিশ-দশকের কবিদের মধ্যে গোবিন্দ চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, দিলীপ রায়, চিত্ত ঘোষ, হরপ্রসাদ মিত্র, কৃষ্ণ ধর, অরুণ ভট্টাচার্য, রাম বসু ও সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতায় তার প্রকাশ। এঁদের মধ্যে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তকে একজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য কবি বলে আমি মনে করি।

হরপ্রসাদ মিত্রের 'সোনার দেদীপ্যমান পৃথিবীর বিশাল বাজারে / দিন যায়, রাত্রি হয়—রাত বাড়ে—আমি সেই রাতে / একটি গভীর কী যে খুঁজে খুঁজে চলি এক মনে' ('কানামাছি—আন্তর্জাতিক') ও গোবিন্দ চক্রবর্তীর 'সেই আগুনের তাতেই নাকি / সৃষ্টি পুড়ে থাক— / এরি মধ্যে আছে তবু / কোথাও কি মৌচাক / টুপ্ টুপ্ টুপ্ ঝরছে মধু / তারা থেকে তৃণে— / হঠাৎ এসে কয়েকজন তার / খানিক নেয় চিনে / ধোঁয়া কিংবা দ্বিগুণ ধাঁধার লাগায় দারুণ তাক্—' ('নাগরদোলা'), পংক্তি হিসেবে সর্বোৎকৃষ্ট না হলেও আমার বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করে। এই সূত্রে দিলীপ রায়ের কবিতা থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করছি :

> সব তো বাস্তব, কত গ্রানাইট দিয়ে গড়া পাহাড়
> খেজুরের গাছ কত, ঋজু দেবদারু,
> লম্বা লম্বা তালগাছ কত সারি সারি···
>
> কিংবা গগনচুম্বী প্রাসাদে, বিদ্যুৎ-লিফ্ট্
> নিঃশব্দে ভ্রমণ করে, কত
> নরনারী কাতারে কাতারে—
> এ সব, যদি হৃদয় না থাকতো, তা হলে থাকতো ? বলো ?
> 'যদি হৃদয় না থাকতো'।

চল্লিশ-দশকের তরুণতম কবি রাম বসু ও সিদ্ধেশ্বর সেন সমাজসচেতন কবি হিসেবে পরিচিত। কিন্তু এঁরা দুজনেই এক ধরনের দার্শনিকতাকে তাঁদের সমাজচেতনার সঙ্গে সম্মিলিত করতে পেরেছেন, এবং হয়তো এই কারণেই এঁরা দুজনেই খুব শক্তিশালী। রাম বসুর কবিতার দৃঢ়নিবদ্ধ চিত্রকল্পের ব্যবহারও খুব আকর্ষণীয়, যেমন আকর্ষণীয়

সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতায় সমাজচেতনার ফাঁকে ফাঁকে এক ধরনের গৈরিক উদাসীনতা। সন্তোষকুমার ঘোষ যদিও ঈষৎ পরবর্তী কালে কবিতা লিখতে শুরু করেছেন, তবু তাঁকে চল্লিশের কবিদের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করতে চাই।

প্রত্যক্ষ ভাবে মূলসমস্যাস্পর্শী কবিতারচনার রীতি চল্লিশ-দশকের মধ্যেই বোধহয় সীমাবদ্ধ রইল। কাম্যু তাঁর 'রেবেল' প্রবন্ধে নির্দেশ দিয়েছেন যে, প্রাচীন সাহিত্যের সমস্যাকেন্দ্র যেমন নৈতিক, আধুনিক সাহিত্যের আধ্যাত্মিক। মোটামুটি ভাবে এই উক্তিটি সত্য মনে হয়, এবং সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতার একটা প্রধান অংশ এই দ্বন্দ্বে আরক্ত হয়ে উঠেছে মনে হয়। কিন্তু হালের কবিতার আধ্যাত্মিকতা যেন নানা ধরনের প্রত্যক্ষত শারীরিক অভিজ্ঞতাকে ছেঁকে, কখনো প্রতীকের সাহায্যে, কখনো বা অন্য ভাবে, এক দুঃসাধ্য পরিশ্রমী প্রচেষ্টা। সেখানে চল্লিশ-দশকের কবিতার সঙ্গে প্রায় মৌলিক পার্থক্যের সূত্রপাত ঘটেছে।

চল্লিশ দশকে দুজন উল্লেখযোগ্য মহিলা কবি আছেন: বাণী রায় ও রাজলক্ষ্মী দেবী। বাণী রায়ও বহুলাংশে অবহেলিত কবি—কিন্তু তাঁর কবিতায় মনীষা ও অনুভূতির যে সুন্দর সমন্বয় চোখে পড়ে তা সর্বত্র আদরণীয় হবার কথা ছিল। রাজলক্ষ্মী দেবীর কবিতা পড়লে মনে হয় যেন তিনি তেলরং দিয়ে ছবি আঁকছেন—এত গাঢ়, আয়তনবান, পুষ্ট তাঁর চিত্রকল্প। তিনি কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর প্রেমের কবিতা লিখেছেন, এ কথাও এখানে স্মরণীয়।

এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে যাঁদের নাম এখনো উল্লেখ করি নি, সেই প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, অরুণাচল বসু, পরমানন্দ সরস্বতী, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, সতীন্দ্র মৈত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র, গোলাম কুদ্দুস, বিরাম মুখোপাধ্যায়, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, বটকৃষ্ণ দাস, অর্চন দাশগুপ্ত, অসীম রায়, মৃগাঙ্ক রায়—এঁরাও নিজের নিজের ক্ষমতায় চল্লিশের কবিতার ধারাকে পরিপুষ্ট করেছেন। সুকান্ত ভট্টাচার্য চল্লিশের কবি। স্বল্পকালের মধ্যেও তিনি যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা আমাদের এখন সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করা উচিত। তাঁর কবিতায় সমাজ-চেতনার সঙ্গে মানবিক সংবেদনশীলতা সম্মিলিত হয়েছিল বলে, এখনো তিনি সবশ্রেণীর পাঠকের কাছে জনপ্রিয় কবি।

৭

পঞ্চাশ

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চাশ-দশকের প্রথম কাব্যগ্রন্থ আলোক সরকারের 'উতল নির্জন' (মে ১৯৫০)। চল্লিশের কবিতার পাশে চোখে পড়ে তার একলার পৃথিবী: 'নিঃসঙ্গ দুপুরে / বাগানে ধূসরবর্ণ ধুলো ওড়ে, শব্দ করে পাতা বলে ওঠে', সে যেন মনের কথা পাতাদের—ফুটে উঠছে নির্জন আবেগে, 'মধ্যাহ্নে নিঝুম ছিঁড়ে শালিক বা দোয়েলের শিস'—প্রায় অছোঁয়া জগৎ যার পংক্তিতে পংক্তিতে 'নির্জন' 'নিঃসঙ্গ' আর 'একাকী' এই তিন শব্দ-মর্মর, প্রকৃতির সেই 'ঘরকবনার ভেতরে' বসে সবটুকু ভালোবাসা আর ভালোলাগা নিয়ে মাটির পুতুল গড়ছে কিশোর বালক, কবি লিখলেন, 'পড়ন্ত বেলার রোদে / একাকী শালিক এক / দৃষ্টির বিস্ময় নিয়ে দিগন্তের সোনারঙ দেখে'। পঞ্চাশের দিক্‌রেখার ওই সোনাটুকু কুড়োতে যেতে দেখি সবাইকে, নির্বিশেষে, তাঁদের চোখে 'দৃষ্টির বিস্ময়':

> ছায়া-তবতর দুপুরসিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে
> আচমকা কোনো সেগুনবনের কাঠবেড়ালীর
> মুখের মতন থমথমে রোদ

অলঙ্কার আছে আনন্দ বাগচীর এই বিস্ময়বিবরণে, সেও তা হলে আরেক লক্ষণ। যেমন এই স্বভাবোক্তি

> বাতাস বইছে ঘুরে ঘুরে, নিরালা, সুরেলা মনে
>
> 'যদি': সুকুমার রায়।

এই সমাসোক্তি

> আকাশে হেলান দিয়ে চোখ চেয়ে বসে থাকা ব্যথিত বিকাল
>
> 'ঘৃণা': রবীন্দ্র বিশ্বাস।

এই সমারোহ

> বাঁশির জাদুকর
> মেঘের ঝাঁপি খুলল যেই ভুজঙ্গপ্রয়াত
> লক্ষ ফণা ছড়িয়ে দিল
>
> 'আষাঢ়ে শ্রাবণে': মোহিত চট্টোপাধ্যায়।

বা এই পরিণাম-অন্তর্মরতা

উদাসীন মেঘে মেঘে ফুটে আছে থোকা থোকা
আরক্ত করবী :
সমস্ত আকাশ যেন গগনেন্দ্র ঠাকুরের ছবি।

'নির্জন দিনপঞ্জী' : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত।

পঞ্চাশের শুরু থেকে খানিক দূর তাকালে দেখা যায় কেবল একলার স্বগতাচারে কবি নিরত হয়েছেন প্রকৃতি-ভালোবাসার নবপত্রস্ফুট নিরালাতে, 'নিসর্গের লতাফুলপাতার আড়ালে আড়ালে সোনার ফল'—এমনই সদ্যজায়মান যে তাতে পূর্বজ কবির পুরাণ-লোকায়তের ছায়ালেশ নেই। পূরক হয়ে আছে প্রেম আর প্রকৃতি পরস্পরে : 'ঘুরে ঘুরে এই প্রকৃতি কী কথা কয় ? / সে বলে যায় প্রেমের মতন আর কিছু নয়!' একটু উদ্ধৃতি দেখাই যেখানে রতি-প্রকৃতি একাকার হয়ে আছে সদ্য-দৃষ্টির আলোকে

হেমন্ত রাত্রির চরে হিরন্ময় বালকের ভোর
কাঁথাকানি ছুঁড়ে দিয়ে বলে, আমি যুবরাজ তোর,
তোর ধেনু বালিহাঁস কাদাখোঁচা পাখির পালক
কুড়িয়ে ফিরব ঘরে, কুচি কুচি আকাশ-আলোক
গ্রহণে তপতী হবি। একদিন হয়তো পালাবো
যখন দুপুর হব, হঠাৎ দুপুর হয়ে যাবো।

'যুবরাজ' : শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

'তপতী'ও এখানে সহজ মানুষের স্মৃতি, রেটরিক নয়। যেমন দেবতোষ বসুর দেখা 'স্বপ্নপুরাণের দেশ'—সেও যেন যেমন লিখেছেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত : চড়িভাতির 'ভ্রমররঙিন কোনো গ্রামের ভেতরে'। প্রায়-অচল আর্কেডিয়া—নদীমাঠগাছপাখিসুখের, শুধু প্রেমের আর দিনক্ষরণের ; এক পাঠিকা তখন লিখেছিলেন : আবার দেখতে পাচ্ছি 'রেনাসেন্স অফ রোম্যান্টিসিজ্ম্' এই তরুণ কবিতাতে। শহরবাস্তবের মুখে অসহায় চল্লিশের কবি : 'অবরুদ্ধ নগরীর বিধ্বস্ত প্রাকারে / বসে আছি নির্বিকার অসহায়তায়', তার জ্বলাপোড়া পথবসতও জরিসাজ পরে নিয়েছে দেখি পঞ্চাশের বিস্ময়দৃষ্টিতে : অরবিন্দ গুহর 'বালিগঞ্জ-টালিগঞ্জ-কালিঘাট পেরিয়ে উধাও / শাদা পক্ষীরাজ ট্র্যাম…' ('অল্পক্ষণের জন্য'), বা

মৃত চিঠির মহল থেকে একটুখানি দূরে।
তোমার দেখা পেয়ে গেলেম দুপুরে রোদ্দুরে,
দুপুরে রোদ্দুরে এলে মাটিআকাশ জুড়ে
ডালাউসিকে ডুবিয়ে দিয়ে শুদ্ধ সারং সুরে।

'ভানুমতীর দুপুরে' : কবিতা সিংহ।

ভুল হয়ে যায় মাত্র কতক দিন আগে মারী আর রক্ত-স্নান সেরে উঠেছে এই শহর, সাতচল্লিশের পরে উৎখাত হয়ে যেতে বসেছে রাজনীতি-অর্থনীতির নতুন অনিশ্চয়ে, দেশভাগের ভার একটু একটু চাপ কেটে বসছে সর্বত্র-সমাজে। 'স্বগত সন্ধ্যা'র ভীরুপ্রেমগুঞ্জনের পাশে অলক্ষ্য হয়ে আছে বটে 'ট্রামছাড়া-ভোর হকার-সকাল', অরবিন্দ গুহর 'মনের ঘোরানো সিঁড়ি'র নিচে নিচে একএকবার চকিত হয়ে ওঠে ধোঁয়া-ধুলো-কালি ভরা বেলেঘাটার কালীতারা বস্তু গলি—যেন সে ছায়াছবির মতো, কবি ঘুরছেন তাঁর স্বপ্নবীজ জপতে জপতে : 'আমাকে সেই কবিতালোকে উদ্ভাসিত করো'। একসময় তাঁর কাব্যপরিচয় লিখতে অলোকরঞ্জন লিখেছেন, 'বক্তব্যের কবিতা নয়, কবিতার বক্তব্যই আধুনিক কবির এষণার বিষয়'। 'বক্তব্যে'র বলে যার চেনা সে যে নিঃসন্তান আয়ুসীমানায় এসে দাঁড়িয়েছিল তা নয়, মনে হয় তার আবেগ সংক্ষিপ্ত হয়েছিল সূত্রাকারে এবং গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিল ছোট মাপের মধ্যে—নবযুগ আনতে নয়, 'বেকার-দুপুরে বাঁচবার জ্বালা মর্গে খুঁজছে পথ' কিংবা 'আমি এক ছা-পোষা কেরানি / দশটার-পাঁচটার রণে আমি এক অক্লান্ত সৈনিক'—এই পরিস্থিতিতে, বলে না দিলে বোঝা যাবে না 'বেকার-দুপুর' আর 'হকার-সকাল' এক কলমের লেখা নয়, এবং 'তিমির সীমান্তে'র (১৯৫১) কবি স্বভাবে যাই হোন ভাবিত হয়েছেন নির্ধারিত বক্তব্যের কবিতাতে। একই বছরের 'একমুঠো রোদ' : পূর্ণেন্দু পত্রীর, সেও বলতে পারি পিঠোপিঠি। কিংবা জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় 'তেরো-চোদ্দর কবিতা' (মার্চ ১৯৫১)। অমলেন্দু গুহর লেখা 'লুইতপাড়ের গাথা'র (১৯৫৬)। রিহা-মেখলায় সাজা মেয়ে, বহাগী-নাহরের আমন্ত্রণ ভরা লুইতপাড়ের শোভাচ্ছবির পাশে পাশে সমুদ্দুরের ঢেউ-মিছিল, কবি বলছেন, 'পার্টি আমাকে দিয়েছে দৃষ্টি' এবং 'সারা দুনিয়ার শান্তিসেনার হাতে হাত রেখে আজকে / নখে নখ টিপে মারব মুখোশে লুকোনো লড়াইবাজকে।' ঈষৎ স্ববিহিত-মার্কস্‌বাদ রয়েছে রবীন্দ্র বিশ্বাসের 'লগ্ন গোধূলি'তে, দুর্গাদাস সরকারের 'অশোকের সময়ের গ্রামে'ও : আগের পিছনের মধ্যে জীবননিশ্বাস নিতে ফিরছেন কবি ক্লিষ্ট বর্তমানকে অতিক্রম করে। শিশিরকুমার দাশের 'জন্মলগ্ন' সেখানেও 'জীবনের জন্য লড়াই', কবি তার ভূমিকা করেছেন, 'আজ এই শতাব্দীর হতাশা জড়ানো আকাশে সূর্যোদয়-আকাঙ্ক্ষায় শুকতারার মতো চেয়ে আছি।' পরে পরে দেখি রোহীন্দ্র চক্রবর্তী, ধনঞ্জয় দাশ, তরুণ সান্যালের লেখা। তরুণ সান্যালের 'মাটির বেহালা'র নাম হয়েছিল প্রকাশকালেই। ধনঞ্জয় দাশ হয়তো বা ঈষৎ পূর্বোচ্চার্য রাম বসু-সিদ্ধেশ্বর সেনের সঙ্গে। কিন্তু 'বক্তব্যে'র বহতা অক্ষুণ্ণ থাকলেও সমর সেন অরুণ মিত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের তেজ নেই তাতে। কোথাও দু-আধা ভাগ হয়ে গেছে সামাজিক আর কাব্যিক উদ্ঘাটন যেমন শঙ্খ ঘোষের 'দিনগুলি রাতগুলি'র (১৯৫৬) লেখায়, 'যমুনাবতী'-পর্যায়েও

কবি যা বলতে পেরেছেন তা সূত্র নয়, সংবেদনা—নম্র, আন্তরিক; তাঁর স্বগত-কবিতাও প্রথাচ্ছন্দিত

একটি গাছ পিলসুজ   ছড়িয়ে পড়ে তাতে
হঠাৎ জাগা জ্যোৎস্নায়   শিখার কণিকা কি ?

তাঁর তত্ত্বের 'গদ্য বা প্রাত্যহিকে'র ছোপ কি এই ?[১] কিন্তু আগাগোড়া অশিথিল-সুলিখিত তাঁর লেখা—জটিল নয়, আবেগে অমনস্ক নয় পাঠকপ্রিয় কবিদের মতো, আত্মপ্রশ্রয়ী নয় বরং নানা পূর্বতনের অনুষঙ্গী, এখনো তাই দেখি। আলোক সরকারের লেখাতে তাঁর নিজের ছাপ দেয়া প্রতি পদে, রেশমপিচ্ছিল সাবলীলতা অলোকরঞ্জনের—তিনজনেই শব্দ-সাবধান তিন ভাবে। শঙ্খ ঘোষেব লেখা যে সহজসঞ্চারী হয়েছে তা তাঁর অ-খরতায়। তাতেই সুব্যক্ত হতে পেরেছেন তিনি অপ্রতিবন্ধে—সুভাষ মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থিত কবেছেন তাঁর 'জীবনবোধদীপ্ত' কবিতা, 'কৃত্তিবাস' বরণ করেছে তাঁকে 'তরুণ কবিদের প্রতিভূ' রূপে।

'আত্মগত' এবং 'সম্মেলক' এই যুগ্ম উত্থাপন করেছিলেন অলোকরঞ্জন শঙ্খ ঘোষেব কবিতা নির্ণয়ে—'সম্মেলক' বলেই পারিভাষিক 'বক্তব্যে'র লেখা নয়, সে তো অনেকেরই খুঁজলে পাবো পূরণ কবেছেন নিজেব নিজের মতো। 'মিতার জন্য রোমান্টিক কবিতা' এবং 'দক্ষিণ নায়কে'র একই প্রকাশবর্ষ, ১৯৫৪, শান্তিকুমারের উত্তরবঙ্গ ও নানা স্থানের দৃশ্যসম্ভোগ প্রকৃতিপিপাসু রোম্যান্টিকদের মতো, ওয়ার্ডসোয়র্থের অদেখা-ইয়ারোর স্মৃতিরক্ষাকারী লেখাও আছে—'টাইগাব হিলে সূর্যোদয়—অদর্শনে' এবং সে লেখা সব মিতার জন্য বলে মিতার যোগ্য কবে লেখা। 'দক্ষিণ নায়কে'র শব্দরন্ধ্রে অনির্ণীত তীক্ষ্ননিশ্বাস: 'দুয়ার খুলেছে। হাওয়া চুপ। কেন জ্বলি।' তবু অরবিন্দরও ইচ্ছা সামাজিকতার, লঘু বা মধুর বিষয় তাঁর—প্রেমের কবিতা যা 'বিকেলবেলার লাল শাড়ির অতলতা' যত গভীর ততখানিই গভীব, ঘরের শাদা-সরল গল্প, ভিড়ের ভারহীন কথাবার্তা—কাটা কাটা সরল বাক্যে বলা যা ছন্দান্বিত প্রাত্যহিকের খুব অংশী। অরবিন্দর কোনো লেখাতে প্রত্যক্ষ সূত্র পাই নরেশ গুহর, যেমন অরবিন্দর সূত্র পাই কখনো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের চপল প্রকরণে।

১. 'আধুনিক কবিরাও অধিকাংশতই গীতিভঙ্গিকেই আশ্রয় করেছেন অথচ রবীন্দ্রনাথের সার্থক অতিক্রমণ সম্ভব শুধু কাব্যে নিছক গদ্যভঙ্গির ব্যবহারে। প্রাত্যহিক বাচনের ব্যবহারে। তার মানে গদ্যকবিতা নয়, গদ্যকবিতাতেও গীতির আমেজ মেশা সম্ভব—ছন্দশুদ্ধ কবিতাতে গদ্যের ঢঙ মিশানোর কৌশলটিই আধুনিক কবির অভীষ্ট হওয়া কর্তব্য।' 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'। শঙ্খ ঘোষ-সমালোচিত। কৃত্তিবাস ৩।

১ উপহার দেবে উপমার শাদা ফুল
তোমাকে আমার বিনীত কণ্ঠস্বর

'স্বর্গের স্বাক্ষর' : অরবিন্দ গুহ।

কিছু উপমার ফুল নিতে হবে নিরুপমা দেবী

'চতুরের ভূমিকায়' : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

২ আমি মূর্খ বিদূষক বলে
আমাকে দাও নি আংটি কিংবা বিশ্বাসেব স্নিগ্ধ মালা।

'বিদূষক' : অরবিন্দ গুহ।

মহারাজ, মা বাপ তুমি, যত ইচ্ছে বকো মারো।

'মহারাজ আমি তোমার' : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

যেটুকু দীর্ঘশ্বাস জমে আছে অরবিন্দব লেখায় তাকে গ্রাহ্য না কবে আমরা শেষ অবধি স্মৃতিধার্য করেছি এক-আধ ছত্র রুথলেস-রাঙ্গিম, বা এইটুকু

ভালোবেসেছিলাম একটি স্বৈরিণীকে
খরচ করে চোদ্দ সিকে।

এর সঙ্গে খুব অন্তর নেই শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়েরও। 'সুন্দবীব গান দিয়ে মুর্গি খেতে পাঁচ টাকা যথেষ্ট'—ইত্যাদি সহজেই মনে পড়ে যায়।

আর তাঁর সচ্ছন্দ-চটুল যে নাগরিকতাটুকু। বিষ্ণু দে করোটিকুটিল এবং দূরতর, সমর সেন এক-পুরুষের ব্যবহিত, ছন্দোহীন এবং মতবাদী। সমর সেনের প্রশস্তি লিখলেও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রত্যক্ষ পেলেন অরবিন্দকে, শরৎকুমারও—প্রেম-যৌনতার জোড ভেসে ওঠে কথনো যাঁর লেখায়, চপলতার নিচে নিশ্বসিত যাঁর আত্মকরুণা, শারীর আর সারাইমের আশ্লেষ। উৎপলকুমার বসু যখন লেখেন, 'সুখ বড বীর্যবতী রেখা / সর্বাঙ্গীণ কুশলতা যৌনব্যাধির মতো বাসনা কাডছে'—আত্মবোধ সে, দেবতোষ বসুও যখন লেখেন, 'মহাশয়া কবে পাবো ও হৃদয়খানি', কিংবা 'বুঝি নি চরিত্রদোষে পরিপন্থী খালি / অপরিমার্জিত কথ্যরীতি'—সে তরলিত 'ক্ষণিকা' বা সুধীন্দ্রীয় হাইনের অবক্ষয়। কিন্তু সুনীল বসুর অনেক ভঙ্গিতে ছায়া আছে এই প্রত্যক্ষসূত্রের। কিংবা নমিতা মুখোপাধ্যায়ের ব্রীডা ছেড়ে শরৎকুমারের যে স্ফূর্তি তার অনেকাংশ সুনীলের হাতে সম্ভাবিত এই কিছু-অরবিন্দায়নে, যা আসলে নরেশ গুহ-বাহিত বুদ্ধদেব বসুর অংশ। বুদ্ধদেব বসুর চপল এবং গহন দুইয়েরই প্রত্যক্ষনিশ্বাস পরে এঁরা নিয়েছেন।

এখন অচ্ছায়াতে দেখতে পাওয়া যায় স্ফূর্তির প্রহরে পঞ্চাশের কতখানি অভিভাবকতা ছিল বুদ্ধদেবের। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য পরবর্তী কালে লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের পরে বিষ্ণু দে-ই আমার কাছে প্রথম আধুনিক কবি।…বিষ্ণু দে-র অনুকরণেই আমি সে

সময় কবিতা লিখতে শুরু করেছিলাম। আমি তাঁর একজন অতি অক্ষম শিষ্য।'[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কোনো লেখাতেই সেই 'অনুকরণ' বা 'শিষ্য'ত্বের পরিচয় নেই, প্রথম লেখাতে তো নয়ই। তার কারণ বামপন্থা নয়, বিষ্ণু দে-র অনুকরণ যে-ধরনের আয়াস-অনুশীলন সাপেক্ষ সে মনোগতিই তখন তরুণদের নয়।[৩] অপরপক্ষে 'কৃত্তিবাসে'র প্রথমদিককার 'বুদ্ধদেব বসু এবং উত্তরকাল' স্বীকৃতিনিবন্ধের কয়েক লাইন উল্লেখ করি: 'বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় যৌবন এবং ছন্দ বহুবিচিত্র।—বাঙলা কবিতাকে তিনি তথাকথিত জীবনদর্শনের হাত থেকে মুক্ত করেছেন।...তিনি শুধু কবিতার জন্যই কবিতা রচনা করেছেন। দৃশ্যমান পৃথিবীকে তিনি শরীর দিয়ে স্পর্শ করেছেন এবং সেই স্পর্শেরই অনুভব আমরা তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে পেয়েছি।'[৪] কবিতার জন্য কবিতা লেখেন নি কি অমিয় চক্রবর্তী? দৃশ্য-পৃথিবীকে সর্বাঙ্গ-শরীর দিয়ে আস্বাদ করেন নি কি জীবনানন্দ দাশ? জীবনানন্দ প্রকৃতির নির্জনতা ছেড়ে তখন শহরের সংবর্ধিত কবি, পঞ্চাশের অ-নির্ণীত তখনো। অমিয় চক্রবর্তী প্রবাসী, সুধীন্দ্রনাথ থাকেন ব্যবধানে, বিষ্ণু দে সমাজমনস্কতায় চেনা শিল্পিতার তুলনায়—সুভাষ মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার সরকার নরেশ গুহ বা অরুণ ভট্টাচার্য তাঁদের যেমন অন্তরঙ্গ পর্যালোচনা করেছেন সদ্য-বেরোনো কাব্যালোচনার সূত্রে: 'সাতটি তারার তিমির' বা 'বনলতা সেন', 'অন্বিষ্ট' বা 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার', 'পারাপার' বা 'সংবর্তে'র, তার পাশে পঞ্চাশের মেধাবীতমরাও—শঙ্খ ঘোষ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত বা আলোক সরকার—একই কর্তব্যে ফিরেছেন ত্বকমাত্র ছুঁয়ে। পঞ্চাশ-সূচনার ওই সব ত্রিংশীয় কাব্যের গুণাগ্রহ বা অনুধাবন যেটুকু তখনো তা চল্লিশের, অধিকাংশ তার প্রকাশিত 'কবিতা'য়। আর সেই 'কবিতা'-পত্রিকার অনতিক্রম্য সম্পাদক, অক্লান্ত পাঠক, নিরলস কাব্যশ্রমী, আধুনিক কবিতা ও কবিদের বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থরচয়িতা, যে-কোনো বিকাশ-সম্ভাবনার অতি সহৃদয় উৎসাহদাতা, সর্বোপরি 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র অবিসংবাদী সংকলনকারী—বুদ্ধদেব বসু সামাজিক অর্থেও দাঁড়ালেন পঞ্চাশের একেবারে অব্যবধানে, শুভার্থী এবং প্রভাবকারী হয়ে। পঞ্চাশের উপক্রমে প্রকাশিত 'দ্রৌপদীর শাড়ী'র যে গুণানুবাদ দেখি অরুণকুমার সরকারের কবিতায় বা রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরীর প্রবন্ধে,[৫] এখন পড়লে ঈষৎ কৌতুক লাগে। তবু রমেন্দ্রকুমারের: বাঙলা কবিতার

---

২. দৈনিক কবিতা, বিষ্ণু দে-র ষাট বছর পূর্তি বিশেষ সংখ্যা, শরৎ ১৯৬৯।

৩. অলোকরঞ্জন অবশ্য 'বিষ্ণু দে-র উচ্চারণভঙ্গির সঙ্গে গাঢ় সহধর্মিতা' দেখতে পেয়েছেন শঙ্খ ঘোষের দ্র° কৃত্তিবাস ৯।

৪. কৃত্তিবাস ১১।

৫. 'বুদ্ধদেব বসুর কবিতা: 'দ্রৌপদীর শাড়ী'': রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী। কবিতা, পৌষ ১৩৫৯ এবং 'দ্রৌপদীর শাড়ি পাঠান্তে': অরুণকুমার সরকার। কবিতা, আষাঢ় ১৩৬০।

ভাষা ও ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন 'লাবণ্য' এবং বুদ্ধদেব দিয়েছেন 'পৌরুষ', অথবা বুদ্ধদেবের পয়ারের 'স্নায়বিক দৃঢ়তা এবং বাক্‌ছন্দের সঙ্গে সৌসাদৃশ্য' রবীন্দ্রনাথে নেই, সুধীন্দ্রনাথে নেই, বিষ্ণু দে-তেও নেই—এই তদগতি প্রত্যক্ষবাহিত হয়ে এসেছে যেন উত্তরাধিকারের রূপে। অরুণকুমার সরকারের কবিতায়

> 'কিন্তু আনন্দ কোথায়' : বুদ্ধদেব বসু বললেন,
> 'য়ুরোপের আজকের কবিতায় কিংবা উপন্যাসে ?
> রবীন্দ্রনাথকে দেখ, কী উজ্জ্বল প্রশান্ত বিশ্বাসে
> জীবন শাশ্বত জেনে মানুষকে ভালোবেসেছেন।'

এর বাক্‌ছন্দ, রবীন্দ্রনাথ, য়ুরোপের সাম্প্রতিক সাহিত্য সবার উপরে রয়ে গেছে, 'বুদ্ধদেব বসু বললেন' এই মোহরটুকু। কেবল জীবনানন্দ-অমিয় চক্রবর্তী, কেবল 'তিরিশ' বা 'চল্লিশে'র প্রতিষ্ঠা-পোষকতার উপলক্ষ্য নয়, যাবতীয় স্বীকার্য আধুনিক কাব্যপ্রয়াসের অনুমোদনস্থল তখন 'কবিতা' পত্রিকা, তার সম্পাদক নিঃসংশয়িত তখনকার কাব্যরুচির নিয়ন্তা। বুদ্ধদেব বসুর মনোনয়ন সেই মুহূর্তে 'তরুণ কবি'র সরকারি পাশপত্র, একসময় যার জন্য তিরিশের কবিরা মুখাপেক্ষা করেছেন রবীন্দ্রনাথের।

অতএব বুদ্ধদেবের উপরে তরুণ কবিদের যে নির্ভর তিরিশের আর কারো পরেই তা নয়, সমর সেন-বিষ্ণু দে-র বৈদগ্ধ্য এমন কি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জনজয়গৌরবও সে ক্ষেত্রে পরাভূত। হয়তো সে আরো একটু আগে থেকেই। অরুণকুমার সরকার যখন বুদ্ধদেব পাঠ করে প্রত্যয়িত হন, 'আশৈশব কবিতাকে ভালোবেসে বুঝেছি প্রেমেই / রূপ, কল্পনার, তথা কবিতার আদি বাসস্থান' তাকে কেবল 'চল্লিশের শাগরেদি' ভাবলে ভুল হয়। 'যে-ছেলে কবিতা লিখে কবিতাকে ছুটি দিচ্ছে' তার 'আত্মবিস্মৃতি'তে ক্ষোভ করেছিলেন বুদ্ধদেব।[৬] সেই অপচয়ের পথে পা বাড়ান নি তরুণ কবি। যে কবিতা 'নিজের মনে গুনগুন করবার নয়, আগাগোড়াই চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে সর্বসমক্ষে চিৎকার করবার' তাকে অস্বীকার করে লিখেছিলেন, 'যে-দুঃখের অনুভূতি জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন, যা একলার, যা নির্জনের সেটাই অসামান্য। সেটা যত তুচ্ছ হোক, কিংবা কাল্পনিকই হোক, বিশুদ্ধ কবিতার জন্ম হয় তা থেকেই।'[৭] সেই বিশুদ্ধতায় স্পৃহা করেছিলেন তরুণ কবি। সামাজিক-রাজনীতিক প্রত্যক্ষতার মুখে বুদ্ধদেব যখন স্বনিরোধ রচনা করেছেন কলাকক্ষে, 'কবিতা'-পত্রিকার এক পাঠক আশঙ্কা করে লিখেছিলেন, 'শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর সামাজিক অস্তিত্ব, তার পরবর্তী উৎক্রমণের সঙ্কটস্থানে এসে রাষ্ট্রিক

৬. 'সুকান্ত'। কবিতা, আষাঢ় ১৩৫৪।
৭. 'এলিয়ট ও কিপলিং'। কবিতা, আশ্বিন ১৩৫২।

আর্থিক সংঘাতে চৌচির হয়ে ফেটে যাচ্ছে'। লেখনীর মুখে মুখে জীবনচেতনা রক্ত হয়ে দেখা দিয়েছে: শিক্ষিত বাঙালীর intellect এক বৃহত্তর জীবনাধিকারের যুক্তি-সমর্থন খুঁজে পেয়ে চেষ্টা করছে তার emotionয়ের সঙ্গে মেলাতে। কাব্যে জেগেছে যুগপ্রসবিনী ব্যথা। এ হেন অবস্থায়, রবীন্দ্রযুগের বিরোধীশক্তিধর আপনার লেখনী, আপনার জীবন যেন এক আশ্রমবাসিক পর্বাধ্যায় রচনা না করে।'[৮] এই তরুণ কবিদল তাঁকে পরিবৃত করেছিলেন তাঁর সেই আশ্রমবাসিক-পর্বে।

যে প্রবর্তনা ছিল তাঁর কাছে, নিশ্চয় তেমন আর কোথাও ছিল না। পঞ্চাশের শুরুতে যখন তিরিশের কবিদের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র সংগ্রহ বেরোতে শুরু করেছে একে একে, আশুফলপ্রসূ হয়ে উঠল বুদ্ধদেবের সংগ্রহখানি। উত্তরকালে শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

> ১৯৫৩ সাল। বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা সবেমাত্র বেরিয়েছে। ইন্দ্র দুগারের আঁকা কলকা দেয়া নয়নাভিরাম প্রচ্ছদ, ভেতরের মসৃণ সুগন্ধ পৃষ্ঠাগুলি পরিপূর্ণ হয়ে আছে রাশি রাশি সরল সুন্দর আবেগময় কবিতায়। সদ্য যৌবন প্রাপ্ত একটি বালককে অভিভূত করেছিল এই সব। পাতা উলটে যেখানেই চোখ পড়ে, আটকে যায় দৃষ্টি। অদৃশ্য কিন্তু স্পর্শগ্রাহ্য একটি মেয়ের অস্তিত্ব সে টের পায়, যে তার অনালোকিত অনিশ্চয়তাময় ভবিষ্যতের দিনগুলি যুঁই আর বকুল ফুলে ভরে দেবে। কী ভালো যে তার লাগে, সে বলতে পারে না।
>
> বয়ঃসন্ধির জ্বালা ও যন্ত্রণা এবং যৌবনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ তাঁর কবিতাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বাংলাদেশের সব যুবকদের হয়ে বুদ্ধদেব বসু তখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সুন্দরীকে প্রেম নিবেদন করছেন।[৯]

অন্তর্বর্তী-পঞ্চাশের কাব্য 'যে-আঁধার আলোর অধিকে'র সূত্রে লিখেছেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত: যে নারীবন্দনা বা নারীদেহবন্দনা 'বন্দীর বন্দনা'য়, বা 'কঙ্কাবতী'তে, 'যে-আঁধার আলোর অধিক'এ তারই রূপান্তরিত অভিব্যক্তি। শিল্পের জন্যই যে শিল্প, এই কলাকৈবল্যবাদ, তার অন্যতম বিষয়। 'একই থীম ও বিষয় বুদ্ধদেব বসুর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে অনেক বেশি আবেগগ্রাহ্য ও উচ্ছ্বাসপ্রবণ কিন্তু 'যে-আঁধার আলোর অধিক'এর কবিতায় তা মূলত বুদ্ধিগ্রাহ্য ও ধারণা-নির্ভর।' 'আরো একটি সূত্র' এই বক্তব্যের সঙ্গে যোগ করেছেন প্রণবেন্দু: 'যে আঁধার আলোর অধিক'এর 'অধিকাংশ কবিতাই একটি প্রধান থীমের অন্তর্গত ;...এই প্রধান থীম বা বিষয়-সূত্র হল: প্রকৃতি ও

৮. সুধাংশু চৌধুরী। কবিতা, চৈত্র ১৩৫৩।

৯. 'বুদ্ধদেব বসু: কবি'। দৈনিক কবিতা, বুদ্ধদেব বসু-সংকলন ১৯৭৪।

শিল্পের সম্পর্ক।...অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের তুলনায় 'যে-আঁধার আলোর অধিক'এর আবেদন অনেক বেশি বুদ্ধিগ্রাহ্য ও ধারণা-নির্ভর। বুদ্ধদেব বসু দর্শন বিরোধী, এই তথ্য স্বয়ং লেখকই একাধিকবার ঘোষণা করেছেন, এবং এই খবর বহুলাংশেই নির্ভুল। কিন্তু 'যে-আঁধার আলোর অধিক'এর রচয়িতা সম্পর্কে এই উক্তি পুরোপুরি খাটে না।' এবং অতঃপর যে সিদ্ধান্ত লিখেছেন,

> 'যে-আঁধার আলোর অধিক'এর প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই বাঙলা কবিতার একটি আবহাওয়াগত পরিবর্তন ঘটেছিল। যাঁদের আজকাল 'পঞ্চাশের কবি' বলা হয় তাঁদের অনেকেই এই গ্রন্থের দ্বারা জন্মান্তরিত হয়েছিলেন...[১০]

এর 'অনেকেই' শব্দটি পূর্বাপরপরিচিত বটে—প্রেমের কবিতা লিখতে তরুণ সান্যাল তুষার চট্টোপাধ্যায় বা অমিতাভ দাশগুপ্ত যে বুদ্ধদেব-স্পৃষ্ট হন নি তা বলা যায় না, কিন্তু যে রূপান্তর-পরিণাম, বা দার্শনিকতা, লক্ষ্য করেছেন প্রণবেন্দু তা কতদূর নজর করেছিলেন এই 'অনেকেই' এবং উজ্জীবিত হয়েছিলেন তার দ্বারা, বলা শক্ত। পরিণতি-কবিতাতেও শরৎকুমার দেখতে পেয়েছেন, 'ন তু ন কো নো দি ক্ চি হ্ন য়, এই সব কবিতার মধ্যে আমরা সেই পরিচিত প্রিয় কবি বুদ্ধদেব বসুকেই দেখতে পাই। কিছুটা নিঃসঙ্গ, কাতর। যৌবনের স্মৃতি নিয়ে বিভোর, তুফান ফুরোলেও যে-যৌবনের কাঁপন থামে না।'

২

আপাতত শান্তিকল্যাণ হয়ে আছে পঞ্চাশের প্রথম প্রহরটুকু। অনিসর্গী কবিরাও অনুমান করে নিয়েছেন শব্দ-ভিড়-অদূষিত সবৈর্ব প্রকৃতির, বিনতিময়ী প্রেমিকার। তাঁদের জগতে আবার দেখা পাই ঈশ্বরের—আদিপ্রকৃতির স্বপ্নোত্থ বা কাব্যন্যায়বিধাতৃ যদি নাও হন, সকল কালক্ষোভের সামনে বরাভয়ধারী শান্তম্। 'নিয়ো-রোম্যাণ্টিক' বলে উল্লেখ করেছিলেন তরুণ মিত্র সমসাময়িক ইংরেজি লেখা, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত এখানকার উপলক্ষ্যেই দাগ দিয়েছেন সেই পরিভাষা, 'কবিতায় নিয়ো-রোম্যাণ্টিকতার আবহাওয়া এখন আর অনেক কবির কাব্যেই আত্মগোপন করে নেই।'[১১] বলতে পারি সহজ-রোম্যাণ্টিক, 'সহজ' কথাটি কেবল অলোকরঞ্জনেই নিঃশেষিত নয়। নম্র প্রণামের মতো যেন নিত্যদিনের কবিতাচার, জীবনের দুঃখ আর রহস্য মেনে নিয়ে অমল অসংশয়ে

১০. 'যে-আঁধার আলোর অধিক' প্রসঙ্গে'। কলকাতা, বুদ্ধদেব বসু-সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৬৯।

১১. 'আধুনিক ইংরেজ কবি': তরুণ মিত্র। শতভিষা ৪। এবং 'সেনেট হলে কবি-সম্মেলন': প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত। কৃত্তিবাস ৩

চলেছে 'সহজতা'র পথস্রোতে যে পথে সহজ বিশ্বাসে যায় নিসর্গজগৎ: 'ওরা তো নিশ্বাসে বোঝে ঈশ্বরকে, কত যে সহজে / পাপিয়া চন্দনা টিয়া ওরা এক নিশ্বাসেই বোঝে / সত্য কোন পথে যায়…' সে কেবল দৈবশ্লিষ্টও নয়, শুধুই প্রাকৃতিক: 'যেন কিশোর আনন্দের রৌদ্রময় সবুজ ঘাসের পাখি / এবং সেই জারুলগাছ মাটির ঘরের সহজ বন্ধুতায়', কেবল

> ডাহুক কোথা দুপুর নিয়ে ঘোরে
> ধুলোর রেখা জড়াতে চায় ফুল,
> একটি ছবি কোথায় গড়ে—কেউ
> ভালোবাসায় দিগ্বিজয়ী হল ;

'ভূমিকা' : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

কিংবা আরো একটু ঘন হয়েছে রাগচ্ছায়াটুকু

> কাজলের মতো কেউ ঢিল ছোঁড়ে দুপুরের চন্দনের জলে।
> নিচু হয়ে উড়ে গেল বেনেবউ। ঘাটের কাছেই কিছু টলে।
> সুরমার বিয়ে হবে জষ্টি মাসে, তাই বুকে সাবানের ফেনা তুলে
> ঘষছে, নাড়ছে, যেন স্তন দুটো স্বচ্ছ শ্বেত পদ্মের পাপড়ি।

'চন্দনবিল' : সামসুল হক

কোথাও স্ফটিক হয়ে জমেছে দুঃখ-নস্‌টালজিয়া, তারাপদ রায়ের 'মায়ের জন্যে' 'জননী জন্মভূমিশ্চ' 'ঠাকুমার ছবি'—মনে পড়ে এই সব উদাস-আকুলিত সরল লেখা, কিংবা সহজ সম্ভাষণ করে উঠেছেন যেখানে অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়: 'ছোটবেলাকার নাম বলো, সহজিয়া!' যদি বড হয়ে ওঠে বিচ্ছেদ-অগৌরব, যেমন এই 'এইটুকুই আমার মাত্র গৌরবের / শ্রাবণধারামুখর কলরবে / আমি অসীম বিরহী, আমি স্পষ্ট দুঃখের' সে অধ্যাত্ম-বিষাদ—শঙ্কর-রামানুজাচার্যের নয়, আধিভৌতিক নয়। আর সন্তোষ তাঁদের। প্রেমচাতুরির পূর্বসূত্রটুকু বিস্মৃত হয়ে যেন পেয়েছেন সদ্য-স্পর্শমণির মতো ভালোবাসা

> ১ আকাশ দূরান্ত রাধা, আমি
> মাটির বিষণ্ণ মথুরায়
>
> ২ আহা মুখটি যেন ছবিটি
> প্রিয় বড সুখেই আছি
>
> ৩ এক মুহূর্তে তুমি আমার বুকে
> বৃষ্টিমুখ মেঘের মতো জাগো
>
> ৪ সারাটা পৃথিবী তুমি রেখে গেছ স্মৃতিচিহ্ন করে…
>
> ৫ দিঘির মতো শরীর তার নরম জলে ভরা…

৬ এলোমেলো পাতার ছায়া তোমার প্রিয়ার মুখের উপর
চন্দনের মতন…

৭ আমি জানি প্রতিমার মতো এই নীল মুখ তুমি দেখবে না…

৮ তোমার নামে যে নদী বয়, যে কথা হয় ভোরবেলার বকুল,
আমি তাদের কাছে ঘুরে বেড়াই মনে-মনে।

৯ তার রূপের পাখি সুখের হল না…

১০ ক্ষেতপাপড়ি ঝাউয়ে বাতাসে নাচে
বিন্দিঘাসে ধুলোর সকাল বাঁচে।
সোহাগ জ্বালে পাগল সঙ্গ তোব ॥

১১ কেন নদীর অন্ধকারে এত গোপন কথা বলা ?
জলেব টানে ভাসে আমার অন্ধ করুণ ভালোবাসা।

১২ তোমার ভালোবাসা ভোরের কথাকলি।

১৩ ভুলি নি ধুলোয় ধোঁয়ায় আলোয় ছায়ায়
রেলিঙে হেলানো তুমি ভুলি নি।

১৪ সকল তারার আলো পরস্পর মেলামেশা করে
প্রেমার্ত চিন্তার মতো, পবিত্র চিন্তার মতো হয়ে।

১৫ পাশের অবাধ্য চুল গালে ঠেকে, পপি-র আঘ্রাণ :
উড়ে চলো, উড়ে চলো—সময়ের সীমা কতদূর ॥

কারো সীমা নয় দিগন্তের একটুও কম, মনে হয় আলাদা করে চেনবারও প্রয়োজন নেই।

আলাদা করে বলতে হয় তবু কয়েকটি নাম। যেমন 'ভিন্ন বৃক্ষ ভিন্ন ফুল' কাব্য বা সুনীলকুমার নন্দী তার কবি : শালশিরীষের ফ্রেমে-বাঁধা অপস্রিয়মান একখানি গ্রাম দেখি যাঁর লেখায়, পিছুটানের মতো ; দীপঙ্কর দাশগুপ্ত : কাঁটার মৃণালে ঘেরা স্থির নীলপদ্ম তাঁর প্রেমের বিগ্রহ, 'হায় রে অন্ধ হরিণ, বন্ধ / করেছো নয়ন, দেখো নি চেয়ে' একসময় প্রিয় পংক্তি ছিল তরুণদের, এখনো অগ্রন্থিত ; শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় : 'অলকদামের মতো কবিতা আচ্ছন্ন করে আছে' যাঁকে ; 'ময়ূখ'-পত্রিকার প্রতিশ্রুতিবান স্নেহাকর ভট্টাচার্য, বা 'কে জাগরী'র কবি শক্তীন্দ্রনারায়ণ দেব ; শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায় যাঁর উৎসুক কল্পনা আবিশ্বভূগোলে সঞ্চরমান ; অসিতকুমার ভট্টাচার্য : 'বাতাবরণ' প্রকাশ করবার পর প্রচ্ছন্ন হয়ে গেলেন, কিংবা পরমেশ ধর, গ্রন্থায়ত না হতেই ; রবীন আদক, পরে বের করেছিলেন 'অগ্নিপাটের শাড়ি' ; অনিরুদ্ধ কয়ের, গৌরীশঙ্কর দে-র, সুনীলকুমার ভট্টাচার্যের লেখা এখন দেখি কদাচিৎ ; কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, নিখিলকুমার নন্দী, শক্তিব্রত ঘোষও এখন বুঝতে দেন না কতখানি সমর্পিত ছিলেন কবিতায় ;

ফণিভূষণ আচার্য: কৃত্তিবাস-প্রকাশনীর তৃতীয় বই হয়ে বেরিয়েছিল যাঁর 'ধূলিমুঠি সোনা'; রেখা দত্ত, শিপ্রা ঘোষ: স্নিগ্ধ কবিতার দুই কবি; রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, প্রফুল্লকুমার দত্ত: একজন মধুররসপ্রিয় অপরজন বাস্তবঘনিষ্ঠ; সুরজিৎ দাশগুপ্ত: যাঁর 'দ্বিতীয় পৃথিবী'র দুই সংস্করণ বেরিয়েছিল অত্যল্প ব্যবধানে, পাণ্ডিত্যের গদ্যে যাঁর দ্বিতীয় যশ; সাহিত্যের সাত-সমুদ্রের নাবিক 'একান্তর' কাব্যের কবি মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কৃত্তিবাসে'র আদি-সম্পাদক দীপক মজুমদার: স্বল্পতম কবিতার লেখক বলে যাঁর খ্যাতি; প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় এবং ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়: নম্র সৌন্দর্যের রূপকথা যাঁদের প্রথম লেখাতে। পঞ্চাশের কবিদের অন্তত তিনটি পর্যায় আছে যার আদ্যংশ কাছাকাছি চল্লিশের, যার মধ্যবর্তীদের টানতে পারি আলোক সরকার থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এই পরিসরে, তৃতীয় ভাগের কেউ কেউ নাম লিখিয়েছেন পরের দশকে যদিও সময় বা স্বভাব কোনোদিকেই অপঞ্চাশী নন, যেমন সামসুল হক বা মণিভূষণ ভট্টাচার্য। আরো আছেন। সর্বাংশেরই কোনো কোনো নাম আজ নাম মাত্র। অনেকে নষ্ট মৃত প্রব্রজিত বা বিস্মৃত। পঞ্চাশের যাবতীয় নাম এবং লক্ষণ বিধৃত করে শান্তি লাহিড়ী এক 'বাংলা কবিতা' সংকলন করেছিলেন ষাট-দশকের মাঝামাঝি। 'পঞ্চাশ'-কৌতূহলীদের জন্যে সে বই একমাত্র আজ ভরসাস্থল।

সুকৃত সুমিত সচ্ছন্দ যে এঁদের লেখা সে প্রাথমিক লক্ষণ। অনভ্যস্ত শব্দের-সংস্কারের প্রতিবন্ধ নেই, হয়তো অসমাজী হবার কুণ্ঠায় কবিতাকে রাখতে চেয়েছেন অনুচ্চ সমতলে। তবু, ভালোবাসা, মগ্নতা, সহজাচার শুনতে যাই সহজ হোক এর কোনোটা তো সমতলের নয়, প্রতিদিনের জীবনচর্যায় তাকে বাঁধতে ছিন্ন হয়ে যেতে হয় দিনানুদিনের সমাজবন্ধ থেকে। অতএব, ঘুরছেন কখনো মধ্যবিত্ত গার্হস্থ্যের অনুকম্পায়ী, শাদামাটা গল্পের প্রকরণে—নিজে যাই হোন। অলোকরঞ্জন যে তাঁর গল্প নিয়ে গিয়েছিলেন শৈলজানন্দের দৃষ্টান্ত-সুরভিত সাঁওতাল পরগণায়, আনন্দ বাগচীর কাব্যোপন্যাসের রোমান্টিকতা যে লাভ করেছিল রবিবাসরীয় গল্পের পথ্যান্তর সে নিজেকে খণ্ডিত করে নয়, সমতলের সঙ্গে একটা সহজ সংযোগ বানিয়ে নেবার অভিলাষে। এই ইচ্ছাটুকু তিরিশ বা চল্লিশের তুলনায় নতুন, তার পূরণ-পদ্ধতিও। নাট্যগূঢ় কবিতার শৈলীও মধুসূদনের আমল থেকেই আছে, সুধীন্দ্র-বুদ্ধদেবও তার ব্যবহার করেছেন, কেবল গূঢ় অপসারণ করে নিলেই যদি সুসামাজিক হওয়া যায়, পঞ্চাশের প্রথমাবধিই দেখি সেই যত্ন-প্রবণতা। পঞ্চাশের গোড়ার কবিতাতে ছন্দের সাধনা যদি না দেখা যায়, দেখা যাবে সাবলীলতার অনুশীলন।

শঙ্খ ঘোষ 'কৃত্তিবাসে'র প্রথম সংকলনে যখন 'সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা'র বিষয়ে লিখেছিলেন, 'এখনকার কবিতা পাঠের সময় বারবার 'চণ্ডিকা' দেখতে হয় না কিংবা

কোথাও কোনো ইংরাজি কবিতার প্রতিধ্বনি অথবা গূঢ় উল্লেখ আছে কি না ভেবে মাথা চুলকোতে হয় না' সে মুখ্যত চল্লিশের কবিদের কথা মনে করে, কিন্তু ওইটুকু চল্লিশ-লক্ষণ পঞ্চাশেরও। অরুণকুমার সরকার নির্ণয় করেছেন প্রত্যক্ষ লক্ষ্য করে কয়েকজন কবিকে

তাঁদের কারুর রচনাতেই জৈব-যন্ত্রণা নেই, অথচ একটা মৌল জীবন-বেদনায় তা ওতপ্রোত। আধুনিক জীবনের বাইরের উপকরণ—যন্ত্র, শহর, শোষিতের সংগ্রাম, বিকৃত যৌনাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি, এঁদের কাব্যের উপজীব্য নয়। অথচ একটা সুস্থ মানব-সম্বন্ধের উত্তাপ এঁদের কবিতায় সার্বজনীন। স্পষ্টতই সমাজের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে অন্য এক বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন। কোন উৎস থেকে, কী ভাবে—সেটা সমাজতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয় হতে পারে কিন্তু নিঃসন্দেহেই এটা চেঁচিয়ে বলবার মতো একটা সদ্‌গুণ। যাঁদের যৌবনকাল অসার রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তেজনায়, অনেক অবদমন এবং ততোধিক অপচয়ের বিশৃঙ্খলায় সংশয়ে যন্ত্রণায় অপব্যয়িত হয়েছে, এ কালের তরুণ কবিদের প্রশান্তি তাঁদের কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এঁদের রচনার সম্মুখীন হলে বুঝতে পারা যায় স্বাভাবিকতার কোনো স্থির সংজ্ঞা নেই; সভামিছিল এবং শায়াশেমিজের পিছনে ছোটাই সকল কালের সব যুবকের স্বধর্ম হতে পারে না। কিন্তু তাই বলে এ কালের কবিরা কেউই কিছু চিন্তাহীন আশাবাদ নিয়ে বোকার স্বর্গে বাস করছেন না, মনের যে অসুখ না থাকলে কবিতাই লেখা যায় না তার লক্ষণ এঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই বিগুমান, এবং এঁরা কেউই ভূদেব মুখুজ্যের নতুন সংস্করণ নন। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির ভিতর দিয়ে আগের যুগের কবিরা যেখানে এসে পৌঁছেছিলেন, কালধর্মে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূলতায় সেখান থেকেই এঁদের যাত্রা শুরু হয়েছে। তাই আধুনিক হবার প্রয়োজনে এঁদের কাউকে নালা নর্দমায় স্নান করতে হয় নি, নৌকো পুড়িয়ে দেবার ভাণ করতে হয় নি, আশ্রয় নিতে হয় নি উপরচালাকির। এঁদের কবিতার স্বাভাবিক এবং সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছন্দ-নৈপুণ্য এবং ব্যাকরণগত বিশুদ্ধি। আমার মতো একজন ছিদ্রান্বেষীও অনেক চেষ্টা করে এঁদের কবিতায় কোনো ছন্দোঘটিত ত্রুটি আবিষ্কার করতে পারে নি। লক্ষ্য করবার বিষয় এঁরা কেউ তথাকথিত গদ্যকবিতা লেখেন না, এঁদের কবিতা রীতিমতো ছন্দোবদ্ধ; এবং বাক্যগঠনে কথিত গদ্যের অনুসারী হয়েও এঁদের অনেকেই বিনা দ্বিধায় কাব্যিক শব্দ ব্যবহার করে থাকেন।

'বাংলাকবিতার একটি স্বতন্ত্র ধারা': অরুণকুমার সরকার, শতভিষা ১৮, ১৩৬৩।

এক দশক পরে 'শতভিষা' ব্যক্ত করেছিলেন কী ছিল তাঁদের সেই সময়ের লক্ষ্য:

> সময়ের হাতে তিরিশের দশকের কবিদের ব্যবহৃত কৌশলগুলির দিন যে ফুরিয়ে গিয়েছে 'শতভিষা' তা উপলব্ধি করেছিল ; তিরিশের দশকের কবিদের যৌন-কাতরতা, মূল্যবোধে অনাস্থা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, অতিরিক্ত সমাজ-ভাবনা, তরল কাব্যময়তা ইত্যাদি আপাতলক্ষণগুলি যে আর ব্যবহৃত হবার নয় এ-সত্য অভ্রান্ত জেনে কবিতার মুক্তির জন্য 'শতভিষা' প্রয়োজন অনুভব করেছিল নতুন পথ-সন্ধানের।
>
> 'সম্পাদকীয়' : শতভিষা ৩৩, ফাল্গুন ১৩৭২।

তিরিশের 'কাব্যের মুক্তি'র পরে এই পঞ্চাশের 'কবিতার মুক্তি'। অতিক্রম্য তিরিশের কবিরাই, কারণ চল্লিশের কবিদের তাঁরা বিবেচনা করেছিলেন তাঁদেরই অগ্রজ সতীর্থ যাঁদের কেউ কেউ লিখছেন তাঁদেরই কথামুখ, যে ক্ষেত্রে চল্লিশের কবি নিজেদের পরিচয় লিখেছিলেন 'তিরিশের কবিদের গুণগ্রাহী পাঠক এবং দ্বিতীয়ত উত্তরসাধক হিসেবে।'[১২]

তিরিশের বন্ধনমুক্ত হয়ে কী আয়ত্ত করতে চেয়েছিলেন কবিরা? খণ্ডকালের সংশয়-ছায়া ঘোচানো শাশ্বত কবিতা? অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত 'যৌবন বাউলে'র উৎসর্গ-কবিতায় লিখলেন, 'মৃত্যু এসে বাঁধুক ঘর / ছন্দে, আমি কবিতা ছাড়ব না', সন্দেহ হয় সে তখন উদ্ধার করে আনবার, শান্তি লাহিড়ী তাঁর 'বাংলা কবিতা' সংকলনের সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন, 'বাংলা কবিতার পঞ্চম দশক পুনরধিকারের, পুনরর্জনের, পুনরুজ্জীবনের মাহেন্দ্রমুহূর্ত', অতএব অন্তর্বর্তী সময়টুকু তাঁদের কাছে 'অন্ধকার যুগ'। কিংবা ঘুম, বা আত্মবিস্মৃতি। অলোকরঞ্জন সোজাসুজি বলেছেন : 'আবার জীবন'—

> এক হাজার বছর পর জান্‌লা খুলে দেখলাম আমার টগর গাছ স্থির দাঁড়িয়ে আছে,
> আমার কবর খোঁড়া হয় নি এখনো, কোনো কবর ছিল যে বলে মনে তো হল না;
> ফুট্‌ফুটে ছোট্ট ছেলেটা এক অমিত উদ্যান খুঁজে পথ ভেঙে আল ভেঙে পথ হেঁটে যাচ্ছে,
> আর কী যে রোদ কী যে রোদ্দুর কী যে রৌদ্র, মাঠের উপর মগ্ন ঘাসের ঘটনা।

রোদ, রোদ্দুর, রৌদ্র, শত নামে বলেও আনন্দ ফুরোয় না যা আসছে সঞ্জীবন-উল্লাস থেকে, প্রত্যহের দিনটি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে একই সঙ্গে সুর এবং বর্ণের ইচ্ছায়, কবিকে আলঙ্কারিক বিপর্যাসের আশ্রয় নিতে হচ্ছে বলতে

> 'সংগীতে রঞ্জিত হব' এই মাত্র ইচ্ছের স্ফটিকে
> ঠিক্‌রে পড়ে যৌবনের প্রাত্যহিক আলো, ফুল ফোটা
>
> 'ধানে গানে বসুধায়' : শঙ্খ ঘোষ।

ঘরকুনো কবির ঘরে শত পথে ঢুকে আসছে ঐশ্বর্য-প্রকৃতি

> সাত রঙের জানলা হাজার আকাশ

১২ 'চল্লিশের চোখে চল্লিশের কবিতা'। অরুণকুমার সরকার। দৈনিক কবিতা, এপ্রিল ১৯৬৮।

আবার কাছে এলো যেন
বৃষ্টি-পড়া দিনের নিবিড় শ্যামল মমতায়।

'কিশোর কবি' : আলোক সরকার।

যৌথ, পৌনঃপুনিক ব্যবহারে এত বড় প্রত্যক্ষ আবেগও যদি হয়ে ওঠে অনুজ্জ্বল প্রবণতা, তাতে বনে ওঠে সার্বজনীন ছাঁচ, কবির পরীক্ষা হয় কিন্তু তার জন্য আবেগটিকে দায়ী করা যায় না। এই সময়কার প্রভূত কবিতার সামান্য চারিত্র আলোক সরকার স্থির করেছিলেন 'মনোময়তা ও সংগীতসংহতি' বলে, একজন অংশী-পঞ্চাশীর আত্মবিচার এই সামাজিক ভাবে: 'কবিতা লেখা যেন সহজ হয়ে গেছে, সর্বত্রই বেশ খুশি-খুশি পরিতৃপ্তির চেহারা। তার মানে এই নয় যে, আমরা আশাবাদী কবিতা লিখছি, বরং উল্টোটাই তো সত্য, দুঃখের কবিতার সংখ্যাই বেশি, কিন্তু দুঃখই হোক আর অন্য যা কিছুই হোক,...যেন প্রায় যান্ত্রিক ভাবে একটি যন্ত্রণার কবিতা লিখে উঠে, আমরা পরীক্ষার খাতা যথাস্থানে তুলে দেবার আগের চঞ্চলচোখে মোক্ষম অংশগুলোর দিকে তাকিয়ে ছাপাখানা বা সম্পাদক-বন্ধুর হাতে তুলে দিই।'[১৩] ফলে, এই কবিতার আরেকটি যে আপতিক-চেহারা, সংরক্ষিত হয়ে আছে জ্যোতির্ময় দত্তের 'আধুনিক কাল ও বাংলা কবিতা' নামে প্রবন্ধে। কয়েকজন পঞ্চাশের কবি এই লেখারও উপলক্ষ্য। লেখাটির আরো গুরুত্ব এটি 'কবিতা'য় পত্রস্থ বলে, আদি ১৯৫৬য়। প্রাসঙ্গিক স্থল থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি :

> ভেবেছিলাম এঁদের কবিতা হবে তারুণ্য না হোক ছেলেমানুষিতে ভরা; বয়সোচিত স্পর্ধা, ঔদ্ধত্য ও ভুল প্রত্যেক পাতায় লক্ষ্য করব, প্রচলিত ধারণাগুলিকে তাঁরা বার-বার প্রশ্ন করবেন, একটুও স্বস্তি দেবেন না কখনো। এবং অপরিণতির ভুল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পূর্বলক্ষণ হয়ে দেখা দেবে ..
>
> কবিতাগুলি পড়বার পরও বিব্রত বোধ করছি, কিন্তু অন্য কারণে। পূর্বগামীদের আধুনিকতার বদলে এঁরা নতুন কোনো আধুনিকতা আনেন নি, তাঁদের ভাষা-চেতনার বদলে নতুন কোনো চেতনার জন্ম দেন নি, এঁদের কবিতার ধারণা জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু বা বিষ্ণু দে-র ধারণা থেকে স্বতন্ত্র নয়। দুঃসাহসিকতা এবং বয়সোচিত বিদ্রোহের বদলে এঁরা সামাজিক ছাঁদ নির্বিবাদে মেনে নিয়েছেন। এঁরা জন্মাবার আগে থেকেই যেন প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন।...।
>
> এ যুগের কবিদের প্রত্যেকে অদ্ভুতরকম বিদেশবিমুখ। তাঁদের মধ্যে সমস্ত

১৩. 'কয়েকটি কবিতার বই'। শতভিষা ২২। এবং 'সাম্প্রতিক কবিতা' : প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, শতভিষা ২৪।

যুগ ও সমস্ত পৃথিবী তোলপাড় করে নিজেদের কাব্যচর্চার আদর্শ-সন্ধানের উৎসাহ প্রায় দেখাই যায় না। বাংলাদেশে যখন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে শুধু ইংলণ্ড নয়, ইওরোপের প্রধান-প্রধান কবিদের রচনা অনুবাদ করে সারা ইওরোপকে আমাদের ঘরানা করে তুলেছেন, তখন বিস্মিত হয়ে আবিষ্কার করি আমার সমবয়সীরা ইয়েট্‌স্ কি এলিয়টের সবচেয়ে কাঁচা লেখা বেছে নিয়ে 'অনসূয়া-বিজয়া সংবাদ' কিংবা 'La figlia che piange'র অনুবাদ করছেন।

এতে দুঃখিত হবার কারণ থাকলেও বিস্মিত হবার কারণ হয়তো নেই। ঠিক যেমন এই প্রতিষ্ঠিত কবিদের দ্বারা অনূদিত কবিতা ও কবিদের বদলে অন্য কোনো বিদেশী কবি কিংবা কবিতার যুগ আমরা নতুন করে খুঁজে পাই নি, ঠিক তেমনি নিজের দেশের কোনো কবি কিংবা যুগও আবিষ্কার করতে পারি নি আমরা। এবং তার কারণ, এঁদের কাব্যাদর্শের বদলে আমরা নিজেদের হয়ে কোনো নতুন শিল্পধারণার জন্ম দিই নি। বিষ্ণু দে কিংবা সুধীন্দ্র দত্তর আধুনিকতা হযতো আমার বয়সের কবিদের কাছে এখনো অত্যাধুনিক। শিল্পে এখনো আমরা হয় 'সমাজবাদী' নয় 'আনন্দবাদী'।

এই আদি-সমালোচনার অনেক যুক্তিই খণ্ডনযোগ্য, সমালোচক নিজেও আলোচ্য কবিদের স্বতন্ত্র-উল্লেখ স্থলে নিজের বিরুদ্ধতা করেছেন। কিন্তু এই আলোচনা পড়ে—সবটাই যে অচ্ছিদ্র শান্তিকল্যাণ নয়, এটুকু প্রতীয়মান হয়। যৌবনের স্পর্ধা-দুঃসাহস কি নেই এই কবিদের? 'আমার যৌবনে তুমি স্পর্ধা এনে দিলে', 'দুঃসাহসী হও, ভালোবাসো, / জানাও তোমার প্রেম লজ্জাহীন লম্পটের মতো'—এই স্পর্ধা, কিংবা 'যে কোনো বৃক্ষের দেহে আমি এনে দিতে পারি দৃপ্ত, পুষ্পভার'—এই ঔদ্ধত্যও তো দেখেছি। নয় বটে যেমন দেখেছি 'জলের পুরাণ'এ: 'পৃথিবীতে আছি আমি ছাব্বিশ বছর, / অথচ ঘটে নি আজো বিস্ফোরণ, আগুনের ঝড়!' 'সমাজবাদ' বা 'আনন্দবাদে' কি সঙ্কুলান হবার নয় আধুনিক শিল্পধারণার? 'পূর্বগামীদের আধুনিকতা' কি এমনই সেকেলে হয়ে গেছে যে সে আর কাজে লাগবার নয় নতুন-আধুনিক কালে? তা হলে ওই 'সেকেলে'-আধুনিককেও ছুঁড়ে ফেলে কবিরা যে আবাহন-বন্দনা করতে গেলেন সনাতনীর সে কি সময়বিস্মৃত হয়ে? সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এক দণ্ড বিশ্রান্ত কাটাতে এলেন 'আর্কেডিয়া'য়, এসে লিখলেন, 'আমিও চাই অমনি না হয় একটা বিকেল / অনাধুনিক হয়েই রইলুম কেই বা দেখছে'। যত বড় পুরাণ হোক, যতখানি আশ্রয় হোক—এই অনাধুনিক থেকে পঞ্চাশের কবিতার দ্বিতীয় মুক্তি যে আসন্ন হয়ে উঠেছে তা লক্ষ্য করা গেল ষাট-দশকের উপকণ্ঠে আসতেই।

৩

এক কবি জানালেন, 'চতুর পাখির মতো উড়ে গেছে পাতায় রুপোলি'। 'চতুর' শব্দ খর শব্দ নয়, তবু লক্ষ্য হয়। শোভন সোম লিখলেন 'রাক্ত শহরে'র বর্ণনায়

দেখ দেখ, প্রকৃতি পালাচ্ছে দ্রুত পায়
বৃক্ষলতামাঠপাখিদৃশ্যের প্রসার ওই আঁচলে লুকিয়ে।

কেবল কি প্রকৃতি ? 'এই উনবিংশ ষাট সালে / হৃদয় আমিষ দষ্ট, রক্ত নষ্ট…'। সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর লেখায় শুনতে পাওয়া গেল, 'পৃথিবীর সমস্তাপীড়িত এ সময়ে / শুধু পতনের শব্দ…'। কিছু একটা ওলোটপালোট হয়ে গেছে নিশ্চয়—পটভূমিকায়, জীবনধারণায়, কিন্তু সে কী স্পষ্টত ? কবিরা লিখছেন একআধ-ছত্র ছিন্ন প্রতিক্রিয়া, অভিমান: 'মা গো আমার খেলার পুতুল অনেক দিন হারিয়ে গেছে / সমস্ত ঘর এখন একলার' যে হয়ে গেল সেই অভিমান, 'নিষিদ্ধ কোজাগরী'র, যৌথ এক 'গোলাপ'-প্রতীকে লিখে রাখা দিব্য রূপ-রিক্থের প্রত্যাহারী যে অভিমান—সারারাত অনিদ্র গোলাপ, 'শোও জানলা খোলা থাক বাতায়নে যেও না গোলাপ', 'কখনো বঁধুর কানে রোজ রাত্রে একই গোলাপ / আবৃত্তি কোরো না' 'গোলাপ এমন করে পথে পথে ঘুরো না প্রত্যহ' 'এ গোলাপ ঝরে যাবে, যাবে না কি…', ক্ষোভ : ভ্রংশ-লাগা আপন গোলাপটির বিরুদ্ধে, 'আমার গোলাপ তবু বিহ্বল ধুলোর নিরুপায়ে / কাঁটার রক্তাক্ত ক্ষোভ ব্যাপ্ত করে অনিঃশেষ জ্যোতির দহনে'—'কাঁটার রক্তাক্ত ক্ষোভ'—যেন অন্তর্গত সময়-আলেখ্য; 'নিগ্রোদের মতো অভিমান করি, অভিমানের স্পষ্ট শব্দ'—যেন সতথ্য হল নিপীড়িত-নিগ্রোর ইতিহাস-যোগে. তবু বিষতীর বেঁধা মুহূর্তটির প্রথম শিল্পায়তি যেন এই কবিতায়

হয়তো গন্তব্য ছিল সূর্যলোক কিংবা আরো দূর গ্রহান্তরে
ডেকে নিয়ে এলো তাকে আমাদের বিষণ্ন পল্লব,
ভাবে নাই, অনভিজ্ঞ, এখানে ঝরনার কণ্ঠস্বরে
গরল লুকিয়ে থাকে, নরক ছড়ায় তিক্ত ফুলের সৌরভ।
হে নীল নক্ষত্রপুঞ্জ, তোমাদের প্রেরিত শয়তান
অগণন শিশু মেরে জুতোর পাহাড় গড়ে তোলে,
অথবা টুকরো ক'রে বাড়ি ভরা নগরের গান
মাথা রেখে শুয়ে পড়ে মদিরা কি রক্ষিতার কোলে।
তবু ওরা চলে আসে। কার জন্য ? কালের প্রপাত
যেখানে ভাসিয়ে আনে দুশো কোটি মানুষের ভিড়,
পৃথিবীর ধূমায়িত যুদ্ধক্ষেত্র কিংবা তার নীড়,

চাকরি, প্রেম, গণৎকার, বৈড়াল সংঘাত।

'গন্ধরাজ' : রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী।

চল্লিশের স্নিগ্ধ, বৌদ্ধ কবি রমেন্দ্রকুমারের এই অভ্যুদয় হল ষাটের উপক্রমে। হল 'কৃত্তিবাসে'র কবি রূপে, কিন্তু অচিরে নিবাস নিলেন তিনি একান্ত গুহায়, 'আরশি-নগরে'র শিল্পশ্রম অফলিত হয়ে রইল।

সময় ঘূর্ণিত হয়ে উঠেছে চারপাশ বিভ্রান্ত করে, যেন হঠাৎ টের পাওয়া গেছে কেউ আর খাপ খাচ্ছেন না জ্ঞানে-ধ্যানে-প্রথায়-পশ্চাৎপটে, যেন অনাদিবহতা জীবন হঠাৎ বিশ্বাসভঙ্গ করে ঠেলে দিয়েছে পদাশ্রয়টুকু—অনাচার ষড়যন্ত্রে, আর সেই 'অনীশ তরঙ্গে'র মুখে স্রস্ত-দিশাহারা হয়ে গেছে তাঁদের জীবন, শব্দ-বন্ধ, ঘন হয়েছে পাপ-অবিশ্বাস—রুখে দাঁড়িয়েছেন, ভাঙতে চাইছেন সব কিছু পরিপার্শ্বের, অথবা যে ভাবে বলেছেন শঙ্খ ঘোষ : 'এক স্পর্ধিত ভয়ঙ্করতার মধ্যে উন্মত্ত ছুটে চলেছেন…', এখানের খবরকাগজে তার কোনো ছাপা নেই—বোমা বিপ্লব, কিংবা দর্শনচিন্তার কোনো বিপর্যয়। তা হলে কি দেশাতীত আন্তর্জাতিকতার সূত্র যাকে আধুনিকতার অবশ্যশর্ত বলে উল্লেখ করেছিলেন জ্যোতির্ময় দত্ত? তবে কি বোদলেয়ার? বুদ্ধদেব-বাহিত? 'মাতাল মাতাল হও, বোদলেয়ার দিলেন বিধান'—এই বিধান? সুররিয়ালিজম্? আরাগঁ বলেছিলেন, সে হল হতবুদ্ধিকারী চিত্রমালার উন্মাদ আবেগময় বিনিয়োগ। পঞ্চাশ-দশকের শেষে ক্যালিফোর্নিয়ার তরুণ কবিদের 'বীটনিক'-আন্দোলন পৌঁছেছিল বৃটেনে, ষাটের শুরুতে অ্যালেন গিন্‌স্‌বর্গ এলেন কলকাতায়, সৌহার্দ্যবদ্ধ হলেন কোনো কোনো তরুণ কবির সঙ্গে। বিলিতি 'ক্রুদ্ধ যুবা'দের কার্যকলাপ, কলিন উইলসনের একখানি বই 'আউটসাইডার' সেও পৌঁছেছিল। এঁদের credo বা তত্ত্ব ছিল সুব্যক্ত, তার পিছনে হাইডেগার-সার্ত্রের দর্শন-নির্ভরও ছিল—এঁরা যথার্থ পৃথিবীকে দেখতে পেয়েছিলেন অনির্ধারিত 'কেঅস'-রূপে, এঁদের বাঁচা অতীতভবিষ্যৎহীন কেবল প্রত্যক্ষ-মুহূর্তের বাঁচা, আত্মাহীন দেশকালের পাপে-অবিশ্বাসে এঁরা বিক্ষত, সমস্ত প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এঁদের আস্থা 'ভায়োলেন্সে' এবং ধ্বংসে। ব্লেক-বিচলিত গিন্‌স্‌বর্গ উদ্‌গ্রাহী কবিদের যে ভাবে বিচলিত করলেন তাতে ব্লেকের দিব্যোন্মাদ আছে না আর কিছু, সে নির্ণয় করবেন কাব্যজ্ঞেরা, ওপরসা দেখা গেল তাঁরা আর দর্শন-চিত্রণের ব্যবধানে নেই সেই উন্মাদনার, যেন নিজেরাই পর্যবসিত হয়েছেন পরিস্থিতি হয়ে। 'দৈনিক কবিতা' গিন্‌স্‌বর্গের প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, 'অতি-আধুনিক কবিদের একাংশ এঁর দ্বারা প্রায় স ম্মো হি ত হয়েছিলেন।' সেই গিন্‌স্‌বর্গকেও বীট-গোষ্ঠীর চরমতম প্রতিবাদ বলে গণ্য 'হাউল'এ দেখা যায় মুহূর্তের সঙ্গে দ্রষ্টার দূরত্ব : 'I s a w the best minds of my generation destroyed by madness, starving hysterical

naked,…'। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় প্রথমত পরিসর হয়েছিল এই অতি-আধুনিকতার। দেখা গেল 'কৃত্তিবাস'-উপচিত হয়ে সেই অদ্ভূত প্রমত্ততা জন্ম দিতে চলেছে এক 'ক্ষুধিত প্রজন্মে'র 'ক্ষুৎকাতর কবিতা'র। 'হাংরি-জেনারেশন' বা 'হাংরিয়ালিস্ট'দের সঙ্গে ছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু, মলয় রায়চৌধুরী, বিনয় মজুমদার, সমীর রায়চৌধুরী এই সব পরিচিত কবিরা। মলয় রায়চৌধুরী 'স্বপ্ন'-সংকলন করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায় গিন্‌স্‌বর্গের কবিতার অনুবাদ। কিন্তু মুখ্যতর ভাবে তাঁরা লিখতে চেয়েছিলেন তাঁদের 'inexorability of poetic violence', 'ক্ষুৎকাতর বুনো অসভ্য মুখোশহীন সত্য'। 'কৃত্তিবাসে'র সঙ্ঘ ছিল কিন্তু সংবিধান ছিল না। মলয় রায়চৌধুরী লিখেছিলেন 'হাংরি-জেনারেশনের কাব্য-দর্শন'। কিন্তু তার আগে ষাট-সূচনার 'দেশ'-পত্রিকায় ১৯৬২ সালে 'দুই বসন্তে' নাম দিয়ে যে আধুনিক কবিতার বিবরণী লিখেছিলেন শঙ্খ ঘোষ, তার থেকে তার প্রাক্‌মুহূর্তটির উল্লেখ করি। এই ভাবে আছে ছবিটি: 'বিগত কয়েক বছরে কবিরা যেন আবার একটি দুঃসাহসী অনুপ্রবেশে প্রস্তুত, …অনভ্যস্ত এই প্রবেশের প্রথম অভিঘাত তাঁদের ঈষৎ বিভ্রান্ত করে দেবে এ হয়তো স্বাভাবিক, তবু তাঁদের দিশা হারানো আর দিশা নির্ণয়ের প্রবল পদক্ষেপগুলি এক নূতন আয়োজন সৃষ্টি করেছে আধুনিক কবিতায়।' অতঃপর:

> এই এক-বছরের কবিতায় সবচেয়ে লক্ষ্যগোচর ছিলেন তিন তরুণ কবি: শক্তি চট্টোপাধ্যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। এই নামগুলি কবিতাপাঠকের মনে পড়ে এ-জন্যে নয় যে এঁরা সবচেয়ে বেশি লিখেছেন অথবা সবচেয়ে ভালো (কেন না ভালোমন্দের বিচার—বিশেষত কবিতার ক্ষেত্রে—জনে জনে বড়ই ভিন্ন), মনে পড়ে এই জন্যে যে অতি তীব্র দ্যুতিতে বাঙলা কবিতার ইতিহাসে এই তাঁরা অধিকার অর্জন করে নিলেন। সম্ভবত সেই জন্যেই এঁরা একই সঙ্গে আজ সবচেয়ে বেশি প্রশংসিত ও আক্রান্ত।

'তোমারে শাসাতে আমি বাদে / এগিয়ে আসে না কেউ' বলে সমস্ত চূর্ণ করে দিতে যেন এগিয়ে আসেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কেন না 'আমি মুক্তি মানে বুঝি / তোমার বুকের পরে. বসে থাকা: গায়ে থাবা গুঁজি / তোমার জগতে যেন কুমোরের মতন গম্বুজে।' এই তাঁর শিল্পের অভিজ্ঞতা, এই এক স্পর্ধিত ভয়ঙ্করতার মধ্যে উন্মত্ত ছুটে যাওয়াতেই তাঁর বিশ্বাস। বস্তুত তিনি বিশ্বাসহীন নন, এক মহাসর্বনাশেই তাঁর বিশ্বাস, ও-ই তাঁর অরণ্যের ছবি। বিশ্বাসহীনতার এই ভয়াল বিশ্বাসে শক্তি এখন আর একাকী নন, সাম্প্রতিক কবিতার একটি ধারাই এই বিশিষ্টতায় চিহ্নিত হয়ে উঠেছে, 'নামহীন আঁধারে অস্তিত্বভ্রষ্ট।'

কিন্তু সুনীল আছেন এক আততায়ী জগতে, যেখানে থাকার অভিপ্রায় তাঁর

নয়। ভ্রষ্ট অস্তিত্বের ওই নির্মমতা থেকে মুক্তি নেই এই তিনি জানেন, অথচ 'যেখানে রূপ গেল সব রূপান্তরে', মাঝে মাঝে সাধ যায় সেখানে যাবার। তাঁর রচনা বিদায়ের, স্মৃতির, প্রত্যাখ্যানের, আত্মপীড়নের। তাঁর 'চতুর্দিকে প্রতিধ্বনি বিদায় বিদায় বিদায়' কেন না কিছুতেই শেষ পর্যন্ত অস্তি-তে পৌছনো যাবে না— মেফিস্টোফিলিস কেবলই দ্রুত ছুটে এসে জানিয়ে দেবে 'এক-পা উপরে গেলে বাঁ-হাতের উল্টোপিঠে মারব তোকে বিষম তুফান!' তার পরেই আর্ত পতন। আর এই পতনের কাছে নত ভাঙা বেদনার জন্যেই কি তাঁর কবিতায় শয়নের চিত্র এত ফিরে ফিরে আসে? অস্তি ও নেতি-র সংগ্রামজাত এই যে পীড়ন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায় এক রক্তাভাব সৃষ্টি করেছে, সেই লক্ষণও আজ আর বিচ্ছিন্ন চিহ্ন নয়, বরং এই বেদনাই আমরা এখন সবচেয়ে বেশি বিকীর্ণ দেখতে পাচ্ছি কবিতাজগতের চতুর্দিকে।

শক্তির পিছনে এবং সুনীলের চতুষ্পার্শ্বে বাঙলা কবিতাব যে ধারা 'নামহীন আঁধারে অস্তিত্বভ্রষ্ট' এবং 'অস্তি-নেতি-র সংগ্রামজাত পীডন'বেদনায় সমাচ্ছন্ন, তার বাইরে ছুটি স্বতন্ত্র নাম আছে এই লেখাতে। একজন অলোকরঞ্জন, আছেন 'শুদ্ধ ব্যতিক্রমে'র মতো, অপরজন আলোক সরকার, 'তাঁর শব্দ-ব্যবহারের এক আপন-রীতিও তাঁকে এক গোপন আবরণের মধ্যে রেখে দেয়, যেন তাঁর কবিতা সকলের সামনে আসবার জন্যেই নয়।'

এঁদের লেখা, এবং পূর্বশ্রুত আরো কোনো কোনো পঞ্চাশের লেখা, হয়তো অতঃপর আর সকলের সামনে আসে নি। জ্যোতির্ময় দত্তের তিরস্কার 'কবিতা'র অনুচ্চ পৃষ্ঠায় কেবল ঘনিষ্ঠদের নেপথ্যকৌতূহলভোগ্য, 'দেশ' পত্রিকায় শঙ্খ ঘোষের মুহূর্তনির্ণয় সঞ্চারিত হয়েছিল আসন্ন এবং আগামী পাঠক অবধি।[১৪]

'সকলের সামনে আসবার'ও এক লক্ষ্য এই যে নতুন কবিতার, সে সেই তিরিশ বা চল্লিশের গণসংযোগআস্পৃহা নয়, লোকবৃত্তোজ্জীবনের নিঃসম্পর্কিত, কবিতা মাত্র সম্বল করে সে দাবি করছে পাঠকের মন এবং প্রীতি, আধুনিক কবির যা অস্বপ্নদুরাশা—জয় করে দিচ্ছে কবিকে। তিরিশের কোনো কবিই সকলের সামনে আসেন নি, চল্লিশের কোনো জনজয়ী অসংশয়িত হন নি কবির পদবিতে। এঁরা হাত দিলেন দুয়ের বিরোধ-নিষ্পত্তিতে। রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষের থেকেই যেন পরিস্ফুট হতে শুরু হল কাললক্ষণ, তার

১৪. জ্যোতির্ময় দত্তের একজন অন্তত পাঠকের প্রতিক্রিয়া 'কবিতা' মুদ্রিত করেছিলেন। পত্রলেখক লিখেছিলেন: 'যে-সাহিত্য 'বনলতা সেন', 'সংবর্ত' বা 'পালা-বদলে'র মতো কাব্যগ্রন্থে ভাস্বর, সেখানে এ ধরনের ক্রমিক অবনতি দেখে নৈরাশ্য এড়ানো যায় না। কবিতা-লেখা শিক্ষার প্রয়োজন তাই স্বীকার না করে উপায় নেই।' কবিতা, আশ্বিন ১৩৬৭।

পরের এক রবীন্দ্রজন্মস্মৃতিদিন উপলক্ষ্য করে 'দৈনিক কবিতা' বেরোতে শুরু হল যুগপৎ হুগলি আর কলকাতা থেকে, দিনের বিলম্বও ধৈর্যাতীত বলে বেরোতে লাগল 'কবিতা-ঘণ্টিকী'—ঘণ্টায় ঘণ্টায় ছাপা কবিতা।[১৫] ষাটের শেষ দিকে অমিতাভ দাশগুপ্ত যে কাব্য-সংকলন প্রকাশ করেছিলেন তার মলাটে মুদ্রিত ছিল শ্লোগান : 'খবরের কাগজের মতো কবিতা পড়া হোক। কবিতা থেকে জল আর ধোঁয়া একেবারে কেটে যাক। শুচিবাই ও অস্পৃশ্যতা থেকে কবিতা মুক্ত হোক। কবিতা খাওয়া-পরার মতো ব্যবহারিক হয়ে উঠুক।' তার আগের প্রয়াস ঈষদ্ভাবে তা হলে সন্ধান করতে হয়।

প্রাথমিক-পর্বের দুটি কাব্যালোচনার থেকে উদ্ধৃত করি সমালোচকের চোখে লাগা কবিতার নিহিত পদ্ধতি :

১ শব্দের ধ্বনি নিয়ে যে সব মূল্যবান পরীক্ষা সাধারণত তরুণ কবিরা করে থাকেন তেমন কোনো চিহ্ন সুনীলবাবুর কবিতায় আমি পাই নে। তাতে তাঁর কাব্যে অসঙ্গতি কিছু দেখা যায় না। সহজ, সাধারণ বিশেষণ তাঁর পক্ষে প্রয়োগ অন্যায় হবে, বলা উচিত সরল কবিতা রচনায় তিনি দক্ষ। তাঁর মেজাজ যে অনুরূপ তার প্রমাণ, একটি 'মুড'এর চেয়ে, কোনো গল্পের ইঙ্গিত অবলম্বনে রচিত কবিতার সংখ্যা এই গ্রন্থে অধিক। এই কারণে তাঁর অধিকাংশ পদ্যই নায়ক-নায়িকা নির্ভর। 'তুমি' 'তোমাকে' 'আমি' 'আমাকে' ইত্যাদি ব্যক্তিস্বাক্ষর-যুক্ত শব্দ তিনি অধিক ব্যবহার করেছেন। এ সব কবিতার স্বাদ ভিন্নতর, এতে আমাদের দম আটকিয়ে আসে না, হয়তো ভাবনার জন্ম দেয় না, কিন্তু একটা স্বস্তি পাওয়া যায়। জানি 'মনোরঞ্জন' কথাটি খারাপ, তথাপি বলতে বাধ্য হচ্ছি এ কবিতা আমাদের মনোরঞ্জন করে।

'একা এবং কয়েকজন' : কমলেশ চক্রবর্তী-সমালোচিত, উত্তরসূরি, পৌষ ১৩৬৫।

তাঁর কাব্যশক্তি বহুপ্রসূ। আধুনিক কবিদের মধ্যে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন-প্রিয়তাও অনন্যসাধারণ। এর সবচেয়ে বড় কারণ, যখন আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে নালিশ সবচেয়ে প্রবল তখনই শক্তি আধুনিক কবিতার কফীহাউসে প্রবেশ করলেন সুবোধ্যতম কবিতা হাতে নিয়ে। শুধু সুবোধ্য নয়, সুশ্রাব্যও। অনেকদিন পর কবিতা-কষ্টের মধ্যে অভ্যস্ত পীড়িত পাঠক শক্তির কাছে পেলেন এক অপ্রত্যাশিত প্রায়-অবিশ্বাস্য ছন্দে প্রত্যাবর্তন। ছন্দ ও আধুনিক কবিতার মধ্যে যে অহিনকুলটি

১৫. হুগলির কাগজটি হল 'কবিতা দৈনিক' কলকাতার : 'দৈনিক কবিতা', বিমল রায়চৌধুরী, শান্তি লাহিড়ী সম্পাদিত। অরুণকুমার ঘোষ দুয়ের পার্থক্য দেখাতে লিখেছিলেন, ' 'কবিতা দৈনিক' দৈনিক কাব্যপত্র, 'দৈনিক কবিতা' দৈনিক কবিতার সংবাদপত্র।' কবিতা দৈনিক ৩১।

এতদিন শার্দূলের মতো বেড়ে উঠেছিল শক্তি প্রথমেই তাকে বধ করলেন ছন্দের তীক্ষ্ণ অব্যর্থ তীর ছুঁড়ে। মিলের চাতুর্যে পাঠকের উপবাসী শ্রুতি সম্মোহিত হল; শক্তি তিরোহিত আবেগকে ডেকে আনলেন কবিতায়, বসালেন কবিতার প্রথমে, শেষে, সবখানে। এ যেন বিদ্রোহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ঠিক প্রত্যাবর্তন নয়, কিন্তু অনেকখানি পশ্চাদপসরণ নিশ্চয়ই। এই পশ্চাদপসরণে সম্মত হয়েই তিনি আধুনিক কবিতার ভূখণ্ড জয় করলেন। ছন্দের দিকে মুখ না ফিরিয়ে হৃদয়ের দিকে মুখ ফেরানো প্রায় অসম্ভব ছিল। শুধু ছন্দ নয়, মিলও। তিনি পাঠককে বুদ্ধি-চর্বণের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিতে চাইলেন। দেখাতে চাইলেন, সহজিয়া কবিতা দিয়েও আধুনিক কবিতা রচনা করা সম্ভব। বাঙলা কবিতার পুরোনো অভ্যাস—ছন্দ, মিল, এমন কি কাব্যিক কথাগুলি পর্যন্ত তিনি নির্লজ্জা ও সাহসের সঙ্গে কবিতায় স্থান দিলেন—'প্রিয়' 'প্রিয়তমা' 'কেহ' 'খুলিয়াছে' 'ডুবিয়াছিল' 'ডাকিয়া' 'এ জনমে' 'খুলিতে' 'দেয় নাই' 'পুরাতন' 'লিখিও' 'বিবাহ'। বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দের হাত ধরে তিনি আধুনিক কবিতার সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করেন। আধুনিকতার মধ্যে অনাধুনিকতা, এও এক ধরনের আধুনিকতা, এর মধ্যেও নতুনত্বের স্বাদ আছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় আধুনিক কবিতার কুট্টিমে বসে প্রথমেই পাঠকের সঙ্গে এই ভাবে আত্মীয়তা পাতালেন, আধুনিকতার প্রতি অ্যালার্জি ভেঙে দিলেন। 'চয়নিকা' 'সঞ্চয়িতা' 'বনলতা সেন'এ যাদের রুচি হয়েছে তাদের কাছে তিনি অধিক কোনো দুরূহ শর্ত আরোপ করতে চাইলেন না, এবং প্রথম রাউণ্ডেই তিনি জয় লাভ করলেন।

'জিরাফ-নক্ষত্র-সোনার মাছি' : জগন্নাথ চক্রবর্তী, লেখা ও রেখা, আশ্বিন ১৩৭৪। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রথমাবধিই কাজে লাগিয়েছেন তাঁর গল্প বয়নের প্রতিভা এবং বলা যায় বুদ্ধদেব বসুর জনসংবেদন-সম্ভাবনা—'মায়াবী টেবিলে'র স্বেদে-তিতিক্ষায় যা পরাহত হয়ে ছিল। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের আপাতশৈলিতে প্রতিফলিত জোড়কলম জীবনানন্দ-সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সফল বাচনাংশ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম লেখা দ্বিতীয় বইয়ের কবিতায় নতুন দৃশ্যাভাস রচনা করেছে, এবং অসংবৃতি-স্থলেও লাভ করেছে ঘনত্ব, কিন্তু শক্তি চট্টোপাধ্যায় 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো' থেকে উত্তরোত্তর পরিহার করেছেন তাঁর আত্মার্জিত রচনাঘনত্ব, যে সাহজিকতার তিনি স্বতঃ-স্বভাবী তাকে ব্যবহার করেছেন মাত্র তুক্ রূপে। বহুযশস্কর তাঁর লিরিকের প্রায়-অনুরূপ অর্থহীন এবং সমধিক সুনিপুণ লিরিকলেখার জন্য রবীন্দ্রপার্শ্ববর্তী কবিদের আমরা দণ্ডিত-অপাংক্তেয় করে এসেছিলাম—সেই অভাব-আকাঙ্ক্ষার শূন্যস্থান ফুলমুকুলিত হয়ে উঠল তাঁর হাতে। অমুখাপেক্ষী তাঁর স্বলক্ষ্য কবিতার চূড়া তাঁর

ভ্রমণডায়েরি কবিতায়—মনভ্রমণ বা বনভ্রমণ, 'সোনার মাছি' বা 'হেমন্তের অরণ্যে'র নিশিপাওয়া সমুনাম্বুলিস্ট মগ্নতা। তবু, স্বপ্নার্ত সেই পরাবাস্তবতা, কিংবা আস্বাদময় তাঁর গুরুচণ্ডালী, কিংবা ধ্রুবাঅনুবৃত্তিময় তাঁর প্রণালীঅভ্যাস—সব নিয়েই তিনি দ্রব করে তুললেন পাঠকচিত্ত। যেমন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি'র স্যুর্‌রিয়ালিস্ট প্রবলতা পাঠককে নাড়িয়ে দিল প্রায় উৎসবউন্মাদনায়, পুনরুক্তিময় তাঁর চারপাশের অগ্নিকাণ্ড প্রতীয়মান হল বন্‌ফায়ারের মতো ফাগ-ব্যাকুলিত। পূর্ণ ষাট-দশক জুড়ে এঁরা যে পঞ্চাশের সবচাইতে সিগ্‌নিফিক্যাণ্ট কবি শঙ্খ ঘোষের এই পূর্বাভাসিত সিদ্ধান্ত এঁরা প্রমাণ করতে চললেন অবিসংবাদিত রূপে।

ব্যক্তিগত কাব্যকৃতির এই পরিচয়। তা হলে উল্লেখ করতে হয় আরো কোনো কোনো ব্যক্তিকৃতি। যেমন সুনীল বসুর কবিতা যা ছন্দহীন লাইট ভার্স কিন্তু অন্তঃস্রোতের মতো তার নিচেকার আত্মবেদনা। জলদস্যু ফার্নাণ্ডিজের গল্প আছে ঝুলিতে—সুনীল বসুর, কমিক-'বাহানা'য় তছনছ করে দিতে পারেন কপট সুস্থিতি, আবার বুকে কান পেতে শান্ত হয়ে বসেন এক দণ্ড। শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ও সহজ লঘুতায় পার হয়ে যেতে যান দৈবানুবদ্ধ রতি বা নারীর তীক্ষ্ণচ্ছায়া, কথ্য আলাপচারিতে ঢাকা দিতে যান হৃদয়ের ক্ষয় বা ফাটল : 'বহুদিন আমি আপস করতে চেয়েছি / যৌবন, তুমি আমার কষ্ট বোঝো নি'। গাঢ়তর হয়ে ওঠেন কখনো সচকিত। সামাজিক এবং অস্তিত্বনিয়তির বেদনালাবণ্যে ভরা কবিতা সিংহের 'সহজ সুন্দরী', 'কবিতা পরমেশ্বরী' দুখানি বই—ছন্দে-মানসিকে পুরোনো আখড়াই ঘরানার রঙ-স্মৃতিরেশ আছে কবিতা-র লেখাতে। তারাপদ রায় যাঁর 'অন্নদা হালদার' বলে বিশেষ একটি লেখা উল্লেখ করি :

তেঁতুল গাছের নিচে কয়েক বছর শুয়ে থেকে
গায়ে তেঁতুলের গন্ধ, ভৌতিক আয়েজ চোখে নিয়ে
অন্নদা হালদার শেষে ঠিক আর-দশজনের মতো
কলকাতায় ফিরে এলো। কলকাতার গলদঘর্ম ট্রামে
গ্রামের তেঁতুলগাছ মজা পচা বাকল শিকড
দেডশো বছরের ছায়া, গাঢ় কটু টক গন্ধভরা
সন্ধ্যারাতে মামদোর হাসাহাসি, গহন কোটরে
তক্ষক সাপের বাসা খেঁকশিয়ালের আনাগোনা
অন্নদা হালদার হাসে—ভৌতিক চাহনি মেলে দিয়ে
এর কান শুঁড় নাক কেটে, চাদরের ফাঁক দিয়ে···

শহর এবং আধুনিক পরিস্থিতির মুখে গ্রামীণ মানুষের সরলতা আর বিভ্রান্তির উপকরণে বানানো এই সরসতা পাঠককে প্রসন্ন করে তোলে মুহূর্তে। এবং এই তাঁর সূচনা-দাগ ৮

উল্লেখ করতে হয় 'পুরী সিরিজে'র উৎপলকুমার বসুকে, পোষ্টমভার্ণ আধারমুখ্যতা প্রস্তুত করতে বসেছিলেন দক্ষ হাতে। জ্যোতির্ময় দত্ত যাঁর লেখায় রূপকথা আর আধুনিক কণ্ঠের পরমা মিলন ঘটে গোপন কুশলতায়। বিনয় মজুমদার, প্রকৃতি আর মানুষের অন্বয়ে দিনানুদিনের ফুটে-ওঠা ঝরে-যাওয়ার অক্ষর নিয়তি ভরে আছে যাঁর পয়ারবন্ধে। সুধেন্দু মল্লিক যাঁর শান্ত ও সাত্ত্বিক কবিতাতে ফুটেছিল স্নিগ্ধ ব্যতিক্রম। উল্লেখ করতে হয় উজ্জ্বল কোনো কোনো নাম—অমিতাভ দাশগুপ্ত বা শিবশম্ভু পাল, মানস রায়চৌধুরী, দেবতোষ বসু, শান্তি লাহিড়ী, রণজিৎ সিংহ, নবনীতা দেবসেন বা শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। মঞ্জুলিকা দাশ যিনি পঞ্চাশের প্রথম মৃত্যুশোক, কিংবা দিলীপকুমার সেন, দ্বিতীয় অপঘাত। দীপক মজুমদার : যাঁর অন্যূন চারটি কবিতা রক্ষা করতে পেরেছেন শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় 'এই দশকের কবিতা' সংকলনে। বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত। রঞ্জিত সিংহ, 'সমুদ্র-শর্বরী' থেকে 'অদৃষ্টচর', তারপর 'অন্যায় মৃগয়া'য় উত্তরোত্তর সন্ধান করেছেন আপাতসমাজের কাব্যবন্ধ।

তবু সময়টি দলগত—যাকে বলে আন্দোলন-মনা। বুদ্ধদেব বসু শেষ পর্যন্ত পরিচয় দিতেন 'কল্লোলে'র কবি বলে, যদিও 'কল্লোল' কবিতার কাগজ ছিল না, তার কাব্যৈষা ছিল না। 'কৃত্তিবাসে'র ছিল। 'কৃত্তিবাস' বেরিয়েছিল 'বাঙলা দেশের তরুণতম কবিদের মুখপত্র' হয়ে কিন্তু প্রথম সম্পাদকীয়তেই তার আকিঞ্চন এইরকম : 'আসল কথা হল তরুণদের একটি গোষ্ঠী বা দল গড়ে ওঠা'। সমগ্র পঞ্চাশ এই দল ছিল নির্বিশেষ, ষাটে পৌঁছে দানা বেঁধে উঠল স্বধর্ম। তাতে ঝুঁকলেন চল্লিশেরও কেউ, নব্য-ষাটেরও অনেকে এবং নতুন কবিতার এক বৃহদংশ গ্রহণ করল যৌথকণ্ঠ।

কী ছিল চারিত্র তার ? শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'এই দশকের কবিতা'র ভূমিকায় লিখেছেন, 'এই তীব্র, উদাসীন, উন্মত্ত, ধীমান, ক্রুদ্ধ, সম্ভ্রান্ত, ক্ষুধার্ত, শান্ত, ভয়ঙ্কর, মগ্ন, চতুর, সৎ, ভূতগ্রস্ত, ধার্মিক ও অতৃপ্ত কবিদের সমারোহ আধুনিক কালের পৃথিবীর তাবৎ কাব্যাদর্শকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে কেবলমাত্র কবিতার জন্য বেঁচে থাকা ও সকল সময় কবিতার মধ্যে অবস্থানের সঙ্কল্প বুঝি বা নূতন।' এর ঈষৎ কাব্যভাষা :

১ শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম, শুধু কবিতার
জন্য কিছু খেলা, শুধু…
কবিতার জন্য এত রক্তপাত…

'শুধু কবিতার জন্য' : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

২ "প্রতিদিন কবিতার যৌবন যাচাই প্রতিদিন
শব্দের কষ্টিতে ধ্বনি ঘষা প্রতিদিন
দগ্ দগে সোনার ছড় ফুটে ওঠা চাই প্রতিদিন

কবিতা কবিতা করে ওষ্ঠাগত প্রাণ…

'প্রতিদিন' : কবিতা সিংহ।

এত 'রক্তপাত', 'ওষ্ঠাগত প্রাণ' যার জন্য, সে কবিতা কেমন? তা কি কতকাংশে জানতে পারব হাংরি-জেনারেশনের ম্যানিফেস্টো থেকে? তার চোদ্দটি সঙ্কল্পের অন্তত তিনটি উল্লেখ করি

আমাদের কবিতায় আমরা যা চাইছি তা মোটামুটি এই :

১ আমার সম্পূর্ণ আমিত্বের বর্বর আবিষ্কার।…

৩ কবিতায় আমাকে ঠিক সেই মুহূর্তে আটক করে এক্সপোজ্ করে দেওয়া যখন আমি কোনো-না-কোনো কারণে ফেটে পড়ছি আর আমার ভেতরদিকটা বেরিয়ে পড়ছে।

৭ গদ্যছন্দ ও পদ্যছন্দ উভয়েই অবলুপ্তি ঘটিয়ে একটা স্ট্রেট-ফরোয়ার্ড নিজস্ব ডিকশনের ব্যবহার যা ধাঁ করে ঢুকে যাবে যাকে কম্যুনিকেট করা হচ্ছে তার মেজাজে।

সঙ্কল্প যে কক্ষেরই হোক, প্রবণতা হাওয়ামণ্ডলের। তার চাইতে প্রত্যক্ষতর আরো কাব্যকর্ম। কেমন সে কবিতা? সর্বভারমুক্ত অনন্য-কবিতা সেই কবিতা, তার জন্য অবলম্বন অনপচিত সম্পূর্ণ-আবেগ, তার জন্য প্রয়োজন আশু-অশাসিত শব্দ এবং অ-তর্কিত কবিত্ব-প্রসিদ্ধি, তার জন্য প্রয়োজন কাব্য ও পাঠকের বিষয়প্রকরণের সংস্কার ভেঙে দেয়া, তার জন্য প্রয়োজন আদর্শ এবং সন্ত্রাস পিঠোপিঠি ছড়িয়ে আসা প্রথায়-সংস্থায়, তার জন্য প্রয়োজন প্রবল জনআনুকূল্য, তার জন্য প্রয়োজন এই লেখাকে অনন্য যুগসাহিত্য বলে প্রতিষ্ঠা করা—এতখানি পর্যায়ক্রমিক সমাধান সহজ নয়, বোধকরি প্রচলিত কবিকর্মও নয়, কিন্তু এক কবি যে লিখেছিলেন 'তোমাকে ঘনিষ্ঠ করি গাণিতিক নিয়মের মতো' সেই নির্ভুল গাণিত-পদ্ধতিতে যেমন প্রেমিকাকে তেমনি কবিতাকে আয়ত্ত করে নিতে অগ্রসর হলেন কবিরা। অলোকরঞ্জন লিখেছিলেন, 'কবিদের মধ্যে একটি সংখ্যাগরীয়ান্ অংশই জেনেছেন আর পাঁচটি বাণিজ্যের মতো কবিতার ক্ষেত্রেও নগদপ্রাপ্তি বাঞ্ছনীয়',[১৬] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখাতেও পাই : 'এবার কবিতা লিখে আমি চাই পনটিয়াক্ গাড়ি' বা 'কবিতা লিখেছি আমি চাই স্কচ, সাদা ঘোড়া, নির্ভেজাল ঘৃতে পক্ক মুর্গির দু ঠ্যাং শুধু, বাকি মাংস নয়··'। কেবল তত্ত্ব বা এই দিনস্বপ্ন নয়, প্রকৃতই তৎপর হতে দেখা গেল কবিদের নগদ আদায়ে।

তাঁরা ভাঙতে লাগলেন—প্রথা সমাজ পুরোনো শব্দবন্ধন : 'সমুদ্যত রোষে শিল্প পদাঘাত করো', 'ভাঙো, চুরমার করো ওই তৃষ্ণাহীন শব্দের পাহাড়', 'চাই লাথি',

১৬ প্রতিক্রিয়া ৩৯, আষাঢ় ১৩৭৩।

দেবতাকে পার করে দিলেন 'শেয়ালদা বা হাওড়া গিয়ে সি-অফ করে', প্রেম এবং প্রেমিকাকে বানালেন 'অস্থি-মজ্জা-মাংস'সার, 'অধর চুম্বনে তার গলিত শবের গন্ধ, ক্রিমিকীট…', প্রাকৃত-মানুষের নিকট হবার জন্য মেনে নিলেন 'স্বেচ্ছাচারী ভাষা' নয়, প্রাকৃত জবান : 'ব্রাদার তোমার গান…', 'গোলি মারো ! আজকাল হচ্ছো ঘোর রোমান্টিক ‥', 'হ্যালো প্রেম, ভালো আছো…', ডাক দিয়ে বললেন : কবিতা বানানো 'সিগারেট ধরাবার মতো সোজা। কিছু অনুভবের ধোঁয়া কণ্ঠনালীতে ভরে তারপর উদ্গীরণ করা। ইতস্ততঃ কিছু ছাই এখানে ওখানে ঝেড়ে ফেলা', কিংবা তার চাইতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য : 'কালির বমন' বা কলমের নীল মূত্রপাত ; কবিতাকৈবল্য হল অনবদমিত যৌনতার পদ্যবন্ধ, শুদ্ধ নির্বহুল। কবিতা বলতে একটিমাত্র শৃঙ্গার-শীৎকার—সন্দেহ হয় পরিহাস কি না, এবং তারাপদ রায় রসিকতাকে নিঃশেষে প্রতিষ্ঠা করলেন কাব্যরস রূপে ; কলকাতার অন্ত্রনাড়ির ভেতর আগুন ধরিয়ে দিয়ে মধ্যরাতে বেরিয়ে পড়লেন শহর শাসন করতে মদমত্ত পায়ে, অনুগামীর এই আরক্ষা পুরোভাগে

তুমি তারাপদ রায় টর্পেডো
তোমার সাজে না বিষণ্ণতা—
শরৎবাবুরই বা এত দুঃখ কেন কাতরতা
চাকা নামাতে দাও বসতে দাও মাদুরে
উৎপল দীপক দুটি উজ্জ্বল হীরক কেন নির্বাসন নেবে অত দূরে
কেন কেন কেন এত বিষণ্ণতা ভয় কেন কাকে
একবার দয়া করে বলুন আমাকে
আমি সামনে থাকব আমি বোম বাঁধতে জানি
আমি লাঠি গুলি ছুরি দিয়ে
বুকের ঢাল দিয়ে…

বিজ্ঞপ্তি লিখলেন : 'পৃথিবীর শেষ কিছু কবিতা অতি দ্রুত লেখা হচ্ছে…'

আর পাঠক তাইতে প্রত্যক্ষ করলেন পৃথিবীর আদি যথার্থ যা কবিতা, সমাজ এবং প্রতিষ্ঠান অগ্রসর হয়ে এলেন জয়মাল্য হাতে—এর পরেরটুকু কবিতার ইতিহাস নয়, সমাজতাত্ত্বিকের সমীক্ষার বিষয়।

পরে অরূপরতন বসু 'কৃত্তিবাসে'র পৃষ্ঠাতেই তার এক পর্যালোচনা করেছিলেন 'উদ্‌ভ্রান্ত দুঃসাহস : কৃত্তিবাস' এই নামে, তাতে লিখেছিলেন, 'তাঁরা পরিশ্রম সাপেক্ষ বুদ্ধিচর্চা অপেক্ষা সরাসরি প্রত্যক্ষ শারীরিক প্রতিক্রিয়ায় ছিলেন ঢের বেশি বিশ্বাসী। কিন্তু…কেবলমাত্র শারীরিক আচরণ ও প্রতিক্রিয়া কবির উপজীব্য নয়। সমস্ত বিধান, নিয়ম ও প্রণালী (system)র বিরুদ্ধে তাঁদের প্রচণ্ড শারীরিক বিদ্রোহ যে

আত্মভুক্ হতে বাধ্য তা তাঁরা খেয়াল করেন নি।' আরো লিখেছিলেন, 'তাঁদের প্রকট বিদ্রোহীপনা সামাজিক ভাবে তাঁদের···সুপ্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য' করেছিল তার কারণ 'নিছক শারীরিক উন্মার্গগামিতা ও ইন্দ্রিয়নির্ভর বিদ্রোহের একটি বাণিজ্যমূল্যও বর্তমান সমাজে রয়েছে'। এই দেশে সে সম্ভাবনা কোনো আকস্মিক বাণিজ্যসংস্থার আবিষ্কার হতে পারে, কিন্তু তাইতে প্রত্যক্ষত যে ভাবে এই অনুন্নত দেশের সব কয়টি প্রকাশ-সূত্র অভিভূত হল, অন্য কোনো একাকী রচনার রন্ধ্র হয়ে এল অতিক্ষীণ, ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হতে লাগল সে লেখার নগদমূল্য এবং সপ্রতিযোগিতায় তাকে নিতে হল পণ্যসাজ —অপ্রতিবন্ধিত যোগানদারি আর চটকদারির নিয়তনির্বন্ধ, তাতে সামান্যজনের কী কথা প্রতিষ্ঠাপন্নেরও রেহাই রইল না: 'সাংবাদিকতা আভালাঁশের বেগে বর্ধমান। এ মুহূর্তে বাংলাভাষায় সাহিত্য লিখে কিছু রোজগার দূরে থাক, তা প্রকাশ করাও দুঃসাধ্য' —স্বয়ং বুদ্ধদেব বসুর এই এক ছত্র চিঠি, দীপক মজুমদারকে লেখা, সন্ত-সত্তর স্পর্শ করে। দীপক মজুমদার এ চিঠি ছাপিয়েছেন তাঁর 'গোলকধাঁধা' কাগজে।

অদ্ভুত এই শেষাংশ-পরিণামে নজর না করে যদি এ বিদ্রোহকে বলি প্রথাবাদ-প্রকৃতিবাদের প্রতিক্রিয়ায়, ভাবার্দ্র রোম্যান্টিকতা বা স্থিতায়তির বিরুদ্ধে, শিল্পের বিদ্রোহ —কোথাও বটে সঙ্গতি-অত্যয়িত, তবে আরেক ভাগও ছিল, নিচু স্বরে। 'আরো নিচু স্বরে কিছু কথা বলতে চাই', নিচু স্বরে প্রণবেন্দু লিখতে প্রয়াসী হলেন প্রায়-ইমেজিস্ট-যাথার্থ্যে শাসিত লিরিক, একটি উদ্ধৃত করি:

> কা রি গ্ না নো ডা ক - বাং লো থে কে
> টানা-বারান্দার মতো ঝাউবন—
> রবারের চাঁদ নেমে আসে;
> এখন আমার কোনো সঙ্গী নেই; আছে টেলিফোন;
> বুনো কুকুরের দল উঠে আসে ঘরের ফরাসে।

ছৌ এবং কাবুকির চেনা-আধচেনা মুখোশের আড়াল পরে নিলেন অলোকরঞ্জন, ঠারে বলতে অভ্যাস করলেন আবিশ্ব-মানুষের পরিস্থিতি। আত্মবয়নে ব্যাপৃত হলেন কেউ —আলোক সরকার, সুধেন্দু মল্লিক বা আরো কেউ। কেউ চলে গেলেন—পথান্তরে বা শূন্যতায়। কেউ হারিয়ে রইলেন কমঠপাষাণের নিচে। দুঃখী সমাজ সে যেন দুঃখী বন্ধু, তার জন্য করুণায় গাঢ় হয়ে উঠল শঙ্খ ঘোষের কবিতা: 'ভালো আছো? বন্ধু ভালো আছো? অনেকেই ভালো নেই, ফিরে চলে আসি সঙ্গোপনে'—স্বচ্ছ, প্রায়-লোকচ্ছন্দ নিল সে কখনো, হাওয়াযন্ত্রের মতো নথি করে রাখতে বসল দিনকালের কায়মনোবাক্যের প্রত্যেকটি বদল, মৃত্যুরোগ-লাগা সময়সংসারের নিরাময় মানত করে উৎসর্গ করতে চাইল স্বয়ং কবিকে—এও লোকব্রত, বিষ্ণু দে যে বলেছিলেন:

'রবীন্দ্রনাথ বাংলার ঐতিহ্যবাদী সাগরগামী নদী নন; বিশাল ও মনোরম হ্রদ' অপরোক্ষ সেই লোকবৃত্তেরও অংশী আধুনিক কবিতা হয়েছে : 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' বা 'বালুচর', কিন্তু জসীমউদ্দীন তা নিয়ে আধুনিক স্বাতন্ত্র্য প্রস্তুত করেন নি যেমন চেয়েছিলেন বিষ্ণু দে—তার শিল্পিত, বা তত্ত্বগত ব্যবহার। পঞ্চাশের এক ভাগে এতটুকু অবকাশ-রেখা দেখা দিল লোকায়ত রীতি-ভাবনার এই সম্ভাবনামুখে।

যে সময় লিখছি এখন এই সবই ইতিহাস হয়ে গেছে। সত্তর পার হয়ে ফের নতুন বিকাশ ফুটে উঠেছে লেখায়—সবার লেখায়, যেন বিষম বিচিত্র নিকষে বোঝাপড়ায় যাচিয়ে নেওয়া হল এতদিন জীবন আর পৃথিবী, এতদিনে এবার আরম্ভ করা যাবে সত্য যা লেখা। বাঁক নেয়া নয়, সমগ্র-স্ফুরণের সুপ্রহর।

৮

ষাট-দশকের কবিতা

মণীন্দ্র গুপ্ত

কোনো দশকই পূর্বাপর-বিরহিত নয়। ষাট-দশকেরও ভূমিকা হিসেবে রয়েছেন পূর্বসূরিরা, প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট হয়ে।

১ এখনো আমার বুকে কত প্রেম জানিলে না তুমি
জানিবে না কোনোদিন ··
ভালোবাসিবার ইচ্ছা সকলই তোমাকে লক্ষ্য করে

২ আমি শূন্যবাদী, শুনি অনিবার্য ক্ষয়ের সংকেত
দ্রুত বিনষ্টির পথে জন্মাবধি যে পদচারণা
আমার নিয়তি

৩ শহর শাসন করি মধ্যরাত্রে একজন,—
মধ্যরাত্রে একজন উড়োই পায়রা
তিন তুড়িতে ঋতুমতী হয়ে যায় বাঁজা
মধ্যরাত্রে, শাসনে প্রমত্ত ঘুরি রাজা

৪ ঘুম থেকে যে ঘুমের দিকে সমস্ত দিন আমার চলা ;
বুকে আমার শুকিয়ে আছে ছেলেবেলার কৃতজ্ঞতা।
যৎসামান্য দয়া তোমার পেলাম বলে ঘুম ভেঙেছে—
ছেলেবেলার বালিকা তুমি, আজ আরূঢ়া রজস্বলা

৫ শরীর দেখে ইচ্ছে হয় না ছুঁয়ে দেখতে যেমন চোখ
ছুঁয়ে দেখলে কাঁপে না যেমন চোখের জল ভিজলে
মনে পড়ে না শীতের কষ্ট···
যেমন মানুষ দেখলে পাশে, আমার কোনো মায়া হয় না।

'ষাটে'র কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত কবির উপরের অল্প কিছু উদ্ধৃতি স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয় তাঁদের কেউ কেউ অতি প্রকট ভাবে অনুসরণ করেছিলেন দূর-তিরিশের জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথকে। এবং কারো কারো উপর প্রভাব পড়েছে নিকট-পঞ্চাশের শরৎ-শক্তি-সুনীল-প্রমুখের। এই সব প্রত্যক্ষ প্রভাব ছাড়াও সমসাময়িক আবহাওয়ামণ্ডলের পরোক্ষ বাতাস নিয়ন্ত্রিত করেছে অনেকেরই চর্চাকে। আবার কেউ কেউ, যেমন পরেশ মণ্ডল - পুষ্কর দাশগুপ্তরা, স্বদেশী সমকালের ধারাকে প্রত্যাখ্যান করে অনুসরণ

করেছেন বিদেশী কাব্যান্দোলনের। অনুশীলনের পর্যায়ে প্রভাবিত হওয়া দূষণীয় নয় যদি পরবর্তী কালে প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারা যায়। আপাতত সামান্য ভাবে দেখা যাক পূর্ববর্তী দশকগুলোর সঙ্গে 'ষাটে'র যোগ বা বিয়োগ কোথায়।

তিরিশের কবিরা সমবেত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য। সমাজবাদী সাহিত্যাদর্শের বিশ্বাস বা ফ্যাশন যূথবদ্ধ করেছিল চল্লিশের কবিদের। পঞ্চাশের কবিদের ঐ রকম কোনো উত্তুঙ্গ প্রতিবন্ধক বা বিশেষ সাহিত্যাদর্শে বিশ্বাস ছিল না—ভাসমান তাঁরা একত্রিত হয়েছিলেন স্রেফ বন্ধুত্বের টানে, হয়তো সাধারণ্যে লুপ্ত না হওয়ার প্রতিষেধক হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন এই রাস্তা।

'ষাটে'র এ সব কিছুই ছিল না। তাঁদের সামনে ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ, কম্যুনিস্ট ভাবাদর্শের জোয়ার বা কোনো গাঢ় বন্ধুতার আহ্বান। বলতে গেলে, মোটামুটি স্বাভাবিক, ঘরোয়া, মধ্যপন্থী মানুষদেরই সমবায় এই 'ষাটে'র দশক। এটা সাধারণ হিসেব, ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। যা হোক, দেখা যাচ্ছে, দলবদ্ধ হবার জন্য পূর্ববর্তী দশক-গুলোর মতো ষাট কোনো অনুকূল পরিস্থিতি তো পায়ই নি, বরং ছিল আরো কিছু সূক্ষ্ম প্রতিকূলতা। কোনো বড মাপের প্রতিষ্ঠান বা প্রতিপত্তিশালীর অনুগ্রহও সৃজনশীলদের আশ্রয় দিয়ে এক-ছত্রছায়ায় আনে। পঞ্চাশের তুলনায় 'ষাট' এ সব আনুকূল্যের কিছুই পায় নি। তার ছিল না দিলীপকুমার গুপ্তের মতো উদার সহায়ক, বুদ্ধদেব বসুর মতো বৎসল অনুগ্রাহক, সর্বোপরি আনন্দবাজার-সংস্থার মতো পরিপালক ও দুর্গ। সত্যি, পঞ্চাশ যেন সম্পূর্ণ দোহন করে নিয়েছিল সমকালীন সমস্ত কামধেনুগুলি। প্রতিভাই যদিও শেষ নিয়ামক, তবু পরিস্থিতির সঙ্কোচনও ম্লান করে রাখতে পারে অনেক দিন ধরে অনেক কিছু। সে যা হোক, আপাতত দেখা যাচ্ছে, পরিস্থিতি বা সুযোগ বা নিজস্ব মেজাজ কিছুই 'ষাটে'র কবিদের দল-বাঁধার অনুকূলে ছিল না। তাঁদের একত্র-চিহ্নিত করার আর কোনোই ভূমি নেই, একমাত্র সময়সীমার চৌহদ্দি ছাডা।

কিন্তু এই সময়সীমানার মাপও সর্বদা গ্রাহ্য হয় নি। পঞ্চাশে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এমন কয়েকজন কবি যেমন স্বেচ্ছানির্বাচনে বেছে নিয়েছেন 'ষাটে'র দশক, তেমনি 'ষাটে' লিখতে-শুরু-করা কেউ কেউ নিজেকে সত্তরের কূলে ভিডিয়ে নিয়েছেন প্রয়োজনবোধে। তা ছাডা, 'ষাটে'র কবিদের বয়ঃসীমায়ও মস্ত তফাত। গৌরাঙ্গ ভৌমিকের সঙ্গে রাণা চট্টোপাধ্যায়ের বয়সের ব্যবধান উনিশ বছরের। কবিরুল ইসলাম বা সত্য গুহর সঙ্গে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত বা ভাস্কর চক্রবর্তীর ব্যবধান পুরো এক দশকের। এ সব বৈশিষ্ট্য 'ষাটে'র সামগ্রিক কাব্যচরিত্র এবং রুচিতে যেমন একটা বিস্তৃতি এনেছে, তেমনি এনেছে এক অসামঞ্জস্য। 'ষাটে'র কবিগোষ্ঠী সত্যিই দলহীনদের একটা দল।

তাঁদের চরিত্রের কোনো সামগ্রিক রূপ বা কবিতার কোনো মূল সুর খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনা। অতএব আমার আলোচনা হবে 'ষাটে'র কবিতার প্রধান ধারাগুলি এবং সম্পর্কিত প্রধান কবিদের নিয়ে। 'প্রধান'-শব্দটির অন্তর্ভুক্ত এখানে প্রতিভাশালী-প্রতিষ্ঠাবান উভয়েই, যেহেতু প্রতিভা আর প্রতিষ্ঠা সর্বদা একই কবিতে বর্তায় না।

২

'ষাটে'র কবিদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তাত্বিকতাপ্রবণ। তাঁরা অনেকেই মেধাবী সুধীন্দ্রনাথের দ্যুতিকঠিন বৈদগ্ধ্যে উপাসকের মতো আকৃষ্ট হয়েও কার্যত আবিষ্ট হয়েছিলেন জীবনানন্দের মানবতার বোধে। কিন্তু 'অনেক বিদ্যার দান উত্তরাধিকারে পেয়ে তবু' অনধিকারীর অচেতনা শুধু সংকলিত করেছে গুরু ভঙ্গিমায় লঘু চিন্তা—নিরাশ্রয় বাগাড়ম্বর। এই সব দার্শনিক উপস্থাপনার সামান্য অংশও যদি নিজস্ব মেধা ও সংবিতের উপলব্ধি হত তবে সত্যিই শ্লাঘার সীমা থাকত না 'ষাটে'র।

আসলে পঞ্চাশের স্মার্ট সাংবাদিক তরলতায় বিরক্ত হয়েছিলেন এই দুরূহতাকামী কবিরা। অথচ নতুন কোনো গভীর সৃষ্টির ধ্যান-সামর্থ্য না থাকায় শুধুই প্রতিক্রিয়াবশত তাঁরা পিছিয়ে গেলেন তিন ধাপ—সমকালীন উপস্থিতিকে অস্বীকার করে পছন্দ করলেন তিরিশের মননশীল ধ্রুপদীয়ানাকে। এই গ্রহণ-বর্জনের ব্যাপারে অবশ্যই ব্যক্তিগত রুচি, বিপ্রকর্ষণ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষাও কাজ করেছিল।

'ষাটে'র দার্শনিকতাপ্রবণ কবিতার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে এই পর্যবেক্ষণের চমৎকার উদাহরণ পবিত্র মুখোপাধ্যায়। পবিত্রর 'চিন্তা চেতনা তেমন পরিস্রুত / নয় বলে অপরের মুখের উজ্জ্বল বিভা / ম্লান করে দেওয়া / করুণ প্রয়াস আজো / তুচ্ছতম মানুষের গভীর অসুখ' জীবনানন্দের বিখ্যাত কিছু পংক্তির অনুরণন মাত্র। তবু, অনুরণন হওয়া সত্ত্বেও, যদি এই বিশেষ চেতনা কবির সজ্ঞান উপলব্ধির সঙ্গে একাত্মতা পেত তবে তার প্রকাশ এত নিরালম্ব, এত পরমুখাপেক্ষী হত না। সে যাই হোক, এই প্রথম প্রতিজ্ঞা থেকে পবিত্রর বক্তব্য সোপানে সোপানে সাজিয়ে দিলে এইরকম দাঁড়ায়: 'সমবেদনার পুনরুত্থান' হলে 'মানুষের বিচ্ছিন্ন সত্তার' মধ্যে এক 'আলোকিত সেতুর নির্মাণ' সম্ভব হত। কিন্তু সেটি যে হচ্ছে না তার কারণ 'শুদ্ধচৈতন্যের' 'প্রজ্ঞানময় উপলব্ধি / আত্মন্তর মানুষের চোখে / এখনো বিশুদ্ধ স্বচ্ছ মমতার অন্তর্গাঢ় বোধের বোধন / ঘটাতে পারে নি।' অর্থাৎ শুদ্ধচৈতন্যের প্রজ্ঞানময় উপলব্ধিই হল মানুষের 'গভীর অসুখ'এর অন্তিম ওষুধ। এবং কবি শুদ্ধ চৈতন্যে উপনীত হবার পন্থাটি সরল ভাবে বাতলে দেন: 'মরণের উদরস্থ প্রিয়তম দেহ—এই বোধ / আমাদের নিয়ে যেতে পারে শুদ্ধ চৈতন্যের দিকে'।

'শুদ্ধ চৈতন্ত' এবং তার 'প্রজ্ঞানময় উপলব্ধি' কী, বা কেমন, সে ধারণা অনেকের মতো আমারও নেই। সুতরাং এদের সম্পর্কে কোনো মন্তব্য নয়।

রত্নেশ্বর হাজরা মেজাজে এবং মানসিকতায় বেশি দার্শনিকতাধর্মী, কিন্তু পবিত্রর মতো তাঁর জীবনবোধে কোনো ইতিমূলক আস্থা নেই, বিশ্বাসের আঁটও নেই। তাঁর জগৎ ততটা ইন্দ্রিয়নির্ভর নয় যতটা ভাবনির্ভর। ফলত পবিত্রর বিদীর্ণ আর্তনাদের তুলনায় তিনি অনেক নীরক্ত, উদাসীনও। তাঁর দার্শনিক প্রতিপাদ্যও আলাদা।

প্রথম থেকেই রত্নেশ্বরের দার্শনিকতায় মূল ভাবনা হয়ে আছে 'অস্তি'-'নাস্তি' শব্দ দুটি, শুধু আইডিয়া হিসেবেই। ঐ 'অস্তি'-'নাস্তি' অবলম্বন করে তিনি কখনো গেছেন ১. উচ্চপর্যায়ের অনিত্যধারণায়, কখনো ২. পপুলার আপেক্ষিকতা-তত্ত্বে :

১ গভীর অর্থে কোনো কিছুই চিরায়ত নয়
না সত্যরা না মিথ্যারা—
এমন কি ব্রহ্মের বোধ, লোকায়ত ধ্যান।
গভীর অর্থে কোনো মানুষ
সুখেও নেই, দুঃখেও নেই ··

২ 'কিছু পুরোপুরি ঠিক নয় নাস্তি নয় অস্তিও না ··
কে বলেছে আমরাই মৃত্যুর দিকে হেঁটে যাচ্ছি
মৃত্যুও তো আমাদের দিকে আসতে পারে—

ক্রমশ সেই দার্শনিকতার ঝোঁক রত্নেশ্বরের সারল্য আশ্রয় করে যে-কোনো স কথাতেই আপ্তবাক্য উচ্চারণের নেশায় মেতে উঠেছে। যেমন :

১ বয়স বাড়ে মানে বয়স কমে যায়
২ জানতে যে চায় তার কোনো কিছু কোথাও থামে না
৩ সময় অফুরন্ত আবার অফুরন্ত নয়
৪ দিন শেষ মানে দিনের শুরু
৫ অনেকে অনেক কিছু পারে কিন্তু অনেকেই বহু কিছু কখনো পারে না
৬ তুমি আর কিছু নও নিজেকে যা গড়ো তুমি তাই—

ইত্যাদি। কিন্তু এ ছাড়াও রত্নেশ্বর অন্য ভাবে অন্য রকম কিছু কবিতা লিখেছেন, এইটুকুই বাঁচোয়া। তাঁর এই কবিতাগুলি ইম্প্রেশনিজ্মের নিয়মে—ভিতরের কোনো ভাব বা অনুভূতি বা উড়ন্ত মুডের গূঢ় চিত্রার্পিত প্রকাশ। একটি উদাহরণ :

আমাদের ছায়া একটা মহুয়া পাতায় পড়ে আছে
কয়েকটা পাতার সঙ্গে অনেক সময়
দেয়ালের পাশ দিয়ে

গল্প করতে-করতে বুড়োবুড়ি
রাজার বাগানে গেল—
রাজার দিঘিতে নড়ে ব্রাহ্মণীহাঁসের ছায়া
খুব শান্ত জল
…আমাদের ছায়া ফেলে তাকায় সম্পূর্ণ হওয়া চাঁদ।

এই কবিত্বটুকুই রত্নেশ্বর।

প্রচলিত অর্থে আধ্যাত্মিক নয়, কিন্তু অন্তর্মুখ ও অনুভূতিপ্রধান হবার ফলে বাস্তব স্পর্শের অতীত, যেন এক অধিদৈব-প্রদোষালোকে-আচ্ছন্ন কবিতার চর্চা করেছেন কেউ কেউ। এঁদের মনোভঙ্গি মূলত মরমী। মরমিতাই এঁদের কবিতায় ঘনিয়ে তোলে অপরিচিত সান্দ্রতা—রহস্য-কুয়াশার স্তর; এবং সেই কুয়াশা ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেখায় উপলব্ধির আত্মিক নীল। মৃণাল দত্ত, রথীন্দ্র মজুমদার, অরুণাভ দাশগুপ্ত, রাণা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অন্তর্মুখ, অনুভূতিপ্রবণ কবিরা অল্প-বিস্তর এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত। কালীকৃষ্ণ গুহ এই ধারার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি। স্বগত কালীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব ও বিশ্বে যেমন বিচিত্রমুখিতা নেই, তেমনি নেই অসঙ্গতিও। তাঁর বিশ্ব বিপরীত বা বিচ্ছিন্নের সমবায়-বিচিত্রা নয়—তা যেন একই রঙ-তুলিতে আঁকা একটি অফুরান চিত্রের স্ক্রোল, যা খুলে যাচ্ছে স্তবকে স্তবকে শুধু উন্মোচিত হবার জন্য। 'দীর্ঘ কবিতা বার বার আমার হাতে ভাঙা ছন্দে লিরিক হয়ে ফিরে আসে'—একঘেয়েমির নালিশ উঠলে, তাঁর নিজের ওই কথাই তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন করবে, চরিত্রও চেনাবে।

অনুভূতি দিয়ে জগৎ তৈরি করতে গেলে প্রতীকের সাহায্য অনিবার্য হয়ে পড়ে, কারো কারো পক্ষে। কালীকৃষ্ণ বেছে নিয়েছেন—শীত, হিম, আকন্দফুল, সন্ন্যাসিনী, পথিক, শ্রমণ, কুয়াশা, সূর্যাস্ত, পর্যটক-ইত্যাদি শব্দ, প্রতীক হিসেবে।

কিন্তু পরিবর্তিত হচ্ছেন কালীকৃষ্ণ—ক্রমশ প্রতীক ছেড়ে আসছেন প্রত্যক্ষে। তাঁর ছায়াম্লান রক্তিম-ধূসর ছোট্ট গ্রহটিতে ক্রমশ জেগে উঠছে বাস্তব হৃৎপিণ্ডের রক্তসঞ্চালন ও কামড। একটু সাম্প্রতিক কালীকৃষ্ণ:

একটিমাত্র কবিতার দিকে চলে যায় আমার প্রতিটি অন্ধকার পাণ্ডুলিপি
নারীর মুখ যায়, তার অনিশ্চিত ভাবে মেলে দেওয়া চুল এবং নিঃসঙ্গতা যায়—
প্রতিটি অন্ধকার পাণ্ডুলিপির ভিতর থেকে একটিমাত্র কবিতার দিকে চলে যায়
হেমন্তের বিষাদ, শীতরাত্রির মূঢ় কাক, এপিটাফ,
(অজস্র এপিটাফ একদিন ঘিরে ফেলবে আমাদের), যায়
বস্তুহীন নিয়তির মাঝখানে বসে থাকা অস্পষ্ট মানুষ, নারী—
তার অনিশ্চিত ভাবে মেলে দেওয়া চুল, নিঃসঙ্গতা—

ক্ষুরধার মেধা বা গূঢ় সংবিতের কর্মফল দার্শনিকতা এবং মরমিতার কাছাকাছি থাকে মস্তিষ্কের নির্ণয়কাজ, যার একটি ফল যে-কোনো বস্তু বা অবস্থার তত্ত্বনির্ধারণ। এখনো-তরুণ 'ষাট', আগের দশকের তুলনায়, কিন্তু একটু বেশিই তত্ত্বসমাকুল। বিজয়া মুখোপাধ্যায়, এবং ইদানীং সামসুল হক এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তাত্ত্বিকতা অতিপ্রজ, পরীক্ষাপ্রবণ সামসুলের সাম্প্রতিকতম আশ্রয়। কিন্তু এই তাত্ত্বিকতা তাঁর মানস-অভিব্যক্তির পরিণতি হিসেবে না এসে, এসেছে একগোছা নতুন কবিতার অবলম্বন হিসেবে। এই চিন্তা অধ্যয়ন-সংগৃহীত নয়, ভিতর-অনুভব থেকেও উদ্ভূত নয়, কবি তাদের বানিয়েছেন মস্তিষ্কশিল্পের সাহায্যে। ফলত এই সব কবিতা ভাষায় ও বক্তব্যে কিছুটা উদ্ভট, অনিশ্চিত, অপরিস্রুত।

বিজয়া মুখোপাধ্যায় কিন্তু অন্য রকম। প্রথম থেকেই তাঁর কবিতা বক্তব্যপ্রধান। এবং তাঁর পরিষ্কার বক্তব্য শেষ পরিণতি পায় কোনো-না-কোনো স্পষ্ট তত্ত্বে। বিজয়া যেন হৃদয় থেকে, ইন্দ্রিয়ের ধমনীজালে বিস্তৃত না হয়ে, সরাসরি পৌঁছে যান মেধায়। তাঁর জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা-অনুভূতি নিংড়ে ওঠে তত্ত্ব, তাঁর সত্য। বিজয়ার তত্ত্বান্বেষী মন শিল্পের পক্ষে কখনো-কখনো ক্ষতিকর হলেও ওটি তাঁর সহজাত, অনেকের মতো ভাণ নয়। একটু উদাহরণ :

> আমরা যার সঙ্গে নিত্য বসবাস করি
> তার নাম প্রেম নয়, উদ্বেগ।
> প্রেম অতিথির মতো
> কখনও ঢুকে পড়ে অল্প হেসে,
> সমস্ত বাড়িতে স্মৃতিচিহ্ন ফেলে রেখে
> হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়।
> তারপর সারাক্ষণ
> আমরা কেউ আর উদ্বেগ
> আমরা একজন আর উদ্বেগ
> বসবাস করি
> রাত থেকে দিন, দিন থেকে রাত।

৩

চিন্তাস্পৃষ্ট এবং আত্মনিবিষ্ট কবিতার বাইরে, দেশকালের সংক্ষুব্ধ দিনলিপি কিংবা মাটি-ঘনিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম ও শান্তিপ্রবাহ নিয়ে 'ষাটে'র খুব কম কবিই লিখেছেন।

প্রাচীনদের স্বাদেশিকতায় তাঁদের উদ্বুদ্ধ হবার কথা নয়। চল্লিশের সাম্যবাদী ভাবালুতার দিনও শেষ। তা ছাড়া, তাঁদের ঘিরে ছিল পঞ্চাশের আত্মপ্রাধান্যময় কবিতার আবহাওয়া। ইতিহাসের অনেক বঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের মুক্তিসংগ্রামগুলির প্রতি 'ষাটে'র বৈরাগ্য ও সন্দেহ খুব অকারণ নয়। তাঁদের কেউ কেউ যে প্রজ্ঞাকে (?) বিশল্যকরণী ভেবেছিলেন তার কারণও সংগ্রামে এই অবিশ্বাস ও অনীহা। দেশবিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, চিরকালের জন্য উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়া-ইত্যাদি ঘটনার চাপ পঞ্চাশের উপর অবশ্যই বেশি ছিল। কিন্তু তবুও তো পঞ্চাশ একটি স্মৃতির ভূমি এনেছিল বুকের মধ্যে ভরে। 'ষাটে'র উদ্বাস্তুদের তো সেটুকুও ছিল না। পিছনে পূর্বপুরুষের বিচ্যুতি, রাজনৈতিক শঠতা, ধূসর ভবিষ্যৎ—দূরবিসর্পী শূন্যতা শূন্যতা কেবল শূন্যতার মধ্যে বেড়ে উঠেছে 'ষাট'। দোষ দেওয়া যায় না, এই অবস্থার চাপে কবিতা পাংশু, নিরালম্ব ও অশক্তমুষ্টি হতে বাধ্য। কিন্তু চাপই কি অন্তিম নিয়ামক? তরুণদের ক্ষেত্রেও? ষাট-সত্তরের সেই সন্ত্রাস—সেই প্রচণ্ড দিনরাত—সেই বীর্যবান, অসহিষ্ণু, মূর্খ প্রাণগুলির ক্রোধ এবং দুঃখ—সমবয়সী হওয়া সত্ত্বেও 'ষাটে'র কবিরা কী করে এদের সংক্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারলেন নিজেদের! ইতিহাসচেতনা, সময়চেতনা, সমাজচেতনা এ সব কি তা হলে কথার কথা মাত্র?

এই ক্লৈব্য, হৃদয়হীনতা ও মনুষ্যত্বের অপস্মার থেকে 'ষাটে'র কবিতাকে বাঁচিয়েছেন মণিভূষণ ভট্টাচার্য, অনেকখানি দেবদাস আচার্য ও বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, এবং কিছুটা রবীন সুর ও শম্ভু রক্ষিত।

প্রাক্তন-রোম্যান্টিক মণিভূষণ সত্তর-দশকের প্রারম্ভে এসে জ্বলে উঠেছিলেন নিষিদ্ধ বিস্ফোরকের মতো। নতুন আগুনের শিখা ও ছাই তাঁর আগেকার কবিতার স্মৃতি ও মমতা গ্রাস করে নিয়েছিল :

কী সব যেন বলেছিলাম ভুলে গেছি।
ভুলে গেছি তুমুল বাতাস ক্ষিপ্র করে
বরেণ্য ঐ ঘাড়ের উপর
চুলে যে অরণ্য ছিল
ভুলে গেছি, এখন শুধু মনে পড়ে
হাজার হাজার ছেলের লাশ ঠাণ্ডা ঘরে।

নকশাল আন্দোলন—ছেলেদের সেই ভয়ঙ্কর আত্মদান, বিরুদ্ধ-শক্তির যুদ্ধাপরাধ মণিভূষণ বর্ণনা করেছিলেন পার্টিজান রিপোর্টারের মতো। মনুষ্যত্বের ক্রোধে, সমব্যথায়, নিজের মধ্যবিত্ত সত্তার প্রতি বিদ্রূপে তাঁর লেখা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল। সহমর্মী হয়েও তিনি সহযোদ্ধার ভাণ করেন নি—সে মর্যাদা থেকে দূরে, সঠিক

শ্রেণীসংস্থানে, নিজেকে একজন অকর্মণ্য মধ্যবিত্ত দর্শক হিসেবেই সর্বদা দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন।

তাঁর কবিতা, রচনার মতো গড়ে তোলা, কিছুটা গদ্যধর্মী এবং অনেক ক্ষেত্রেই কাহিনীর ফ্রেমে বাঁধা বা কাহিনীতে অনুপ্রবিষ্ট। কিছু কিছু আধিক্য তাঁর কোনো-কোনো কবিতাকে নষ্টও করেছে। কিন্তু থাক—বিষয়মাহাত্ম্য ঢেকে দিয়েছে সব ত্রুটি। পারম্পর্য রেখে মণিভূষণের কিছু উদ্ধৃত করলাম :

১ উঠে আসছে যে প্রখর তরুণ পদধ্বনি, আমি খুবই সতর্ক, তাদের জন্য
অনর্গল প্রতীক্ষা করি।

২ এই মধ্যনিশীথে আজ প্রথম বসন্ত।
…উত্তরকেন্দ্রে প্রধান বিচারপতি ধ্রুবতারা, আপাদমস্তক জেরায়
কঠিন সপ্তর্ষি, ঠিক মাথার উপরে ভ্রষ্ট রজনীর ঘাতক কালপুরুষের
উদ্যত খড়্গ,…
বিচারবিভাগীয় তদন্তের চমৎকার নৈঃশব্দ্য ভেদ করে
মাঝে মাঝে ওল্টানো ছাত্রদের বেআইনি হাড়
…সকালে নখ কাটতে গিয়ে মনে হয়
শেষরাত্রির ময়দানে সরোজ দত্তের দোমড়ানো শরীর ফেলে গেছে…

৩ …বরানগরের দেড়শো লাশ—মুখে
আলকাতরা মাখানো ; একটার পর একটা, একটার পর একটা ঠেলাগাড়ি
গঙ্গার দিকে যাচ্ছে, আসছে, যাচ্ছে, আসছে—
…পাশের ফ্ল্যাট থেকে যে দুটো ছেলেকে মাঝরাতে বিছানা থেকে
চুলের মুঠি ধরে টেনে-হিঁচড়ে ভ্যানে তুলে খালের ধারে
নামিয়ে গুলি করা হয়েছে—তাদের পোড়ানোর গন্ধ ভেসে আসছে,
বরং ধূপকাঠিগুলো নিবিয়ে দিন।

৪ অধ্যাপক বলেছিল, 'হ্যাট্‌স্ রঙ্, আইন কেন তুলে নেবে হাতে?'
মাস্টারের কাশি ওঠে, 'কোথায় বিপ্লব, শুধু মরে গেল অসংখ্য হাভাতে!'

৫ কোনো পরাজয়চিহ্ন লেখা নেই নক্ষত্রের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগে
একটাও আপস-খত ধরে নি মৃত্তিকা
কেবল অমর অস্থি, কেবল স্বাধীন খুলি পাওয়া গেছে গোপন চিতায়…

এই সন্ত্রাসকালের বীর্য ততটা নয়, যতটা জ্বালা, ঘৃণা ও কারুণ্য স্পর্শ করেছিল বুদ্ধদেব দাশগুপ্তকে। কিন্তু তাঁর আবেগ বিস্তৃত হলেও ছিল অনেকটাই উপস্থিতলের —দেশের এই স্থায়ী অবস্থাটারই বেশি বিপক্ষে। ফলত তাঁর কবিতা আর্ত নয়, ক্ষুব্ধ ;

গম্ভীর নয়, স্মার্ট ; সরাসরি নয়, প্রতীক ও প্যাটার্নে অন্বিত। দ্রুত, উত্তেজিত, খোলামেলা ও উদ্ভট চিত্রে কীর্ণ তাঁর এই সময়ের কবিতা বলিষ্ঠতা, নতুনত্ব ও সাম্প্রতিকতার জন্য প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই আদৃত হয়েছিল। উদাহরণ :

> হাডহিম ছোট্ট ফোকরের ভেতর সেই বন্দুক শুয়ে থাকে সারারাত
> সারারাত সমস্ত শহর জুড়ে ফ্যান ঘোরার ঘর-ঘর শব্দ শুনতে পায়
> সেই বন্দুক, বন্দুকের ঘুম হয় না
> জেগে জেগে সে শুধু স্বপ্ন দেখে হাজার হাজার বন্দুকের।
> আর দিন যায়—
> মাঝে মাঝে আলো পড়ে তার শরীরে, রাগে সে ঠিক রাখতে পারে না
> তার মাথা, ছায়ার দিকেই সে ঘুরিয়ে দেয় নল,…
> সমস্ত দিন কানের কাছে সে শুনতে পায় লাখ লাখ
> কেন্নোর মতো মানুষ সপ্ সপ্ করে টানছে তাদের লালা। ভয়ে
> নীল হয়ে ওঠে বন্দুকের বুক, দিন যায়, মাস যায, বছর যায়, বন্দুক
> লজ্জা দুশ্চিন্তা ঘৃণার মধ্যে তবুও অপেক্ষা করে, শুধুই অপেক্ষা করে
> আর শক্ত হয় ভেতরে ভেতরে।

কিন্তু পৃষ্ঠপোষক-পাঠকের আদরও যে একজন প্রতিশ্রুত কবির পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে, বুদ্ধদেবের পরবর্তী-কবিতা তার উদাহরণ। এখন চাহিদার ফলে বুদ্ধদেব ক্রমে অতিপ্রজ হয়ে তাঁর সেই একদা-আদৃত বাক্-প্যাটার্ন ও প্রতীককৌশলের চূড়ান্ত করে চলেছেন। ফলে, এখন তাঁর কাছে বক্তব্যের চেয়ে বড হয়ে উঠেছে প্রতীক। বক্তব্য রইল সীমিত হয়ে, ক্রমশ তাৎপর্যও হারাল, কিন্তু সংখ্যাতীত হতে থাকল প্রতীক। এবং এই প্রবৃদ্ধির ফলে স্বভাবতই তাঁর কোনো ভাবের কোনো বিশিষ্ট প্রতীক রইল না—তারা তাদের স্থির ব্যঞ্জনা ও নির্দিষ্ট মূর্তিরূপ হারিয়ে হল গলানো কাঁচা-মালের মতো। অতএব আর ভাবের প্রতীক নয়, সেই কাঁচা-মাল নিয়ে বুদ্ধদেব এখন বানাচ্ছেন প্রতীকের ভাব। এবং সেই জন্যেই, হাত, পা, মাথা, জিভ, দাঁত, কান, চোখ, আঙুল, নাক সব কিছু নিয়েই তাঁর পক্ষে এখন উপর্যুপরি কবিতা লেখা সম্ভব হচ্ছে। একটু সাম্প্রতিক নমুনা :

> বছর যায় মাস যায় দিন যায় বাজার যায় দু'পাটি দাঁত। দিন যায়
> মাস যায়
> বছর যায় রান্না করে স্কুলে যায় অন্য দু'পাটি দাঁত।
> টেবিলের দুপাশে
> মুখোমুখি ব'সে থাকে চার পাটি দাঁত…

মণিভূষণের সঙ্গে দেবদাস আচার্যের তফাত মুখ্যত শ্রেণীচরিত্রের। খুব মৌল তফাত। মধ্যবিত্ত মণিভূষণ বিদীর্ণ হয়ে যান মনুষ্যত্বের ক্রোধে, শ্রেণীহীন দেবদাস যেন শ্রমজীবীর অটল বিশ্বাস নিয়ে প্রাকৃতিক শক্তির মতো অপেক্ষা করেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—

আমার বাবা সেলাইকল চালাতেন
এবং তাঁর ঘাম দিয়ে ভিজিয়ে দিতেন আমাদের রুটি
সেই রুটি খেয়ে আমার এই স্পর্ধা
যা সব কুলি-কামিনদেরই থাকে ··

এই পৃথিবীর মাটি-ঘেঁষা জীবনের সঙ্গে দেবদাসের পরিচয় আবাল্য। আমাদের গ্রাম ও কৃষকজনশ্রেণীকে, অন্য কবিদের মতো রূপকথার দূরত্বে না দেখে, দেখেছেন অভিজ্ঞতার মধ্যে :

সে নিড়িনি চালায় শস্যে, বিদে দেয়, খুঁটে তোলে আগাছা
সে কাজললতার মতো মেঘ দেখলে খুঁট থেকে বিড়ি বার করে
···সে পাখি তাড়ায় লাঠি দিয়ে, ইঁদুর মারার কল পাতে
···ফসলের জন্য সে বয়ে আনে ওষুধপত্তর
···তার নাওয়া-খাওয়া নেই, তার কুটুম্বিতে নেই।
এক সানকি পান্তা আনে মেয়ে তার গামছা দিয়ে বেঁধে,
ঠিলেয় করে জল, সরায় কাছিমের ডিম,
সে মধু ভাঙ্গে গাছ থেকে, মধু দিয়ে পান্তা ভাত খায়
···তার মেয়ের নাকছাবির মতো ফসল রম রম করে।

অভিজ্ঞতা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও ইতিহাসজ্ঞান প্রথম থেকেই দেবদাসের মনে শ্রেণীসংগ্রামের চিন্তা রোপণ করেছে। কিছু উচ্চৈঃস্বর কবিতা তার সাক্ষী। পরবর্তী কালে, শহরতলিতে জমে ওঠা দুর্ভর, আবর্জনার মতো জীবন তাঁর অস্তিত্বকে নিয়ে গেছে অসহায় আত্মলাঘবতার দিকে, কিছু কালের জন্য। কিন্তু এই সব ক্ষোভ প্রতিআক্রমণ কিংবা বিপর্যয়ে নয়, দেবদাসের কবিতা সত্যিকারের মহত্ত্ব পায় যখন তিনি প্রত্যক্ষনিষ্ঠ নিকট-বাস্তবের উপর ভর করে, ইতিহাসের জ্ঞান নিয়ে, দ্রষ্টার মতো অতীত ও অনাগত অনেক দূর দেখতে পান। তখন তাঁর কবিতার মধ্যে এক নিরুত্তাপ, সুদূরবিস্তৃত আশা এবং বেদনা সঞ্চারিত হয়ে ওঠে তলায় তলায়। পৃথিবীর সঙ্গে দেবদাসের এই গভীর রকমের চেনা ঘটেছে কখনো কখনো। যেমন :

এই দূর গ্রাম এখানে হাঁটছি একজন বোকা মানুষের মতো
রবিখন্দের খামার পাহারা দিচ্ছে জোতদার, চাবুক হাতে, এই ভারতীয় গ্রাম
সামনে গমের ক্ষেত, ঝিঁঝি পোকার গানের মতো নোনতা বাতাস বয়ে যায়

একটা গরুর গাড়ির চাকার শব্দ, ধীরলয় গতি, অতীত ও অনাগত
চেতনার সীমার বিন্দুতে স্তব্ধ হয়ে আছে ভাষা ও সংঘাত
এ রকম ভারতীয় বিষাদ ও দর্শন, ভারতীয় সম্মোহন, গভীর গ্রামের স্তন
ইতিহাসের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে মৃত্যুঞ্জয়ী দুধ ও নম্র শোকগাথা···

৪

কবিরা কবিতা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করেন নানা কারণে—কখনো প্রথা থেকে বেরুবার জন্যে, কখনো নিজেকেই পালটাবার জন্যে, কখনো বিশেষ বক্তব্যের প্রয়োজনে, কখনো শুধুই চমকপ্রদ নতুনত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। পরীক্ষার ভাঙচুর আঙ্গিকের উপর যত সহজে ঘটে, অন্তর্বস্তুর পরিবর্তন কিন্তু তত সহজ নয়।

'ষাটে'র কবিরাও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। পরেশ মণ্ডল, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ কবিরা টাইপোগ্রাফি ও মুদ্রণবিন্যাসের সাহায্যে কবিতার নতুন দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ এনে নতুন অনুষঙ্গ / ব্যঞ্জনা ফোটাতে চেয়েছিলেন। এই অভিনব প্রক্রিয়া বাঙলা কবিতায় নতুন হলেও, এর পিছনে ছিলেন পশ্চিমী আপোলিনেয়ার, কামিংস্-ইত্যাদি। এঁদের অনুকরণের সার্থকতা এইটুকুই যে তা কবিতার দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপের প্রয়োজনীয়তার দিকে বাঙালি কবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

পবিত্র মুখোপাধ্যায় চেষ্টা করেছিলেন পৌরাণিক মীথ্ ব্যবহার করে কবিতার অন্তর্বস্তুকে একটা অন্য মাত্রা দেবার। তিনি হয়তো সফল হতে পারতেন যদি সেই ব্যবহার এত নির্বিচার না হত। প্রসঙ্গের তত্ত্ব, তথ্য, জ্ঞান সবই গভীর-মিশ্রণে এক মৌলিক বস্তু হয়ে প্রকাশিত হতে পারে কবিতায় অমোঘ প্রয়োজনে। কিন্তু সংগ্রাহক-কবির চেতনা সেই পরিণতিতে না পৌঁছনো পর্যন্ত অনিশ্চিত পাণ্ডিত্যের প্রকটতা বড় ব্যভিচারী।

অনেক রকম ভাবে অনেকবার নিজেকে বদলিয়েছেন সামসুল হক। অচিন্তনীয় উৎকেন্দ্রিকতা থেকে উদ্ভট তাত্ত্বিকতা, মুদ্রণকারু থেকে ছন্দ-মিলের সুষ্ঠু ব্যবহার—সব রকমই করেছেন। যেমন :

১ 'ক'-এর হাতে 'খ'-এর একজন খুন,
তার নাম : খ—০০৫/১৪ (৭০)···
'খ'-এর হাতে 'ক'-এর একজন খুন,
তার নাম : ক—২০'০১৩ (৪৭)

২ আসুন তবে ঘুরেই আসি জলার ধারে :
পশ্চিমে লাল আকাশ পুবে চন্দ্র উদয়,

দুই দিকে দুই রাস্তা গেছে দপ্‌দপিয়ে,
মধ্যিখানে জলা মহাকালের মতো

মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে এত দ্রুত পরিবর্তন, এইরকম পরীক্ষানিরীক্ষা হয়তো বহুপ্রসূ সামসুলের নিজেকে নবীকরণের চেষ্টা, হয়তো এটা তাঁর ব্যসন। কিন্তু এর ফল ভালো হয় নি। অনস্বীকার্য কবিত্বশক্তির অধিকারী হলেও কখনো-কখনো অস্বচ্ছ এবং ভঙ্গুর হয়ে যায় তাঁর কবিচরিত্র।

কবিতা নিয়ে এক চমৎকারী পরীক্ষা করেছেন পুষ্কর দাশগুপ্ত। প্রচল কবিতার রীতি-নীতি-ভঙ্গি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নামহীন ব্যক্তিত্বহীন মানুষকে এবং দৃশ্যকেও, কাটা কাটা অ্যাক্‌শন-পরম্পরায় এনে তিনি হৃদয়হীন কম্প্যুটারের মতো যেন তাদের নড়াচড়ার গ্রাফ এঁকেছেন। এও এক রকম প্রতীকী কবিতা। পুষ্করের মানুষ নাচের পুতুলের প্রতীক, ভেন্ট্রিলোকুইস্টের পুতুলের প্রতীক, রোবটের প্রতীক, আত্মাহীনতার প্রতীক, আত্মনিয়ন্ত্রণহীনতার প্রতীক, অনিশ্চিতিতে বিলুপ্ত হবার প্রতীক। একটি কবিতা :

ঘরে ঢুকল
টেবিলের পাশে দাঁড়াল
চেয়ারে বসল
উঠল
জানলা খুলে দিল
বসল
উঠল
পর্দা তুলে দিল
বসল
উঠল
ঘুরতে লাগল। ঘড়ির দিকে তাকাল।
বসল। খাতার ওপর বই চাপা দিল।
উঠল। ফ্যানের স্পীড বাড়িয়ে দিল।
বসল। উঠল। জানলা বন্ধ করল।
বসল। উঠল। পর্দা নামিয়ে দিল।
বসল। উঠল। ফ্যান বন্ধ করে দিল।
বসল
উঠে দাঁড়াল
ঘর থেকে বেরিয়ে গেল

কবি কোথাও বলেন নি, তবু মনে হয়, দেশকালহীন একটা মরুমরীচিকার পটে যেন এই সব ঘটছে। সে পট চিরন্তন, আবার চিরন্তন নয়। মরীচিকার আবার চিরন্তনতা কী? পুষ্কর দাশগুপ্তের ভাবনার পিছনে হয়তো আছে আধুনিক দর্শন। সেই দর্শন-সিদ্ধান্ত হয়তো তাঁকে কবিতার প্রচল চেহারাকে ভেঙে দিতে প্রবৃত্ত করেছে।

নতুন পরীক্ষার ব্যাপারে পুষ্করের পরই যাঁর নাম করতে হয় সেই শম্ভু রক্ষিতের কিন্তু কোনো দার্শনিকতা নেই। প্রতীকীও নন তিনি। তাঁর কৌশল একেবারেই অন্য। পড়তে পড়তে যখন শম্ভুর এই রকম পংক্তিতে আসি—'পীচের পথের দুপাশে প্রাচীন পুরুষদের মত লম্বা উঁচু গাছের সারি' কিংবা 'মানুষ ছোট ছোট সবুজ শিখার মতো' কিংবা 'অনেক দূর দেশ ঘুরে আমার সোনার দাসী আসে···বায়ুমণ্ডলের মত তাকে মনে হয়' কিংবা 'শঙ্খর মত ধূসর ছাইরঙের কিছু গ্রাম, কিছু শহর দেখা যাচ্ছে / গড়িয়ে পড়ছে রঙিন ঘাসের ঘোড়া'—তখন সন্দেহ থাকে না তাঁর মৌলিক কবিত্বে। কিন্তু তাঁর শিল্প কবিতার সজীব শরীরকে কতখানি স্পর্শ করতে পেরেছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া কঠিন। কেন না কম্যুনিকেশনের শর্ত তিনি বড় একটা মানেন না। এবং প্রাচীন গূঢ় ভাষার মতো এক রকম ভাষায়, অপ্রচল শব্দে যেন গোলকধাঁধাময় স্থাপত্য তৈরি করাতেই তাঁর আগ্রহ। সন্দেহ হয়, শম্ভু হয়তো এক অফুরন্ত প্রত্ন-আকরের সন্ধান পেয়েছেন। ফলত, শম্ভু তাঁর অতি দীর্ঘ বা ভেদরেখাহীন এই কবিতাবলিতে পৌনঃপুনিকতার দোষ এড়াতে পারলেও কোনো স্থির কেন্দ্রে আবিষ্ট হতে পারেন নি। তাঁর জগৎ যেন বিচিত্র প্রাণীফসিল-আকীর্ণ লুপ্ত সমুদ্রবেলা, অথবা শব্দমূর্ছিত এক প্রত্ন জাদুঘর। শম্ভুর আরো কিছুটা উদ্ধৃত করলাম, হয়তো এখানেই রয়েছে তাঁর কবিতার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও রহস্যের উন্মোচন :

> ···আমি প্রাচীনকালের ম্যাজিক ধরতে পেরে গেছি।···এখন আমার প্রেততত্ত্ব পড়ার সময়, আমি জলের মত ব্যবহৃত হয়েছি। কার্তুজের মতো আমার চোখ বাষ্পাকুল হয়ে উঠছে।···মানুষের সব রকম মূর্ছনা আমি ধরে ফেলেছি। আমি বের করেছি মুখের ভেতর থেকে এক সমুদ্র।···নিরিখ করেছি অর্ধপ্রোথিত দ্রষ্টার মুখের, কৃপাজীবী ক্লীবের, উড়ুক্কু সরীসৃপের ও প্রোষিতভর্তৃকার গর্ভের ক্রূর বধিরতা ···একটা তীব্র উন্মাদিকতা আমার মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। বাগানে এসেছে উদ্ভিদ আর প্রাণীদের রাজত্বকাল। এই স্বপ্নগর্ভনম্রতা, এই মুণ্ডহীন তমস্বিনীকে পেয়ে দিন কেটে যায়।···

৫

তাত্ত্বিক, সাংকেতিক, বৈপ্লবিক এবং প্রক্রিয়াশীল—এতক্ষণ যাঁদের কথা বলা হল—তাঁদেরই বাইরে বয়ে চলেছে 'ষাটে'র আর এক উল্লেখযোগ্য প্রাণবন্ত ধারা। আমি ভাস্কর চক্রবর্তী, শামশের আনোয়ার, বেলাল চৌধুরী, তুষার রায়, অরুণেশ ঘোষ, দেবারতি মিত্র-প্রমুখের কথা বলছি। এঁদের কবিতার উৎস, বৃদ্ধি ও অবসাদ জীবনেরই প্ররোচনায়, জীবনেরই উদ্বেলতায় এবং জীবনেরই পক্ষাঘাতে। কয়েকটি ঐকান্তিক নাম উল্লেখ করলাম বটে, কিন্তু এ কথাও সত্যি, এই আত্মজৈবনিক কবিতার ধারা এতই প্রাকৃতিক যে অন্য অন্য ধারার সপ্রাণ কবিরাও কখনো-না-কখনো এসে এতে মিলেছিলেন, মিলেছেন এবং হয়তো মিলবেন। যেমন: পবিত্রর আর্তনাদের পিছনে রয়েছে তাঁর নিজস্ব অপ্রাপ্তির ক্ষোভ, বিজয়ার তাত্ত্বিকতা নিঃশ্বসিত হয়েছে তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে, মণিভূষণ ও দেবদাসকে তো স্পষ্টই নাড়া দিচ্ছে তাঁদের প্রতিকারহীন পরিবেশ। তবু এঁরা সকলেই জীবনের কোনো-না-কোনো অন্য অর্থ করেছেন। কিন্তু যাঁরা শুধুই নিজের জীবন—তার তিক্ততা, অকিঞ্চিৎকরতা, তীব্রতা, বিষণ্ণতা, কারুণ্য, সৌন্দর্য ও সুদূরতায় আচ্ছন্ন ও মুগ্ধ হয়ে দানব বা শিশু-পৌত্তলিকের মতো একাশ্রয় হয়ে আছেন—খাঁটি অর্থে তাঁরাই আত্মজৈবনিক। আত্মজৈবনিক এই কবিদের সাধারণ লক্ষণ হিসেবে বলা যায় প্রয়োগ, প্রকার ও প্রকরণে তাঁরা যথেষ্টই টাটকা রকম নতুন—বৈদগ্ধ্য, শব্দসমৃদ্ধি ও প্রথাসাচ্ছল্য থেকে অনেক মুক্ত, নির্ভার। দূর ঐতিহ্যের কাছে তাঁরা প্রায় অঋণী। তাঁদের যেটুকু দেনা তা পঞ্চাশের 'কৃত্তিবাসী'দের কাছে। ঐ অগ্রজ সোদরোপমরাই হয়তো তাঁদের শিখিয়েছিলেন সাহসী হতে, সাহসের সঙ্গে নিজেকেই বিষয় বানাতে। কিন্তু ওইটুকুই। এঁদের নিজেদের ভিতরে চলাচলের বাতাস যথেষ্ট স্বচ্ছন্দ হলেও, তা শুধু সৌরভেরই আদানপ্রদান ঘটিয়েছে, সবীজ রেণুকণা উড়িয়েছে ক্বচিৎ। সুতরাং এই কবিদের মধ্যে মিল যেটুকু আছে তার চেয়ে অমিল আছে কূটস্থ হয়ে। অতএব প্রত্যেকেই আলাদা দ্রষ্টব্য।

খোলামেলা বেলাল চৌধুরীর আত্মপ্রাধান্য বা আত্মকরুণা কিছুই ছিল না। আত্ম-জীবন বলতে শুধু নিজের দিনগুলি। সেই দিনগুলিকেই বর্ণনা করেছেন বেলাল—সেই সময়স্ফোটের বাইরে কোনো মর্মকথা, কোনো নতুন কথা বা কোনো বড় কথা বলেন নি। যাযাবর বেলালের যৌবনউজ্জ্বল, প্রীতিরঙিন দিনগুলো ছড়িয়ে আছে জাপানে, কলকাতায়, অন্য নদীতীরে, অন্য সমুদ্রপারে—কখনো অগাস্ট চন্দ্রাতপের নিচে, সবুজ চা খেতে খেতে জাপানী আলাপের সৌগন্ধ্য :

> ১৯৬৪-র শেষাশেষি টোকিওতে হবে অলিম্পিক
> ওসাকাতে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফেয়ার, নারাতে বিউটি কনটেস্ট,

অটোমোবাইল রেস হবে, জুজুৎসু হবে কিয়োতোয়…'তখন এসো কিন্তু'
সবুজ চা খেতে খেতে অগাস্ট চন্দ্রাতপের নীচে চা-ঘরে বসে
এই সব কথা বলাবলি হল কত না সে বার ইয়াকোহামায়
পথের ধারে আজো কি ফোটে ঘনলাল চেরিফুল
মার্চে হারিকিরি করে যুবকযুবতীরা…
পশ্চিমে বাঁশবনে কি সূর্য ডোবে…
প্রজাপতি উড়ে উড়ে বসে নাকি চার্চের ঘণ্টায়…

কখনো অন্য দেশের কোনো টেনিসকোর্টের চটুল অপরাহ্ন :

সুন্দর এই অপরাহ্নে ঘাসের নিবিড় সবুজ লনে
মেতে উঠেছে অনিন্দ্যকান্তি কিছু যুবাপুরুষ
খেলছে টেনিস নিবিড় সবুজ ঘাসের কোর্টে
—তাদের সুঠাম মাংসপেশীর
সমর্থ হিল্লোলে ক্রমাগত নেটের এপার-ওপার
করছে একটি চটুল রোমশ ছোট্ট বল
তাদের হাতের শানানো র‍্যাকেটে বেজে ওঠে
টপাটপ শব্দের মঞ্জরী…

বেলালের যৌবনসম্মোহিত প্রীত-জগতের থেকে অনেক দূরে যেন এক সার্কাসের এরিনায় বা নৈশ ক্যাবারে হাউসে বা বিচিত্র যানবাহনের জটিল গোলকধাঁধায় বা কোনো স্যানাটোরিয়ামের গম্ভীর ওয়ার্ডে লাল কম্বলের বিছানায় তুষার রায় কখনো নৃত্যপর বিদূষক, কখনো ক্ল্যারিওনেট-মুখে ফোলাগাল ভঙ্গিপরায়ণ বাদক, কখনো বেপরোয়া লম্ফবাজ স্মার্ট ক্যালকাটান, কখনো অসহিষ্ণু অবাধ্য দুরূহ রোগীর ভূমিকায় অভিনয় বা মজুরি খাটছেন। আমাদের পরিচিত এই খুঁটিনাটিসমেত বাস্তব জগৎই অস্বাভাবিক হয়ে দেখা দেয় তুষারের অদ্ভুত মানসিকতার সংক্রামে বিচলিত ও বিকৃত হয়ে। কিন্তু বাইরে তাঁর এত লাফঝাঁপ দেখে অনুমান করা যায়, এই বিকৃতি তুষারের স্বভাবজ নয়, আরোপিত। নিজের উপরে এই বিকৃতির আরোপ, এই ক্লাউনের ভঙ্গি —গভীর এক অভিমানপ্রসূত। কেন এবং কোথায় তাঁর এই অভিমানের উৎস ?

১৯৬৬ সালে 'কৃত্তিবাসে'র প্রথম পারিবারিক শোকে কবিদের মুহ্যমান অবস্থা দেখে তুষার লিখেছিলেন, 'আমি সামনে থাকব আমি বোম বাঁধতে জানি / আমি লাঠি গুলি ছুরি নিয়ে বুকের ঢাল দিয়ে রুখতে পারব জানবেন প্রথম আঘাত / …তারাপদ শরৎবাবু সুনীল আপনাদের এ বিষণ্ণতা সহ্য হয় না / হাস্যন নয় তো সামনে কমিক করব / হাস্যন নয় তো দেখবেন আমিই মরব'। তুষারের এই ফুর্তিবাজ, দুঃখে অসহিষ্ণু, একটু বেশি

অতিবাদী সেল্ফ-পোর্ট্রেটটি খুব তাড়াতাড়িই. নানা বিরূপ টানাপোড়েনে উদ্ধত ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। ভালোবাসা, বিপ্লব ও কবিতা—ভাবপ্রবণ তরুণদের এই দিব্য ট্রিনিটি ক্রমশ তাঁর কাছে শুধু ঘৃণার বস্তু, প্রেমিকার উদ্দেশ্যে তিনি লিখলেন: 'তুমি কিছু বুঝলে না—বোবা কালা বেডপ্যান তুমি / তুমি ভাঙা বাথরুমে ঝকঝকে মুতের বেসিন'। দ্বিতীয়ত, সাধের সন্ত্রাসের বিক্রয়যোগ্য তৈজসরূপ দেখলেন তুষার : 'সন্ত্রাস লুকিয়ে আছে সোফায় ছারপোকার মতো / তাকিয়ায় লুকানো আছে বিপ্লব বারুদ ও বোম, / দু দিন পরে মাড়োয়ারীতেও ভাও বলবে জিনিষগুলোর।' তৃতীয়ত, অগ্রজ এবং সতীর্থ কবিদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা হল : 'লক্ষ টি. এন. টির বম মেগাটনে যেন / ঠোঙা ফাটারও আওয়াজ নেই, তবু স্খলিত শালায় শালা কবিতা ছাপছে।' এই সব নৈমিত্তিক দুঃখ, প্রেমের ভঙ্গুরতা, বৈপ্লবিকতার পণ্যে অধঃপতন, যশোলিপ্সু কবিদের ফাঁপা ভড়ং দেখে দেখে তুষার জীবন-সত্যে অবিশ্বাসী হয়েছেন এবং শেষাবধি যেন প্রতিহিংসা নেবার জন্যে নিজেরই জীবনের প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছেন। এই সব প্রতিক্রিয়ার ঝাঁঝ ও বিদ্রূপই তাঁর কবিতা।

শেষ পর্যন্ত এই বৈরিতা, অবিশ্বাস, অভিমান, ভাঁড়ামি, অসহিষ্ণুতা এবং নিজেকে অপচয় করার গূঢ় ইচ্ছা—সমস্ত মিশ্রিত হয়ে একটা ঝাঁঝালো প্রমত্ত আরকের মতো তুষার ও তাঁর কবিতাকে মাতায় আত্মধ্বংসের খেলায়, মৃত্যুর সম্মোহনে। ঝানু, সজ্ঞান ড্রাগ-অ্যাডিক্টের মতো তুষার নানা রকম আত্মহত্যার কল্পনা নিয়ে খেলা করেন :

> এক উজ্জ্বল সকালে আজ দাড়ি কামাতে, অন্যমনস্ক…
> হাতের ক্ষুরকে কোনো সময়ে বেহালার ছড় ভাবলে
> রক্তের কাঁপন, লোনা স্বাদ, তারপর খেয়াল নেই…

কিংবা, '[ঘুমের] সতেরোটা বড়ির পরেও মনে পড়ে যায় এই প্রাণ, এই প্রাণধন… একবার নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখুন…ঠিক পড়ছে কি না।' এবং

> লাল আলোর সিগন্যালটা ডাউন
> তারপরে আপ
> আইঃ……ব্বাপ
> ঘচাৎ করে ঘ্যাচ
> তারপরে প্যাচ্‌প্যাচ্‌ রক্তে হড়কে
> চলে গেল বাহান্নটা কামরা।'

তারপর ? 'মুচকি হাসলুম দেখে নিজেরই মুণ্ড স্থির রেললাইনে—'.

বলা যায়, মৃত্যুর সঙ্গে এই রকম গভীর তামাশা উপভোগে ষাটের কবিতায় তুষারের জুড়ি নেই। কিন্তু তবু এই সব [illegible] মুচকি, বাঁকা কিংবা ঠা ঠা হাসির পরই আসে

আসল রক্তক্ষরণ—পিছুটানের মায়ায় ধ্রুব বিষণ্ণতা :

রান্নাঘর কুটনো-বাটনা

দিদির বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল পাটনায়,

মা কি ডাকছে ?

আসলে, তুষার রায় নামক ক্ষুদে দানবটির হৃৎপিণ্ডের দুই অলিন্দে ছিল আরো ক্ষুদে এক তেজস্ক্রিয় বোমা এবং একটি গোপন হৃদয়। 'বার বার বুক চিরে' সেই গোপনকে দেখাতে চেয়েছিলেন তুষার। তারপর হার মেনে চাবি টিপেছেন সেই সময়-বোমার। এখন বাকি রইল এক প্রখর বিদায় এবং উদাস বিদ্রূপ—

বার বার
পেশী অ্যানাটমি শিরাতন্ত্ত দেখাতে মশায়
আমি গেঞ্জি খোলার মতো খুলেছি চামড়া
নিজেই শরীর থেকে টেনে
তারপর হার মেনে বিদায় বন্ধুগণ,
গনগনে আঁচের মধ্যে শুয়ে এই শিখার রুমাল নাড়ছি
নিভে গেলে ছাই ঘেঁটে দেখে নেবেন
পাপ ছিল কি না।

আত্মজৈবনিক কবিদের সততা ও সাহসের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা স্বীকারোক্তিমূলক কবিতায়। এবং এই দিক থেকে শামশের আনোয়ারের বিশেষ ভূমিকা। তাঁর ঈডিপাস কমপ্লেক্স, তাঁর শারীরিক রিরংসা নানা পথে মোচড় খেয়ে ঘুরে যায় বিভিন্ন অস্বাভাবিক তির্যকে। তাঁর মধ্যে পর্যায়ক্রমে দেখা দেয় আত্মকরুণা, মর্ষকাম, প্রেমহীনতা—

১ আমার এ ঘর চতুষ্কোণ, অন্ধকার
অনন্ত অন্ধকারে আমি সাঁতার কাটি, হামাগুড়ি দিই···
সংগমের ইচ্ছা হলে নিজেকে জড়িয়ে ধরে সংগম করি
···মৎস্যনারীদের মতো আমি আলো দেখি না, তীর দেখি না।

২ এই কলকাতা আর আমার নিঃসঙ্গ বিছানা ছাড়া কোনো সত্যের অপেক্ষা আমি রাখি না।

৩ মাথার ওপর দিয়ে নীল পেটিকোটখানা ছুঁড়ে ফেলে, শান্তি, ওর
সমস্ত চুল বিপজ্জনক ভাবে খোলা, ঠোঁটে হিংসার চেয়েও গাঢ় রক্ত···
ভালোবাসাহীনতার পরিশ্রমে মেঝে থেকে দেয়াল অবধি বেঁকে যায়
আমি ওর ডালপালার জঙ্গলে একটা মৃত
পতঙ্গের মতো আটকে থাকি।

এই সব জটিলতার সঙ্গে অবদমনেরও অনেকখানি চাপ। এক দিকে তরুণটির উপর নারীরা—জননীরা ও প্রেমিকারা—আনছেন জটিলতা, অন্যদিকে পিতৃকর্তৃত্ব, ধর্ম ও সমাজানুশাসন আনছে অবদমন। এদের কাছ থেকে মুক্তি হয়তো আছে, কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয়, তরুণটি তা চান না। কেন? তার উত্তর দিয়েছেন শামশের একটি তাৎপর্যময় পংক্তিতে: 'এ জটিল পুজো ছেড়ে কিভাবে তোমাদের কাছে যাবো? / হে অখণ্ড মন্দির! হে পতাকা!' নিজের, এবং সাধারণভাবে সবারই, অসুস্থ সব কষ্ট নিয়ে নাড়াচাড়া করে মনের এই যে গোপন তৃপ্তি, শামশের সেই বিরূপ সত্য চমৎকার ধরে ফেলেছেন। আর, তাঁর কবিতা কেন এই রকম—সেই ক্লুও রয়েছে এইখানে। ক্রমশ দেখা যাচ্ছে আত্মকরুণাকে অধিকার করে নিচ্ছে তাঁর ক্রোধ। কোনো কোনো কবিতায় অন্য রকম মনে হলেও, কোনো আদর্শের অনুগমন করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক নয়। অবদমন তাঁকে দিয়েছে প্রচলিতের উপরে ঘৃণা, অতএব নৈরাজ্যই তাঁর পথ:

> যে সৃষ্টি আর সভ্যতা আমার বুকের বাইরে গড়ে উঠেছে
> তার প্রতি আমার বুকের কোনো মায়া নেই।

তাঁর ওই আবেগ ক্রমশ স্পষ্ট লক্ষ্য পেতে থাকে:

> তোমরা মোকদ্দমার কথা ভাবো এবং খড়ুই দিয়ে
> পরিষ্কার করো দাঁত…
> চোখ মটকে বলছো 'এই যে, আমাদের সেই
> প্রতিভাবান তরুণ কবি'। থুতু
> আমি তোমাদের মুখের ওপর ছড়িয়ে দিই থুতুর নক্ষত্রমালা।

ভাস্কর চক্রবর্তী প্রায় আক্ষরিক অর্থেই আত্মজৈবনিক। সামান্য কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া তাঁর প্রায় সব কবিতারই বিষয় তিনি নিজে—তাঁর দিন, রাত, শোয়া, ঘুম, স্বপ্ন, একটু বেড়িয়ে আসা, তাঁর দেখা ছোট ছোট সামান্য দৃশ্য, তাঁর একটু অভিমান, অপমান, স্নেহ, নিঃসঙ্গতা, নিষ্প্রভ ভালোবাসা, তাঁর নিজেকে সাময়িক ভাবে নতুন করার উজ্জ্বল ইচ্ছে এবং এই সমস্ত নিয়ে তাঁর মৌলিক অনুভূতির সঞ্চরণ। বোঝাই যাচ্ছে, তাঁর শাদামাটা, গতানুগতিক দিনগুলোতে খুব উচ্চকিত, দ্রুতস্পন্দিত, সমারোহপূর্ণ বা তরঙ্গসঙ্কুল কিছুই ঘটে না।

অন্যান্য আত্মজৈবনিক, বেলাল, তুষার, শামশের, অরুণেশ ও দেবারতির মতন তিনি স্বাস্থ্যল, উদ্ধত, অতিচারী, বিকৃত ও সৌন্দর্যোপাসক নন। তা হলে কেমন তাঁর চারিত্র? হয়তো নঙর্থক গুণ দিয়ে এবং অস্পষ্টতা রেখে এই ভাবেই বলা ভালো যে, তা অনাড়ম্বর, অতীক্ষ্ণ, অবিদ্বিষ্ট, অচপল, অবসন্ন, বিমর্ষ, একটু জটিল, একটু স্বপ্নপর, একটু দূরত্বপরায়ণ এবং যথেষ্ট মমতাময়। তাঁর কবিতাকে যদি ছবির সঙ্গে তুলনা করা যায়

তবে এই ভাবে বলা যায় : অনেক ছবি যেমন রেখানির্ভর তেমনি অনেক কবিতা পংক্তিনির্ভর—সেখানে সরলরেখার মতো কবিত্বপূর্ণ পংক্তিও আলাদা ঔজ্জ্বল্যে স্বাধিকারপ্রমত্ত। ভাস্করের কবিতা সে রকম রেখাচিত্র নয়, বহুবর্ণ ছবিও নয়। শুধু শাদা কালো জলরঙে পটের উপরে তার রেখাহীন কোমল বিস্তার—ঘন, হালকা, গভীর, অস্পষ্ট, আচ্ছন্ন—বিভিন্ন টোন। যেমন :

'অথবা যে রাত্রিবেলার জন্যে সারাজীবন এই অপেক্ষা, সেই রাত্রিবেলার খুব কাছাকাছি চলে এসেছি মনে হয়। ঝড় আসার আগের মুহূর্তে পাখিদের এখন তীক্ষ্ণ, সংক্ষিপ্ত চিৎকার। আর গাছেদের চিত্তচাঞ্চল্য—পাতা থেকে শুধুই পাতার ভেতর ছড়িয়ে পড়া। অন্ধকার ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে আমি আমাদের ফাঁকা জীবনের কথা ভাবি। সেই সব বাতাসহীন রাত আর দুর্দশার কথা তোমাকে আমি লিখি নি কখনোই যা আমি একা একা কাটিয়েছি আমাদের কথা ভাবতে ভাবতে। —শুধুই পায়চারি-ভর্তি জীবন ছিল আমার। আর ছিল, রাঙতায় মোড়া নতুন নতুন সব ট্যাবলেট। আমি আবার পাশাপাশি চেয়ারে আমাদের বসে থাকার কথা ভাবি। ভাবি, বিশাল কোনো রাত্রি ধুয়ে দেবে আমাদের দুঃখ, বেদনা ও অভিমান। ওগো কাঠের বাক্সে ঢাকা হারমোনিয়ম, তুমি গান গাইতে থাকো আমাদের।'

এই রকম কোমল, উত্তেজনাহীন অনুভূতির আমাদের এখনকার ব্যস্ত হৃদয়কে ছুঁতে পারার কথা নয়। তা হলে ভাস্কর কী করে এত আকর্ষণ করছেন সমকালীনদের ?

আসলে এই আকর্ষণের প্রধান কারণ তাঁর বাক্‌ভঙ্গি। ভাস্করের ভাষা নিখাদ গদ্য —সহজ, স্পষ্ট, একটু ভিজে, একটু আচম্বিত, লঘু নাগরিক গদ্য। কিন্তু তাঁর বলবার নিভার, নির্জন, শান্ত ভঙ্গিটি নিজস্ব। এই বাক্‌ভঙ্গির কারণেই তাঁর লেখায় কবিতা উপরে ভেসে না উঠে, কাজ করে তলায় তলায়। এই নিরুচ্ছ্বাস স্নিগ্ধতা, অপ্রকটতা, আত্মীয়তা পাঠকের ভালোবাসা কাড়তে বাধ্য।

কবিতা অনেক রকমের আছে—অনেক করণকৌশলের, অনেক প্রসঙ্গের। কিন্তু সেই কবিতাই কবিতা যা এই সমস্ত আপেক্ষিক বা ক্ষণিকের আলোড়নময় বাতাস পেরিয়ে পৌঁছতে পারে বিন্দুর মতো এক কেন্দ্রসত্যে। শুধু সেই কবিই তাঁর সমস্ত সত্তা দিয়ে জানেন, ঐ বিন্দুসত্যেই গোপন হয়ে আটকে আছে পুরো সৃষ্টির মূল—অগণ্য জীবন যার পরিস্ফুটন। সেই সত্য বা সত্যের অনুভূতি ভয়ঙ্কর হবে কি সৌম্য হবে তা নির্ভর করে কবির সত্তাসারাৎসারের বিশেষ রঙের উপর।

অরুণেশ ঘোষের প্রসঙ্গে এই সব চিন্তা মনে আসে। খুব কম লিখেও তিনি এই সব চিন্তা জাগাতে পারেন। আপাত-পাঠে অরুণেশকে ভুল বুঝবার অবকাশ আছে। অসুস্থ, অশ্লীল, রাগী, ক্ষুধার্ত ইত্যাদি উপাধি বর্ষিত হতে পারে তাঁর উপর। প্রশ্ন উঠতে নিশ্চয়ই

পারে, তাঁর কবিতা জুড়ে কেন এত বেশ্যা, বেশ্যাপল্লী, ভাঁটিখানা ও মাতালদের উপস্থিতি। উপর-উপর পড়েই আমরা অরুণেশকে দাগী করে দিতে পারি, কেন না আমাদের অন্ধ চেতনার কাছে এদের অনুষঙ্গ বহুকেলে-অশ্লীল।

কিন্তু আমাদের ভাগ্য, পাঠক ও কবিদের বস্তুবিষয়ে প্রচলিত ধারণাকে অরুণেশ গ্রাহ্য করেন নি। জীবন ও সৃষ্টি, তিনি একটু একটু করে, অনেক দিন ধরে, তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে দেখেছেন, অন্য রকম। ক্লেদ থেকে ক্লেদে, বিফলতা থেকে বিফলতায়, ম্লানতা থেকে ম্লানতায় মানুষের এক নিশ্চিত, স্তিমিত গতি এবং অবসান— মাঝখানে শুধু জংলা বাতাসের মতো মাতালদের জড়িত স্বরের হৈ চৈ—যোনি থেকে যোনিতে পরিভ্রমণ, বিশ্রাম, উদ্ভব, ভার খালাস করে দেওয়া—অরুণেশ বলতে চেয়েছেন এই সব দুর্জ্ঞেয় অনুভূতির কথা। বেশ্যাপল্লী ও ভাঁটিখানার বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর সেই অবাচ্য অনুভূতিকে শরীরী করেছে, না সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার দীর্ঘ সংসর্গই তাঁকে ওই অনুভবে নিক্ষেপ করেছে, এ প্রশ্ন অবান্তর। কেন না অরুণেশের চেতনার মর্মন্তরে বেশ্যা-অনুষঙ্গের ফিউশন ঘটেছে সৃষ্টিগ্রন্থির দুঃসাধ্য রহস্যের সঙ্গে—প্রতীক, সংকেত ও চিত্রকল্পে ভাসন্ত থাকার চেয়ে এ অনেক গহন অ্যালকেমির ফল। 'উত্তরের বুড়ী বেশ্যার দিকে আমার এই বন্দনাগান' অনায়াসে পৃথিবীরই প্রতি 'বন্দনাগান' হতে পারে :

তোমার দিকে আমার এই বন্দনাগান
এই শহরের পচে ওঠার মধ্য থেকে আমার মুখের গরম তাপ
তোমার দিকে, প্রথম শহরের থেকে বয়ে আনা কাঁচা ও সবুজ বাতাস
আর জঙ্গলের মধ্যে আলোড়নময় বাঁকাচোরা হাওয়া
আজ তুমি তোমার কুয়াশার মধ্যে বসে থাকো
বসে আছো সারা গায়ে শাদা চাদর জড়িয়ে
তুলোর থেকেও নরম ও দুঃখময় থোক থোক চুল…
সকালবেলার রোদে তুমি দেখ—সদ্য ঘুম থেকে জেগে-ওঠা
বেশ্যাদের লালচে হাই…
সায়ার মধ্যে ঘূর্ণিস্রোত তোলে হেঁটে-যাওয়া দুটি পা
তুমি দেখ এই সব সকালবেলায়…
এ রকম ভাবে তোমার পা একটু ছড়িয়ে যায় হিম-হিম রোদ্দুরের দিকে
বেতো হাঁটু গোল ও সোনালী মুদ্রার মতন ভেসে ওঠে
তোমার উরু ও স্তনের স্মৃতি ও বিস্মৃতির মধ্য দিয়ে রোদ ও বাতাস
তোমার শরীরের মধ্য দিয়ে রোদ ও বাতাস চলে আসে
একমুঠি শুভ্রতার মধ্যে ঘুরপাক খায় হাওয়া, খেলা করে

খেলা করে আর খেলা করে আর সুড়সুড়ি দেয়
রোদ ছড়িয়ে পড়ে আর প্রসারিত হয় আর ঝুঁকে পড়ে
ছোট্ট টিবির মতন রোমশ যৌনাঙ্গে তোমার…

আমাদের যোগাযোগহীন, পারাপারহীন প্রবাহের আরম্ভ ও শেষ কোথা থেকে কোথায় ? অরুণেশ দেখছেন : আমরা আরম্ভেই পরিত্যক্ত। প্রসূতি ও আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে ভেসে যেতে থাকি পৃথিবীর বিদেশী রাস্তায়। জন্মের বঞ্চিত স্নেহগ্রন্থি থেকে আমাদের বড রসক্ষরণ হয় :

জয়পুর থেকে আমার চিঠি যায়…
তুমি চিঠি পডতে পারো না, মা আমার,
তোমার শাদা ছানি ক্রমে রক্তিম ক্রমে নীলাভ হয়ে যায়
সেই হিজিবিজি আঁকা এক খণ্ড কাগজ হাতে নিয়ে তুমি বসে থাকো…
লাইটপোস্টের তলায় তুমি বসে আছো
ভিখিরির মতো তোমার পোশাক ভিখিরির মতো তোমার চুল
আধা-অন্ধ দুচোখ তুলে তুমি তাকাও
মেয়েদের হল্লা গলির ভেতর থেকে ভেসে আসে, তুমি শুনতে পাও…

কিন্তু আমাদের আর দেখা হবে না। আমরা ভেসে যেতে থাকি বিদেশের রাস্তায়, বেশ্যালয়ে, ভিখিরি হয়ে, মাতাল হয়ে, সরাইখানা থেকে সরাইখানায়, আর :

এক সরাইখানা থেকে আরেক সরাইখানায় হেঁটে যাবার পথে
আমার সঙ্গে আলাপ হল বেশ্যাদের
ক্লান্ত ঘুম-জড়ানো তাদের চোখ, চোখ কচলে হাই তুলে
সায়া ও ব্লাউজ পরা মেয়েরা বেরিয়ে এল আমার গলা শুনে…
চোলাইয়ের গ্লাসে আমার শাদাটে ঠোঁট নড়ে ওঠে
চোখ ও চশমা সুদ্ধু আমার মুখের ছায়া
নাথুয়া শাল বাড়ির নেপালী মেয়েদের হো হো হাসির মধ্যে
আমার দাড়ি ধূসর হয়ে আসে…

এবং এই ভাবে যেতে যেতে যেতে যেতে…একদিন :

মা,
আমাদের কোনো দুঃখ নেই আর, কোনো শোক
দুজনেই মরে পড়ে থাকব, দুজনেই
দুই দেশের দু-রকম রাস্তার পাশে
একইরকম ভাবে

আমরা কে, কোথা থেকে আসি, কোথায় যাই—সেই পুরোনো প্রশ্নের উত্তর নিজের মতো করে দিতে চেয়েছেন 'ঝাটে'র সবচেয়ে স্বাধীনচেতা, গভীর, শক্তিশালী অরুণেশু ঘোষ।

সতীর্থ আত্মজৈবনিকদের সঙ্গে দেবারতি মিত্রের প্রভেদ খুব স্পষ্ট। একই কালে দূর ঐতিহ্যে সুপরিচয় এবং সাম্প্রতিকের প্রতি সজাগতা তাঁকে অন্য, নিজস্ব দ্রাঘিমায় আকর্ষণ করেছে। ফলত তাঁর বোধ ও বাসনা প্রকাশের শব্দ ও রীতি, প্রয়োজনে, দূর-দূরান্ত থেকেও আহৃত হতে পারে। কোনো যোগাযোগসূত্রে তাঁর স্থানাঙ্ক নির্ণয় সম্ভব না।

উন্মেষকালীন কবিতায় দেখা যায় তাঁর তারুণ্য ছিল অনেকটাই জন্তুর মতো স্বাস্থ্যবান, নির্বোধ, শরীর-সুখী, প্রকৃতিলিপ্সু এবং সঙ্গীহীনতায় বিমর্ষ। দৃষ্টান্ত :

১ রাত্রিবেলা টেনে নিয়ে গেছি তোমার ঘাড় কামড়ে
রক্ত চারিদিকে পাপ কালো রক্ত নিশ্চিহ্ন জঙ্গলে—
তোমাকে আত্মসাৎ করেছি

২ আবেশে মুদিত তার তপ্ত মুখখানি ঢলে আছে
যে আমার বুকের উপর :
পাহাড়ী ঝিঁঝির ম্লান ছায়াঘন গান,
নিমজ্জিত অরণ্যের অন্ধকার জ্বর।

৩ ওষধির খোঁজে আমি ঘুরব না বনে বনে আর ;
আমার মাথার ক্ষতে ব্যথাহীন অসাড় অজ্ঞতা—
আমাকে বোলো না তুমি কোনোদিন যেতে
সঞ্জীবনী ঝরনার পায়ের তলায়।
আমি আর কাঁদব না, আমি আর খুঁজব না পথ,
কাতর রহস্য থেকে চলে যাব একা ছুটি নিয়ে।

কিন্তু আত্মকরুণার নিষাতন থেকে ওই জন্তুর মতো অটুট মানসিক স্বাস্থ্যই তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনল, নতুন করে প্ররোচনা দিয়ে। এবার তাঁর অনুভবে নতুন এক ঔজ্জ্বল্য :

তারুণ্যের মধ্যিখানে রুক্ষ উৎকণ্ঠ চুল কড়া ঘাম
সৌরভ, পৌরুষ, স্নেহ, রক্ত, সিগারেট মাতাল করছে বিষণ্ণতা,
আমার গলায় হার হাওয়াতে ঝটকা লেগে
আটকে রয়েছে শাদা নিথর বোতামে

এই সময় থেকেই ক্রমশ নিসর্গসৌন্দর্যের আনন্দানুভূতি দেবারতির কবিতায় গভীর প্রত্যক্ষ। যেন ঝঞ্ঝাবর্ষণঘোরা পৃথিবী ক্রমশ চলেছে শরৎকালীন আবহাওয়ার দিকে। কবির মূল ভালোবাসা ও সৌন্দর্যতৃষ্ণা যেন তাদের অন্ধ, ঘন বলয় ছেড়ে যাচ্ছে নির্ভার

লঘু ব্যাপ্তির দিকে। দৃষ্টান্ত :

নরম সূর্যের কুচি একঝাঁক অতসীর মুখ
হঠাৎ আড়াল থেকে বলে উঠল টু,
চতুর্দোলার মতো বাগান বিজন বৃষ্টিপাত
বৃষ্টিপাত থেমে গেছে···
বেদেনী দুর্গাব মূর্তি, বিকেলের রূপকথা আলো
ঘামতেল চাপচাপ অষ্টধাতুর মেঘ

দেখা যাচ্ছে, একদিন যে শরীরে, মনে হত, নামছে 'পাহাড়ী ঝিঁঝির ম্লান ছায়াঘন গান, নিমজ্জিত অরণ্যের অন্ধকার জ্বর', সেই শরীরকে এখন অনুরূপ বা আরো প্রখর পারিপার্শ্বিকে মনে হয় : 'তার কাছে গেলে জাহাজের স্ক্রু খুলে যায় / আলগা হালকা নিষ্ঠ নির্জন শরীর'। বোঝা যায়, ক্রমশ শরীর তলিয়ে গিয়ে ভেসে উঠছে মন।

এই পর্যায়ও কেটে গেলে, ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, অকৃত্রিম সৌন্দর্যই দেবারতির শান্তির আশ্রয়। তবু শেষ পর্যন্ত তিনি পান অন্য এক দেশে জেগে ওঠার স্পৃহা :

পারার চেয়েও আট হাজার গুণ ভারী
অতি নীল পৃথিবীহীন গূঢ়তায় ডুবিয়ে দাও আমাকে
সে পাখি হও কিংবা সক্রেটিস।
স্বপ্নবাসবদত্তা, কোয়াণ্টম থিয়োরি
সানফ্লাওয়ার, রাগ পটদীপ
এবং অফুরন্ত ইত্যাদি
রোজ দুপুরবেলা আমি তোমাদের জন্য
দরজা জানলা খুলে বসে থাকি।

'আমি আর ভালোবাসা আর স্মৃতি'—এই তিনজন নিয়েই ছিল মঞ্জুষ দাশগুপ্তর আত্মজৈবনিক কবিতা। চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে যে অল্প কজন কবি সুরম্য শব্দশিল্পে শোভন কোমলতা ও বিষণ্ণ আবেগ-মাধুরীর চর্চা করেছিলেন, মঞ্জুষ তাঁদেরই উত্তরসূরি, তাঁর 'অন্য বনভূমি' বইটিতে।

ব্যর্থ ভালোবাসার স্মৃতি তাঁর কবিতায়, সমস্ত আবহ যেন এক অপরাহ্লের নদীপাড় —ভিজে, অভিমানী, এখন-রঙিন, কিন্তু অন্ধকারের পূর্বাভাসে বিষণ্ণ:

সন্ধ্যার আঁধারে তুমি বলেছিলে প্রায় স্তব্ধ মাঠের ভিতরে—
কারা যেন দূর থেকে ডেকে উঠছে থেকে থেকে দ্রুত
তোমার নামটি ধরে 'পুতুল' পুতুল'···

৬

'ঘাটে'র কবিতার পূর্বোক্ত প্রধান ধারাগুলি থেকে গীতা চট্টোপাধ্যায় নিজস্ব নিষ্ঠায় স্বতন্ত্র। বলা যায়, তিনি একাই একটি ধারা। তাঁর কবিতা মুখ্যত বিষয়নির্ভর। এবং সেই বিষয়ও বিচিত্র ও বহুমুখী। তিনি যেমন বিদ্যাসাগরের কথামালার স্মরণে কবিতাগুচ্ছ বা সিরিজ রচনা করেন, যেমন মনুসংহিতা বা কালিদাস বিষয়ে আরো এক সিরিজ, তেমনি ধ্বনি, শব্দ, কবিতা, ক্রিকেট, খরগোশ শিকার, ব্রহ্মপুত্র, গল্‌ফ্‌ মাঠে আঠারো হোলের খেলা, ফায়ার প্লেসে প্রবাস-সন্ধ্যা, বার্থ ডে পার্টি, 'ও' ব্লাড-গ্রুপের কিডনি, ফুটবল-উৎসব, সন দু হাজার বিরাশি, পুলিশ বিদ্রোহ, কনজাংটিভাইটিস, সায়েব বাড়ি ভাঙা হচ্ছে ইত্যাদি এমন কি পালকাপ্যের হস্ত্যায়ুর্বেদ নিয়েও সমান মনোযোগে রচনা করেন অজস্র কবিতা।

একটি একাকী-কবিতা লেখার চেয়ে কবিতাগুচ্ছ বা সিরিজ রচনার দিকেই তাঁর ঝোঁক। সিরিজের কবিতা—সাধারণত একটিব সঙ্গে আরেকটি, চিন্তা বা ভাব বা অন্য কোনও পরম্পরা-সূত্রে বাঁধা থাকে। এবং এই ধরনের কবিতায় স্বতঃস্ফূর্ততার চেয়ে বেশি আসে রচনার ধর্ম, অন্তত কোনো সঙ্গোপন প্রাক্‌পরিকল্পনা। এ সব কবিতায় আমরা টের পাই তাঁর বহির্জীবনের অভিজ্ঞতা, তাঁর পাঠের পরিধি, তাঁর কল্পনার প্রবণতা। দেখা, শোনা, পড়া ও অন্বেষণ এই চারে মিলিয়ে তাঁর চিন্তা-অনুভূতি প্রক্রিয়া।

সহস্রমুখের সব মুখ কখনো সমান সুন্দর বা সুগঠিত হয় না। গীতা চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার অগণ্য মুখের সবচেয়ে শ্রেয় এবং প্রেয় মুখটি সম্ভবত প্রাচীনকালের বাঙলাদেশ। বাঙলাদেশের ইতিহাস, পুরাণ, পুথি, কিংবদন্তীতে ছড়ানো বাঙালিজীবনের বিচিত্র তথ্য সমস্ত দূরপ্রসার আবহ নিয়ে গীতা চট্টোপাধ্যায়ের কল্পনায় যেন প্রাণ ফিরে পায়। কবিপ্রত্নবিদের মতো তিনি সেই সব ছেঁড়া, হারানো, ঝাপ্‌সা দিনগুলোকে তাঁর কল্পনা ও বিদ্যা-মনীষায় জোড়া দিয়ে নিয়ে পুনর্গঠিত করেন :

১ কলাগাছ উলুটানা ছায়াপথে লগ্ন-শেষাবধি
বিজন কোকিল-ডাকা রমণীয় পাড়ে এসেছো যে,
তারি তো তরঙ্গধ্বনি অখিল গুণ্ঠনবতী চোখ!
সমস্ত হলুদ নিয়ে পৃথিবীর গায়ে-হলুদের বনে আলো
তোমার দৃষ্টির আগে পরপার গোধূলি কাঁপালো।

'বাঙলার বর'

২ স্তিমিত রাত্রির খাটে ঘনবর্ষা পিচ্ছল দর্শন—
জোনাকিকাঁটার থোঁপা, শেষ আলো, তাও নির্বাপণ!
ঝিঁঝির অস্পষ্ট দেহ শব্দময় হবে কত আর

কোয়া শাড়িটির মুখ আতরের লজ্জায় মরেছে।
আলপনার গণ্ডিটানা সেই এক আড়-অন্ধকার
পালঙ্কে পরম শুয়ে, রুপোর জাঁতিটি রাঙাধুতি
প্রথম দিনের মতো শুধু এক ধূসর আকৃতি
ঘোমটার মায়াবী সুতো ধরে যা বেধেছে পোড়া চোখ···

'কর্তার ঘোড়া দেখে রাসসুন্দরী'।৭

৩ স্বপ্ন নেমে এলে মাঠে, রাঢের তমালে দিনশেষ
কৃষ্ণকীর্তনের মাঠে সাক্ষাৎ এলেন ব্রজেশ্বরী,
শারদীয়া একাদশী, শুক্লা জ্যোৎস্নামাখা একরাশ
আকাশগঙ্গার জলে উবুছুবু মুছে নেন কেশ···

'যে-দেশে কোকিল ডাকতো'।৮

কিন্তু মাত্র তিনশো বছর না, আরো প্রাচীনতর দিন তাদের গোধূলিবিষণ্ণ সৌরভ নিয়ে পুনরুজ্জীবিত হয় গীতা চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়। সৌভাগ্যক্রমে এই কবিতা শুধু সেই কালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—টের পাওয়া যায় সময়ের নীরব চলমানতা—পাখির রেখাহীন শূন্যপথের মতন সর্বদা অস্পষ্টভাবে ধরা থাকে এই অতি-সাম্প্রতিক কালের সঙ্গে সেই হারানো কালের যোগাযোগ, আসা-যাওয়া।

কমল তরফদার আর একজন, অভিনবত্বের প্রয়াসে স্পেন ও দক্ষিণ আমেরিকার পটভূমি এবং নরনারীদের সরাসরি এনেছেন তিনি কবিতায়। নিজেকে কখনো তিনি রেড ইণ্ডিয়ান, কখনো গাউচো, কখনো জিপসি হিসেবে কল্পনা করেছেন, সাধারণ বাঙালি পাঠকের অজানা হিস্পানী শব্দ নির্ভয়ে বসিয়েছেন কবিতায়—

লাল জুতো পা, কালো জুতো পা, সবুজ শাদা—
নাচের বাহার···
ঘুরছে কেমন তন্বী শরীর নারীর শরীর রমণীয়
ড্রাগন প্যাঁচের ল্যাজ ঘোরায়
কুমির ধরে কামের কায়া
সাপিনী তার সবুজ শরীর
বাঁকিয়ে হেসে ছড়ায় মায়া (হায় রে হায় ফ্লামেন্‌কো)
রক্ত নখ, জিপসি মুখ, আদব-ঢঙে ভারতীয়···
স্বপ্নে কেবল ডাকতে থাকে
সেভিল, কাদিজ, করদোবা।

হায় ফ্লামেন্‌কো।

'ষাটে'র কবিদল ও নিজস্ব সতীর্থগোষ্ঠীর মধ্যে অশোক চট্টোপাধ্যায় একজন অনিবার্য আধুনিক। সমস্ত না, কিন্তু তাঁর অনেক কবিতাতেই, দেখা পাই নির্ভার ফুরফুরে এক তাজা আধুনিকতার। চাতুরীহীন শিল্পের সদাত্মা যেন আড়ালে থেকে তাঁর কবিতার মুখমণ্ডলকে অকৃত্রিম লাবণ্য ও অনাড়ষ্ট সজীবতায় ভরে দেয়। পাখাহীন, অথচ ভিতরের প্রোপালশনে যেমন গতিময় হয়ে ওঠে জেটপ্লেন, তেমনি অন্তর্গত সংহতি, তাজা কল্পনা এবং বুদ্ধির অভিনিবেশে গতি এবং ঋজুতা পায় তাঁর কবিতা। তাঁর নাতিশীতোষ্ণ ভাষায় কোনো গিমিক্ বা চমক নেই, তবু তাঁর স্বাতন্ত্র্য পাঠকের কাছে অস্পষ্ট থাকে না। নিজের কবিতা সম্বন্ধে তাঁর প্রশ্ন ও উত্তর এই রকম :

> শাস্ত্রে বলে কবিতা বিষ্ণুর অংশ
> কবিতা স্বর্গের সিঁড়ি
> এ সব কি সত্যি কথা ?
> আমার কবিতা পড়ে কি এ সব মনে হবে ?…
> এখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে
> কয়েকটি ভৌতিক ঘোড়া
> জানি দরজা খুললেই তারা দৌড়বে এক এক দিকে
> নানা রঙে আর রেখায়
> আমার কাজ হবে তাদের অনুসরণ করা

অশোকের রোম্যান্টিকতাও যেন হালকা, ফুরফুরে—কোনো এক প্রাচীন অনুষঙ্গে তা ভারাক্রান্ত নয়, অথচ কোথায় যেন দূরের সঙ্গে যোগ থেকে যায়। যেন কোনো নারীর গায়ের অলঙ্কার—কারুকার্য হারিয়ে শুধু ঝিলিক দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তাঁর লেখায় পাই অফুরান নিরাবরণ আস্তিক্য :

> এ জন্মে মানুষ হয়েছ কিন্তু গত জন্মে হয়তো দেবতা ছিলে
> সামনের জন্মে হয়তো গাছ বা পর্বত বা সমুদ্র হতে পারো…
> আমি কিন্তু বই পড়ে জেনেছি
> আমার এক পূর্বপুরুষ মাছ ছিলেন
> তারও আগে গুল্ম
> তার আগে সঠিক জানি না
> বোধ হয় দেবতা ছিলেন—ব্রহ্ম
> নাম ছিল
> শ্রী ব্রহ্মদেব চট্টোপাধ্যায়

পঞ্চাশেরই কবিতা-আবহাওয়ায় নিজেদের লালন করেছিলেন করুণাসিন্ধু দে, বঙ্কিম

মাহাত, রুচিরা শ্যাম, শান্তনু ঘোষ, সুব্রত চক্রবর্তী ও যোগব্রত চক্রবর্তী। সুব্রত ও যোগব্রত অকালপ্রয়াত। অন্যেরা, বহুদিন হল, কবি হিসেবে অজ্ঞাতবাসী। মনে পড়ে রুচিরা শ্যামের মৌলিক অনুভূতি ও শিল্পমাধুরী :

'এখন অপেক্ষা করা ঘর ঘিরে নিশ্চিত আষাঢ়
পদ্মনালে জড়াজড়ি জট খুলতে মাথা নাড়ে ফুল,
এ বড় পিছল ঘাট, হাসতে গিয়ে শেষে কাঁদতে হয়—
তোমাকে বলেছি সই, জল আনতে নদীতে যাবো-না।'

এ ছাড়াও দেখতে পাই অগ্রজ-'পঞ্চাশে'র সঙ্গে গভীর সাজাত্য রয়েছে শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, শংকর দে, শান্তনু দাস ও অরুণ বসুর। তাঁদের নিজস্ব উচ্চারণে ওতপ্রোত হয়ে আছে দীক্ষিত সেই সপ্রতিভতা। অন্য দিকে বাঙালি কবিত্বের প্রথা-প্রচল ধারাকেই যেন অবলম্বন করেছেন আশিস সান্যাল, বাসুদেব দেব, সুশান্ত বসু, রূপাই সামন্ত, পরিমল চক্রবর্তী, মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত ও শিশির ভট্টাচার্য।

বিনোদ বেরার উপাদান পল্লীপ্রকৃতি ও পল্লীবাসী মানুষ। অন্য মেরুতে আছেন দেবী রায় ও তুলসী মুখোপাধ্যায়—দু জনেই মানুষের দুর্দশায় ক্রুদ্ধ এবং ক্ষুব্ধ। অনন্ত দাশের ব্যক্তিগত উপলব্ধি কেলাসিত হয়ে আসে মানবতাবোধে। সমকালীন মুকুল গুহ কিন্তু অন্য রকম। তাঁর কবিতা অতীন্দ্রিয়তা ও রহস্যে খচিত।

কেতকী কুশারী ডাইসন কবিতায় অত্যন্ত স্বচ্ছ, স্পষ্ট ও সাবলীল। তাঁর কবিতা যেন দুই স্বদেশের উজ্জ্বল দিনলিপি—গার্হস্থ্য রেখাচিত্রমালা। মতি মুখোপাধ্যায়েরও কবিতায় পাই তাঁর জীবনের ও কর্মের অনুষঙ্গ। ত্রিদিবরঞ্জন মালাকার, উত্তম দাশ, ঈশ্বর ত্রিপাঠী সচেতন ভাবে কবিতার গঠন ও অন্তর্বস্তু সম্বন্ধে নিজস্ব চিন্তায় চিন্তিত। প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ মনে রাখতে চান একই সঙ্গে ঐতিহ্য ও সমসাময়িকতাকে। মানিক চক্রবর্তী খোঁজ করেন অসম্ভূত আগামী সময়কে।

পরিশেষে, প্রবন্ধটি সম্পর্কে দুটি অসম্পূর্ণতার কথা জানানো প্রয়োজন মনে করি। এই আলোচনায় ষাট-দশকের কবিদের প্রায় প্রত্যেককেই উল্লেখ করার চেষ্টা হয়েছে, তবু সেই দীর্ঘশ্রেণীর হয়তো কয়েকজন আমার অনবধানতাবশত অনুল্লিখিত থেকে গেছেন। তা ছাড়া, 'ষাটে'র অনেকেই এখনো তরুণ। আয়ুষ্মান, অনুশীলনশীল কেউ কেউ ভবিষ্যতে কোন্ পরিবর্তন বা পূর্ণতার দিকে যাবেন এখনই তা বলা সম্ভব নয়। এখনই কোনো শেষ কথা নয়।

৯

ভাষার মুদ্রা—আধুনিক কাব্য

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

উনিশশো উনচল্লিশ সাল, তেইশে এপ্রিল — সেই পুরী, সেই সার্কিট হাউস, দোতলার বারান্দা—সামনেই প্রলাপিনী, আন্দোলিত সমুদ্র, যেমনটি ছিল সাতচল্লিশ বৎসর আগে, 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতা লেখার দিনে[১]। শুধু, সেই কলমটা নেই। সমুদ্রের উদ্দামতা, যা ছিল তাঁর সাতচল্লিশ বছর আগেকার কবিতার বিষয়, আজ তাঁর চোখেই সে উদ্দামতা স্তিমিত। নতুন কবিতার অজানা জগতের দিকে যাত্রায় তিনি আর উৎসাহ পান না। অথচ তাঁকে ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত করে, প্রত্যক্ষত তাঁকে ছাড়িয়ে যাবার প্রয়াস তৃতীয়-দশকে যার শুরু, চতুর্থ-দশকেই তা একটি সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে নিজের নিজের স্বতন্ত্র কবি-ব্যক্তিত্বের যৌথ সমাহারে রচনা করছেন তখনই এই আন্দোলনের সামষ্টিক রূপ—'আধুনিক কবিতা' তার ডাক-নাম। চতুর্থ-দশক শেষ হবার আগেই এ কথা স্থির হয়ে গেল যে, কাব্যভাষা, প্রসঙ্গ-প্রকরণ রবীন্দ্রসীমানা পার হতে চলেছে। এবং আশ্চর্যের বিষয়, নিজের তৈরি করা নাটমন্দির কালের হাতে সমর্পণ করে সেই বৃদ্ধ পথিকও স্খলিত পদে এই সব দৃপ্ত পথিকের সঙ্গ নিতে চাইছেন মতাদর্শে তার প্রমাণ পাওয়া কঠিন বটে, কিন্তু কবিতায় তার পরিচয় দুষ্কর নয়। 'ঐ শালগাছ পঞ্চাশ বছর আগে যে অম্লান ফুল ফুটিয়েছিল, আজও ঠিক সেই ফুলই ফোটাচ্ছে কিন্তু ক্ষণিকায় আমি ত্রিশবছর বয়সে যে কবিতা লিখেছি, আজ আমি সে কবিতা লিখি নে।'[২] অথচ 'পরিচয়-বদল' ব্যক্তি ও জাতির জীবনে ঐতিহাসিক অনিবার্যতায় ক্রমেই দেখা দেয়—এ কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ কবিজীবনে সুন্দর প্রমাণ করেছেন।

কেন বাঙলা কবিতার পরিচয় এ শতাব্দীর চতুর্থ-দশকে বদলে গেল, কেন প্রয়োজন হল নতুন অভিজ্ঞানের, সে আলোচনাকে আমরা দুটো খাতে বইয়ে দিতে পারি। এক, পরিচয়-বদলের কারণটা কী, অথবা কী কী? দুই, পরিচয়-বদলের স্বরূপটা কী? বর্তমান আলোচনায় আমরা প্রথম প্রশ্নের মীমাংসার দায়িত্ব বিশেষ গ্রহণ করব না। বিনয় ঘোষ, বিমল সিংহ, গোপাল হালদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সে

১. চিঠিপত্র, একাদশ খণ্ড। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ২২৭।

২. ১৩ই জুলাই ১৯৩৯। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি।

আলোচনা করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে পরিবর্তমান বিশ্ববাস্তবতা ও বিশ্ব-ভাষা কেমন করে কবিতার প্রাথমিক শর্তগুলিকে স্পর্শ করেছে, প্রভাবিত করেছে, সামাজিক-ঐতিহাসিক দিক থেকে তার ব্যাখ্যা বিভিন্ন সময়ে হয়ে গিয়েছে। আপাতত আমাদের আলোচনা দ্বিতীয় খাত ধরেই চলবে—চতুর্থ-দশকে বাঙলা কবিতার যে-পালাবদল শুরু হল, তার স্বরূপটা কী? এ সম্বন্ধে সব চেয়ে ভালো দিশারি নিশ্চয় আধুনিক কবিরাই। কবি-ব্যক্তিত্বের দিক থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত, অথচ গুরুত্বপূর্ণ কবিকৃতির অধিকারী, দুজন কবির আধুনিকতা-বিষয়ক চিন্তার আলোকে বিষয়টি অনুধাবন করা যাক। জীবনানন্দ দাশ 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা' আলোচনায় বলেন :

> প্রত্যেক বিশিষ্ট কবিই তাঁর যুগ ও সমাজ সম্বন্ধে সচেতন থেকে ভাবনা প্রতিভার আশ্রয়ে যখন কবিতা লিখতে যান, তখন তাঁর কবিতার আঙ্গিক ও ভাষা বিচিত্র ভাবে সৃষ্ট হয়—এমন একটা অপরূপ সঙ্গতি পায় যা তাঁব কবিতায়ই সম্ভব—অন্য কারু কবিতায় নয়। আজকাল বাংলাদেশে যাকে আধুনিক কবিতা বলা হয়, তার জন্মের ইতিহাস সম্পর্কে যদি উপরের কথাটি প্রয়োগ করতে পারি তবেই তা সার্থক।

অন্য দিকে বিষ্ণু দে 'একালেব কবিতা'র ভূমিকায় বলেন :

> কবিতারচনা মাত্রেই আত্মসচেতনতার এক কর্ম। এবং সে হিসাবে আধুনিক কাব্যের বংশ পরম্পবা অতিদীর্ঘ। কিন্তু ঐতিহাসিক কারণে যতই মানুষের ব্যক্তিসত্তা সমাজাতিরিক্ত, যতই সমাজবিচ্ছিন্ন-বা-বিরোধীই হয়ে উঠছে, ততই আত্মসচেতনতার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।

লক্ষ্য না করে পারা যায় না সচেতনতাব প্রতি দুজনের সমান আগ্রহ। এবং লক্ষ্য না করে থাকা যায় না 'প্রতিভা' শব্দটিকে একা একা মঞ্চস্থ করতে জীবনানন্দ রাজি নন, তাই 'ভাবনা প্রতিভা'। বিষ্ণু দে ঠিক ওই অর্থে না হলেও 'মনন' শব্দটিকে তুল্য গুরুত্ব দেন। স্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথও 'প্রতিভা'কে স্বনামে চালাতে চান না। তিনিও তার এক নাম ঠিক করেছিলেন—'বিশ্বমানবমন'[৩]। সে যাই হোক, জীবনানন্দ যখন বলেন কবির কবিতার অনন্যসম্ভব 'সঙ্গতি'র কথা, বিষ্ণু দে যখন ব্যক্তি সত্তার নির্বিশেষ আকৃতির প্রকাশকে বিশেষের আততিতে বা 'কাব্যশরীরের সজ্ঞান নির্দিষ্টতায়' বাঁধার কথা বলেন, তখন এই দুই ভূয়োদর্শী কবির উপলব্ধি কাছাকাছি আসে। বস্তুত শুধু এঁরা দুজনেই নন, অমিয় চক্রবর্তী বা বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কি সমর সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র কি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপলব্ধির উচ্চারণে যতই

৩. 'সাহিত্যের বিচারক', সাহিত্য।

ব্যবধান থাক না কেন, এঁরা সকলেই নিজ নিজ সচেতনতা ও সংবেদিকতাকে বাঁধতে চেয়েছেন স্ব-তন্ত্র বস্তুজ্ঞানে ও রূপধ্যানে।

প্রাথমিক পর্যায়ে আধুনিক কবিতা সেই বস্তুজ্ঞান ও রূপধ্যানের অভিনবত্বকে সহসা উপস্থাপিত করেছিল, সেই আকস্মিকতায় ঝাঁকানি লেগেছিল পূর্বসংস্কার-লালিত পাঠকচিত্তে। তাই উঠেছিল দুরূহতার ও দুর্বোধ্যতার অভিযোগ। কিন্তু আসল কথা, প্রকৃত কবি সকল কালেই নিজ সময় অপেক্ষা অগ্রবর্তী। তাঁর সমসাময়িকেরা যে কাব্যসংস্কারে অভ্যস্ত তিনি সেটাকে ভাঙেন বলেই তিনি নতুন কবি। এবং এ কথায় কোনো সন্দেহ নেই, যে কবি অ্যাভারেজ-পাঠকের বৃহত্তর সীমাকে কবিতা লেখা মাত্রেই স্পর্শ করে ফেলেন, তিনি ঐ অ্যাভারেজ-পাঠক-পরিতোষণ-সম্ভব প্রসঙ্গে-প্রকরণেই নিজেও বন্দী। রবীন্দ্রনাথ যে চিরকালের আধুনিক কবি, তার একটা কারণ এই, তিনি তাঁর পাঠকসমাজকে কোনো রুচিবৃত্তে বন্দী রাখেন নি। তিনি অত্যন্ত জীবিত কবি ছিলেন বলেই তাঁর ভিতর দিয়ে পৃথিবীর মৃত কবিরা মৃত্যুহীন বলে পরিগণিত হলেন। অথচ সংযোগের সেতু নিয়ে তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না, সে সমস্যার মোকাবিলায় তিনি কোনো দিন পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তাই তাঁকেও বিভিন্ন সময়ে পুরোনো পাঠক হারাতে হয়েছে, নতুন পাঠক গড়ে নিতে হয়েছে দুরূহতার অভিযোগ তাঁকেও সহ্য করতে হয়েছে—'অস্পষ্টতা'-নামে। দুরূহতার অভিযোগ 'তিরিশে'র কবিদেরও বহন করতে হল—'দুর্বোধ্যতা'-নামে। রবীন্দ্রনাথের দুর্বোধ্যতার কারণ হল, তাঁর বিশ্বনাগরিকতা আমাদের খণ্ড, খঞ্জ, অর্ধগঠিত ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত জীবনের সামনে মেলে ধরতে চেয়েছে বন্ধনবিহীন মনুষ্যত্বের আনন্দ। আর, এঁদের দুর্বোধ্যতার কারণ হল এঁদের সময়মনস্কতা সংজ্ঞাহারা মানুষের নতুন সংজ্ঞা-সন্ধানের যন্ত্রণাকে অঙ্গীকার করেছে। দু দিকের অভিজ্ঞতাব ব্যবধানই এর মূল কথা।

২

শব্দই স্মৃতি। শব্দই অভিজ্ঞতা। শব্দেই গান। শব্দেই অনুষঙ্গ। আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রেও শব্দই অভিজ্ঞান। কবিতার ধ্বনিগত-কাঠামোর প্রধান উপাদান শব্দ। এবং সংগীতে ধ্বনি যতই সুর-সংযোগে আভিধানিক ভাবে অর্থ-ব্যতিরিক্ত, অথচ সর্বজনীন ভাবে আবেগবহ হতে পারুক না কেন, কবিতায় অর্থ-নিরপেক্ষ ধ্বনি অসম্ভব ও অবাঞ্ছনীয়। তথাপি ছন্দের ভাষা বলেই কবিতা বোধ হয় আদিম জন্মের জের মুছে ফেলতে পারে না। ছন্দ ভাষাকে দেয় অতিরিক্ত জীবনীশক্তি। দেয় বিচিত্র হবার ক্ষমতা। আমরা দেখেছি একই শব্দ দুই ছন্দে—এমন কি একই কবির হাতেই, দুই

আলো ছড়ায়।" ধ্বনির সঙ্গে আবেগের সহজাত একান্ত মানবিক সম্পর্কটি এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়। উপলব্ধি এবং মূল্যায়নের সঙ্গে কবিতার ধ্বনিগত কাঠামোর যোগটিও অনুধাবনীয়। সে অনুধাবনের পথেই স্পষ্ট হবে কবির জীবন-সংক্রান্ত উপলব্ধি কেমন করে হয়ে ওঠে শব্দার্থের নিয়ামক, সংগঠক ও প্রসারক। এ পথেই জানা যাবে, কোথায় বাঙলা আধুনিক কবিতার ধ্বনিগত কাঠামোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতার ধ্বনিগত কাঠামোর পার্থক্য।

তাই তো, এ পথে রবীন্দ্রনাথেব কবিতার 'আমি'-চরিত্রটির সঙ্গে বিশ্বের অন্য রোম্যান্টিক কবিদের 'আমি'-চরিত্রকল্পনার অমিলটি আগে বুঝে নিই। কেন না সেই 'আমি'ই তো শব্দগুলিকে দেবে তাঁর অভিজ্ঞতার, আবেগের, স্মৃতির রূপস্পন্দন। দেবে নির্মিতিকে অভিজ্ঞান। শেলি, বায়রন, কি হুগোর নায়ক 'আমি'—যেমন বলেছেন জে. এম. কোহেন, যেন প্রমিথিয়ুসেব অন্তবাগ্নির অংশভাক্। যন্ত্রণায় এবং যন্ত্রণার গৌরবে সে 'আমি'-কল্পনা বিশিষ্ট। সমাজের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত, তবু সে-'আমি'র দৃঢ় প্রত্যয ছিল তাঁদেব নিগ্রহের ভিতব দিয়ে সমাজে তাঁরাই কল্যাণকৃৎ হবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ছিল উল্টো। তিনি নিজেই পরিহার করেছিলেন এখানকার ঔপনিবেশিক জীবনের সংকীর্ণ মন্থরতা, জরদ্গব পুনরাবৃত্তি, সীমিত দিগন্তেব ঘূর্ণাবর্ত, পুরুষার্থের বিবর্ণ ব্যর্থতা। প্রমিথিয়ুসের মতো তিনিই অগ্নিগ্রাহী হবেন, অথবা হারকিউলিসের মতো তিনিই অজিয়ান আস্তাবল সাফ করবেন—এ কল্পনা তাঁর ছিল না। অন্ধকারকে মাত্র স্পর্শ করেই তিনি বলে ফেলেছিলেন সারা জীবন ধরে এক অদ্ভুত কথা—ব্যাপ্তি ও বিকাশের পিপাসাই আলোক, আলোকেরও অধিক। এই বিশেষ অনুভূতি তাঁর মধ্যে সক্রিয় ছিল বলেই তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রায় অর্ধেক ক্ষেত্রে কবিতাব নির্দিষ্ট ভূমিকে ছেড়ে চলে যেতে চায় গানের অনির্দেশ্য অনির্বাচ্য জগতে। কেন না ওই আলোক প্রতীক্ষাঘন কল্পনায় অসংজ্ঞেয়, যদি না অতীন্দ্রিয়।

আধুনিক বাঙালি কবির 'আমি' নায়ক নয়। এমন কি ভোক্তা বা দ্রষ্টা-মাত্রই নয়। হতে পারে সে বিশ্লেষক—কিন্তু সে বিশ্লেষণ সমাজের নয়, রাষ্ট্রের নয়, নিজেকেই ব্যবচ্ছেদ। সেই আত্মব্যবচ্ছেদের ওপর আলো ফেলার জন্যই ডাক পড়েছে সমাজ-রাষ্ট্র-মনস্তত্ত্ব-ইত্যাদিব। অমিয় চক্রবর্তীর মৃদু আলাপনী ভঙ্গি, বুদ্ধদেব বসুর রোম্যান্টিক নির্জনভাষণ, সুধীন্দ্রনাথের প্রৌঢ় বিষণ্ণতা, জীবনানন্দের চিত্রল চিন্তা, বিষ্ণু দে-র ব্যাপ্তির পিপাসা—সবই একটা-সময়ের আত্মজিজ্ঞাসার এক এক অংশ। খুব স্থূল কথা—কিন্তু না লক্ষ্য করে উপায় নেই যে, আমাদের কথিত আধুনিক কবিরা কেউ গান লেখেন নি। জিজ্ঞাসা যেখানে বিশ্লেষক সেখানে গান আসে না। ব্যবচ্ছেত্তার গান নেই। না থাক গান, তবু লক্ষণীয়, সংগীতের—ভারতীয় এবং পাশ্চাত্ত্য সংগীতের

রূপকল্প এঁদের কবিতার বহিরঙ্গে ও অন্তরঙ্গে প্রভাব ফেলেছে। প্রধানত সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে, এবং অমিয় চক্রবর্তী এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় যে বারে বারে ওই সময়ে ঊর্ধ্বচূড়া মন্দির-মিনার, বা বৃক্ষাগ্রভাগ[৪] ছায়া ফেলেছে, দেখা দিয়েছে 'সিঁড়ি'—তা সংগীতের ধর্মের স্মারক। অবরূঢ় অবস্থা থেকে তাও উঠে যেতে চায় অশেষের দিকে। সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে কাব্যাংশের বাদী-সম্বাদী স্থাপনায় যে কৌশল প্রয়োগ করেন তা পাশ্চাত্য সংগীতের গঠনশৈলির সঙ্গে তুলনীয়। সুরসঙ্গতির দিক থেকে যে প্রয়াস ছিল সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র, সুরলহরীর দিক থেকে সেই প্রয়াসই অমিয় চক্রবর্তীর। এই দু দিকের প্রয়াসই তাৎপর্য পেয়েছে তিনজনের বিশ্ববোধের জন্য। পক্ষান্তরে সংগীত ততটা নয়, চিত্রের পারম্পর্যে অনুভবকে সঞ্চারিত করা ছিল জীবনানন্দের লক্ষ্য। 'কঙ্কাবতী'-পর্যায়ে বুদ্ধদেবেরও তাই ছিল অভিপ্রায়। দুজনের পার্থক্য এই যে, জীবনানন্দের বর্ণ ও চিত্রগুলি অনেক সময় বিরলতায় ধনী। বুদ্ধদেবের 'কঙ্কাবতী'-পর্যায় ধ্বনি ও বর্ণের সমারোহে প্রসারিত।

৩

যে স্তরেরই হোক নিজের দেশ এবং সময়ের উপাদানের সহায়তায় তাৎপর্যপূর্ণ কবিমাত্রেই একটা বিশ্বভাষ্য রচনা করে নেন। এই বি শ্ব ভা ষ্য ব্যতিরেকে একজন কবি বড় কবি হয়ে উঠতে পারেন না। এই অর্জিত বিশ্বভাষ্য কাউকে দিয়েছে নিয়তি-বোধ, যেমন জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব; কাউকে দিয়েছে ত্রিকালের ছন্দ-বোধ, যেমন বিষ্ণু দে; কাউকে দিয়েছে আত্মিক-প্রশান্তি, যেমন অমিয় চক্রবর্তী। খুব শক্তিশালী কবিকেও স্তব্ধ হয়ে যেতে হয় এই বি শ্ব ত ত্ত্ব ব্যতিরেকে, যেমন সমর সেন; উদ্দেশ্যহীন রচনায় কালাতিপাত করতে হয় কাউকে, যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্র। বিষ্ণু দে-র 'ক্রেসিডা'-কল্পনা এবং জীবনানন্দের 'ক্যাম্পে'-কল্পনা প্রসঙ্গত আলোচ্য হয়ে ওঠে ওই বিশ্বতত্ত্ব-গঠনের স্বাতন্ত্র্যে। 'ক্যাম্পে'-কবিতায় জীবনানন্দ বলেন, মৃত্যু এ অস্তিত্বের শিয়রে জেগে আছে। তবু মৃত্যুর সতত-বর্তমানতা ভুলে গিয়ে অস্তিত্বকে হতে হয় ধারাবাহী। মৃত্যু এবং জীবনের সহাবস্থান অবিতর্কিত সত্য। 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থে বিষয়টি আর-একবার এসেছে 'শিকার'-কবিতায়। যা ছিল রূপকে প্রসারিত, তা হল প্রতীকে সংহত।

৪. উল্লেখ করা সমীচীন যে রবীন্দ্রনাথের আয়ু-প্রান্তবর্তী কবিতায়, বিশেষ করে 'আরোগ্য'র এ জাতীয় ঊর্ধ্বতাবাচক প্রসঙ্গের বহু ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। স্তব্ধতা, বিরাম, প্রশান্তি বা মহাপরিণাম অর্থেই ওই প্রসঙ্গগুলি এসেছে। অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এই যে অমিয় চক্রবর্তী তাঁর মানসিক আস্তিক্যকে আধুনিকতা দিয়েছেন প্রতিবাদী অভিজ্ঞতাকে বর্জন না করে।

আদিম নিটোল অস্তিত্বে সভ্যতা এসেছে অরণ্যজীবনে আরোপিত শিকারীর মতো। ছন্দ ভাঙতে শুরু করেছে তখনই। কবিতাটির গঠন, বর্ণলেপ, চিত্রকল্প তাৎপর্য পায় জীবনানন্দের বিশ্ববোধের জন্য। 'ঘাসফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল' কেমন করে 'মচকা ফুলের পাপড়ির মতো লাল' হয়ে গেল এ কবিতার বর্ণময় সোপান-পরম্পরা তা-ই বুঝিয়ে দেয়। 'সুন্দর বাদামী হরিণ' আসে স্বাস্থ্যময় স্বস্থ বাস্তব জীবনের প্রতীক হিসাবে। 'সোনার বর্শা' যৌন-জীবনের অদম্য উল্লাস। তারপরেই: 'একটা অদ্ভুত শব্দ'—এতক্ষণের বর্ণনায় কোনো আওয়াজের কথা ছিল না। 'অদ্ভুত' বিশেষণটি ওই অরণ্য ও আরণ্যের জন্যই অর্থ পায়। 'মচকা' শব্দটির অনুষঙ্গে জেগে ওঠে এমন ঘটনা-স্মৃতি যা চমক দেয় শ্রোতাকে। 'উষ্ণ লাল হরিণের মাংসে'র বর্ণনায় এবারে স্পর্শও যুক্ত হল: 'উষ্ণ' বিশেষণে। ভোগ্য হয়ে উঠল রঙ, যা এতক্ষণ ছিল রম্য। 'নিরপরাধ ঘুম': সভ্যতার অননুশোচিত নিশ্চিন্তা। অপর দিকে 'ক্রেসিডা'-কল্পনায় বিষ্ণু দে আনেন ট্রয়লাস-প্রতীকে এ কালের জটিলতার মাঝে প্রহত নায়কের জীবনবিস্ময়—জিগীষা নয়, জিজীবিষা যার নামান্তর। যে-স্বপ্ন দুর্মর লোকোত্তর এবং যে-সংগ্রাম দুর্ধর্ষ লোকায়তিক —তারই বৈপরীত্যে ও আলিঙ্গনেই জীবনের বিচিত্র বন্ধুরতা। শব্দের সমাহার এখানে হয়ে ওঠে অভিজ্ঞতারই প্রতাকী রূপান্তর। যেমন কেউ বলেন, 'ক্রেসিডা! আমার প্রচণ্ড আকুলতা / জিজীবিষু প্রজাপতির বিভ্রমণ'—এখানে জিজীবিষার অন্তহীনতা ও চঞ্চলতা শক্ত 'জ'-ব্যঞ্জনের পুনরাবৃত্তিতে প্রতিধ্বনিত। চসর-হেনরিসন-শেক্‌স্‌পীয়র ট্রয়লাস-কল্পনাকে এক এক নতুন বাতাবরণ দিয়েছেন। বিষ্ণু দে-র কল্পনাতেও তা এক নতুনতর তাৎপর্য পায় প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বিশ্ব ও স্বদেশের গ্লানি অপচার, অথচ অন্তহীন সংগ্রামের পটভূমিতে। শেক্‌সপীয়রের ট্রয়লাস অধিগত করেছিল এক অভিজ্ঞতালব্ধ অনাসক্তিকে, সে জানে গ্রীক-পক্ষে ও ট্রোজান-পক্ষে মূঢ়ত্বের সমাবেশ ঘটেছে সমান ভাবে। বিষ্ণু দে-র ট্রয়লাস এমন ভাবে নিজ চলিষ্ণু ভূমিকাকে গৌণ করে ফেলতে চায় না:

উষসী আকাশ ধূসর করেছে মরণের আনাগোনা।
হেলেনের বুকে শবসাধনার বিশ্রাম আর নেই।
আমার হৃদয়-ঘটাকাশে শুধু জীবনের আরাধনা।

৪

যাকে বলছি, যে বলছি, এই দুয়ের সহযোগিতায় গড়ে ওঠে কবিতার মানে। কবিতার মানেও ব্যক্তিগত। শুধু ব্যাখ্যার সময় তা হয়ে ওঠে সামাজিক। যেমন বলা যায় যে, 'রিপন তখনো সুরেন্দ্রনাথ হয় নি' অথবা 'শান্তিপুরে না, কৃষ্ণনগরে যাব,

তা হলে কলকাতা পৌঁছতে দেরি হবে না'—আজকের শ্রোতার কাছে এ সব বাক্যের অর্থ এই কারণেই সহজবোধ্য যে, শ্রোতা এবং বক্তার স্থান-কালের ঐক্যই এ সব বাক্যের অর্থ নির্ণয়ে সাহায্য করছে। বেশি পিছনে যেতে হবে না, উনিশশো পঁয়তাল্লিশেও প্রথম বাক্যটির জন্ম হয় নি। আঠারোশো সত্তরেও দ্বিতীয় বাক্যটি ছিল বোধাতীত এক অসম্ভবতার ওপারে। সে সব দিনের কোনো মানুষ যদি এ সব বাক্য শোনেন তা হলে এ মন্তব্য অবশ্যম্ভাবী—'এ কালের মানুষের কথার কোনো মানে হয় না'। আধুনিক কবিতার ভাষা বোঝা যায় না—এই অভিযোগের মূলেও কতকটা এই জাতীয় ব্যাপার রয়েছে। মানসিকতায় যিনি তাঁর যুগের, বা, সময়ের বাসিন্দা নন, তিনি আজকের কবিতার ভাষাকে ন্যায়তই দুর্বোধ্য বলবেন। এ কালের কবিতা-সংক্রান্ত তিনখানি বই আমার সামনে রয়েছে, প্রত্যেকটিরই প্রারম্ভিক আলোচনায় আধুনিক কবিতার ভাষায় আপাত-দুর্বোধ্যতার বিষয়টি সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। এ জাতীয় আলোচনায় প্রতি ক্ষেত্রে না হলেও প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে কবিদের সময়-সচেতনতার প্রশ্নটি উঠেছে। কবি তাঁর সময়ের মুখপত্র নন, মুখপাত্র। তাই, যিনি কবি তাঁর, একমাত্র তাঁরই, কোনো বধিরতা নেই—নেই বলে তিনিই পারেন সাড়া দিতে সময়ের উঁচুনিচু, সর্বজনীন-ব্যক্তিগত, সকল প্রকারের স্পন্দনে। তাঁর সময়ের পটে তিনিই সব চেয়ে জীবন্ত, সব চেয়ে সজাগ। আর, সকল সামাজিকের মধ্যে কবির নিজস্ব বিশিষ্টতা অন্য যে একটি কারণে চিরকালই প্রতিষ্ঠিত সেটি হল এই যে কবির সত্যবোধ এবং শব্দাগ্রহ অবিচ্ছেদ্য। সকল সজাগ ব্যক্তিই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সচেতন—কবির স্বাতন্ত্র্য এইখানে যে, তাঁর এই সচেতনতা বা অবধানতাই তাঁর প্রকাশমাধ্যম। এ কথা বলা যায় যে কবিতার ভাষা কবির অভিজ্ঞতারই ভাষা।

অবশ্য অভিজ্ঞতার কোনো তর-তম বিচার সম্ভব নয়। কেউ বলতে পারে না অভিজ্ঞতার কোথায় আরম্ভ, কোথায় বা শেষ। অভিজ্ঞতার পরিমাণ বা আয়তন নিয়েও বিতর্ক চলে না। একমাত্র বিতর্ক চলে, অন্তত চলেছিল—কোন্ অভিজ্ঞতা কাব্যবহ, কোন্ অভিজ্ঞতা নয়, তাই নিয়ে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরিজ রবীন্দ্রনাথ, পরস্পরের মধ্যে সচেতন পার্থক্য রচনা করেও কাব্যিক অভিজ্ঞতার আভিজাত্য বিষয়ে ছিলেন সজাগ। ওয়ার্ডসওয়ার্থ যখন বলেছেন 'grandeur of imagination', কোলরিজ তখন বলেন 'grandeur of its subject' এবং রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, 'ভাত-কাপড় ছাতা-জুতা আমাদের মনে সৌন্দর্যের পুলক সঞ্চার করে না, কিন্তু লক্ষ্মণ রামের সঙ্গে সঙ্গে বনে গেলেন—এই সংবাদে আমাদের মনের মধ্যে বীণার তারে যেন একটা সংগীত বাজাইয়া তোলে...'[৫]—তখন ক্লিন্থ ব্রুক্স্কে অনুসরণ করেই বলতে ইচ্ছে করে যে,

৫. 'সৌন্দর্যবোধ', সাহিত্য।

এরা সব এক-গোত্রের রসসৃষ্টি। আধুনিক কবিতার ভাষা-রহস্য ব্যাখ্যায় যে কথা প্রথমেই স্মরণীয় তা হল, সপ্তদশ শতাব্দীর ড'ন-প্রমুখ মেটাফিজিক্যাল কবিদের মতোই আধুনিকতাবাদীদের কাছেও স্বতঃই কাব্যিক বিষয় বলে কিছু নেই, অকাব্যিক বিষয় বলেও কিছু নেই। আমাদের মনে পড়ে অমিয় চক্রবর্তীর 'খেজুরের চোখা সবুজ' 'ঝাঁঝর রোদ', মনে পড়ে জীবনানন্দের 'বেতের ফলের মতো ম্লান চোখ', মনে পড়ে 'গোধূলি-মদির' নক্ষত্রের মতো নিশানাগরী মেয়েটিকে, হলুদ্ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমোচ্ছে যে শালিক তাকে, মনে পড়ে বুদ্ধদেব বসুর 'চলচ্চিত্র' কবিতার সেই নায়কের প্রত্যন্তরবিহীন স্বপ্নকে। অর্থাৎ মেধা বা মননের সঙ্গে আবেগের বৈরিতাকেও তাঁরা স্বীকৃতি দিলেন না। তাঁদের ভাষারও প্রথম বৈশিষ্ট্য ও দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য রচিত হয়েছে এই কাব্যিক ও অকাব্যিকের সীমা ভেঙে ভেঙে।

স্বীকৃতি দিলেন না, কেন না, যাঁদের আমরা রোম্যান্টিক কবি বলে থাকি, তাঁদের সময় থেকেই কবিতার গঠনবিন্যাসের formal logic পরিবর্জনের যে প্রবণতা দেখা দিয়েছে, তাই আরো তীব্রতা পেল আধুনিক পর্যায়ে। ইতিহাসের সূত্রেই এ-বিষয়টিও অব্যাখ্যাত থাকে না। অস্তিত্ব এবং বিশ্বের মধ্যে অনন্বয়জনিত সংকটকে সমাহিত করতে গিয়েই ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতি-ধ্যান। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিমুক্তির চেতনাও আর-এক তাৎপর্য পায় এ দেশের পঙ্গু অষ্টাবক্রতা এবং সার্বিক ঔপনিবেশিক অচরিতার্থতার পটে। বাস্তব ইতিহাসে যেদিন এ বিকল্পরচনার সাধ আরো বিড়ম্বিত হল কালের প্রহারে, নানা দিক থেকে যখন মানুষের সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞার্থ মানুষের কাছেই বদলে যেতে লাগল —তখন সমস্ত পুরোনো বনেদের ভাঙচুরের মাঝখানে কবিতার গঠনবিন্যাসের পরিচিত লজিককে আশা করাই অসম্ভব। এই সময় আজকের কবিতার textureএ, বা বুনোনে ছাপ রেখেছে গভীর। এও অকস্মাৎ দেখা দেয় নি। এরও পূর্বসূত্র আছে রোম্যান্টিক কবিদের রচনাতেই। যাকে a-logical বা যুক্তি-নিরপেক্ষ বিন্যাস বা structure বলে তা প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে রোম্যান্টিকদের বিদ্রোহের ফল। আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্নতার ছবি রবীন্দ্রনাথের হাতে ফুটে উঠেছিল নতুন রেখায়। 'সোনার তরী'-কবিতার প্রথম স্তবকের ছোট ছোট অব্যবহৃত পূর্ণচ্ছেদগুলি ফুটিয়ে তুলেছে যেন কোনো প্রির‍্যাফেলাইট শিল্পীর তুলির অমোঘ টান : 'গগনে গরজে মেঘ। ঘন বরষা। কূলে একা বসে আছি। নাহি ভরসা। রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হল সারা। ভরা নদী ক্ষুরধারা খর পরশা। কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।' পরের স্তবকের 'বাঁকা জল'—এই বর্ণনার 'বাঁকা' বিশেষণটি গভীরার্থদ্যোতক। বাক্যের এই গভীর গঠন, শব্দের এই জটিল গূঢ় হবার ক্ষমতাকে উত্তরাধিকার হিসাবে পেলেন প্রতীকী কবিরা—তা বর্তেছে আধুনিকতাবাদীদের লেখনীতে। আসলে আধুনিক

কবি আর-একটু এগিয়ে গেলেন—শব্দের ব্যক্তার্থ বা বিশেষাভিধানকে অক্ষুণ্ণ রেখে তার গূঢ়ার্থের যে অভিজ্ঞতাগত পরিবর্তন ঘটল তাকে প্রতীকী সংবেদিতায় ধরে নিলেন। এই সংবেদিতাই আধুনিকতা। যাকে আমরা আপাতদৃষ্টিতে বলি বিশেষণের বেড়া ভেঙে দেওয়া, যাকে বলি বিপরীত-সন্নিবেশ—এ সবই ওই প্রতীকী সংবেদিতায় অভিনব হয়ে উঠেছে। শব্দের ব্যক্তার্থ ও বিশেষ অভিধাকে অক্ষুণ্ণ রেখে, তার গূঢ়ার্থের যে কালগত পরিবর্তন ঘটে, কবি, আধুনিক কবি, তাকে ধরে ফেলেন আশ্চর্য সংবেদিতায়। শব্দের এই বিভিন্নমুখী নির্দেশকে আবিষ্কার করাই ultimate responsiveness, এবং এই ultimate responsivenessএর ক্ষমতা যাঁর থাকে, সেই কবিই শব্দকে দিতে পারেন এক বিশিষ্ট গতি। আধুনিক কবির ভাষার তৃতীয় উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য সেই গতিকে কালচিহ্নে উচ্চাবচ করে তোলা। শব্দের এই অর্জিত স্বাধীনতাও আসলে অর্জিত হয়েছে ঘটনার অভিঘাতে, সময়ের ক্রোড়ে। লিয়র-কল্পনার আলোকেই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে বিষ্ণু দে-র 'তিনটি কান্না'-কবিতার তিন-নম্বর অংশটি—

"শহুরে পথে যেন সে এক প্রাকৃত দুর্যোগ—
পাগল বুঝি ? পাগল নয় মোটেই ?
প্রবল বেগে মাথা নাড়ায় ঝড়ে তালের কাতরানি
কিম্বা যেন লিয়র মাথা কোটে।"

'ঝড়ে তালের কাতরানি' আপাতবিন্যাসে বা surface structureএ যাই হোক, deep-structureএ এই কান্নাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে তদানীন্তন দেশকালের মর্মন্তুদ পটভূমিকায়। কিন্তু এখানে ভাষার আধুনিকতার সুমুদ্রিত স্বাক্ষর ফুটেছে 'প্রাকৃত দুর্যোগ'এ। Surface structureএ ঝড়ের ছবির প্রসঙ্গে 'প্রাকৃত' শব্দের বিশেষাভিধান বা ব্যক্তার্থ ঠিকই কাজে লাগে—'প্রকৃতি-সম্বন্ধীয়'। কিন্তু চকিত ঢেউ ওঠে এক সুগভীর গূঢ়ার্থের—'প্রাকৃত দুর্যোগ' মানে প্রজা-সম্বন্ধীয় বিপর্যয়ও হতে পারে। তখনই কবিতাটির বৃদ্ধ চরিত্রটি হয়ে যায় দেশহারা লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু ভিখারীর একজন। তখনই কবিতাটি হয়ে ওঠে এ কালের কবিতা। এ কি শুধুই কৌশল ? এ কি শুধুই রীতি ? না কি এই ভাবেই কবি ব্যক্ত করেন তাঁর উপলব্ধ পৃথিবী ? শব্দের এই বহুবর্থ-বিস্তারী শক্তি, এই বিচিত্রাধিকার আধুনিক কবিতার অভিজ্ঞান। এর মধ্যে যে-যুক্তি (logic) কাজ করছে সেও এক প্রতীকী যুক্তি। সে-যুক্তিরও আমাদেরই সার্বিক অস্তিত্বের গ্রন্থিল দুর্মোচনীয় জটিলতার প্রতিফলনের জন্যই প্রয়োজন। বিষয়টি ব্যাখ্যার জন্য বিষ্ণু দে-র 'ওফেলিয়া'-কবিতার একাংশ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে :

দেবযানী ! সাঁঝে তোমার প্রণাম মাঝে
ক্লিষ্ট আমার দিবসের ক্ষমা বাজে

শাপমোচনের সুরভিসুরের পাকে পাকে এই সাধনা আমার।

সাহিত্য শিল্পের চিরন্তন জগতে নিয়ত যাতায়াতের ভিতর দিয়ে গভীরতর বিষয়-বাস্তবতার উদ্ঘাটনে, নিরাসক্ত ব্যক্তির সমীচীন জীবনদর্শনে এই এলিয়টীয় ভাবনারীতি বিষ্ণু দে-র কবিকৃতিতে পৃথক্‌ তাৎপর্য পায়। 'হ্যামলেট'-নাটকে স্তবরত ওফেলিয়াকে দেখে গ্লানিজর্জর হ্যামলেটের বিখ্যাত উক্তি 'The fair Ophelia—Nymph—in thy orisons / Be all my sins remembered'—এখানে মাত্র পুনরাবৃত্ত হয় নি, বর্তমান শতাব্দীর বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণাকে তা সূচ্যগ্র অভিব্যক্তি দিয়েছে। আধুনিক কবিতার ভাষার জটিলতা অথচ অব্যর্থ অভিপ্রায়কে বোঝার জন্য 'দেবযানী'-শব্দটি আলোচনা করা যায়। হয়তো কবি কল্পনায় *nymph*-শব্দটির অভিঘাতেই 'দেবযানী'-শব্দটির উদয়। *nymph*-শব্দের ব্যক্তার্থ এবং 'দেবযানী'-শব্দের নামবাচক বিশেষ্যার্থ না ধরলে, যা সাধারণ ব্যক্তার্থ দাঁড়ায়, তাতে দুই শব্দ পরস্পরের থেকে খুব দূরে নয়। কিন্তু উৎকৃষ্ট কবিকর্ম কখনোই অর্থের এই বন্দীদশাকে প্রশ্রয় দেয় না। বিপুল বিশ্ববীক্ষার পটে অর্থকে নতুন জীবনদান সেই কবিকর্মেরই বিশিষ্ট ভূমিকা। 'দেবযানী' *nymph*কে আলগোছে ছুঁয়ে থেকেও হয়ে গেল ভারতীয় পুরাণের 'দেবযানী'—অস্তিত্বের সমস্ত প্রতিকূলতা ও বৈরিতার মাঝখানে মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রের জন্য আকুল নায়কের আশ্রয় যে-নায়িকা, সে-ই দেবযানী। সুতরাং 'দেবযানী'-শব্দের প্রয়োগে আভাসিত হল নায়কের নির্বেদ নয়, এক পজিটিভ ভূমিকা। অথচ যে-গ্লানিজর্জর জীবনের উত্তরণের অভীপ্সাও হারিয়ে যায় না 'শাপমোচন'-শব্দের ইঙ্গিতে, এ শব্দের অনুষঙ্গে আসে ওই নামের বিখ্যাত গীতিনাট্যের ভাবস্মৃতি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা যে ভাবে খুলতে খুলতে এগুচ্ছি, সে ভাবে নয়, কবি এগিয়েছেন বাঁধতে বাঁধতে। এখানেও, 'গান যে করে সে আনন্দের দিক হইতে রাগিনীর দিকে যায়, গান যে শোনে সে রাগিনীর দিক হইতে আনন্দের দিকে যায়।'

চিত্রকল্পকে কাব্যভাষায় রূপান্তরিত করা আধুনিক কবিতার বিশিষ্ট লক্ষণ এ কথা বলা যাবে না। এ বিষয়ে আধুনিক কবিদের প্রবল পূর্বগ রয়েছেন রোম্যান্টিক কবিরা, প্রতীকী কবিরা। ভাষা এবং চিত্রকল্প, সুজান ল্যাঙ্গের যেমন বলেন, অভিজ্ঞতারই প্রতীকী রূপান্তর। কিন্তু আধুনিক কবিতার কাব্যভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল চিত্রকল্পের ভিতর দিয়ে বিপরীতের সমপাতন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজ মেটাফিজিক্যাল কবিরা এই ভাবে আশ্লিষ্ট বিপরীতের সাহায্য নিয়েছিলেন, আধুনিক কবিকেও এ সাহায্য নিতে হয় আধুনিক জীবনের অধিকতর জটিলতার চ্যালেঞ্জকে স্বীকৃতি দিয়ে। আপাত-দৃষ্টিতে যারা অসম্বদ্ধ, তাদের পাশাপাশি সন্নিধি আধুনিক কাব্যের বিষয়, কেন না তারা আধুনিক জীবনেরই অংশ। জীবনানন্দের কাব্যভাষার তিনটি চিত্রকল্প এ প্রসঙ্গ

ব্যাখ্যায় সহায়ক হবে :

ক. স্তন তার
করুণ শঙ্খের মতো—দুধে আর্দ্র—কবেকার
শঙ্খিনীমালার··

খ. উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে।

গ. পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

স্তন এবং শঙ্খের সাদৃশ্য ক.-চিহ্নিত উদ্ধৃতিতে বড় কথা নয়। সে সাদৃশ্যকে উপেক্ষা করা হচ্ছে না, তবে তাকে গৌণ করে দিয়ে এক অমেয় রহস্যকে ডাক দিয়েছে 'করুণ'-বিশেষণটি। আমরা জানি, দৃশ্যবাস্তবের শৃঙ্খল ভেঙে পরাবাস্তবতায় উত্তরণের আধুনিক রীতিতে জীবনানন্দ বিশেষণের সীমা ভেঙে দেন। 'অরব অন্ধকার'এর 'অরব' শুধু 'নীরব'এর বিকল্প নয়, সে এক বিমর্ষ শূন্যতার অনুষঙ্গবাহী। ঠিক তেমনি 'করুণ'-এই দ্ব্যর্থক বিশেষণ দুঃখাবহ এবং দয়ার্দ্র এই দুই অর্থের মধ্যবর্তী ছায়ায় অপরূপ। অব্যবহারে অচরিতার্থ শঙ্খের কারুণ্যই কি এখানে উপমেয়? সৌন্দর্য এবং বিষণ্ণতার আশ্লেষে এ হয়ে উঠেছে রোম্যান্টিক কল্পনার পরাকাষ্ঠা। কিন্তু 'করুণ'কে যদি পাত্রান্তরিত বিশেষণ রূপে ভাবা যায়, তা হলে যে-অর্থে ইয়েট্‌স্ আধুনিক, সেই অর্থেই জীবনানন্দ সঞ্চার করেন আধুনিক অর্থ—শঙ্খের মতো স্তন যার, সেই শঙ্খিনীমালার সৌন্দর্যের যুগ পৃথিবীতে চিরকালের মতো শেষ হয়ে গেছে, সৌন্দর্য-বিচ্ছিন্ন সেই আধুনিকের কারুণ্যই কি এখানে উদ্দিষ্ট?

খ.-চিহ্নিত চিত্রকল্পটি কাব্যভাষায় পরাবাস্তবতার বিশিষ্ট লক্ষণ। যে-নিস্তব্ধতা কিম্ভুতকিমাকার, যে-নিস্তব্ধতা অনির্দেশ্য এবং আধুনিক অর্থে absurd, তাকেই উটের 'গ্রীবা'র আকস্মিক উল্লেখে সংক্রামিত করা হল। অন্য দিক থেকে 'উট'-শব্দের অর্থগত অনুষঙ্গে ভেসে ওঠে বিবর্ণ ধূসর মরু-শূন্যতা। সেই শূন্যতার ভয়াবহ স্তব্ধতা কখনো কখনো অপ্রতিরোধ্য, অস্তিত্বের নিরর্থকতার বোধ জেগে উঠলে আর রেহাই নেই।

গ.-চিহ্নিত চিত্রকল্পটি বিস্তৃত ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। 'বনলতা সেন' কবিতায়, রসিক পাঠক লক্ষ্য করেছেন, বনলতা সেন বর্ণিত হয়েছেন মাত্র দ্বিতীয় স্তবকটিতে। প্রথম ও তৃতীয় স্তবকে তিনি শুধু উল্লেখিত। প্রথম স্তবকে কালে এবং স্থানের অসীমে বিস্তীর্ণ যন্ত্রণাময় মানব-অস্তিত্বের স্মৃতি। বনলতা সেনের ভিতরে প্রেমের মানুষ খুঁজে পেল তার identity. দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম দুটি চিত্রকল্পে বনলতা সেনের সৌন্দর্যকে ক্লাসিক স্পষ্টতা দেওয়া হল। অথচ ওই স্তবকেই প্রচলিত উপমারীতিকে ধাক্কা দেওয়া ওই চিত্রকল্পটি সমুত্থিত—'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে'। মনে হতে পারে, আপাতদৃষ্টিতে, দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম দুই চরণের উপমারীতির সঙ্গে এ বুঝি

অসমঞ্জস। কিন্তু কবিতাটি ভিতরে ভিতরে এমন ভাবে বেড়ে চলেছে যে, দুই অসমঞ্জসতা আশ্চর্য ভাবে সঙ্গতি পেয়ে গেল। দিশাহারা যাত্রী, দিশাহারা পাখির মতোই—প্রেমের মধ্যে আশ্রয়-কল্পনাতে যেখানে প্রেমিকার চোখ আশ্রয়দাতা, স্বভাবতই নীড়ের উপমা পেয়েছে। সৌন্দর্যের নিরাসক্ত বর্ণনা অকস্মাৎ ব্যক্তির আকুলতায় একান্ত মন্ময় হয়ে উঠল। প্রথম দুই স্তবকের শেষেই বনলতাকে স্থানে কালে চিহ্নিত করা হল—ওই মন্ময় উচ্চারণ তার ফলেই পেয়েছে তীব্রতা। শেষ স্তবকের শেষ চরণে আর দরকার নেই 'নাটোরের' কথাটি। শুধু 'বনলতা সেন'ই যথেষ্ট। যে-ধ্যানলোক তৃতীয় স্তবকের বর্ণনীয়, তা শিল্পীর ধ্যানলোক। বনলতা সেন আর তখন বাস্তবের কেউ নন, কাব্যকাহিনীর বিষয়—নাটোরের ভৌগোলিক বন্ধন থেকে তিনি তাই মুক্ত। চিত্রকল্পের এই কালগত মৌলিকতা আধুনিক কাব্যভাষাকে দিয়েছে চৈতন্যকে নাড়া দেবার ক্ষমতা।

এ কথা কে না জানেন যে, আধুনিক জীবনের জটিলতার আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়েই আধুনিক কবিতার ভাষা প্রচলিত রীতিকে আঘাত হেনেছিল। কোনো অভিজ্ঞতাই প্রত্যাখ্যানের যোগ্য নয়, কৌতূহল কোথাও প্রতিহত হবার নয়। অমিয় চক্রবর্তী যখন লেখেন, 'না-দাড়ি-কামানো বুড়ো, লেখেন, 'কাঁসাটে', 'মাদুরে চ্যাপ্‌টানো প্রাণ', বুদ্ধদেব বসু যখন বলেন, 'সজ্ঞহীন সংজ্ঞাতীত এককের আদিম জ্যামিতি,' বা বলেন, 'সূর্যাস্তের জাদুকর আলোর আয়না হাতে নিয়ে সন্ধ্যা নামে,' লেখেন 'জলের উজ্জ্বল শস্য রাশি রাশি ইলিশের শব,' অথবা সমর সেন যখন বলেন :

মৃত্যু শুনেছি শেষ কথা নয়,
কালস্রোতে ভেসে আসে নবীন জঞ্জাল,
আবার সঙ্গোপনে ঘরে রহস্যভরে বিড়ি ধরে
বালক বংশধর,
তারো পরে টেরি কেটে কাব্য প'ড়ে
জানায় অমর প্রেম বখাটে যুবক—

বা সুভাষ মুখোপাধ্যায় যখন বলেন :

নখাগ্রে নক্ষত্রপল্লী, ট্যাঁকে টুক্‌রো অর্ধদগ্ধ বিড়ি।
মাংসের দুর্ভিক্ষ নইলে ঋষি মনে হত হাবভাবে।
বিকৃতমস্তিষ্ক চাঁদ উল্লাঙুল স্বপ্নে অশরীরী—

তখন কবিদের শব্দের স্বাধিকার এক চৈতন্যের পরিবর্ধিত পরিধির স্মারক হিসাবেই আমাদের কাছে জীবন পায়। এখানে গন্ধময় জগতের অভিঘাত অস্বীকৃত হয় নি, তবু এরা কবিতা কেন না 'নবীন জঞ্জাল' অথবা 'নখাগ্রে নক্ষত্রপল্লী' অথবা মেটাফিজিক্যাল

কবিদের স্মারক জ্যামিতির উপমা আসলে শব্দেরই আধুনিক অব্যর্থতা, বিকল্পবিহীনতা। 'তিরিশে'র কাব্য যতক্ষণে এই ভাবে পথ করতে করতে এসে হাজির হল চল্লিশের চৌকাঠে ততক্ষণে তার তরুণ উত্তরাধিকারীদের হাতে দেবার মতো সম্পদ কিছু না কিছু সে রচনা করে ফেলেছে। বিষ্ণু দে-র পুরাবোধে, সংস্কৃতিচেতনায়, অমিয় চক্রবর্তীর বিশ্ববোধে, জীবনানন্দের হৈমন্তিক সন্ধ্যাভাবনায়, সমর সেনের ধূসরতার চেতনায় এবং সুধীন্দ্রনাথের ঊষরতাবোধে 'তিরিশে'র উপলব্ধ বিশ্ববাস্তবতা ও আত্মবাস্তবতার সামগ্রিক ছবি ফুটে উঠেছিল। আমাদের বিস্মিত হবার কোনো কারণই থাকে না যখন আমরা সুধীন্দ্রনাথ ও সমর সেনের প্রসঙ্গ-প্রকরণের বিপুল বৈপরীত্যকে একই বিশ্ববাস্তবতার অংশ হিসাবে অনুধাবন করি। সুধীন্দ্রনাথের ঊষরতাবোধ, শব্দের দুরূহতা, তাঁর নিপুণ প্রায়-দুঃসম্ভব পংক্তি-স্তবক বিন্যাস—অথচ অন্তরশায়ী এক ঘন বিরহস্মৃতি, সব মিলিয়ে অস্তিত্বের তদানীন্তন ট্র্যাজেডির বিচিত্র আধার। অধিকাংশ কবিতাই যেন সেই পঞ্চাঙ্ক ট্র্যাজেডির শেষতম দৃশ্যের বিদগ্ধ নায়কের বিষণ্ণ চিন্তাসমাকুল স্বগতোক্তি। বিষণ্ণ বিদগ্ধের স্বগতোক্তি বলেই যে নায়ক শেক্‌স্‌পীয়রের ট্রয়লাসের মতো অযথা মাথা ঘামায় না তার শব্দচয়ন সহজগ্রাহ্য হবে কি না এই নিয়ে। সুধীন্দ্রনাথের নায়কের নৈরাশ্যবোধ সভ্যতার সংকটলগ্নে বিশূন্য বর্তমানের মুখোমুখি দাঁড়ানো সচেতন যুবার নৈরাশ্যবোধ। দুর্বহ বিষণ্ণতাই বুঝি মাঝে মাঝে দুর্বোধ্য হতে চায়। কেন বুঝি না আমরা যে, তাঁর চয়িত দুরূহ শব্দগুলি অর্থেরই আর-এক ডাইমেন্‌শন্? অন্য দিকে সমর সেন যে-ধূসরতার দ্বারা ছিলেন অধিকৃত তাও এক ভূমিকাহারা যুবকের মধ্যবিত্ত আত্মগ্লানির, সম্বিৎময় নির্বেদের স্মারক। বারে বারে তাঁর কবিতায় আসে 'পাহাড়'-প্রসঙ্গ। অনড় দুশ্চিন্তার প্রতিমা সেই পাহাড়—অথচ যে কদাচ হল না উত্তরণের আহ্বানের প্রতীক!

৫

চারের দশকে কবিতার ভাষায় আর-এক রঙ ফেরানো শুরু হল। তিনের দশকে ভাষায় যে প্রাতিস্বিকতার চর্চা প্রবলতা পেয়েছে, প্রচ্ছন্নে অপ্রচ্ছন্নে তারই বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া চারের দশকের কবিতায় লক্ষিত। এর একটা কারণও ছিল। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মানবীয় দুর্গতি, এক কথায় বাস্তবের চাপ নানা দিক থেকে প্রত্যক্ষ এবং ভারী হয়ে উঠেছিল। কবিতা তাদের সব কিছুকে অঙ্গীভূত করতে চেয়ে সেই প্রত্যক্ষের জল-হাওয়া নিজের গায়ে লাগিয়েছে। প্রত্যহের কশাঘাতে যথাসম্ভব দ্রুত সাড়া দিতে হবে—এই মানসিকতা থেকে চারের দশকের কবিতার ভাষা সহজ হবার জন্য সম্বন্ধ

হল। এই সহজ হবার সত্বরতায় চারের দশকেই 'কবিরা দুর্বোধ্য'—'তিনের দশকের' এই কিংবদন্তী তরুণতর কবিদের মধ্যেও কারেন্সি পেল অধিকতর। আরো লক্ষণীয় যে, চারের দশকেই কবিতা দুই শিবিরে বিভক্ত। এই শিবির-বিভক্তি কতকটা তত্ত্ব-ভিত্তিক, বেশিটাই অর্থহীন। শিবির থাকলেই শিবিরকে বাড়াতে হবে এই বোধও থাকে—আঙ্গিকরীতির তরলীকরণ—'কবিতাকে সাধারণ পাঠকের কাছে নিয়ে যেতে হবে' এই নামে, অথবা 'কবিতাকে তার mainstreamএ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে'—এই ভেবে, দুই শিবিরকেই ঠেলে দিয়েছে কৃত্রিম সহজত্বের সাধনায়। 'তিরিশে'র প্রত্যয়ভ্রষ্ট 'চল্লিশে'র চটুলতার মাঝখানে সুকান্ত ভট্টাচার্য যতখানি প্রতিশ্রুতি, ততখানি প্রতিশ্রুতিপালন নন। মণীন্দ্র রায়, হরপ্রসাদ মিত্র, নরেশ গুহ অথবা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এই সময়ের দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের মাঝখানে শিল্প ও জীবনের দুই প্রান্তকে জ্যা-বদ্ধ করার চেষ্টায় কখনো ঝোঁক দিয়েছেন কেউ জীবনের দিকে, কখনো শিল্পের স্বরাজ্য খুঁজেছেন কেউ শিল্পীকে বিশ্লিষ্ট ভেবে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় জীবনকে সাবেগ আশ্লেষ করে কবিতার ভাষাকে কতটা ঋজু করা যায় চারের দশকে তার একটা নিদর্শন রেখেছিলেন। দুই শিবিরে ছিল একই সীমাবদ্ধতা। যিনি কবিতা খুঁজেছিলেন মাঠে-কারখানায় তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারেন নি যে, কবিতা ঘরেও থাকে; যিনি মেদুর আলোয় কবিতাকে পেতে চেয়েছেন ব্যক্তিগত ভাবে, তিনি মানতেই চান নি যে, কবিতা উনবিংশের তরুণীর মতো অসূর্যম্পশ্যা নন।

অথচ এরই মাঝখানে কবিতার ভাষায় কথ্যরীতির নিজস্ব বেগবান বাক্স্পন্দের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছিল নতুন অভিজ্ঞতার দান। উনিশশো ছেচল্লিশের পুজোর 'অরণি'তে প্রকাশিত হল বিষ্ণু দে-র 'মৌভোগ', 'পরিচয়ে' 'কঙ্কালীতলার মাঠ': ওই দুটি কবিতায় দেশজ রূপকথা, লৌকিক 'মিথ্'-ইত্যাদি প্রয়োগে কবির আত্মাবিষ্কারের, অবিকলতা-সন্ধানের সকল প্রয়াস নির্দিষ্ট রূপবন্ধনকে সফল করে তুলেছে। বিস্ময়ের বিষয় যখনই দেশ-ভাগ, গান্ধী-হত্যা, লালমোহনের আত্মদান, চতুর্দিকব্যাপী নৈতিক ও রাজনৈতিক অরাজকতা প্রাধান্য পেয়েছে, তখনই বিষ্ণু দে এই মিথ্এর প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্ন প্রয়োগে প্রতীকায়িত করেছেন মানুষের এক আদিম অভীপ্সাকে—সে হল বিশৃঙ্খলা থেকে বিপর্যস্ত মানুষের উত্তরণের অভীপ্সা। মণীন্দ্র রায় এবং মঙ্গলাচরণ অত্যন্ত নিবিষ্ট তৎপরতায় ভাষার এই ভঙ্গিমাকে, রূপকথা-লোককথার এই ডিজাইন্‌কে চমৎকার ব্যবহার করেছেন। প্রসঙ্গত মণীন্দ্র রায়ের 'কবিয়াল' কবিতাটি স্মরণ করি।

অন্য দিকে জীবনানন্দের গূঢ়ভাষণ চারের দশকের প্রান্তে এসেই আর-এক মাত্রা খুঁজে পায় 'মহাত্মা গান্ধী'র মতো কবিতায়। পরাবাস্তবতার জটিল ছায়াপথ ছেড়ে মানুষের অগণন দুঃখ-ব্যর্থতার প্রত্যক্ষ মেঘরৌদ্রে জীবনানন্দের কবিতায় নতুন অধ্যায়

শুরু হচ্ছিল। এক কথায় বলা যায় বাঙলা কবিতা চারের দশকে প্রচণ্ড অনিশ্চয়তা, বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলার মাঝখানে জীবনের স্থির মূল্যের কথা ভুলে যায় নি। এই একটা দশক যখন এলিয়ট-বোদলেয়ার-র‍্যাঁবো প্রায়-উহ্য ছিলেন। কবিতার ভাষা চারের দশকে দেশজ অভিজ্ঞতার মাটিতেই দাঁড়াতে চেয়েছে। ওই দশকের সরলীকরণের, অতিবামপন্থার, প্রতিবামপন্থার নানা বিপরীত স্রোতের মাঝেও এই কথা তাৎপর্য হারায় 'না। এবং এরই মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল আধুনিক কবিতার নিজস্ব ভাষামুদ্রা। অচল হয়ে গেল পুরাতন মুদ্রা। অথচ আধুনিক কবিতার এই প্রতিষ্ঠার কালেই ভঙ্গির দিকে, মেকি বিদেশী প্রসাধনের দিকে ঝোঁক বাড়তে লাগল। যা ছিল বরাবর কৃত্রিম সেই রাজনৈতিক উচ্চারণের ধ্বনি ফিকে হয়ে গেল। কিন্তু কবির যেটা আসল সমস্যা, সংযোগ স্থাপনের সমস্যা, সেটা যে কবিদের সমানে ভাবিত করে রেখেছে তা বোঝা যায় 'কৃত্তিবাসে'র প্রথম সংখ্যা[৩] দেখলে। তখনো বোদলেয়ারের অভিঘাত অথবা র‍্যাঁবোর প্রভাব বাঙলা কাব্যে কৃত্রিম আবহাওয়া রচনায় নিয়োজিত হয় নি। যে নাগরিকতা এবং বুর্জোয়া সভ্যতার সংকটাপন্ন পটভূমিকার সমর্থন থাকলে ওই অভিঘাত কাব্যগত সফলতাকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে পারত, তা যে এখানে মূলত অনুপস্থিত, সে কথায় তখনো সন্দেহ ছিল না। র‍্যাঁবোর 'অ্যা-ল্‌জিক্যাল' বাগ্‌বিন্যাস, মালার্মের দিব্য শব্দ বাঙলা কবিতার বাতাবরণকে স্পর্শ করেছে মুখ্যত ছয়ের দশকে। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় দুটি রচনা পাঁচের দশকের প্রারম্ভে যে সমস্যার ইঙ্গিত দেয়, তা কিন্তু একান্ত ভাবে বাঙলা কবিতারই সমস্যা। প্রবন্ধ দুটির লেখক হলেন সমর সেন ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র।

১ আমাদের অভিজ্ঞতা এখনও অনেকটা ধার করা, বই পড়া, দেশের মাটির, দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় বলতে গেলে সবেমাত্র শুরু হয়েছে, আত্মীযতায় এখনো পরিণত হয় নি। 'সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা'। সমর সেন।

২ কাব্যের মহৎ সাধনা… ব্যক্তি-চিত্রকল্প থেকে লোক-চিত্রকল্পের সাধারণ্যে উত্তরণ…
'স্বরান্বিতা'। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র।

এই উক্তির পৃথক্‌ পৃথক্‌ সারবত্তা নিয়ে কেউ ইচ্ছে করলে তর্ক করতে পারেন, কিন্তু সন্দেহ নেই এদের সমস্যা-সচেতনতায়। এবং সম্পাদক যে যথেচ্ছ প্রবন্ধ নির্বাচন করেন নি, তার প্রমাণ পাওয়া যায় সম্পাদকেরই 'কাব্যসভা' নামক প্রায়-সম্পাদকীয় তুল্য বিবরণী-মন্তব্যে—'তবুও প্রথমদিককার কবিতায় (সম্পাদক আধুনিক বাঙলা কবিতার কথা বলছেন) কিছুটা অসংস্কৃত হলেও আত্মপ্রত্যয়ের সুর ছিল। এখনকার কবিতা যেন বেশিমাত্রায় ভঙ্গিপ্রধান এবং বক্তব্যে অনিশ্চয়তার সমস্যা।'

৩. শ্রাবণ ১৩৬০।

এ রকম যথার্থ কথা পাঁচের দশকের কাব্যপ্রয়াস সম্বন্ধে আর কেউ বলেন নি, যা 'কৃত্তিবাস'-সম্পাদক বললেন—'বক্তব্যে অনিশ্চয়তার সমস্যা'। ভাষার ভঙ্গি আসে অনিশ্চয়তা থেকেই। পাঁচের দশকের কবিতার অনিশ্চয়তার কারণটি বিশেষ ভাবে অনুধাবনীয়। জীবনানন্দের মৃদু স্বভাবের সঙ্গে, তাঁর অন্তর্গূঢ় বাক্যগঠনভঙ্গির সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের কোনো অমিল ছিল না। ভেদ ছিল না। পাঁচের দশকে জীবনানন্দকে যাঁরা স্বাঙ্গীকরণ করতে চাইলেন, তাঁরা কিন্তু জীবনানন্দের এই অখণ্ডতাকে স্বীকৃতি দিলেন না। প্রথমত ভঙ্গিটা সর্বস্ব হয়েছে এই রন্ধ্রপথে; দ্বিতীয়ত জীবনানন্দকে পরিগ্রহণের কালে কেউ তেমন করে তলিয়ে দেখেন নি কোথায় ছিল জীবনানন্দের সীমাবদ্ধতা। জীবনানন্দের ইয়েট্সীয় প্রতীকী রূপজগতের ভাবালম্বনে ত্রুটি ছিল এই যে, তিনি ঈষ্টার-অভ্যুত্থান-উত্তর ইয়েট্সীয় চলিষ্ণুতা থেকে কোনো অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেন নি। তিনি নিজে যে এই সীমাবদ্ধতার বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠছিলেন 'বেলা অবেলা কালবেলা' বইয়ের কোনো কোনো কবিতায় তার ইশারা রয়েছে। কিন্তু পাঁচের দশকের জীবনানন্দ-শিষ্যরা জীবনানন্দীয় হ্রদের উপরিতলটুকু মাত্র নাড়াচাড়া করেছেন। বহুদিন আগে সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর 'নিরুক্ত' পত্রিকার কোনো সংখ্যায় এ রকম মন্তব্য করেছিলেন যে জীবনানন্দের অচরিতার্থতা যিনি ঘুচিয়ে নিতে পারবেন, বাঙলা কাব্যে মহৎ কবির সম্মান তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। পাঁচের দশক এ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো সচেতনতার প্রমাণ রাখে নি। কৃত্তিবাসে'র প্রথম সংখ্যায় কিন্তু প্রতিশ্রুতির অভাব ছিল না। সে দিন তার কাব্যভাষায় ছিল উত্তরাধিকারের বিনীত অঙ্গীকার—এ কথা 'কৃত্তিবাস'-নিরপেক্ষ কবি শঙ্খ ঘোষের কাব্যভাষা প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য, এ কথা 'কৃত্তিবাস'-কীর্তিত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতাটি সম্বন্ধেও সত্য। পাঁচের দশকের বাঙলা কবিতার যেটুকু নিজস্ব স্বর তাকে খুঁজতে হবে এই পথেই।

উ ল্লে খ প ঞ্জী

১ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। 'আধুনিক বাংলা কবিতা'। পরিচয়, অগ্রহায়ণ ১৩৪৭।
২ বিমল চন্দ্র সিংহ। 'সমাজ ও সাহিত্য'।
৩ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও আবু সয়ীদ আইয়ুব-সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা'।
৪ বিনয় ঘোষ।
৫ গোপাল হালদার। 'আধুনিক সাহিত্য'।
৬ বিষ্ণু দে। 'একালের কবিতা'র ভূমিকা।
৭ জীবনানন্দ দাশ। 'কবিতার কথা'।
৮ সুজান্ লাঙ্গের। 'ফিলজফি ইন্ এ নিউ কী'।
৯ জর্জ স্টেনার। 'এক্স্ট্রাটেরিটোরিয়াল্' গ্রন্থের চোমস্কি-বিষয়ক আলোচনা।

১০

বাঙলা ছন্দ : রবীন্দ্রনাথ এবং তারপর

দীপংকর দাশগুপ্ত

বাঙলা ছন্দের প্রাক্-আধুনিক ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ প্রধানতম পুরুষ এবং সম্ভবত তিনিই শেষতম। ইতিহাসের প্রথম-পর্বে প্রধান পুরুষ ভারতচন্দ্র, দ্বিতীয়-পর্বে মধুসূদন। বাঙলা ছন্দের একটা ন্যূনতম প্রমাণ (standard) ভারতচন্দ্রের কাব্যেই প্রথম সুস্পষ্ট ; তিনি বাঙলা ছন্দকে হাত ধরে হাঁটতে শিখিয়েছেন, শুধু তাই নয়, বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য সংস্কৃত এমন কি ফারসী ছন্দকেও তিনি বাঙলা ছন্দের সঙ্গে মেশাতে দ্বিধা করেন নি। বস্তুত, বাঙলা ছন্দকে একটা নির্ভরযোগ্য ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে তার শক্তিকে যথাসাধ্য কাজে লাগিয়েছিলেন তিনি। ভারতচন্দ্র যে সে-যুগের শ্রেষ্ঠ বিদগ্ধ ছান্দসিক কবি এ বিষয়ে মতান্তরের অবকাশ নেই।

যতি-নির্ভরতা বাঙলা ছন্দের চরিত্রের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য—বাক্‌প্রবাহের যতিখণ্ডিত অংশগুলির মাত্রাসমতাই ছন্দঃস্পন্দনের উৎস। বাঙলায় 'অক্ষরবৃত্ত' রীতির[১] ছন্দ প্রথম থেকেই প্রাধান্য লাভ করে এসেছে। প্রাক্-মধুসূদন পর্বে নির্দিষ্ট অর্ধযতি ও পূর্ণযতির সাহায্যে বিভক্ত পদগুলির নানা রকমের ছন্দোবন্ধ বা ছন্দের প্যাটার্নকে অনুসরণ করেই কবিরা সাধারণত কাব্যরচনা করতেন—ভাবকে বিনীত ভাবে যতির অনুগামী হতে হত। এতে ছন্দে বৈচিত্র্য সৃষ্টির সম্ভাবনা কম ছিল। এবং হয়তো, বাঙলা ছন্দের স্বভাববিরোধী বলে সংস্কৃত-রীতির ছন্দকেও বাঙালি কবিরা বিশেষ কাজে লাগাতে পারেন নি। 'স্বরবৃত্ত' বা লৌকিক ছন্দের শক্তি ও সম্ভাবনাকে হয়তো অন্ত্যজ জ্ঞান করেই, তাঁরা তেমন গুরুত্ব দেন নি কিংবা বলা যায় যথাসম্ভব পরিহার করেছিলেন। বাঙলা ছন্দের নিস্তরঙ্গ প্রবাহে—সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর 'ছন্দ-সরস্বতী' যে-ছন্দকে 'মন্থরগতি মকরাঙ্গী ডিঙ্গা' বলেছেন, মধুসূদন এসে গতির সঞ্চার করলেন। যতির দাসত্ব থেকে কবিদের মুক্ত করলেন মধুসূদন ; না, যতিকে অস্বীকার করে নয়, ভাবকে যতির প্রভুত্ব

১. এই ছন্দোরীতি বিভিন্ন নামে পরিচিত : যৌগিক, তানপ্রধান, পদভূমক, ভঙ্গ-প্রাকৃত, পয়ার বা পয়ার-জাতীয়, ইত্যাদি। 'অক্ষরবৃত্ত' নামটি ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন এক সময় প্রচলিত করেছিলেন ; নামটি অত্যন্ত পরিচিত, তাই এই প্রবন্ধে ব্যবহার করা হল। এই নামটিতে এই ছন্দের সঠিক 'প্রকৃতি' চেনা যায় না বলে প্রবোধচন্দ্র সেন এর নতুন নাম দিয়েছেন 'মিশ্রকলাবৃত্ত' বা মিশ্রকলামাত্রিক,' তার কিছু পূর্বে নাম দিয়েছিলেন 'বিশিষ্ট কলামাত্রিক'। উল্লেখ্য যে অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বাঙলা ছন্দের নামের সঙ্গে 'বৃত্ত' শব্দটি ব্যবহার করার পক্ষপাতী নন, কারণ সংস্কৃত 'বৃত্তছন্দ' মাত্রাসমক ছন্দ থেকে মূলত পৃথক্‌। দ্র° 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র', ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৮৬।

থেকে মুক্ত করে যতিকে ভাবের অনুগামী করেছিলেন তিনি। তাঁর ছন্দে পয়ারের ৮/৬-মাত্রার প্যাটার্নে পংক্তিবিন্যাস বজায় রেখেছিলেন, সম্ভবত এই কারণে মধুসূদনের সমকালীন ও পরবর্তী অনেক কবির কাছে 'অমিত্রাক্ষর'-ছন্দের আসল প্রকৃতি ধরা দেয় নি; মিলহীনতাকেই 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন —গতানুগতিক পয়ারে মিল বর্জনের স্বাধীনতাটুকু গ্রহণ করেই হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের মতো কবিদের তৃপ্ত থাকতে হয়েছিল। ব্যতিক্রম, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও রাজকৃষ্ণ রায়। হয়তো নাটকের প্রয়োজনেই নির্দিষ্ট ৮/৬-মাত্রার পংক্তিবিন্যাসকে ভেঙে ফেলে ভাবের-অনুগামী যতিকে তাঁরা পংক্তিবিন্যাসে প্রাধান্য দিয়েছিলেন; মধুসূদনের ছন্দঃপ্রকৃতিকে তাঁদের রচনায় অনেকটা কাজে লাগাতে পেরেছিলেন তাঁরা। এই প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র উৎসর্গ-পত্রটি উল্লেখযোগ্য; স্বয়ং মধুসূদনের রচনাতেও ভাবযতির অনুগামী পংক্তিবিন্যাস[৩] একেবারে অলভ্য নয়।

রবীন্দ্র-পূর্ব ও রবীন্দ্র-উত্তর বাঙলা ছন্দের মধ্যে শিল্পগুণগত ব্যবধান মেরুপ্রমাণ। মধুসূদন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের পরিচর্যায় সে সাবালক হয়ে ঘরের দরজা খুলে উন্মুক্ত রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছে। অলোকসামান্য অন্তর্দৃষ্টি

২. এই ছন্দোরীতির অন্যান্য নাম : ছড়ার ছন্দ, প্রাকৃত, বল-প্রধান, শ্বাসাঘাত-প্রধান, দেশজ ছন্দ, ইত্যাদি। 'স্বরবৃত্ত' নামটিও প্রবোধচন্দ্র সেন সুপ্রচলিত করেন, সেই থেকে এই নামটি অতিপরিচিত; এই নামটিতে ছন্দের 'প্রকৃতি'-সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির অবকাশ থাকায় তিনি এর নতুন নাম দিয়েছেন 'দলবৃত্ত' বা 'দলমাত্রিক'।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি, দ্ব্যর্থকতার সম্ভাবনা আছে এই কারণে প্রবোধচন্দ্র সেন 'অক্ষর' শব্দটিকে 'syllable'এর প্রতিশব্দ রূপে গ্রহণ করেন নি, তিনি এর পরিভাষা করেছেন 'দল'। ভাষাবিজ্ঞানে 'অক্ষর' শব্দটি 'syllable'এর একটি স্বীকৃত পারিভাষিক শব্দ, তাই এই প্রবন্ধে 'অক্ষর' শব্দটি সর্বদাই 'syllable' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, সুধীভূষণ ভট্টাচার্য-প্রমুখ ছান্দসিকদের ছন্দ-আলোচনাতেও 'অক্ষর' শব্দটি 'syllable'এর প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত। ছন্দ আলোচনায় উচ্চারণ-পদ্ধতিই বিবেচ্য, লেখন-পদ্ধতি নয়, সুতরাং 'অক্ষর'কে 'হরফ'এর সমর্থক শব্দ রূপে গ্রহণ করবার সম্ভাবনা কম বলেই মনে করি।

৩. হে সজ্জন,
স্বভাবের সুনির্মল পটে,
রহস্য রঙ্গের রঙ্গে,
চিত্রিনু চরিত্র দেবী, সরস্বতী বরে।

'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র এই পংক্তি কয়টিকে সুধীভূষণ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা ছন্দ' গ্রন্থে গৈরিশ ছন্দের আদি-রূপ বলে উল্লেখ করেছেন।

শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'ছন্দের বারান্দা'য় মধুসূদনের 'কুক্কুট ও মণি' রচনাটি উদ্ধৃত করেছেন, এতে মধুসূদন ছেদ বা ভাবযতিকে অনুসরণ করে ৮/৬-এর প্যাটার্নকে ভেঙেছেন।

রবীন্দ্রনাথের কাছে উদ্‌ঘাটিত করেছিল পয়ার-জাতীয় ছন্দের 'দ্বৈমাত্রিক লয়' আর 'শোষণশক্তি', যার মধ্যে নিহিত এই ছন্দের মুক্তির মন্ত্র। এবং এরই পরিণতি 'বলাকা'-কাব্যের বন্ধনমুক্ত অক্ষরবৃত্ত। বলেছি যে মধুসূদন যতিকে ভাবের অনুগামী করেছিলেন : আসলে তিনি 'দ্বৈমাত্রিক লয়'কে প্রাধান্য দিয়ে ভাবযতিকে—অর্থাৎ বাক্‌প্রবাহে ভাবপ্রকাশের অনুকূল স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ ছেদকে ছন্দোযতির মর্যাদা দিয়েছিলেন। 'দ্বৈমাত্রিক লয়' বাক্‌প্রবাহের অন্তর্গত স্বাভাবিক 'ঝোঁক' বা প্রস্বর (stress)এর দ্বারা স্পন্দিত চতুর্মাত্রিক ধ্বনিগুচ্ছের উপর প্রতিষ্ঠিত, স্বাভাবিক উচ্চারণে এই চতুর্মাত্রিক বাক্‌স্পন্দ ব্যাহত হলেই পয়ারভিত্তিক বা পয়ার-জাতীয়[৪] অক্ষরবৃত্ত ছন্দোবন্ধুর হয়ে ওঠে, তাই এই ছন্দের পর্বাঙ্গবিন্যাস এমন হওয়া উচিত যাতে বাক্‌প্রবাহের অন্তর্গত স্বাভাবিক 'ঝোঁক' চতুর্মাত্রিক বাক্‌স্পন্দন সৃষ্টি করতে পারে। ধীর লয় আর স্বরপ্রস্বর (pitch and duration accent) এই ছন্দের আর একটি বৈশিষ্ট্য ; এই বৈশিষ্ট্যই অক্ষরবৃত্তের 'শোষণশক্তি'র মূলে। আর 'শোষণশক্তি' আছে বলেই এই ছন্দের সহনশীলতা খুব বেশি—ব্যঞ্জনবহুল ভারী ভারী শব্দ এতে সহজেই স্থান করে নেয়, ছন্দ ভেঙে পড়ে না। এই দুটি তত্ত্বের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ অক্ষরবৃত্তের শক্তি ও সম্ভাবনাকে নিপুণ ভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রবহমান ও বন্ধনমুক্ত সমিল ও অমিল পয়ারভিত্তিক কবিতা আধুনিক পর্বের কবিদের বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রবহমান ও বন্ধনমুক্ত অক্ষরবৃত্তের প্রধানত দুটি আদর্শ রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের কবিতায় লক্ষিত। একটির পদবিন্যাস দৃঢ়সম্বদ্ধ কিন্তু স্বাভাবিক বাক্‌বিন্যাসের নিকটবর্তী ; অপরটির পদবিন্যাসে শিথিল দীর্ঘপর্বের সমাবেশ, তাই সুরের প্রাধান্য বেশি। প্রথম আদর্শের এক প্রান্তে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, আর দ্বিতীয় আদর্শের অপর প্রান্তে জীবনানন্দ দাশ। বুদ্ধদেব বসু অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে নানা ভাবে বাজিয়ে দেখেছেন, যেমন, পংক্তিপ্রান্তিক দ্বৈমাত্রিক শব্দের সঙ্গে পরীক্ষামূলক ভাবে দ্বৈমাত্রিক শব্দের মিল,[৫] বিশেষত, তাঁর শেষের দিকের কোনো কোনো কবিতায় পর্বাঙ্গ ও পর্ব-বিন্যাসের হেরফের ঘটিয়ে তিনি পরীক্ষা করেছেন পয়ারভিত্তিক ছন্দ কতটা টান সহ্য করেও গদ্য থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য টিকিয়ে রাখতে পারে। উদাহরণত, বুদ্ধদেবের 'যে-আঁধার আলোর অধিক'এর কয়েকটি কবিতা থেকে বিক্ষিপ্ত কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করি :

৪. 'অক্ষরবৃত্ত' দু রকমের : পয়ারভিত্তিক ও অ-পয়ারভিত্তিক। এ প্রসঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধের তৃতীয় অংশ দ্রষ্টব্য

৫. বুদ্ধদেব বসুর 'দময়ন্তী' কাব্যের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

১ শুধু বিসংবাদী, যতক্ষণ, তটের উদ্বেল ঢেউ পেরিয়ে, তুমি না
শেখাও সাগর-যাত্রা···
দূর থেকে আরো দূরে, জন্মান্তরে প্রাগৈতিহাসিক
নীলিমায়—যেখানে, মাতার গর্ভে, নক্ষত্রপুঞ্জের মতো, জলে···

২ সব যেন, বৃহদরণ্যের মতো তর্কপরায়ণ···

৩ দূরের বন্ধুকে লেখা। যীশু কি পরোপকারী
ছিলেন, তোমরা ভাবো ? না কি বুদ্ধ কোনো সমিতির
মাননীয়, বাচাল, পরিশ্রমী, অশীতির
মোহগ্রস্ত সভাপতি ? উদ্ধারের স্বত্বাধিকারী···

শুধু কি তাই, মূলত রবীন্দ্র-অনুসারী হয়েও তিনি সংস্কৃত বা 'তৎসম'-শব্দের অপ্রান্তিক রুদ্ধ অক্ষরকে (closed syllable) দ্বৈমাত্রিক মূল্য দিয়ে[৬] কখনো কখনো অক্ষরবৃত্তে ব্যবহার করেছেন, যেমন,

১ পাবে বাড়ি, মাংস-ভাত ; গন্ধের অন্ধকারে ঢুকে

২ আলিঙ্গনে সত্তার সারাৎসার ক'রে সমর্পণ—

৩ বাক্, অর্থ, সম্পর্কের হিংস্রক দাঙ্গা শেষ হ'লে।

রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন (দ্র° 'ছন্দ' ১৯৬২ পৃ ৬০-৭৯), অ-সংস্কৃত শব্দের অপ্রান্তিক রুদ্ধ অক্ষরকে এক-মাত্রা আর দু-মাত্রা এই দু-রকমের মূল্য দিয়েই ব্যবহার করা সম্ভব। ইদানীংকালে অপ্রান্তিক তো বটেই, এমন কি, শব্দের প্রান্তিক রুদ্ধ অক্ষরকেও, যা অক্ষরবৃত্তে এতকাল সর্বদাই দু-মাত্রার মূল্য পেয়েছে, এক-মাত্রার মূল্য দিয়ে কবিরা ছন্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করছেন, বিকল্পে দু-মাত্রার মূল্য তো দিচ্ছেনই! তবে রুদ্ধ-অক্ষরের মাত্রা পূরণের চেয়ে মাত্রা হরণের দিকেই কবিদের প্রবণতা এখনকার কবিতায় বেশি চোখে পড়ে ; ফলে, অক্ষরবৃত্তের সাবেকী রীতির পাঠভঙ্গিতে যাঁরা অভ্যস্ত তাঁরা অস্বস্তি বোধ করেন। যাই হোক, মাত্রা হরণ-পূরণের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন হিসেবে নিচের স্তবকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি :

'যেমনি ভো কাট্টা হ'য়ে উপড়ে গেল পেটকাটি ঘুড়িটা
মারলো কার্নিক ছুটকে ময়ূরপঙ্খিও,
গোঁত মেরে নিজেরই মাথা ভেঙে ফেললো একবগ্‌গা মুখপোড়া
ভয়ে ভয়ে গুটিয়ে নিল শতরঞ্জি নিজেকে হঠাৎ।
বেগুনি সবুজ শাদা একে একে অন্তর্হিত হলে

৬. অক্ষরবৃত্তরীতিতে 'তৎসম' বা সংস্কৃত শব্দের অপ্রান্তিক রুদ্ধ অক্ষরের স্বাভাবিক মূল্য এক-মাত্রা।

নোংরা আকাশটায় একমেবাদ্বিতীয় হলুদ
লেজঅলা লালমুখো এক অহংকারের উরু দেখিয়ে নাচতে থাকলো।

'পরিস্থিতি', অরুণকুমার সরকার।

পয়ারভিত্তিক ছন্দে দ্বৈমাত্রিক লয়-আশ্রিত পর্বাঙ্গ ও পর্ববিন্যাসকে পরিবর্তিত করে গদ্য-পদ্যের বিবাদভঞ্জনের চেষ্টাও কোনো কোনো রচনায় চোখে পড়ে, আবার কোনো কোনো রচনায় চোখে পড়ে শব্দের প্রান্তিক-অপ্রান্তিক রুদ্ধ অক্ষরের মাত্রা সংকোচন-প্রসারণের সাহায্যে পয়ারভিত্তিক মুক্ত-ছন্দের পরীক্ষা :

১ একটা সেলাম

কলকাতার চিড়িয়াখানায় পাশাপাশি তিনটি মস্ত হাতি,
কিছুক্ষণ তাদের মুখোমুখি দাঁড়ালাম,
ভালো।

আলাদা জায়গায় একটা বাচ্চা-হাতি আছে,
তার কথা আমি ভুলি নি,
কিন্তু আপাতত তাকে হিসেব থেকে বাদ দিচ্ছি।

'চিড়িয়াখানা', অরবিন্দ গুহ।

২ তুমি তুলে ধরো তোমার
মেঘের মতো ঠাণ্ডা, চাঁদের মতো বিবর্ণ মুখ
কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত চুপ মাটির ঢেউয়ের মতো স্তন
প্রার্থনায় অবসন্ন ব্যাকুল বিশীর্ণ দীর্ঘ প্রত্যাশার হাত
সেই বিক্ষুব্ধ প্রকাণ্ড আকাশের দিকে—
আর তাই ঘিরে অন্ধকার, গুঁড়ি গুঁড়ি চুল,
নিঃসীম নিঃসঙ্গ হাওয়ায় অজস্র স্বরের বাজনা।

'আকাঙ্ক্ষার ঝড়', শঙ্খ ঘোষ।

৩ অনুমানে আনত করেছ সন্ধ্যার মালা, শেষে তোমাকেই দিতে হল বুকের সময়
তোমাকে বুঝি নি আমি, আমার অন্ধকার বেয়ে এসে পড়ে সহস্র মুকুট
দাঁড়ালে কেমন চক্ষুহীনতায়, বাল্যের সব অভিমানে গড়ে তোলা লাখো লাখো
প্রতিদান—অমি তো অন্ধ হব সম্পদের মানদণ্ড হাতে, অথবা…

'স্মৃতিগত', মানিক চক্রবর্তী।

উদ্ধৃত তিনটি স্তবকই মূলত পয়ারভিত্তিক অক্ষরবৃত্ত থেকে উদ্গত। দ্বৈমাত্রিক

য়-আশ্রিত চতুর্মাত্রিক বাক্‌স্পন্দকে ব্যাহত করে বা গৌণ রেখে, শব্দের প্রান্তিক-অপ্রান্তিক রুদ্ধ অক্ষরের স্বাভাবিক মূল্যকে প্রায়শ অগ্রাহ্য করে উল্লিখিত কবিতার অংশগুলি গদ্য-ছন্দের আর মুক্ত-ছন্দের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে : প্রথমটির ছন্দ গদ্যের দিকে, দ্বিতীয়টি মুক্ত-ছন্দের দিকে, আব তৃতীয়টি ব্যতিক্রম সত্ত্বেও, অক্ষরবৃত্তের পরিচিত চালের নিকটবর্তী। রক্ষণশীল ছান্দসিকরা অবশ্য বলবেন, প্রথমটি গদ্য-ছন্দে রচিত, দ্বিতীয়টির ছন্দ কোনো প্রথাসিদ্ধ ছন্দের গণ্ডিতে পড়ে না, তৃতীয়টি মূলত পয়ারভিত্তিক, কিন্তু ছন্দোবিচ্যুতিতে বন্ধুর। তরুণ কবিদের কবিতায় এই ছন্দোবিচ্যুতির অভিযোগ অনেকেই করেন, বিশেষত যাঁরা প্রবীণ। এ কি বিচ্যুতি, না ছন্দের ভিতরে থেকে মুক্তি, না কি বিশৃঙ্খলা ? না কি প্রথাসিদ্ধ ছন্দ ভেঙে অপর এক ছন্দের জগতে উত্তরণের চেষ্টা, কিংবা নতুন এক ছন্দঃস্পন্দ আবিষ্কারেব আপাতনৈরাজ্য ? ছন্দোবোধ অভ্যাসনির্ভর, প্রচলিত ছন্দোরীতিতে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা অস্বস্তি বোধ করবেনই যতদিন না তাঁরা এই ছন্দঃস্পন্দে অভ্যস্ত হচ্ছেন। সাম্প্রতিক, বিশেষত তরুণ কবিদের অধিকাংশ, নির্ভুল ছন্দে কবিতা লিখতে পারেন না, বা তাঁরা ছন্দোজ্ঞানশূন্য এমন সিদ্ধান্ত একদেশদর্শিতাপ্রসূত। 'কবিতা' মাত্রই কোনো না কোনো ছন্দ মেনে চলে, সে ছন্দ অতিনিরূপিত প্রস্ফুট হতে পারে, অস্ফুটও হতে পারে যেমন স্পন্দমান গদ্য, কিংবা হতে পারে কখনো-প্রস্ফুট-কখনো-অস্ফুট।[৭] যে কবিতার ছন্দ নেই তা 'অ-কবিতা'।

২

পূর্বেই বলেছি যে প্রাক্‌-রবীন্দ্রযুগের কবিরা 'স্বরবৃত্ত' বা লৌকিক ছন্দেব শক্তি ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগান নি, সম্ভবত এই ছন্দের সাহিত্যিক আভিজাত্য ছিল না। সে যুগে রামপ্রসাদ ছাড়া আর কোনো প্রখ্যাত কবি এই ছন্দে গভীর-ভাবের কবিতা বড একটা লেখেন নি। তা হলেও, লোকসাহিত্যে—যেমন, বাউল, কবিগান, ছেলে ভুলোনো ছড়া, মেয়েদের ব্রতকথা-ইত্যাদিতে স্বরবৃত্ত ছন্দই ছিল প্রধান, হয়তো বা একমাত্র ছন্দ। রবীন্দ্রনাথই প্রথম স্বরবৃত্তের প্রাণশক্তিকে উপলব্ধি করেন, যাকে তিনি বাঙলার 'স্বাভাবিক ছন্দ' বলেছেন। স্বরবৃত্ত ছন্দকে তিনি সাহিত্যের রাজসভায় সগৌরবে এনে পাকাপাকি ভাবে আসন দিয়েছেন। স্বরবৃত্তের একটা সাহিত্যিক আদর্শ তিনিই নির্মাণ করেছেন ; তাঁর সমসাময়িক এবং পরবর্তী কবিদের, এমন কি সমকালীন কবিদের স্বরবৃত্তের আদর্শ মোটামুটি রবীন্দ্রনাথের আদর্শেরই অনুবর্তন, বিশেষ করে তাঁদের রচিত সেই সব কবিতার কথা বলছি যে-গুলির ছন্দ নিয়ে কোনো বিতর্কের

---

৭. তুলনীয় সংস্কৃতের 'বৃত্তগন্ধি' গদ্য।

অবকাশ নেই ছান্দসিকদের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ স্বরবৃত্ত ছন্দকে শুধু প্রতিষ্ঠাই দেন নি, তার মুক্তির চাবিও তিনি পরবর্তী কবিদের হাতে দিয়েছেন, যার নিদর্শক তাঁর সমিল অমিল প্রবহমান স্বরবৃত্তে রচিত কবিতাগুলি,—'বলাকা', 'পলাতকা', 'পরিশেষ', 'পুনশ্চ' কাব্যে ; অবশ্য 'পলাতকা' কাব্যেই প্রবহমান স্বরবৃত্ত সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও 'বাংলা ভাষার প্রাণপাখি' স্বরবৃত্তের ছন্দঃস্পন্দনে বিমুগ্ধ ছিলেন, নানা ভাবে তিনি এই ছন্দ নিয়ে চর্চা করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ-চর্চা ছান্দসিকদের কৌতূহলী করলেও, পরবর্তী কালের—বিশেষ করে সাম্প্রতিক কালের কবিরা তাঁর কাছ থেকে পথের সন্ধান পান নি এর কারণ সম্ভবত, এই যে, তাঁর স্বরবৃত্ত ছন্দের পরীক্ষা 'মুক্তি'র চেয়ে 'বন্ধন'কেই আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিল। সম্ভবত, একই কারণে সংস্কৃতের বৃত্ত-ছন্দের অনুকরণে স্বরান্ত অক্ষর (মুক্ত অক্ষর) ও ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর (রুদ্ধ অক্ষর) সুনির্দিষ্টভাবে বিন্যস্ত করে সত্যেন্দ্রনাথ বাঙলা ছন্দের যে দিক নির্দেশ করেছিলেন তার প্রতিও পরবর্তী কবিরা স্বভাবতই বিশেষ আগ্রহী হন নি। এর আরেকটা কারণ, স্বরান্ত (হ্রস্ব) ও ব্যঞ্জনান্ত (দীর্ঘ) অক্ষরের বিন্যাস সুনির্দিষ্ট থাকলেও এই ছন্দ বাঙালির কাছে মাত্রা-ছন্দের কাঠামোর মধ্য দিয়ে ধরা দেয়, হ্রস্ব-দীর্ঘের নির্দিষ্ট পারম্পর্যের ছন্দোগত মূল্য বা তাৎপর্য গৌণ হয়ে পড়ে ; সুতরাং যৎসামান্য লাভের আশায় কবিরা কেন বৃথা পরিশ্রম করবেন, বিশেষত যার পরিণতি ছন্দের মুক্তিতে নয়, বন্ধনে। পয়ারভিত্তিক অক্ষরবৃত্ত আর স্বরবৃত্ত ছন্দের মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত মিল আছে, সেটা অক্ষর উচ্চারণের নমনীয়তা এবং এই নমনীয়তার জন্যই উভয় ছন্দের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান সম্ভব। এই ছন্দে শুধু বল-প্রস্বর (stress accent) নয়, স্বর-প্রস্বরেরও (pitch and duration accent) একটা স্থান আছে ; বল-প্রস্বরের প্রাধান্য কমিয়ে স্বর-প্রস্বরের প্রাধান্য বাড়ালে স্বরবৃত্ত পয়ারভিত্তিক অক্ষরবৃত্তের কাছাকাছি এসে পড়ে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর বহু কবিতায় পয়ারভিত্তিক অক্ষরবৃত্ত আর স্বরবৃত্তের মধ্যে বোঝাপড়া ঘটিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে দেখতে পাই, জীবনানন্দ দাশ বল-প্রস্বরের প্রাধান্য কমিয়ে, পঙ্‌ক্তিকে প্রবহমান করে ও তাতে বহু পর্বের সমাবেশ ঘটিয়ে, স্বরবৃত্তকে পয়ারভিত্তিক অক্ষরবৃত্তের গাঁটছড়ায় বেঁধে নিজের কবিস্বভাবের উপযোগী করে নিয়েছেন। হয়তো, রবীন্দ্রনাথেই তিনি পেয়েছিলেন এর সূত্র, যা থেকে নির্মাণ করেছিলেন নিজের চরিত্র-উপযোগী ছন্দ।

> মনে পড়ে সেই কবেকার গভীর সাগর কী এক নিখিল বৃক্ষ থেকে ঝরে,
> অন্ধকে চোখ দান ক'রে রোদ ক্রন্দসীতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে ;
> দুপুরবেলা সূর্যালোকের থেকে নেমে অতিথিদের মতো
> অসংখ্য সব শাদা পাখি সহসা ঘুম ভেঙে

দিয়েছে ব'লে মনে হ'ত ;

'পৃথিবী, জীবন, সময়', জীবনানন্দ দাশ।

[illegible]লনীয় রবীন্দ্রনাথের

একের বাঁচন সবার বাঁচার বন্যাবেগে আপন সীমা হারায়
বহু দূরে ; নিমেষগুলির ফলের গুচ্ছ ভরে রসের ধারায়।
অতীত হয়ে তবুও তারা বর্তমানের বৃন্তদোলায় দোলে,—
গর্ভবাঁধন কাটিয়ে শিশু তবু কেমন মায়ের বক্ষে কোলে
বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের গ্রন্থি দিয়ে ··

'শেষ গান', পলাতকা।

নিচের পঙ্‌ক্তি কটি অনেক পরবর্তী একজন কবির, এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে :

কী হাহাকার শুনতে পেলে, দুটি স্তনের চূড়ার মধ্যে শীতল সমতলে
কয়েক হাজার মুখ লুকোনোর ব্যাকুলতা ; বুকের কাছে হাওয়ার কৌতূহলে
কত কাতর শব্দ উঠলো স্পষ্ট দেখলে তোমার চতুর্দিকে
কয়েক হাজার ব্যগ্র চোখের উষ্ণ নিশ্বাসের আগুন জ্বলে।

'কয়েক হাজার নিশ্বাসের ভিড়ে', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

পঙ্‌ক্তির প্রথমেই অপূর্ণ-পর্ব ব্যবহার করে মাত্রার ফাঁক রেখে স্বরবৃত্ত ছন্দের স্পন্দনকে আরো হিল্লোলিত করে তোলা যায়, এ-কৌশল বহু পরিচিত,[৮] এই কৌশলকেই স্বাভাবিক বাক্‌স্পন্দের অনুগত রেখে ব্যবহার করলে স্বরবৃত্ত গদ্যের দিকে ঈষৎ হেলে পড়ে, অথচ তার চরিত্রগত স্পন্দন লুপ্ত হয় না :

এ-ঘরে লক্ষ্মীই নেই, আর কি কাজ !
স্বামী তোর দাওয়ায় একা। ঠিকে ঝি
বলুক তোকে সকলে,
আমি তো হাত পুড়িয়ে শিখেছি :
যা আছে তোর দখলে
তার নাম আগুন, ওদের নিকুচি।

'দাসীকে', অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত।

---

৮. যেমন, রামপ্রসাদের, কিংবা রবীন্দ্রনাথের

১ স্বভাবে হও রে সোজা
বয়ো না ভূতের বোঝা
ভবে আর ক-দিন রবে।

২ এবারে ঘুচল কি ভয় এবারে হবে কি জয়।
আকাশে হল কি ক্ষয় কালির রেখা।

অবশ্য এই ভাবে স্বরবৃত্ত ছন্দকে বাজানোর প্রয়াস খুব কম চোখে পড়ে। অক্ষরভিত্তিক পয়ারের কথা ছেড়ে দিলে, প্রস্ফুট ছন্দোরীতি হিসেবে স্বরবৃত্তকেই আধুনিক-পর্বের কবিরা বেশি কাজে লাগাচ্ছেন, নানা ভাবে তার সম্ভাবনাকে বাজিয়ে দেখছেন।

১ যেন অশ্রু যেন আমার সমস্ত অস্তিত্ব
সঙ্গোপনে লুকিয়ে
কত লুকিয়ে ঝরে পড়ল। হঠাৎ
যেন সমস্ত ঝাড়লণ্ঠন ভীষণ জ্বলে উঠল। যেন চুড়ির
শব্দ যেন মিলিয়ে-আসা ঘুঙুরের হরবোলে
অন্ধকারের লক্ষ মশাল সমস্বরে হেসে উঠল···

'যেতেই হবে', দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২ উচ্চাশা। কি ভীষণ দিবানিশি
দুর্গ-প্রাকার তোরণে কে কাঁদে
নাড়ে
বাহিরে কাল-পেচক
ভগ্নস্বর
ভিতরে সেই প্রেতিনী
ঘুরে মরে
বাতিদানের ছায়ায়···

'দুই চরিত্র', সিদ্ধেশ্বর সেন।

৩ পৃথিবীতে কত নামের পথ আছে।
সন্ধ্যাবেলায় আমবনের ভিতরে সেই পথ
রেখেছি মনে মনে। ঘণ্টা বাজে সমারোহে উদ্ভাসিত মন্দিরের
মায়েব মুখ স্নিগ্ধ, শাঁখ-বাজার শব্দ নিবিড় কাছে।···

'সময়', আলোক সরকার।

উদ্ধৃতিগুলির প্রথমটিতে, দীর্ঘ পঙ্‌ক্তিকে ভেঙে সাজিয়ে প্রতিটি বাক্যের শেষে সমাপিকা ক্রিয়ার স্বাভাবিক অবস্থান বজায় রেখে ছন্দঃস্পন্দে বৈচিত্র্য আনা হয়েছে ; দ্বিতীয়টিতে, পঙ্‌ক্তিকে ভেঙে এমন ভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে যে ছন্দ প্রচণ্ড টান খেয়ে প্রায় গদ্য-ছন্দের সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে, এর স্বরবৃত্তের কাঠামো চট করে ধরা পড়ে না ; তৃতীয়টিতে, ভাবযতি বা অর্থযতিকে পর্বযতি থেকে বিযুক্ত করে অপূর্ণ-পর্বকে পঙ্‌ক্তির মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। ফলত, পয়ারভিত্তিক অক্ষরবৃত্ত আর গদ্যের সঙ্গে স্বরবৃত্তের একটা মেলবন্ধন ঘটেছে।

সমকালীন কবিদের অনেকের রচনায় রবীন্দ্রনাথের স্বরবৃত্তের অনুবৃত্তি লক্ষিত হলেও, বিভিন্ন কবির অনুশীলনে এই ছন্দের সম্ভাবনা যে বিস্তৃততর হয়েছে, উল্লিখিত কবিতার অংশগুলিতেই তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে। স্বরবৃত্তের ছন্দঃস্পন্দকে ভিত্তি করে এঁরা পৌঁছতে চাইছেন এক নতুন ছন্দঃস্পন্দে, যা প্রস্ফুট অথচ মুক্ত।

৩

বাঙলা ছন্দের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে 'অক্ষরবৃত্ত' ও 'মাত্রাবৃত্ত'[৯] প্রাকৃত-অপভ্রংশের মাত্রা-ছন্দ থেকে উদ্‌গত; এমন কি সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদা না পেলেও, স্বরবৃত্তের যে-রূপটির সঙ্গে আমরা রবীন্দ্র-পূর্ব যুগের সাহিত্যে পরিচিত হই, তাও গড়ে উঠেছে অক্ষরবৃত্তের পয়ার ও ত্রিপদীর উপর দেশজ বা লৌকিক ছন্দের প্রভাবে—যেমন লোচন দাসের 'ধামালি'।[১০] রবীন্দ্র-পূর্ব যুগে 'অক্ষরবৃত্ত' আর 'মাত্রা-বৃত্ত' ছন্দের পার্থক্য সুস্পষ্ট ছিল না, উভয় ছন্দেরই মাত্রা গোনার পদ্ধতি ছিল এক—অর্থাৎ উভয় ছন্দেই অ-প্রান্তিক রুদ্ধ অক্ষর এক-মাত্রার মূল্য পেয়েছে। বর্তমানে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের মাত্রা গোনার যে-বিশিষ্ট রীতির সঙ্গে আমরা পরিচিত—শব্দের প্রান্তিক ও অ-প্রান্তিক রুদ্ধ অক্ষর মাত্রেরই দ্বৈমাত্রিক মূল্য—তখন তা প্রচলিত ছিল না। তাই তখনকার মাত্রাবৃত্ত ছিল প্রকৃতপক্ষে অক্ষরবৃত্ত। বরং বলা যেতে পারে তখনকার 'অক্ষরবৃত্ত' ছিল দু-ধরনের: এক, পয়ারভিত্তিক অক্ষরবৃত্ত, যার ছন্দঃস্পন্দের উৎস হল দ্বৈমাত্রিক লয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত চতুর্মাত্রিক ধ্বনিগুচ্ছ, যেমন পয়ার ও দীর্ঘত্রিপদী-জাতীয় জোড়মাত্রার ছন্দোবন্ধ; দুই, অ-পয়ারভিত্তিক অক্ষরবৃত্ত, যার ছন্দঃস্পন্দ দ্বৈমাত্রিক লয়যুক্ত চতুর্মাত্রিক ধ্বনিগুচ্ছের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে সমমাত্রিক পর্ব-বিন্যাসের উপর: ছন্দ পর্বনির্ভর বলে পর্বাঘাত স্পষ্ট এবং দ্বৈমাত্রিক লয়-নির্ভর নয় বলে এই ছন্দে বিজোড়-মাত্রার পর্ব বা পঙ্‌ক্তিবিন্যাস সম্ভব।

৯. এই ছন্দোরীতির অন্যান্য নাম: ধ্বনিপ্রধান, শুদ্ধ-প্রাকৃত-ইত্যাদি। 'মাত্রাবৃত্ত'-নামটিও, 'অক্ষরবৃত্ত' 'স্বরবৃত্তে'র মতোই প্রবোধচন্দ্র সেনের ছন্দ-প্রবন্ধের মধ্যবর্তিতায় প্রচলিত হয়েছে, এই রীতির অন্যান্য নামগুলি 'মাত্রাবৃত্ত' নামের মতো এত জন-প্রচলিত হয় নি। এই নাম ছন্দোরীতির যথার্থ পরিচয় দেয় না, তাই প্রবোধচন্দ্র সেন পরে এই ছন্দোরীতির নতুন নাম দিয়েছেন 'কলাবৃত্ত' বা 'কলামাত্রিক'।

১০. লোচন দাসের ধামালি-র নিদর্শন:

> আর শুন্যাছ আ লো সই গোরা ভাবের কথা।
> কোণের ভিতর কুলবধূ কান্দ্যা আকুল তথা॥

পয়ারভিত্তিক অক্ষরবৃত্ত :

১ মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

কাশীরাম দাস।

২ মহাজ্ঞানী মহাজন যে-পথে করে গমন
হয়েছেন চিরস্মরণীয়
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তিধ্বজা ধরে
আমরাও হবো বরণীয়।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অ-পয়ারভিত্তিক অক্ষরবৃত্ত :

১ কৈলাশ ভূধর অতি মনোহর
কোটি শশী পরকাশ।
গন্ধর্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর
অপ্সরাগণের বাস ॥

ভারতচন্দ্র রায়।

২ পাপ আয়ানে শুনিলে কানে
গঞ্জনা বাণে বধিবে প্রাণে।...
বংশীর ধ্বনি যেন হে ফণী
আমি রমণী প্রমাদ গণি।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

৩ প্রভু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি,
ওগো পুরবাসী কে রয়েছ জাগি,
অনাথ পিণ্ডদ কহিলা অম্বুদ নিনাদে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উদ্ধৃত উদাহরণগুলি তুলনা করলেই 'অক্ষরবৃত্ত'-রীতির দু-ধরনের ছন্দের পার্থক্য ধরা পড়বে : পয়ারভিত্তিক অক্ষরবৃত্তে পর্বাঘাত নেই, যতি-খণ্ডিত বাক্যাংশগুলি চতুর্মাত্রিক (২+২=৪ বা ২+০০=৪ ; ০০=২ মাত্রা-পরিমাণ বিরতি) ধ্বনিগুচ্ছের স্পন্দনে তরঙ্গায়িত ; ছন্দের লয় ধীর (steady) ও দ্বৈমাত্রিক, তাই পর্বাঘাতজাত তালের অবকাশ প্রায় নেই।

লক্ষ্য করবার বিষয় যে 'যে-পথে ক'রে গমন' পর্বটিতে ছন্দ টাল খেয়েছে, কারণ 'করে-শব্দটিতে চতুর্মাত্রিক বাক্‌স্পন্দ ব্যাহত হয়েছে—চতুর্মাত্রিক বাক্‌স্পন্দ রক্ষা

রতে গেলে এখানে 'রে'-অক্ষরটির উপর যে-জোর বা 'ঝোঁক' দিতে হয় তা স্বাভাবিক উচ্চারণ সমর্থন করে না। অ-পয়ারভিত্তিক অক্ষরবৃত্তের ছন্দঃস্পন্দ দ্বৈমাত্রিক লয় থেকে হয় না, হলে 'অনাথ পিণ্ডদ কহিলা অম্বুদ নিনাদে' বাক্যটিতে ছন্দ ভেঙে পড়ত এবং 'গঞ্জনা বাণে' জাতীয় পর্ববিন্যাস সম্ভব হত না। অ-পয়ারভিত্তিক অক্ষরবৃত্তে প্রতি পর্বের মাত্রাসমতা পর্বাঘাতের সাহায্যে তালযুক্ত ছন্দঃস্পন্দের সৃষ্টি করে। প্রবন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদে যে-অক্ষরবৃত্তের আলোচনা করা হয়েছে তা পয়ারভিত্তিক অক্ষরবৃত্ত। এক নতুন উচ্চারণরীতি প্রয়োগ করে অ-পয়ারভিত্তিক অক্ষরবৃত্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছিলেন তাঁর 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দ। 'মাত্রাবৃত্ত' বলতে এখন আমরা যে ছন্দোরীতিকে বুঝি তার স্রষ্টা ও রূপকার রবীন্দ্রনাথ। শব্দের প্রান্তিক রুদ্ধ-অক্ষরের দ্বৈমাত্রিক মূল্য তো অক্ষরবৃত্তে ছিলই, রবীন্দ্রনাথ শব্দের অ-প্রান্তিক রুদ্ধ-অক্ষরকেও সর্বদা দ্বৈমাত্রিক মূল্য দিয়ে পর্বগুলির মাত্রাসমতা অতিনিরূপিত করলেন, ফলে, অক্ষরবৃত্ত-রীতির তুলনায় পর্বাঘাতগুলি আরো স্পষ্ট হল, বিলম্বিত লয়ের উচ্চারণ প্রতিটি পর্বের কালসমতাকে আরো সূক্ষ্মভাবে পরিমাপের সহায়ক হল। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ এক নতুন ছন্দঃস্পন্দের সঙ্গে বাঙালি কবিদের পরিচিত ও অভ্যস্ত করলেন। আমরা এই ছন্দোরীতিতে এত অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে অক্ষরবৃত্ত-রীতির মাত্রাবৃত্তকে আমরা 'মাত্রাবৃত্ত' বলে মনেই করি না, এমন কি ওই রীতির কবিতা পাঠ করতে অনেকেরই অসুবিধে হয়, তাঁরা অস্বস্তি বোধ করেন। শব্দের অ-প্রান্তিক রুদ্ধ অক্ষরের দ্বৈমাত্রিক উচ্চারণ যে রবীন্দ্র-পূর্ব যুগে অজ্ঞাত ছিল তা নয়, ছিল ব্যতিক্রম, একমাত্র সংস্কৃত বৃত্ত-ছন্দের ও প্রাকৃত মাত্রা-ছন্দের অনুসরণে লিখিত কবিতাগুলিতেই এই উচ্চারণরীতি অনেকটা অনুসৃত, যদিও সুনির্দিষ্টভাবে নয়। রবীন্দ্রনাথের মাত্রা-ছন্দে এই উচ্চারণরীতি সুনির্দিষ্ট, ব্যতিক্রমহীন। রবীন্দ্রযুগে মাত্রাবৃত্তের এই নতুন রীতি একটি বিশিষ্ট ছন্দোরীতিতে পরিণত হয়েছে এবং এখন 'মাত্রাবৃত্ত' বললে এই ছন্দোরীতিকেই বোঝায়। রবীন্দ্রযুগের কবিদের কাছে 'মাত্রাবৃত্ত' একটি অতি-প্রিয় ছন্দোরীতি। এ-ছন্দে চার-মাত্রা, পাঁচ-মাত্রা, ছ-মাত্রা, সাত-মাত্রা-র পর্ববিন্যাস সম্ভব; কৌশলে চার-মাত্রার পর্ব-যতি লোপ করে এই ছন্দে আট-মাত্রার পর্ববিন্যাসও সম্ভব। তবে, এই ছন্দে ছ-মাত্রার পর্ব মনে হয় বেশি প্রচলিত। ছ-মাত্রার ছন্দকে, রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে, অনেক ছান্দসিক[১১] তিন-মাত্রার ছন্দ ব'লে গণ্য করেন। ছ-মাত্রার ছন্দে ৩+৩ পর্বাঙ্গ বিন্যাস বেশি ব্যবহৃত হলেও ৪+২, ২+৪, ২+২+২ পর্বাঙ্গ বিন্যাসে কোনো বাধা নেই; যেহেতু ৪+২, ২+৪, ২+২+২ অঙ্গসমন্বিত পর্বে তিন-মাত্রার পর যতির অবকাশ নেই, এই ছন্দের ভিত্তি প্রকৃতপক্ষে

---

১১ বুদ্ধদেব বসু, মোহিতলাল মজুমদার; সম্প্রতি প্রবোধচন্দ্র সেন।

পুরো ছ-মাত্রার পর্ববিন্যাস। ওই ধরনের পর্বে তিন-মাত্রার পরে যতি-লোপ পেয়েছে ধরা যেত যদি যতি লোপের প্রত্যাঘাত (reflex) ছন্দঃস্পন্দে ধরা পড়ত :

১ তোমার সন্ধ্যা ছিল প্রদীপহীনা,
আঁধারে দুয়ারে তব বাজানু বীণা।
তারার আলোক মাঝে মিলি মোর চিত্ত
ঝংকৃত তারে তারে করেছিল নৃত্য,
তোমার হৃদয় নিস্পন্দ ছিল।

উপরের উদাহরণের নিম্নরেখ শব্দগুলিতে চতুর্মাত্রিক যতি লোপের প্রত্যাঘাত বা প্রতিক্রিয়া অনুভব করা যায়—ওই সব শব্দে পৌঁছে ছন্দ দুলে ওঠে।

২ হৃদয় আমার খেয়ার যাত্রী বৈতরণীর পার
কাণ্ডারীহীন বালুকা বেলায় দৃষ্টি ঘুরিছে দূরে।
হৃদয় আমার ছাপিয়ে উঠেছে বাতাসের হাহাকারে।

৩ পৌষপ্রখর শীতে জর্জর ঝিল্লীমুখর রাত্তি,
নিদ্রিত পুরী নির্জন ঘর নির্বাণ দীপবাতি।

উপরের উদাহরণদুটিতে নিম্নরেখ শব্দগুলির কোথাও ত্রৈমাত্রিক যতি-লোপ ঘটেনি, তার অবকাশও নেই, যতি-লোপ ঘটলে তার প্রত্যাঘাত বা প্রতিক্রিয়া থাকত—ছন্দ দুলে উঠত ; সুতরাং এই ছন্দের প্রতিটি পবের কালপরিমাণ তিন-মাত্রার পরিবর্তে ছ-মাত্রা গণ্য করাই সমীচীন।

রবীন্দ্রনাথের সমকালের এবং পরবর্তী কালের কবিরা মাত্রাবৃত্তে প্রচুর কবিতা লিখেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কতকগুলি কবিতা তো মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত উভয় রীতিতেই পাঠ করা যায় (যেমন, 'মহৎ ভয়ের মুরত সাগর বরণ তোমার তমঃশ্যামল / মহেশ্বরের প্রলয়পিণাক শোনাও তুমি শোনাও কেবল ॥')-ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত উচ্চারণ-রীতিকে অনুসরণ করেও অনেক কবিতা (লিখিত হয়েছে, মনে হয়, গানের জন্য) মাত্রাবৃত্তে রচনা করেছেন (যেমন, 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী / আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি ॥')-ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কবিরা কিন্তু এই যত রীতির মাত্রাবৃত্ত তাঁদের কবিতায় বিশেষ ব্যবহার করেন নি, অবশ্য সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যে এই রীতির সুন্দর প্রয়োগ আছে (যেমন, 'আগত আগত উদার সবিতা প্রাচী রঞ্জিত রাগে'-ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিগুলি)। রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে মাত্রাবৃত্তের সম্ভাবনাকে বিশেষ ভাবে কাজে লাগিয়েছেন। এঁদের প্রবহমান মাত্রাবৃত্তে রচিত কবিতা (বুদ্ধদেবের 'কঙ্কাবতী', বিষ্ণু দে-র 'চোরাবালি'র

'মন-দেওয়া-নেওয়া' কবিতা) এখনো আদর্শ হয়ে আছে। প্রবহমান মাত্রাবৃত্তের আদর্শ অবশ্য রবীন্দ্রনাথেও আছে, 'সেঁজুতি' কাব্যে এই কবিতার একটা লক্ষণীয় বিষয় হল, প্রথম স্তবকেই ছ-মাত্রার পর্বযতি থেকে ভাবযতিকে বিযুক্ত রাখা হয়েছে :

যাক এ জীবন,
যাক নিয়ে যাহা টুটে যায়, যাহা
ধূলি হয়ে লোটে ধূলি-'পরে, চোরা
মৃত্যুই যার অন্তরে, যাহা
রেখে যায় শুধু ফাঁক।

'যাবার মুখে'।

মাত্রাবৃত্তের একটা বড় অসুবিধে হল ভাবযতি এই ছন্দে স্বভাবত পর্বযতির অনুগামী, ব্যতিক্রম হলে হোঁচট খাবার সম্ভাবনা, অথচ ভাবযতিকে সর্বদা পর্বযতির অনুগামী হতে হলে প্রবহমানতায় স্বাচ্ছন্দ্য থাকে না। আধুনিক কবিতায় মাত্রাবৃত্তে পর্বযতি থেকে ভাবযতিকে বিযুক্ত রাখার প্রয়াস চোখে পড়ে; কিন্তু এ-ধরনের প্রয়াসের সার্থকতা নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'বাংলা ছন্দ' প্রবন্ধে (দ্র° 'সাহিত্যচর্চা') মণীন্দ্র রায়ের কবিতা থেকে উদাহরণ তুলে অভিযোগ করেছেন যে এতে ছন্দের 'অপঘাত' ঘটেছে।

বিষ্ণু দে তাঁর শব্দ-ব্যবহার ও পর্ব-বিন্যাসের বৈচিত্র্যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে বিশেষ ভাবে নিজের ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন যা নাকি তাঁর পরবর্তী অনেক কবিকে প্রভাবিত করেছে। 'মাত্রাবৃত্ত' নিয়ে পরীক্ষার নিদর্শন হিসেবে বুদ্ধদেব বসুর দুটি কবিতার নাম উল্লেখ করতেই হয় : 'আমন্ত্রণ—রমাকে' এবং 'জোনাকি' (দ্র° বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা)—প্রথমটি আট-মাত্রার (৪ + ৪) ছন্দ, এতে অতি-পর্ব আর অপূর্ণ-পর্ব ব্যবহারের কৌশল লক্ষ্য করবার মতো ; দ্বিতীয়টিতে ছ-মাত্রার ছন্দকে অন্তরালে রেখে শব্দবিন্যাসকে প্রাধান্য দিয়ে ছন্দঃস্পন্দে বৈচিত্র্য আনা হয়েছে।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এই সে দিন পর্যন্ত কবিরা প্রচুর কবিতা লিখলেও, অতি সাম্প্রতিক কালে দেখতে পাচ্ছি যে এই ছন্দে কবিতা বিশেষ লেখা হচ্ছে না। এর একটা কারণ হয়তো এই যে মাত্রাবৃত্তে কবির স্বাধীনতা পয়ারভিত্তিক অক্ষরবৃত্তের তুলনায় অনেক কম—কবিকে সচেতনভাবে ছন্দকে অনুসরণ করতে হয়; তা ছাড়া, পর্ব, অপূর্ণ-পর্ব, অতি-পর্বের বিভিন্ন ছন্দোবন্ধ বা প্যাটার্নের মধ্য দিয়ে কবিরা এই ছন্দে যে-বৈচিত্র্য এনেছিলেন সে ছন্দোবন্ধ বা প্যাটার্নগুলিও ব্যবহারে ব্যবহারে মলিন, নতুন সম্ভাবনাও হয়তো কবিরা খুঁজে পাচ্ছেন না। নতুন সম্ভাবনা যে একেবারেই কেউ খুঁজে পাচ্ছেন না তাই বা কী করে বলি ? যেমন,

দশটি ছবির ভিতরে একটি ছবি
তোমার জন্যে এনেছিলুম।...
কত সহজের পরিবর্তন। তোমার সফেন
চুলের উপর একটি তমসা। এক মুহূর্ত
চুলের উপর দ্বিতীয় তমসা। আমি
দীর্ঘ জীবন তোমার নিকট স্বতঃস্ফূর্ত
প্রস্তুত আহ্বান।

'অবিরাম', আলোক সরকার।

এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ছ-মাত্রার মাত্রাবৃত্তকে গদ্যের বাক্‌ভঙ্গির ছকে ফেলে নতুন ভাবে বাজাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

৪

অতি সাম্প্রতিক কালের কবিরা পয়ারভিত্তিক অক্ষরবৃত্ত আর গদ্য-ছন্দে বেশি স্বচ্ছন্দ, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাগুলি দেখলে অন্তত সেই রকম ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ গদ্য-ছন্দের যে-আদর্শ নির্মাণ করেছেন তার নিদর্শন শুধু কবিতায় নয়, গদ্যরচনাতেও রেখে গেছেন। বুদ্ধদেব বসু, সঙ্গতভাবেই লক্ষ্য করেছেন 'পুনশ্চ' 'শ্যামলী' 'শেষ সপ্তক' কাব্যের কবিতার গদ্যের সঙ্গে 'শেষের কবিতা', 'কালের যাত্রা', 'বিশ্বপরিচয়'এর গদ্যের মিল। 'রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতার ছন্দের লক্ষ্য ছিল 'পদ্য-ছন্দের মৌতাত' কাটিয়ে ওঠা (দ্র° বুদ্ধদেব বসুর 'বাংলা ছন্দ')। গদ্যের ছন্দ বাক্‌প্রবাহের স্বাভাবিক ছেদ-নির্ভর; যতি-নির্ভর নয় বলে গদ্য-ছন্দ 'প্রস্ফুট' নয়, 'অস্ফুট';—ছেদ-নির্ভর বাক্যাংশগুলির নিরূপিত বিন্যাসই গদ্য-ছন্দের উৎস। বাক্যবিন্যাসে 'প্রস্ফুট' ছন্দের অতিনিরূপিত বন্ধন নেই তাই গদ্য-ছন্দ আপাত দৃষ্টিতে সহজ, কিন্তু এতে সিদ্ধিলাভ কঠিন; সম্ভবত এই কারণে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত গদ্য-ছন্দে বাঙালী কবিদের 'সর্বনাশের সূত্রপাত' আশঙ্কা করেছিলেন। তৎকালীন ও সাম্প্রতিক কালের কিছু কিছু গদ্য কবিতা প্রমাণ করে যে তাঁর আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক ছিল না, তবু রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কবিদের অনেকেই যে গদ্য-ছন্দে বিশেষ সিদ্ধি লাভ করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। সমর সেন গদ্য-ছন্দকেই তাঁর কাব্যের বাহন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে সমর সেনের কবিতায় 'গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য প্রকাশ পেয়েছে যত দূর ধারণা।' অরুণ মিত্রও প্রধানত গদ্য-ছন্দেই লেখেন। জীবনানন্দ দাশও গদ্য-ছন্দকে নিজের ভাষার উপযোগী করে নিয়েছিলেন;

পয়ারভিত্তিক অক্ষরবৃত্ত আর স্বরবৃত্তের মতোই গদ্য-বৃত্তেও তাঁর কবিচরিত্র প্রতিফলিত। বুদ্ধদেব বসুর গদ্য-ছন্দের আদর্শ মূলত রবীন্দ্র-অনুসারী হলেও তাঁর 'শীতরাত্রির প্রার্থনা' কবিতায় নিরূপিত ছেদ যুক্ত দীর্ঘপঙ্‌ক্তি ও মিল ব্যবহার করে গদ্য-ছন্দকে প্রায় পদ্য-ছন্দের প্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছেন। অমিয় চক্রবর্তী বিভিন্ন প্রস্ফুট ছন্দের আভাসযুক্ত বাক্যাংশের সাহায্যে গদ্য-ছন্দকে পদ্য-ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর কবিতায় :

স্পষ্ট বেসুরে একা বসে গান গাই
ক্ষুব্ধ তানসেনী তানে তা-না-না-না
কেননা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই
(তোমরাও দেখো, নয়তো চক্ষু কানা)
গানের বক্তব্য প্রধানত আজ
চতুর্দিকের সঙ্গে বিদ্রোহ ;
পুরনো সাম্রাজ্যের বরকন্দাজ
যখন নতুন মন্ত্রীর সমারোহ
স্বাধীন দেশের বুকে গুলি চালিয়ে
বাদামী ধনিকের তন্ত্রে রাখে বজায়,
একটু স'রে এসে (দূরে পালিয়ে)
খানিকক্ষণ অন্তত থাকি মজায় ;
প্রসিদ্ধ ঘরানা এখনো আছে জানা
তাই দিয়ে গাই তা-না, না-না ॥

'পাগলা জগাইয়ের গান', অমিয় চক্রবর্তী।

উদ্ধৃত অংশটিকে মিশ্র-ছন্দের (vers libre ?) নিদর্শন বলেও কেউ কেউ মনে করতে পারেন। বুদ্ধদেব বসু ও শঙ্খ ঘোষ ফরাসী *vers libre*কেই মিশ্র-ছন্দ বা মুক্ত-ছন্দের আদর্শ বলে গ্রহণ করেছেন (দ্র° বুদ্ধদেব বসুর 'বাংলা ছন্দ' প্রবন্ধ ও শঙ্খ ঘোষের 'ছন্দের বারান্দা' গ্রন্থ)। মিশ্র-ছন্দের প্রতি আধুনিক কবিদের আগ্রহ ক্বচিৎ চোখে পড়ে। এর প্রথম কারণ সম্ভবত এই যে রবীন্দ্রনাথের মতো কোনো ব্যক্তিত্ব যথার্থ মিশ্র-ছন্দের আদর্শ পরবর্তী কবিদের জন্য রেখে যান নি ; দ্বিতীয় কারণ, সম্ভবত প্রস্ফুট ছন্দে 'মাত্রাসমতার' প্রতি কবিদের আনুগত্য। বরং মনে হয়, গদ্যছন্দের প্রতিই সাম্প্রতিক কবিদের আগ্রহ বেশি। গদ্য স্পন্দকে তাঁরা বিভিন্ন ভাবে সৃষ্টি করছেন :

১ রাস্তার ওপাশে ওটা কি গাছ
আমি জানি না।
বাগানে ফুটে আছে ওটা কি ফুল

আমি জানি না।…
আমার মনে পড়ছিল
এক নিষ্ফল জীবনের কথা।
নিজের দেশ, নিজের কালের কথা।
আমার মন কেমন করছিল।

'মরুভূমির হাওয়ায়', সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

২ অলীক উদ্ভাস লুপ্ত পটভূমি প্রতিষ্ঠিত সম্ভাবণ
সময়হীনতা সংস্কারহীনতা বাসনাহীনতা
আজ অমলিন পূর্ণায়ত উপস্থিতি
প্রতিটি শব্দের সহযোগিতায় প্রতিটি বস্তুর অনির্ভরতায়
স্বচ্ছ উদ্ভাসন প্রাকৃত মৌলিক। অবিমিশ্রতা অনির্ভর রীতি।

'অনির্ভর', আলোক সরকার।

৩ সকালে যতটা দড়ি ধরে ওঠো
ততটাই নেমে যাও সন্ধ্যায়।…
প্রত্যেক দিনের চেহারা এক রকম—
দেবীসূক্ত বা কিং লীয়রের পঙ্ক্তি চিবিয়ে যদি শুরু,
শেষ তবে সুনীলমাধবের বর্ণবিভ্রমে
কিংবা এসপেরান্তোর একতায়।

'দড়ি ধরে ওঠো', বিজয়া মুখোপাধ্যায়।

প্রথম উদ্ধৃতিতে, গদ্যকে স্পন্দিত করা হয়েছে সমধর্মী অথচ স্বাভাবিক বাক্যাংশের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে, মন্দ্রিত শব্দ ও মিল ব্যবহার করে স্বাভাবিক ছেদ-যুক্ত খণ্ডিত বাক্যাংশগুলির ধ্বনিস্পন্দন জোরালো করা হয়েছে, ফলে গদ্যে প্রায় প্রস্ফুট ছন্দের আভাস এসেছে। তৃতীয় উদ্ধৃতিতে, পঙ্‌ক্তিপ্রান্তিক অর্ধস্বর (semi-vowel)-যুক্ত মিল গদ্য-ছন্দকে রেশযুক্ত ক'রছে।

প্রবন্ধের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথকে বাঙলা ছন্দের প্রাক্-আধুনিক যুগের প্রধানতম এবং শেষতম পুরুষ বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পরে, রবীন্দ্রনাথের মতো একক প্রয়াসে বাঙলা ছন্দের নতুন কোনো আদর্শ গড়ে ওঠে নি। আধুনিক পর্বে, সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত, বাঙলা ছন্দের যে-বিকাশ ও বৈচিত্র্যময় উদ্‌গতি ঘটেছে তা এক অর্থে রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দেরই অনুসৃতি। রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিরা বাঙলা ছন্দকে সমৃদ্ধ করেছেন—নানা দিক দিয়ে তার শক্তি ও সম্ভাবনা বিস্তৃততর হয়েছে ঠিকই, কিন্তু গঙ্গোত্রী সেই রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাঙলা ছন্দের রূপকার।

অনুষঙ্গ

১১

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাব্য-পাঠক

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়

'আমি সাধারণত যে সাহিত্য নিয়ে কারবার করি পাঠকের মনোরঞ্জনের উপর তার সফলতা নির্ভর করে। পাঠকের অভ্যাসকে পীডন করলে তার মন বিগডিয়ে দেওয়া হয়, সেটা রসগ্রহণের পক্ষে অনুকূল অবস্থা নয়।'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'জনসাধারণের রুচির প্রতি আমার অশ্রদ্ধা এত গভীর যে তাদের নিন্দাপ্রশংসায় আমি উদাসীন···যারা কবিতাকে ছুটির সাথী বলে ভাবে, কবিতার প্রতি ছত্র পড়ে হৃৎকম্পন অনুভব করতে চায় তাদের কবিতা না-পড়াই উচিত।'—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

পত্রাবলী, 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৯।

উপর্যুক্ত দুটি উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় কবি, কবিতা ও পাঠকের পারস্পরিক সহজ সম্পর্কটিও সময়বিশেষে একটি সমস্যার রূপে দেখা দিতে পারে। বস্তুতপক্ষে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের কালে কবি ও পাঠকের এই সহজিয়া সম্পর্কটিতে ফাটল দেখা দিয়েছিল, কবিতা ও তার পাঠকের মিলনভূমি ভেঙে গিয়েছিল খান্‌খান্‌ হয়ে। পাঠক জানালেন নালিশ যে, 'আজ আর তিনি বিষয় নন কবিতার, তাই কবিতা থেকে ফিরে আসে তাঁর মন'।[১] এই যুদ্ধোত্তর নবীন শিল্পে প্রতিপক্ষ বা পাঠকের ভূমিকাটি সঠিক কী তার আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। অবশ্য পাঠকের ভূমিকার প্রশ্ন ওঠে তখনই যখন মেনে নেওয়া হয় যে শিল্পকর্ম কবিমানসের এমনই একটি প্রকাশ যাকে পাঠকের অন্তরে পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত তার তৃপ্তি নেই : 'an act of communication presupposes an audience'—বলেছেন জনৈক বিদেশী এবং জনৈক বাঙালি কবি বলেছেন : 'কাব্য সম্বোধন, সম্বোধনে শ্রোতার সম্বন্ধ গ্রাহ্য'।[২] কিন্তু এই যুদ্ধোত্তর কালে ওই মেনে নেওয়ার ব্যাপারটি অত সহজে ঘটে ওঠে নি।

অত সহজে ঘটে ওঠে নি তার কারণ পাশ্চাত্ত্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে যে নতুন বিপ্লবাত্মক একটি আধুনিক যুগ সাহিত্যের সমালোচক ও ইতিহাসকারগণ চিহ্নিত করে থাকেন সে যুগ মহাযুদ্ধের দামামা বাজিয়ে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং কাব্য ও কাব্যপাঠকের মধ্যে সহজ, ইন্দ্রিয়বেদী, অনুভূতিনির্ভর গীতলতার সামবায়িক মিলনস্থলটির বদলে একটা বড় রকমের 'চৈনিক দেয়াল' তৈরি হয়ে

১ শঙ্খ ঘোষ : 'কবি আর তাঁর পাঠক', নিঃশব্দের তর্জনী পৃ ৪৪

২ বিষ্ণু দে : 'বাঙলা সাহিত্যে প্রগতি', সাহিত্যের ভবিষ্যৎ পৃ ১০

গিয়েছিল সম্ভবত তার আগেই, এবং তারও আগে থেকে, অনেক দিন থেকেই রাষ্ট্র সমাজ ও তার অর্থনৈতিক ভিত্তি অতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে চলেছিল। এক দিকে যেমন পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, তুলনামূলক নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রে বহু বৈপ্লবিক চিন্তাধারার আবির্ভাব ঘটল, অন্য দিকে পাশ্চাত্ত্যের সমাজদেহে সর্বাঙ্গীণ পচনশীলতার পরিণাম হল ত্বরান্বিত, আবার এই মুহূর্তেই প্রয়োগবিদ্যার অসাধারণ প্রসার ঘটল; য়ুরোপ-ভূখণ্ডে কোথাও কোথাও রাষ্ট্রবিপ্লবের পদধ্বনি শোনা গেল। ১৯১৪ থেকে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ ব্যাপী সমগ্র পৃথিবীতে যে প্রচণ্ড ভাঙাগড়া চলেছিল তার বড় বড় কারণ ও বৃহৎ ঘটনাসমূহ আজ সকলের কাছেই স্পষ্ট। অতি দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন কাব্যে, চিত্রে, ভাস্কর্যে ও অন্যান্য সৃজনশিল্পে নিয়ে এল সমধর্মী বিপুল পরিবর্তন; পুরাতন মূল্যমান, ভাবনা ও রীতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে নতুন পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু হল। কবিতার পালাবদল হল কিন্তু চিড় খেয়ে গেল কবি ও শ্রোতার অন্তরঙ্গ সম্পর্কটি; মুদ্রাযন্ত্রের ষড়যন্ত্রে যা শুরু হয়েছিল, সমাজযন্ত্রের বিকলনে তা হল সম্পূর্ণ। কবি পাঠককুল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। য়ুরোপ-ভূখণ্ডের এই আলোড়ন বাঙলা কাব্যে ও বাঙালীর শিল্পকর্মেও প্রভাব বিস্তার করল। এখানেও কবিকৃতির মধ্যে দেখা দিল বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন—কবি ও পাঠকের সম্পর্কটি আবার নতুন ভাবে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভূত হল।

এইখানে একটি সতর্কতার প্রয়োজন আছে। বিরাট ভূখণ্ডের সর্বগ্রাসী যুদ্ধের অনলে ভারতবর্ষ তো ততখানি প্রত্যক্ষতায় বিদগ্ধ হয় নি, কাজেই এই ভাঙা-গড়ার প্রভাব নিয়ে সেই যুগে কিঞ্চিৎ বিতর্কের অবতারণা হয়েছিল। বিশাল জনপদবাসী ভারতের মন্থর কিন্তু স্খলিত মন্দাক্রান্তা ছন্দে যে জীবনের অবিচ্ছিন্ন ধারা প্রবহমান ছিল তার তলায় তলায় যে ধ্বংসের ধ্বনি বাজতে শুরু করেছিল তা প্রথমেই বিশেষ গোচরীভূত হয় নি। ইয়েট্স্ রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' পড়বার কালে এই একক মানসিক গড়নের প্রশংসায় নিজের দেশের বিক্ষিপ্ততার সম্বন্ধে সখেদ উক্তি করেছিলেন। কিন্তু বিদেশী লালন-পুষ্ট আত্মপরিচয়হীন বহুধাবিভক্ত ভারতীয় সমাজের পূর্ণ পরিচয় হয়তো তিনি জানেন নি। ভারতের মধ্যেও যে সব ঘটনা একটার পর একটা ঘটে চলেছিল তার সঙ্গে য়ুরোপীয় চিন্তাধারা মিলিত হয়েই মূল্যবোধের পরিবর্তন এল এবং তাকে প্রকাশ করবার জন্যই নতুন আঙ্গিক, নব-প্রকরণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাঙলা কাব্যে যাঁরা অবতীর্ণ হলেন তাঁদের শব্দব্যবহারের স্বাধীনতা, তাঁদের চিত্রকল্পের বাঁকানো ভঙ্গি, তাঁদের ছন্দের স্বাধীনতা, বাগ্-বিন্যাস স্বরক্ষেপের নতুন ধরন—সমস্তই সিদ্ধরসের কবিকুলকে বিচলিত করল। রবীন্দ্রনাথ একে 'দেশের সাহিত্যে ধার করা নকল নির্লজ্জতা'[৩] নাম দিলেন এবং শ্রী অতুলচন্দ্র গুপ্ত

---

৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সাহিত্যের পথে পৃ ৯২

একই সঙ্গে প্রশ্ন করলেন :

> **Conscript army**তে ভর্তি হয়ে তাঁদের [ইউরোপীয় লেখকদের] অনেককেই সে যুদ্ধের হত্যাকাণ্ডে অংশ নিতে হয়েছে। বাঙলা আধুনিক সমাজে কোথায় সে অভিজ্ঞতা। এক বাঙালী হিন্দুর চাকরীর সংখ্যা ও বেতন কম ছাড়া অন্য কোন্ সামাজিক উপবিপ্লবের মধ্য দিয়ে তাঁরা গিয়েছেন ?[৪]

—বাঙলা কাব্যের পটপরিবর্তনের বিচারের এই পরিপ্রেক্ষিত।

ভারতবর্ষের মাটিতেও অনেকগুলি বড় বড় ঘটনা ঘটে গিয়েছিল যার অভিঘাত অনিবার্যভাবেই শিক্ষিত মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। স্বাধীনতার আন্দোলন, মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ডের ব্যর্থ সংস্কার-পরিকল্পনা, জালিয়ানওয়ালাবাগের নরমেধ যজ্ঞ, রাউলাট আইনের জঙ্গলের নীতির প্রয়োগ, অসহযোগ আন্দোলন, ভারতে প্রথম কম্যুনিষ্ট পার্টির পত্তন, ১৯২৯-৩০এর সার্বিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়-ইত্যাদি সকলেরই জানিত কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করলাম, এই কারণে যে রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক কবিদের কৈশোর ও যৌবন এই যন্ত্রণাজটিল ও উত্তেজনাময় বৎসরগুলির মধ্যে কেটেছে—সুতরাং 'সকালের রোদ আজ বিকালের ছায়ায় মলিন।'

> সাবধানে যেয়ো সখা, চোখে তব মোহ নামে পাছে,
> পাছে তার মৃত্যুকণ্ঠে শোনো তুমি অবরোধ গান...[৫]

১

প্রবন্ধের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথের যে উদ্ধৃতিটি আছে সেটির অন্তরের কথাটি এই প্রসঙ্গে অনুধাবন করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আর তাঁর পাঠকের মধ্যে যে সম্পর্কের উল্লেখ করেছেন তাকে তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে উভয়ের মধ্যে যে সামঞ্জস্য ছিল সেটিও কতকগুলি প্রত্যয় ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে যুগে সমাজের অধিকাংশ মানুষের প্রত্যয় ও বিশ্বাসের সঙ্গে শিল্পীর উপলব্ধির একটি প্রশান্ত কিন্তু অনুচ্চারিত ঐক্য থাকে, বাক্যটি সে-যুগের কাব্যকৃতির পক্ষে সত্য। সম্ভবত আমরা যাকে ক্লাসিকাল যুগ বলি সে যুগে কবি ও পাঠকের অয়নচক্র অব্যাহত থাকে, কেন না কতগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত ভাব ও অনুভব এই অয়নচক্রকে কার্যকরী রাখে। হিংসা, ক্রোধ, বৈরাগ্য, আসক্তি, ব্যঙ্গ, উন্মাদনা, উচ্ছৃঙ্খলতা, প্রকৃতি-প্রেম, ধর্ম, আত্মরতি, দৃশ্যমান অভিজ্ঞতার জগৎ-

৪ দীপ্তি ত্রিপাঠী : আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় পৃ ৬৬

৫ 'জিজ্ঞাসা', অজিত দত্ত।

৬ 'যেখানে রুপালি', ঐ।

ইত্যাদি উপাদানগুলি শিল্পী আর তাঁর পাঠককে একটি অচ্ছেদ্য, অঘোষিত নিবিড় বন্ধনে বেঁধে রাখে। কিন্তু যখনই সেই বস্তুগুলিই মননির্ভর আবেগে ধ্বনিত হয়ে ওঠে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সেখানে প্রখর হয়ে ওঠে; আবার যখন আন্তর্জাতিকতার অভিঘাতে সেই ব্যক্তিমানস উদ্দীপিত হয়ে ওঠে, পাঠক অসহায় বোধ করেন। কবি তাঁর অধীত জ্ঞানসম্ভারের সাহায্যে, যা নিখিলবিশ্বব্যাপ্ত, কবিতার নতুন দেহশয্যা ও অন্তর্বাস নির্মাণ করেন, পাঠকের পথ কবির পথ থেকে বেঁকে যায়। তখনই পাঠকের কণ্ঠে শোনা যায় যে আজ আর 'সে কবিতার বিষয় নয়'। আর সেই মুহূর্তেই পাঠকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে কবি জানান: 'ভিড়ের হৃদয় পরিবর্তিত হওয়া দরকার।'[৮] প্রবন্ধ-সূচনার সুধীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতিটি ওই বাঁকা পথের প্রথম নিশানা। এই অবস্থার জন্য দায়ী কে—পাঠক, না কবি?

৩

আসলে কবি ও কাব্যপাঠকের প্রচলিত সম্পর্কটি পরস্পর-নির্ভরশীল: 'একাকী গায়কের নহে তো গান / গাহিতে হবে দুইজনে'। সমাজ যে ভাবে পালটে চলেছিল, বিজ্ঞান যে হারে এগিয়ে চলেছিল তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করা সাধারণ মানুষের পক্ষে ক্রমশই দুঃসাধ্য হয়ে উঠছিল। যুদ্ধ-পূর্ব ভারতে, নিরবচ্ছিন্ন শান্তির মধ্যে বাঙলার কাব্যপাঠক একটি তরলিত রোম্যান্টিকতা, পেলব স্বপ্নবিলাস, মুগ্ধ আত্মরতি, কৃষিনির্ভর পল্লীকেন্দ্রিক জীবনের পরম শান্তি, ধর্মে সার্বিক সমর্পণ, রোম্যান্টিক আদর্শায়িত প্রেমের মহানতায় আস্থা, পদাবলী-আশ্রিত নারীহৃদয়ের কবোষ্ণ আবেগ ও গার্হস্থ্যজীবন-বন্দনাতে অভ্যস্ত হয়ে কবিকৃতি সম্পর্কে তাদের যে নিশ্চিত ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছিল, সেই ধারণার মূলে হঠাৎ কুঠারাঘাত হল। ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক বিভীষিকা, নগরসভ্যতার নতুন ক্রীতদাস কলকারখানার শ্রমিক, ধর্মে আস্থাহীনতা, চিন্তাজগতে নৈরাজ্য ও জগৎ-জোড়া অনিশ্চয়তা আমদানি করল একটি নয়া বাস্তবজীবনমুখিতা, বলিষ্ঠতা ও সত্যভাষিতা, যার অত্যুজ্জ্বল আলোকে সাধারণের চোখ গেল ধাঁধিয়ে। রোম্যান্টিক প্রকৃতি-ধ্যানে এল সংশয়, সৃষ্টির মূলে দেহের হল পুনঃপ্রতিষ্ঠা, অকুণ্ঠ আত্মবিশ্লেষণকে পাঠকের মনে হল কপট আত্মগ্লানি। সভ্যতার কেন্দ্র গ্রাম থেকে এল শহরে, শহরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য কাব্যদেহে নতুন প্রসাধন ও নতুন শব্দসম্ভারের সৃষ্টি করল, তারই সঙ্গে এল বিশ্ববীক্ষা ও বৈদেশিকতা, নিখিল ইতিহাসচৈতন্যের মধ্যে কাল ও দেশের

৭ শঙ্খ ঘোষ: 'কবি আর তাঁর পাঠক', নিঃশব্দের তর্জনী পৃ ৪৪

৮ জীবনানন্দ দাশ: কবিতার কথা পৃ ১৬

সীমায় বিধৃত ভারতীয় ঐতিহ্যের নতুন মূল্যায়ন হল। পরিচিত জগৎ ও জীবন যেন পাঠকের কাছে হারিয়ে গেল, কবির হাত ধরে সে যে সংস্কারমুক্ত জীবনের প্রভাতসূর্যকে বরণ করবে তারও উপায় আর রইল না, কেন না কাব্যজগতে তার পরিচিত অনুষঙ্গ একটি একটি করে নিবতে শুরু করল। ছন্দে এল মুক্তি, কথ্যভাষা আর কাব্যের ভাষায় ব্যবধান হল দূরীভূত। কাব্যে এসে আশ্লিষ্ট হল মনস্তত্ত্ব, তার বাক্-বন্ধনে দেখা দিল নতুন semantic disturbance। কবির সৃজনবাসনা এবং পাঠকের রসপিপাসা—এই দুয়ের মিলনবিন্দুটি যেন ক্রমশই পিছিয়ে যেতে থাকল। জীবননীতি ও শিল্পনীতি যেন পরস্পরবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অভিজ্ঞতার জগতে এমন একটুকরো জমিও থাকল না যেখানে সহজে কবি আর তাঁর পাঠক মিলতে পারেন।

এ তো গেল পাঠকের বিভ্রান্তির সার কথা। কিন্তু এই অবস্থায় কবিরা কি করলেন?

কবিও খুব-একটা বিচলিত হলেন বলে মনে হল না। তিনি বললেন, যে সাহিত্য গতানুগতিকতার সহজিয়া রসে পুষ্ট, আমরা সে রসের রসিক নই। আমাদের বুঝতে হলে তোমাদের এগিয়ে আসতে হবে, মনঃসমীক্ষণের বকযন্ত্রে 'আধুনিকতা'র বিপর্যয় ও সঙ্কটের স্বরূপটিকে বুঝতে হবে, তোমাদের কালের কবিতাও নেই, কাব্যরীতিও নেই, কবিতার সংজ্ঞার্থ ই তো বদলে গেছে। সুতরাং 'কাব্যের তরফ থেকে আমি পাঠকের কাছে সেই নিবিষ্ট অনুশীলন ভিক্ষা করি, যেটা সাধারণত অর্পিত হয় অন্যান্য আর্টের প্রতি'।[৯] তাঁরা কাব্যের আধুনিক চারিত্রের কথা তুলে আরো বললেন কবিতা এখন আর স্বভাবকবির সহজ অধিকার নয়, নগরসভ্যতা যেমন বৈদগ্ধ্যের বহির্লক্ষণ, তেমনি কবিতারও—কবিতাও সেই একই বৈদগ্ধ্যের সচেতন শিল্পকৃতি। কাজেই পূর্বে কবি যে জন্য কবিতা লিখতেন, এখন আর সেই কারণটাও নেই। সনাতনী পাঠককুলের চৈতন্যে আমূল নাড়া দিয়ে প্রাচীন মূল্যমানগুলির গোধূলিলগ্নে আবির্ভূত হয়ে কবি এলিয়ট বললেন, 'The Poet must become more and more comprehensive, more allusive, more indirect, in order to force, to disolate if necessary, language into hismeaning'···*Poetry is an escape, not from life, but from emotion.* এই বাক্যের সার বস্তু প্রতিধ্বনিত হল বাঙলা কাব্যেও। অর্থাৎ কবিরা দুরূহতার দুর্গেই নিশ্চিত আশ্রয় খুঁজলেন। কবিতা চাইল কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি থেকে মুক্তি, হতে চাইল আত্মসচেতন কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক যুগমানসের প্রতিবিম্ব।

কবি সন্ধান করলেন তাঁর কবিতার মধ্য থেকে নিজেকে বার করে আনবার চাবি-কাঠি এবং পাঠকের দিকে তাকিয়ে বললেন তোমরাও তোমাদের নিঃসৃত সত্তাকেই

৯ 'গদ্যাবলী'। দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৯

পাবে আমার কবিতায়।[১০] এক দিকে ইয়ুং-এর collective unconscious, অন্য দিকে বাক্‌রীতি ও স্পন্দবদলের নবায়ন—act of communication হয়ে উঠল প্রত্যক্ষ সামীপ্য : confrontation, মাঝখানে সাধারণ পাঠক দাঁড়িয়ে থাকলেন কম্পিত হৃদয়ে, কাতর চোখে, হতাশ মনে :

> যুগের হাওয়া বদলে গেল, নিভিয়ে দিল ঝড়
> বঙ্গমাতার আঁচল আড়ের দীপটি মনোহর…[১১]

৪

এখানে একটি সঙ্গত জিজ্ঞাসা : কাব্যের সাধারণ পাঠক বলতে আমরা কী বুঝি? একটি অখণ্ড সার্বভৌম পাঠকের অস্তিত্বের ধারণা নিছক আরামপ্রদ কল্পনা মাত্র। আমাদের আলংকারিকগণ শুরুতেই সতর্ক করে দিয়েছেন, কাব্যরস হচ্ছে 'সহৃদয়হৃদয়-সংবাদী'। সে রসের আস্বাদন একমাত্র দরদী লোকের মনই অনুভব করতে পারে। কবি যে ভাবকে, যে অভিজ্ঞতাকে রসমূর্তি দিতে চান পাঠকের মন ও অভিজ্ঞতা যদি সে ভাবের অনুকূল না হয় তবে সেই কাব্য সেই পাঠকের কাছে ব্যর্থ। 'কবির কাজ পাঠকের চিত্তে রসের উদ্‌বোধন।·· কাব্য কোনো পাঠকবিশেষের মনে রসের উদ্রেক করবে কি না তা কেবল কাব্যের উপর নির্ভর করে না, পাঠকের মনের উপরেও নির্ভর করে'।[১২] অর্থাৎ পাঠকেরও করণীয় আছে কাব্যআস্বাদনের ব্যাপারে। সুতরাং শীতল ছাপার অক্ষরে যে কবিতার কঙ্কাল পুস্তকের শুষ্ক পত্রে বিরাজমান পাঠক তাকে নিজের অনুভূতি, নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রাণবন্ত করে তুলবেন—তা যদি তিনি না পারেন তবে কাব্যপাঠের উপযুক্ততা তাঁর নেই এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে। কাব্যে প্রীতি আছে বহু লোকের কিন্তু কাব্যের রস আস্বাদনের ক্ষমতা তত লোকের নেই, এই কথাটা ঈষৎ রূঢ় শোনালেও সত্য। কবির মনের রস ও অভিজ্ঞতা তো যান্ত্রিক নিয়মে স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে পাঠকের কাছে পৌঁছায় না, 'শব্দ ও অর্থের, বাচক ও বাচ্যের উপায়কে আশ্রয় করেই কবি এই উদ্দেশ্য সাধন করেন।'[১৩] সুতরাং দেখা যাচ্ছে একে তো কাব্য-পাঠক সীমায়িত, তদুপরি আঙ্গিক ও প্রকরণ, অনুভব ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে যে বিবর্তন এল তাতে পাঠকের পরিধি গেল আরো কমে। রবীন্দ্রকাব্যের প্রভাবে থেকে মুক্ত

১০ শঙ্খ ঘোষ : নিঃশব্দের তর্জনী পৃ ৪৫

১১ কালিদাস রায়।

১২ অতুলচন্দ্র গুপ্ত : কাব্যজিজ্ঞাসা পৃ ৪৭

১৩ ঐ পৃ ৪৭

হবার আকাঙ্ক্ষায়, স্বতন্ত্র হয়ে উঠবার প্রেরণায়, কাব্যের যে 'মুক্তি' ঘটল তারই আর একটি দিক হচ্ছে সাধারণ কাব্যপাঠকের রসবোধের প্রতি এই 'বিদ্রোহী' কবিদের অনাস্থা—শুধু অনাস্থাই বা বলি কেন, যেন একটা বৈরী মনোভাব কবিকে নিয়ত ঠেলে দিচ্ছে আরো গোপন গুহাহিত সন্ধ্যাবলয়ে।

তা ছাড়া পাঠকও পরস্পরবিচ্ছিন্ন। প্রত্যেকেই বাস্তব পরিবেশের আঘাতে, সমস্যা-কণ্টকিত প্রত্যহের প্রয়োজনে, জৈবিক জীবনধারণের তাড়নায় আপন আপন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তে টুকরো হয়ে গেল। যে জাতিগত ঐক্যবোধে, সমজাতীয় মনোবৃত্তিতে, মানবিক দায়িত্ববোধে, পরস্পর পরস্পরের নিকটে আসে তার আর বিশেষ কিছুই বাকি থাকল না। বৃহৎজীবনের ঝর্ণাতলা, যেখান থেকে শিল্পী ও সাধারণ গৃহস্থ মহৎ অনুভূতিগুলি সঞ্চয় করেন, তাও হল শুষ্ক ; জীবনের মন্দাকিনী—যার একই কূলে সাধারণ মানুষের ও শিল্পীর সহ-অবস্থান তার স্রোত হয়ে এল শীর্ণ। শুধু দুটি যুদ্ধই তো নয়, মহামারী, বন্যা, দেশবিভাগ এবং আরো নানা প্রত্যক্ষ কারণে সাধারণ মানুষের মন থেকে বহু কল্যাণকর অনুভূতি নষ্ট হয়েছে। ১৯২০ ও ১৯৩০ নানা ভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল বুদ্ধিজীবী ও অনুভূতিপ্রবণ মনগুলিকে। আধুনিক বাঙলা কবিতার পশ্চাতে রয়েছে প্রথম থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত বিস্তারিত বিশ্বপটভূমি। কিন্তু তারপর ? তারপরও কি অবস্থার উন্নতি হয়েছে ? সে আলোচনা আমার বিষয়বহির্ভূত। 'নিখিল নাস্তিতে' পীড়িত কবিমন তার শিল্পের মধ্যে এই জীবনের রন্ধ্রহীন শূন্যতার, আত্মবিরোধের ও অনিকেত মনোভাবের বাঙ্‌ময় রূপ দিয়েছে। কিন্তু এই খণ্ডিত জীবন থেকে একাত্মতার ভূমিতে পৌঁছে দেবার দায়িত্বও শিল্পীকেই নিতে হয়। সে দায়িত্ব কতখানি পালিত হয়েছে তা এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য।

কিন্তু শিল্পী তো তাঁর শিল্পপ্রকরণের পথেই পাঠকের গুটিয়ে-নেওয়া হাতটি ধরবেন। কাজেই আবার প্রকরণের কথাটাই অনিবার্য ভাবে এসে পড়ে। টেক্‌নিকের পরিবর্তন তো শুধু ভাব থেকে রূপের পরিবর্তন নয় ; সভ্যতার বিশেষ স্তরে, মানসিকতার বিশেষ মুহূর্তে, শিল্পরীতির পরিবর্তন আপন নিয়মেই দেখা দেয়। কাজেই শিল্পীর দাবি : 'আজকের মানুষের কাছে আজকের ভাষায় কথা বলতে হবে।'[১৪] 'আজকের' শব্দটি লক্ষণীয়। কিন্তু এই 'আজ'-সূচক ভাবসত্তাটি তো এসেছে অনতিসরল ইতিহাসের পথেই। কবির সময়চৈতন্য ও পাঠকের সময়-ধারণা এক নয়। কবি আজকের কালে সমস্ত কালকে প্রত্যক্ষ করেন, তাঁর মানসপটে বিগত, বর্তমান ও অনাগত, প্রত্যহকে কেন্দ্র করে উপস্থিত হয়। তাঁর বোধের অণুপরমাণুতে সামগ্রিক ইতিহাসচৈতন্য ছড়িয়ে আছে, তাঁর ঐতিহ্যসচেতনতায় এদেশ ও বিদেশ, একাল ও সেকাল একটি স্থির কেন্দ্রবিন্দুতে

১৪ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : 'যুদ্ধ, যুগমুহূর্ত ও আমরা', শিল্পিত স্বভাব পৃ ১৭২

মিলতে পারে। ভাষার তো নিজস্ব কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ গৌরব নেই, সে তো ভাবেরই বাহন। সুতরাং আধুনিক কালের জটিল ভাবনা ও চিন্তার সঙ্গে পাঠকের বোঝাপড়া না করে উপায় নেই—পাঠকের আধুনিকতার সারাৎসার আত্মস্থ করবার প্রস্তুতি আবশ্যিক।

৫

'আজকের ভাষা' কথাটিও জটিল। কলকাতার শিক্ষিত যুবকের ভাষা, গ্রামের সরল ভাষা সমসময়ে থেকেও তো এক নয়। কাজেই ভাষাকেও আধুনিকেরা ব্যবহার করেছেন সেই ভাবে যেমন করে বিজ্ঞানী তাঁর ল্যাবরেটরিতে বস্তুর মৌলসত্তাকে বিশেষ প্রয়োগপদ্ধতির দ্বারা বিচ্ছিন্ন করেন। শেলি যাকে 'language at its source' বলেছেন তাকেই প্রয়োগ করেছেন সুধীন্দ্রনাথ; বিষ্ণু দে বিশেষ বৈদগ্ধ্যের রসায়নে মিশ্রিত করেছেন বাক্‌রীতি ও কাব্যরীতি; আর জীবনানন্দের কাব্যের একটি সহজ বৈশিষ্ট্য হল গদ্যগন্ধী শব্দের ব্যবহার। কবিদের কাব্যরীতি ও প্রকরণপদ্ধতির বিচার আমার উদ্দেশ্য নয়, বক্তব্য শুধু এই যে এই সব কবিদের প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য মিলেমিশে পাঠকের কাছে নিশ্ছিদ্র জটিলতারই সৃষ্টি করেছে। এই জটিলতার গ্রন্থিমোচনে কবিরা তেমন করে কেউ এগিয়ে আসেন নি যেমন করে এলিয়ট এসেছিলেন। তাঁর 'The Waste Land' ছাপা হয়েছিল তাঁর নিজেরই করা টীকাটিপ্পনীসহ। ওইগুলো পাঠকের পরম সহায়। কালিদাসের টীকা করেছিলেন মল্লিনাথ; আমাদের দুরূহ কবিদের সুবোধ্য করার জন্য কোনো মল্লিনাথের আবির্ভাব হয় নি।

ইতিমধ্যে শিক্ষার ব্যাপ্তি ঘটেছে, মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাই কয়েকজন অবতীর্ণ হয়েছেন কবি রূপে এবং পাঠকও বিভক্ত হয়ে পড়েছেন বিভিন্ন স্তরে। পাঠকের এই স্তরবিভেদ কাব্যের আস্বাদনকে আরো যেন গোষ্ঠীশায়ী করে তুলল। কবি একাধারে হলেন শিক্ষক, সমালোচক ও ভাষ্যকার। বলা হল, কাব্য-নামক জটিল বস্তুকে কর্ণ ও হৃদয়ের মাধ্যমে আস্বাদন না করে ক্ষুরধার বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণশক্তির দ্বারা আয়ত্ত করতে হবে। 'যে দুরূহতার জন্ম পাঠকের আলস্যে, তার জন্য কবির উপরে দোষারোপ অন্যায়'।[১৫] অর্থাৎ শিক্ষিত-সমাজে ও ছাত্র-সমাজে কাব্যের আদর যে পরিমাণে বেড়ে গেল সাধারণের কাব্য ভোগের আশা সেই পরিমাণে এল কমে।

কাব্যসম্ভোগের আরো শত্রু দেখা দিল; সিনেমা, রেডিও, অর্থাৎ 'মাস্ মিডিয়া'—আর সায়েন্স্-ফিক্‌শন। যুদ্ধের ফলশ্রুতি হিসেবে যে সার্বিক নেতিবাদ দেখা দিয়েছিল তাতে সস্তা ও চটুল আনন্দের দিকে ঝুঁকে পড়াই স্বাভাবিক। কাব্য—কাঁচির দুটি ফলার মতো এক দিকে প্রয়োগবিজ্ঞানের প্রসার ও অন্য দিকে নয়া সমালোচককুলের

১৫ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত: 'কাব্যের মুক্তি', স্বগত পৃ ৩৭

নবোদ্ভাবিত কাব্য-আস্বাদনবিধির মধ্যে পড়ে অতিমাত্রায় আত্মসচেতন, উদ্ধত, অসহিষ্ণু হয়ে নিজের অন্তরের মধ্যেই আশ্রয় খুঁজে পেতে চাইল; আর এর ফলে তার মধ্যে বহির্মুখিতা ও অন্তর্মুখিতার ভারসাম্য বিনষ্ট হল। আত্মরক্ষা ও আপন মূল্যমান-প্রতিরক্ষার তাড়নায় সাধারণের বাহবাকে বিষবৎ ত্যাগ করলেন কবিরা। জনপ্রিয়তা, অর্থ, স্বাচ্ছন্দ্য—সমস্ত বিসর্জন দিয়েও তাঁরা আত্মদীপ হয়ে উঠতে চাইলেন।

এই অবস্থায় কবি ও পাঠক পাশাপাশি না দাঁড়িয়ে মুখোমুখি দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হবার আয়োজন সম্পূর্ণ করলেন। মধ্যস্থতা করার জন্য এগিয়ে এলেন কিছু দরদী সমালোচক, শিল্পীসমাজ থেকেই বেরোল কিছু কবিতাপত্রিকা ও কবিতাসংকলন, যাদের দান পাঠক তৈরির ক্ষেত্রে অসামান্য। এঁরা নানাবিধ রচনার মধ্য দিয়ে কবির নিজস্ব মেজাজ, অভিজ্ঞতা, চিত্রকল্প, ব্যক্তিপ্রযুক্তি, ছন্দের অভিনবত্ব-ইত্যাদি বিষয়ে পাঠকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করলেন। সাধারণ জীবন ও শিল্পীর অভিজ্ঞতাকে পুনরায় একই সূত্রে গ্রন্থিবদ্ধ করার জন্য একটা নতুন চেষ্টার শুভ ইঙ্গিত দেখা দিল। সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করবেন যে যখনই কাব্যের পালাবদল হয়েছে, তখনই পাঠকের প্রতিক্রিয়ার প্রতিচ্ছবি প্রায় সর্বত্রই সমধর্মী। এই প্রতিক্রিয়ার উত্তেজনা মিলিয়ে গিয়ে চিদাকাশ নির্মেঘ হতে সময়ের প্রয়োজন হয়। যা কঠিন তা কঠিন বলেই তার প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণও থাকে, ইয়েট্‌স্‌ যাকে বলেছেন 'fascination for what is difficult.' অতএব এই নতুন শিল্প আস্বাদন করার জন্য যাঁরা এগিয়ে এলেন তাঁরাও নবীন—সংখ্যায় নগণ্য, কিন্তু সুপরিশীলিত। সাধারণ পাঠকের ভীতি ও ঔদাসীন্য কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে। এই প্রসঙ্গে কবি হুইটম্যানের একটি পংক্তি স্মরণীয়: *To have great Poets there must be great audiences too.* এই 'great audience' তৈরির কাজ অবশ্য 'কল্লোল'-'কালিকলমে'র কাল থেকে শুরু হলেও, ১৯৩৫এ 'কবিতা'র প্রকাশ পাঠক তৈরির কাজে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। শিল্পসাহিত্যতত্ত্ব বা রাজনীতি কোনো বিষয়েই এই পত্রিকার কোনো গোঁড়ামি ছিল না। 'সমকালীন সৎকাব্যের সমগ্র ধারাটিকে আমরা এর মধ্যে সংহত করতে চেয়েছিলাম' বলে বুদ্ধদেব যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন তা সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হয়েছে। এই 'কবিতা'-গোষ্ঠীরই উদ্যোগে ১৯৪০এ 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র মূল্যবান সংকলনটি প্রকাশিত হয়। ওই পুস্তকে আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের দুটি ভূমিকা সাধারণ পাঠককে আধুনিক কবির কাছে পৌঁছে দেওয়ার সহৃদয় প্রচেষ্টা হিসাবে উল্লেখ্য। গদ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে একদা 'সবুজপত্রে'র যে ভূমিকা ছিল, আধুনিক বাঙলা কবিতার ক্ষেত্রে 'কবিতা' সেই ভূমিকাই পালন করেছে। এই 'কবিতা' পত্রিকায় পাঠকের কাছে পরিচিত হলেন জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, অমিয়

চক্রবর্তী, সমর সেন এবং আরো নবীনতর কবিকুল। ১৯৫৩ সালে বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র সংকলন প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত 'কবিতা'র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। তারপর বহু পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, যাদের পাঠক-প্রস্তুতির কাজে গৌণ ভূমিকা রয়েছে। 'নিরুক্ত', 'একক', 'শতভিষা', 'কৃত্তিবাস', 'পূর্বমেঘ', 'কবিপত্র', 'সীমান্ত'-ইত্যাদি পত্রিকাগুলির সম্পাদকরাও কবি এবং তার পাঠকও মূলত কবিরাই। ইংরেজিতে যাকে 'climate of confidence' বলে সেই 'বিশ্বাসের বাতাবরণ'-সৃষ্টির কাজে বুদ্ধদেবের গদ্যরচনা, বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথের সমালোচনা, জীবনানন্দের 'কবিতার কথা'র ভূমিকা অনস্বীকার্য। এঁদের সমালোচনার মূল্যায়ন এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, শুধু মোটের উপর কথাটা এই যে, এই কবিরাই তাঁদের গদ্য ও পদ্যের মধ্য দিয়ে, সেই সময়ের সংশয় ক্লান্তি নৈরাশ্য বিদ্রোহ ও জটিল আবর্তকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন এবং একটি পরিশীলিত অনুরাগী পাঠক-চক্র সৃষ্টি করেছেন। আমার কথার অর্থ কিন্তু এই নয় যে বুদ্ধদেবের 'সাহিত্যচর্চা' পড়ে তাঁর কবিতাকে বোঝা যাবে অথবা সুধীন্দ্রনাথের 'কুলায় ও কালপুরুষ' পড়লে তাঁর নিজস্ব কবিতার অর্থোদ্ঘাটন হবে। তাঁরা কেউ নিজের কবিতার টীকা করেন নি। কিন্তু তাঁদের গদ্যরচনায় সামগ্রিক ভাবে রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কাব্যের পরিচয় পাওয়া যাবে।

৬

ইতিমধ্যে আধুনিকতারও রূপান্তর ঘটেছে। আধুনিকতা একটি বোধ, বিশেষ মননভঙ্গি, গতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির ফলশ্রুতি। আবার সমাজের আভ্যন্তর অবস্থার, দ্বিধাদ্বন্দ্বের মানসপ্রকৃতিকেই কাব্যে ধ্বনিরূপ দান করে শিল্পকর্ম। সুতরাং কবির মন যেমন এক দিকে বিশ্বদীক্ষা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে, অন্য দিকে দেশ ও কালের ঐতিহ্যের নির্যাস তার সৃষ্টিপ্রবণ ধমনীতে রক্তকণিকার মতো সঞ্চারিত থাকে, তাই সে সামাজিকের অচ্ছেদ্য অংশও বটে। এই সামাজিকেরই ইতিমধ্যে বিবর্তন ঘটে গিয়েছে। পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে আজকের ভূমিতে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রমুহূর্তের দিকে, আধুনিক কবিতার প্রস্তুতি-পর্বের দিকে তাকালে প্রথমেই যে কথাটি মনে আসে সেটি হল নবকাব্য-অলকানন্দায় প্লাবনের যে প্রতিশ্রুতি ছিল তা সফল হয় নি। চতুর্থ দশকের কবিকুল যে-বেদনার যে-রিয়ালিটির যে-রূপের কলাকার হয়েছিলেন, ষষ্ঠ দশকে তা অনুপস্থিত। এই বিবর্তনের সঙ্গে পাঠকের সম্পর্কটি কোনো অবিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই বিবর্তনের শুরু রবীন্দ্রনাথেই। নিরলস প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব একটি পাঠকসমাজ প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর রচনার শেষ পর্বেই কিন্তু কবি-পাঠকের হার্দ্য সম্বন্ধে রন্ধ্রের সৃষ্টি

হয়েছিল। 'পূরবী'-পর্যন্ত নিখিল পাঠকচিত্ত যে রসের আস্বাদন পেয়েছিল 'পরিশেষ'এ এসে সেটিতে ভাঙন ধরল। 'পরিশেষে'র 'আগন্তুক' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,

কালের নৈবেদ্যে লাগে যে-সকল আধুনিক ফুল
আমার বাগানে ফোটে না সে।

কিন্তু সে ফুল তিনি নিজেই ফোটালেন 'পুনশ্চ' কাব্যে (১৯৩২)। শুধু যে গদ্য-ছন্দের জন্য কবিরা বিশেষ ভাবে ওই কাব্যকে স্বাগত জানিয়েছিলেন তাই নয়, তৎকালীন আধুনিক কবিদের কাছে তিনি প্রথম 'আধুনিক' হয়ে উঠেছিলেন ওই কাব্যের সূত্রে। কিন্তু পাঠক সমাজের প্রতিক্রিয়া?

গদ্য-কবিতা বাস্তবতার অতি কাছাকাছি—এই কথাটি যদি সত্য বলে ধরে নেওয়া হয় তবে গদ্যে উপন্যাস-গল্প পড়ায় অভ্যস্ত পাঠকের কাছে সে-কবিতা অতি আদরণীয় হয়ে উঠবে এটাই আশা করা যায়। কিন্তু তা হয় নি। যে সময়ে গদ্যছন্দ ও কথ্যপ্রকরণ কাব্যরীতির অঙ্গ হল, সে সময় থেকেই দেখা যায় কবিতা তার জনপ্রিয়তা হারাল। কবিরা গদ্যছন্দকে যুগ-ছন্দ বলে আবাহন জানালেন কিন্তু কবিতার পাঠক বিসর্জিত হল গোষ্ঠীশিল্পে। সাধারণ সামাজিক তার আপন দেহের অভ্যন্তর থেকে শুরু করে নিখিল বিশ্বে যে স্বাভাবিক ছন্দঃস্পন্দনের ব্যাপ্তি দেখতে পায়, বোধ হয় তাকেই দেখতে চায় কাব্যে। কথাটা খুবই পুরাতন, কিন্তু একজন এ যুগের কবিই বলছেন:

> সম্প্রতিকালে গদ্যছন্দের চর্চা কমে এসে পদ্যছন্দের চর্চা বেড়ে গেছে, এমন কি ঐতিহ্যসম্মত পয়ারেরই নানান রূপে অধিকাংশ কবিতা লেখা হচ্ছে।

কিছুক্ষণ পাঠক স্থিতি পেলেন যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদে, সত্যেন্দ্রনাথের সমসাময়িকতায়, নজরুলের প্রগল্ভ যৌবনের উদ্দামতায়, মোহিতলালের দেহচর্যায়। 'কল্লোল'-পর্বে এঁদের অভিঘাত সুস্পষ্ট। তারপরেই বুদ্ধদেব, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে-র কাল। এর কিছু পরে সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় আধুনিকতার জটিল যন্ত্রণাকে তুলে ধরলেন। এক লহমায় এতখানি রাস্তা পার হয়ে আসার অর্থ এই যে রবীন্দ্রনাথে যে-আধুনিকতা শুরু হয়েছিল এবং যা পরবর্তী চার-পাঁচজন কবির রচনায় পরিস্ফুট, পঞ্চম দশকে এসে সেই আধুনিকতাই কবিরা ব্যবহার করেছেন। নজরুল-তটে ভিড় জমেছিল, বাণতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের প্রসাদে এবং মধ্যবিত্তসুলভ মানবিকতার মধ্য দিয়ে সাধারণ জীবনের শরিকের। নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথে। মোহিতলাল আকর্ষণ করেছিলেন সেই কালের কবিকে—'কল্লোল যুগে'র ইতিহাসে তার সাক্ষ্য আছে। রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েও রোম্যান্টিকতার 'enchanted circle' (মোহিনী চক্রব্যূহ) এঁরা ভেদ করতে পারেন নি। কাজেই পাঠকের রক্তেও রোম্যান্টিকতারই সংস্কার কাজ করে চলেছিল। কিন্তু তারপর পাঠক পেল

অন্যতর কাব্য। তখন আর 'নিখিল পাঠকচিত্ত' বলে কোনো বস্তুর কল্পনা করা অসম্ভব।

আধুনিক যুগের মরুভূমির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বদগ্ধ মানুষ আর কবিতার প্রগতির সঙ্গে তাল রাখতে পারছেন না। কিন্তু এরই মধ্যে কবি যখন পাঠকসাধারণকে তাঁর অভিজ্ঞতার অংশীদার করে নিয়েছেন—যেমন নিয়েছিলেন কিছু বামপন্থী কবি, দেখা গেছে পাঠক তাঁকে ঘিরে আসে, তাঁর চারিদিকে গোল হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বামপন্থী কবিতা বলতে যা বোঝায় তা আজ খুবই নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। কিন্তু কবিতার এই সমস্যা, কিংবা পাঠক ও কবির এই সম্পর্কের সমস্যা কিছু নতুন নয়। কবিতার এই সমস্যা যুগে-যুগেই আছে, কেন না কবিতার সমস্যা তো যুগেরই সমস্যা। রবীন্দ্রনাথের সময় থেকে জীবনানন্দের সময় যেমন সরে এসেছে, তেমনি বিষ্ণু দে-সমর সেনের কাল থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্যও ততখানিই সরে এসেছেন—এক মানসিকতার স্তর থেকে সম্পূর্ণ অন্যতর মানসিকতায়; মানসিকতা ও সময়ের এই ভিন্নতা পাঠককেই বোঝবার ক্ষমতা অর্জন করতে হয় বারে বারে।

কালের যাত্রার শেষ নেই। ১৯৪৭ সালের পর ১৯৪৮-৫০এর মধ্যে এল আর-একটা নতুন উত্তেজনার যুগ, রাজনৈতিক উত্তপ্ত আবহাওয়া কবিতাকে রাজনীতির দিকে ঠেলে নিয়ে গেল। কিন্তু পঞ্চম দশকের সঙ্গে ষষ্ঠ দশকের কত না তফাত! উত্তেজনার পর শ্রান্তি, আলোড়নের পর হতাশা, কিন্তু তারপর? হতাশা, ব্যর্থতা, রাজনৈতিক সংকট, অর্থনৈতিক সর্বনাশ সবই কবিতার অঙ্গে আশ্লিষ্ট হয়েছে, কিন্তু কবিতার জগৎ হয়ে এসেছে ক্ষুদ্র। সুধীন্দ্রনাথ-বিষ্ণু দে-র কাব্যে যে বিশাল বিশ্বের ছবি ফুটে উঠত, সেই চৈতন্যের আন্তর্জাতিকতা আজ প্রায় লুপ্ত। ব্যক্তিগত চিত্রকল্প এসে কবিতাকে তীব্র করেছে, কিন্তু বিস্তৃত করে নি। অর্থাৎ কবিতা যে পরিমাণে সামাজিক হয়ে উঠল সেই পরিমাণে কাব্য হল না। মনে রাখতে হবে স ম সা ম য়ি ক তা, বা তা ৎ ক্ষ ণি ক তা ক বি তা ন য়, ক বি তা র বি ষ য ব স্তু। ক্লিশে-জর্জরিত, স্লোগান-অধ্যুষিত, শারীররতি-সর্বস্ব কবিতাও কাব্য হয়ে উঠতে পারে শিল্পগুণে, অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখেছিলেন,

> সৃষ্টি কেন মানুষের মনোমতো নয় এ অভিযোগ আজ নিদারুণ পরিহাস। সৃষ্টি যা আছে তাই। কেন এ রকম প্রশ্নের অর্থ নেই। এর সবই যে নিষ্ঠুর ও বীভৎস নয় সে আমাদের সৌভাগ্য। কঙ্কালকে ঘিরেও যে থাকে শরীরের সুষমা, কামের পাঁকেও যে প্রেমের পদ্ম ফোটে, কৃতজ্ঞ মনে তাই স্মরণ করতে হবে…

অতিআধুনিকদের কাছে উল্লেখটি অতিমাত্রায় রাবীন্দ্রিক মনে হতে পারে। কিন্তু বাক্যটির অন্তরে যে সত্য আছে, সে সত্য শুধু জীবনের নয়, কাব্যেরও।

১২

শব্দ, পুরাণ, মুখচ্ছদ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

শ ব্দ

কবিতার শব্দ যেদিন থেকে বহিরঙ্গ সংগীতের আশ্রয় হারাল, সঞ্চারিত হতে পারার দর্পে কোথায় যেন ঘা পড়ল। কেন না সংগীত মানবহৃদয়ের সার্বজনিক ভাষা। সংগীতকে আশ্রয় করলে মানবচেতনার সন্নিহিত এবং প্রত্যন্ত প্রদেশগুলি স্পর্শ করা যায়।[১] রবীন্দ্রনাথ জানতেন। তাই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কবিতাকে গান এবং গানকে কবিতা করে তুলছিলেন তিনি।

ফলত তাঁর শেষের দিকের কবিতায় আমরা দু-রকম শব্দ ব্যবহার লক্ষ্য করি—গীতিধর্মী এবং প্রত্যহধর্মী। যে সমস্ত শব্দ কোনো অদৃশ্য রাগিণীকে ভর করেছে, সেই গীতিধর্মী এবং যে সব শব্দ প্রতিদিনের বেঁচে-থাকার ক্ষিপ্র আবর্তে ঘুবতে-ঘুরতে ব্যবহৃত হয়, সেই প্রত্যহধর্মী—দু-রকমেব নমুনা একই সময়ের পরিবেশে রচিত কবিতা থেকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব :

১ যে কথাটি নিশীথ তিমিরে
তারায় তারায় কাঁপে অধীর মির্মিরে···

'কাকলি', মহুয়া।

২ চোরাই করে এনেছো মোরে তুমি
বিচিত্রা, হে বিচিত্রা···

'বিচিত্রা', পরিশেষ।

---

১ সংস্কৃত কবিতার সঙ্গে গানের প্রকাণ্ড প্রভেদ মুছে দেবার আগ্রহে তথাকথিত অ-সংস্কৃত কবিরা গীতিগুঞ্জময় মাতৃভাষার শরণ নিয়েছিলেন। আবৃত্তিসাপেক্ষ সংস্কৃত ভাষা তার স্বর্ণযুগে মননের নির্দিষ্ট স্বচ্ছতার দিকে ঝুঁকেছিল। পক্ষান্তরে, অভিমানী উত্তরসূরিদের লক্ষ্য ছিল অনির্দেশ্য, সর্বাশ্রিত আবেগ-ভাবনার অভিব্যক্তি। উৎকৃষ্ট গদ্যের আর্নল্ড-নির্দেশিত গুণগুলি ধ্রুপদী সংস্কৃত কবিতায় পরিস্ফুট। অর্থাৎ সংস্কৃত কবিতা উত্তীর্ণ গদ্যের মতোই নিয়মানুগ, সুসমঞ্জস, পরিচ্ছন্ন এবং ভারসাম্যে স্থিত। অপভ্রংশ কবিতা কিন্তু এই গদ্যপ্রতিম কবিতার প্রতিক্রিয়ায় প্রাণবন্ত প্রতিযোগীর সুঠাম ভঙ্গিতে একটি সচেতন কার্যক্রম গ্রহণ করল। এই কার্যক্রমের প্রধান অঙ্গ হল সংগীত। গান, নৃত্যযুক্ত গান এবং বাদ্যসংগীতের কাছে সাহায্য নিয়ে বাঙলা কবিতা শব্দকল্প ও ছন্দপ্রকল্পনার ক্ষেত্রে যে-উত্তরাধিকার রেখে গেল, হাজার বছরের বেশি কাজ করে অবশেষে গত শতাব্দীতে অবসন্ন হয়ে 'পাঠ্য-কবিতা' ও 'গীত-কবিতা'র মধ্যে পুনর্বার একটি বিচ্ছেদকে ব্যক্ত করে তুলল। আধুনিক কবিতার সংগীতজিজ্ঞাসায় এই প্রেক্ষণী স্মরণযোগ্য।

শেষোক্ত উদাহরণে দুই ধরনের শব্দসমীক্ষা মিশে গিয়েছে। নিতান্ত চলতি এবং অত্যন্ত পুষ্পল শব্দকে অভিন্ন আধারে ধারণ করার এই প্রবণতাকেই রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত মেনে চলেছিলেন বলে গদ্যকবিতা ছেড়ে ঢিলেঢালা মুক্তক-বন্ধে তাঁকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছিল।

রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিরা নিঃসন্দেহে আরো এক স্তর বিবর্তিত। এই বিবর্তনের জন্য তাঁরা অবশ্যই মাশুল দিয়েছিলেন। বৃহৎ জনসভা প্রথমে তাঁদের 'দুর্বোধ' বলে যে ঠাউরে নিয়েছিল তার একটি কারণ, আধুনিক কবিরা শব্দকে তার স্বয়ংস্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে তার আপন স্বরূপে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।[২] তাঁরা প্রমাণ করতে চাইলেন, সমার্থক শব্দ বলে কিছু নেই, আছে বোধিক্রমে বরদ শব্দকল্প। অথবা এক-একটি শব্দ, আজকের সময়ের বিশ্লিষ্ট মানুষের মতোই, এক-একটি ব্যঞ্জনাসঙ্কুল দ্বীপ। অর্থাৎ একটি কবিতা একটি দ্বীপপুঞ্জ যেখানে এক-একটি শব্দের অনাশ্রয়িতা শেষ অবধি মুছে গিয়ে পরম আশ্রয়ের মতো হয়ে ওঠে।

কিন্তু একদিনেই শব্দের এই ক্রমমুক্তি ঘটে নি। শব্দকে এ যুগের কবিরা ক্রমশই যত ইঙ্গিতবঙ্কিম করে তুলেছেন, তার বাচ্যার্থের দিকটি উপেক্ষা করা অসম্ভব হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে যখন প্রতিপাদ্য ভাববস্তুই আধুনিকতা বলে গৃহীত হয়েছিল, নজরুল-মোহিতলালের উদাত্ত উত্তেজনা আমাদের শ্রবণে এসে পৌঁছেছিল, কোনো অর্থনিরপেক্ষ বাক্‌প্রপঞ্চ আমরা শুনি নি। এবং দ্বিতীয় পর্বের কবিরা এক বিদ্রোহের বিরুদ্ধে আরেক সুষম বিদ্রোহ যখন ঘোষণা করলেন, তখনো। কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত সম্প্রদায়ের অধিকাংশের লক্ষ্য ছিল বাচ্যার্থ ও মূর্ছনাকে সমাহৃত করা। তিনজন বক্তব্যধর্মী কবির রচনা থেকে দৃষ্টান্ত :

২ আধুনিক কবির কাছে শব্দের এই স্বনিকেত মহিমা গটফ্রীড বেনএর 'একটি শব্দ' (Ein Wort) কবিতাটিতে ব্যক্ত হয়েছে

> একটি শব্দ, একটি বাক্যবন্ধ : শূন্যের মধ্য থেকে উঠে আসে
> অনুভূত জীবন, আকস্মিক চেতনা,
> সূর্য নিশ্চল, স্তব্ধ বৃত্ত,
> কেবল সব কিছু এগিয়ে আসছে একটি শব্দের কেন্দ্রে।
>
> একটি শব্দ—আলোর এক ঝলকানি—পাখা মেলা এক উৎক্রান্তি এক আগুন
> আগুনের এক ঘোরানো শিখা, ছিটকে-বেরিয়ে-আসা একটি নক্ষত্র—
> এবং অন্ধকার আবার, বিশাল আর দানবিক,
> পৃথিবীর আর আমার চারপাশের শূন্য প্রান্তর।

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১ জানি সবই, তবু পরিবর্তনে তোমার
অসূর্য পেয়েছে ছাড়া, এমন কি নিত্য বিধাতার
জ্যোতির্ময় সিংহাসনখানি
ডুবেছে নাস্তির গর্তে, সে-কথাও মানি।

'সর্বনাশ', সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

২ অনন্দ অসূর্যলোকে
অর্গল লাগাবে নাকো দ্বারে।

'জন্মাষ্টমী', বিষ্ণু দে।

৩ বড়ো প্রীতি করেছিলে এই পল্লীটিকে
মুগ্ধস্রোতা আজো বয় নদী নিরঞ্জনা—
কী চোখে এদের তুমি দেখেছিলে তাই ভাবি।

'বোধগয়া', অমিয় চক্রবর্তী।

তিনটি উদাহরণেই (বিষ্ণু দে-র কোনো-কোনো চমকপ্রদ, স্বতশ্চালিত ভাবপ্রবাহঘেঁষা শব্দলীলা স্মরণে এনেই বলছি) শব্দার্থ এবং শব্দমূর্ছনা তুল্যমূল্যায়িত হয়েছে। এই কবিরা, বৃহৎ পাঠকসংসারের সঙ্গে নিজেদের আত্মীয়তা অব্যক্ত রাখেন নি। একই কারণে ইংরেজি ভঙ্গিভণিতির নমনীয় প্রত্যক্ষতা ও সংস্কৃত ভাষার অন্তর্লীন পৌরুষের ঐশ্বর্যকে মেলানোর প্রচেষ্টা যে তাঁদের কার্যসূচীর অন্তর্গত হয়েছিল তার স্বীকৃতি আছে বুদ্ধদেব বসুর সুচিন্তিত মন্তব্যে :

ইংরেজি যেমন আমাদের পক্ষে বিশ্বচেতনার মাধ্যপ্রণালী, আমাদের ভাষাজ্ঞানের ভিত্তি তেমনি সংস্কৃত ; এ দুয়ের রাজযোটক ঘটাতে পারলে, তবেই সম্ভব আধুনিক বঙ্গভাষায় নির্বস্তুক ভাবের যথোচিত অভিব্যক্তি।

'সমালোচনার পরিভাষা'। কবিতা, আশ্বিন ১৩৫৫।

সদ্যোদ্ধৃত তিনজন কবিই যে আরো পরবর্তী কালে নির্বস্তুক ভাবকে ধারণ করতে পেরেছেন, তার তিনটি প্রমাণ :

১ কখন ওঠে, পাতাল ভেদ ক'রে
অসম্ভূত অমা :
বায়ুর বেগ সহসা যায় ম'রে
দ্রাঘিমা দেয় ক্ষমা।

'নষ্ট নীড়', সুধীন্দ্রনাথ।

২ প্রকৃতির আক্ষেপস্পন্দে
কবিতার ছন্দের মতন।

'জল দাও', বিষ্ণু দে।

৩ কানে কানেই ঝরে বাঁশি
সেখানে কেউ নেই।
মধুকোরকে মুকুল রাশি
কমল দল নেই॥

'দিঘি', অমিয় চক্রবর্তী।

ইতিমধ্যে সমর-সুভাষের খরোষ্ঠী অথবা লোকায়ত সাংবাদিকতার পর্বাঙ্গ শেষ হয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার শব্দনির্বাচনে এসেছে লজ্জাবতী বধূর ছায়াচ্ছন্নতা এবং সর্বতোভদ্র ঋজুতার সমন্বয়। এবং পঞ্চম দশকের কবিদের প্রায় সবাই সেই একই অপরূপ দোটানায় নানা ভাবে স্পৃষ্ট। কিন্তু প্রধানত কার পৌরোহিত্যে এর মধ্যে কী-সেই কল্পান্ত ঘটল যার ফলে 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' বা নির্বস্তুক শব্দ অধ্যক্ষতা গ্রহণ করল?[৩] দুই যুদ্ধের অন্তর্বর্তী-অধিত্যকা এবং সম্ভাব্য অথবা অসম্ভব তৃতীয় আসন্ন যুদ্ধের সানুদেশে শব্দের ঘনশ্যাম অনুষঙ্গের মহাদেশ রচনা করলেন একজন কবি, জীবনানন্দ। তাঁর কৃতিত্ব হয়তো একক নয়, যুগযুক্তিবশত সমবায়ী হয়তো-বা। তবু তিনিই পরিপূর্ণ ভাবে আধুনিক মানুষের নিঃসঙ্গতার দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন বলে শব্দের সমস্যাকে মৌলিকতম প্রেক্ষিতে দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তাঁর সতীর্থেরা আর সবাই যেখানে সামাজিক, তিনি অ-সামাজিক (ব্লেক, অথবা হেল্ডারলীনের মতো) হয়ে সমস্ত অস্তিত্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন। একদা ইয়েট্স্ একটি ভীষণ গোপন প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন: 'Why should we honor those who die on the field of battle? A man may show as reckless a courage in entering into the abyss of himself.' জীবনানন্দও নিজের (অর্থাৎ সর্বমানবের) অস্তিত্বের দারুণ সেই বিবরে প্রবেশ করেছিলেন যেখানে যেতে গার্গীকে বারণ করেছিলেন ভারতবর্ষের মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য। আবার, সেইখান থেকে উত্তর বয়ে নিয়ে এসে তিনি বহিঃস্থ যুদ্ধক্ষেত্রেও বেরিয়ে এসেছিলেন সাতটি তারার তিমির থেকে প্রভাতসংগীতে, মুক্ত-রণাঙ্গনে বৈতালিকের মন্ত্র শুনিয়েছিলেন: 'জয় অস্তসূর্য জয় অলখ অরুণোদয়, জয়।' বস্তুত, এই নিষ্ক্রমণ যে সর্বথা সার্থক হয়েছিল সে কথা বলা যাবে না। এটুকু বলা সম্ভব, জীবনানন্দ প্রমাণ করে গিয়েছেন আমরা যে-পরিমাণে একা হয়ে উঠি ততখানিই

৩ 'নির্বস্তুক' বলতে এখানে কোনো চিত্ররেখাশূন্য অনুভূতি অথবা বিবিক্ত অস্পষ্টতা বোঝাচ্ছে না। চিত্র দেশপরিবেশের আধার এবং কবিতা কালচেতনার মাধ্যম—লেসিং-রচিত এই প্রাচীর ঘুচে গিয়ে আজ আধুনিক কবিতায় যে নির্বস্তুকতা উদ্ভূত হয়েছে তা চিত্রার্পিত। ইমেজ বা চিত্রকল্প ন্যূনতম শব্দের অরণিতে যে বহ্নিবলয় জ্বেলে ধরে তার নিহিত যথাযথ, অমোঘ স্পষ্টতা অন্তর্মুখী। এই অর্থে আজকের যথার্থ নির্বস্তুক শব্দ স্পৃষ্ট, মূর্ত।

বিশ্বজনীন হয়ে ওঠে আমাদের ভাষা, শব্দের বিবেকও ততই আত্মদীপ থেকে জ্বলে উঠে লক্ষ দীপের সঙ্গে অকারণে জ্বলতে থাকে।

এই বিরোধাভাসের রুচিরা তাঁর অজস্র উচ্চারণে পরিকীর্ণ। 'বলাকা'র 'চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে' থেকে 'সাতটি তারার তিমিরে'র 'ইহারা উঠিবে জেগে অফুরন্ত রৌদ্রের তিমিরে' আপাতবিরোধের গভীরে আরো এগিয়েছে, সন্দেহ নেই। আধুনিক পাঠককে চকিত করে জীবনানন্দ যখন বলে ওঠেন, 'তোমার নিশিত নারিমুখে, জান কি অন্তর্ধামী!' অথবা 'গিয়েছিলে অনেক দূরে স্থির বিষয়ের দিকে', সন্দেহ থাকে না পাঠককে তিনি আমন্ত্রণ করছেন তাঁর আভিপ্রায়িক শব্দভূমিতে যেখানে আমাদের বিভিন্নমুখী উদ্যম, প্রশ্ন ও অভীপ্সাগুলি মিলিত হয়, একাগ্র বিশেষ্যের অনন্যতায় সমগ্র সৃষ্টি অন্তর্ভুক্ত হয়: 'এ জীবনে আমি ঢের শালিখ দেখেছি / তবু সেই তিনজন শালিখ কোথায়।' এবং বিশেষণও হয়ে ওঠে অমূর্ত বিশেষ্য: 'অকূল সুপুরিবন স্থির জলে ছায়া ফেলে এক মাইল শান্তিকল্যাণ হয়ে আছে।'

ভাষা এবং শব্দ এক নয়। ভাষার মধ্যে ধ্বনি আছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে। তা না হলে অর্থহীন বৈদিক স্তোভধ্বনি ওই মর্যাদা পেত না, ব্রজবুলির মতো আবেগ-নিয়ন্ত্রিত, ব্যাকরণবিস্মৃত ভাষা পেতাম না আমরা। আধুনিক কবিতায় শব্দই সমগ্র ভাষাকে কোণার্ককিন্নরীর চিবুকে ক্ষোদিত করে তুলে ধরেছে। অনন্ত শূন্যের দিকে মালার্মে শাদা কাগজ মেলে রেখেছিলেন, ভাষার ভাষা পরম শব্দকে অভ্যর্থনা করে নেবেন বলে। বাঙলা কবিতায় এই মুহূর্তের শব্দৈষণা বিশ্লেষণ করলে দেখব মালার্মের নিরঞ্জন সেই শব্দসন্ধানে এসে মিলেছে জীবনানন্দের শব্দব্যক্তিত্ব। রাগ-রাগিণীর শিরোভূষা সমকালীন কবিতার নেই। কিন্তু শব্দকে সাহায্য করবার উদ্দেশে ছন্দের অক্লান্ত সন্ধান চলেছে। রবীন্দ্রসংগীত এবং অবনীন্দ্রভাষার দ্বৈত মন্ত্রণা এসে কবিতার শব্দকল্পকে ভবিষ্যতে আরো জটিল সুন্দর করবে, আলোক সরকারের এই ভাবিকথন, ইতিমধ্যেই, তাঁর নিজের এবং আরো কয়েকজনের মধ্যে আভাসিত হয়ে উঠছে।

পু রা ণে র প্র য়ো গ

পৃথিবীতে একদিন স্বাভাবিক স্বর্ণময় অতীত শেষ হয়ে গেল। চারণকবিরা অগোচরে অপসৃত হয়ে গেলেন। অতীতের এই অবকাশ উপলক্ষ্যে হার্ডার বলেছেন, শিল্প এসে নিসর্গকে নির্বাপিত করে দিল যেন; কবিতা লেখা ঠিকই চলতে লাগল, কিন্তু রইল না তার অভিঘাতের অমোঘতা, যেন ইস্কুলের ছেলের পরিশোধিত অনুশীলনী হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু সত্যিই কি অতীত কখনো শেষ হয়ে যায়? আমরা এই মুহূর্তে যে কথা উচ্চারণ করেছি তা এইমাত্র অতীতে পরিণত হল, কিন্তু পর্যবসিত হয়ে গেল কি? প্রকৃতপক্ষে পুরাণের জন্ম পুরাঘটিত এবং বর্তমান মুহূর্তের অবিচ্ছেদ্য হৃদ্যতায়। 'পূরণ' কথাটি থেকে 'পুরাণ' কাথাটার মৌল সূত্র মিলবে: যা ঘটে গিয়েছে বা ঘটে গেল তার সঙ্গে এই মুহূর্তের দূরত্ব মনে মনে পূরণ করতে হবে। স্মৃতির শরীরটিকে নতুনতর ব্যঞ্জনা ও উপকরণে ঋদ্ধ এবং সম্প্রসারিত করে তোলাই পুরাণের কাজ।

দূরতম যে-বৈজয়ন্তীয়ম ইয়েট্‌স্ এবং জীবনানন্দের হাতে মানুষের পুনর্ণব যৌবরাজ্যে পরিণত হয়েছে, তারও একদিন সমস্যা ছিল কিভাবে বিগতকে বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত করবে। বাইজেন্টিয়ামে বিরচিত 'দিগেনেস আক্রিতাস'-নামক এপিকে প্রাচীন গ্রীক মিলেছিল সজীব সাম্প্রতিকের সঙ্গে সেমেটিক ও খৃষ্টীয় জীবনভাবনার মেলবন্ধনের অভিমুখিতায়।

প্রাগাধুনিক বাঙলা কাব্যে প্রথামন্থর পুচ্ছানুগ্রাহিতা সত্ত্বেও মঙ্গলকাব্য ও অনূদিত মহাকাব্যগুলিতে পুরাণের জঙ্গম স্বাস্থ্যময়তা বিস্ময়কর। এবং সতেরো-আঠারো শতকের অবক্ষয়িষ্ণু পদাবলীতেও ভারতপুরাণের নম্য অনুস্যূত এবং তান্তব বিন্যাস চোখে পড়ে।

কিন্তু মিশনারী মনীষীবর্গের আন্তরিক অথবা বাণিজ্যিক প্রাচীপুরাণ-প্রীতি সত্ত্বেও উনিশ শতকের প্রথম মুহূর্তে বাঙলাদেশ স্মৃতিহীন হয়ে গিয়েছিল। এর মর্মান্তিক নজির দাশরথি রায়ের পাঁচালির আসরে। কোনো নির্দিষ্ট পৌরাণিক বিষয়ের অবতারণা করতে গিয়েও মাঝে-মাঝে দাশরথি রায় অন্যমনস্ক শ্রোতৃমণ্ডলীর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য 'রসপ্রসঙ্গ' বলে একটি কৌতুকী-বিরতিকল্পের উদ্‌ভাবন করতেন। প্রসঙ্গান্তরে চলে যাওয়াটাই ছিল রসপ্রসঙ্গ। নানান্ লঘু প্রসঙ্গে বিহার করে অবশেষে মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসার এই বিষণ্ণ উদ্যম কতটুকু সমর্থনযোগ্য তা নিয়ে মতদ্বৈধ হতে পারে। কিন্তু সন্দেহ নেই, সে দিন মূল প্রসঙ্গ অর্থাৎ ভারতপুরাণের ঐতিহ্যসম্মানিত প্রতিষ্ঠানটি নির্জীব হয়ে এসেছে। কবিওয়ালারা তাকে নেচেকুঁদে প্রাণময় বলে ঘোষণা করলেও তাতে ভারত-পুরাণের বহিঃশরীর অথবা কবিওয়ালার কোনো প্রাণিক ভূমিকা প্রমাণিত হয় নি। মাঝখান থেকে বৈদেশিকতায় ঈষৎস্পৃষ্ট অথচ ঐতিহ্যকাতর কবিদের মধ্যেও একটা ঐতিহাসিক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হল। প্রথমতম উদাহরণ রঙ্গলাল—সরকারি পরিচয়পত্রে যাঁর বিষয়ে এ রকম লিখিত ছিল যে ওঁর মুখের একদিকে পোড়া দাগ রয়েছে, ছেলেবেলায় কবিওয়ালাদের গান শুনতে গিয়ে প্রদীপের উপর পড়ে গিয়ে পুড়ে গিয়েছিল। বস্তুত, ওই পোড়া দাগ রঙ্গলাল থেকে শুরু করে অগণ্য কবির কবিতায় অসচেতন প্রত্নচর্যার অনপনেয় চিহ্ন রূপে মুদ্রিত ছিল।

মধুসূদন অবশ্যই দেশজ ভাষা-পথ খনন করে পুরাবৃত্তকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত

করলেন। এবং তাঁর নব্য-পুরাণে প্রাচী-প্রতীচীর বৈপ্লবিক সামঞ্জস্য ঘটেছিল। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত—পুরাণের তথাকথিত এই পঞ্চলক্ষণ তিনিই বোধ হয় সর্বাগ্রে পরিত্যাগ করবার সাহস পেলেন। গাছটাকে বাঁচাতে হলে তার ডালপালা বারবার ছেঁটে দিতে হবে, এটা মধুসূদন জানতেন। পুরাণের অদল-বদল তিনি চূড়ান্তই করেছিলেন বলেই তাঁরই বাধ্য উত্তরসূরি এ রকম বলতে পেরেছিলেন :

> পরিশেষে নিবেদন এই যে, সকল বিষয়ে কিংবা সকল স্থানে পৌরাণিক বৃত্তান্তের অবিকল অনুসরণ করি নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ স্থলে কৈলাসের উল্লেখ করিতেছি। পৌরাণিক বৃত্তান্ত অনুসারে কৈলাসের অবস্থিতি হিমালয়ের পর্বতের উপর না করিয়া অন্যত্র কল্পনা করিয়াছি। ইহার দোষগুণ পাঠকেরা বিবেচনা করিবেন।

দ্বিধাদর্পিত এই বহ্বারম্ভের ফল লঘু ক্রিয়া হলেও এর প্রয়োজন ছিল। কেন না এ কথা ভুললে সত্যের অপলাপ হবে, রবীন্দ্রনাথেরও বিস্তর সময় লেগেছিল। তাঁর আগেকার 'রাজা' ও অন্ত্য-পর্বের 'রক্তকরবী'র মধ্যে তুলনা করলে দেখা যাবে প্রথমোক্তটিতে হিন্দুবৌদ্ধ পুরাণের প্রয়োগ কী পর্যাপ্ত পরিমাণে অনুগত এবং বিবেচিত, যেটুকু বদল ঘটিয়েছেন তা-ও সুশোভন হওয়ার প্রয়োজনে। কিন্তু 'রক্তকরবী'তে রামায়ণের কাহিনীটি প্রতিসরণে বিচ্ছুরিত বলেই এত ইঙ্গিতসঞ্চারী! অথবা আদি-পর্যায়ের 'পরিশোধ'এর সঙ্গে অন্তিমের 'শ্যামা' তুলনায়নে যে এত দ্বিমেরুবিষম, তারও একটি কারণ পুরাণে পরিবর্তন প্রণয়নে সাহস সংগ্রহের অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত লয়। 'বীরাঙ্গনা'-কাব্যের কৈকেয়ীর পাশে আবেদনরত গান্ধারী শুধু বাচংযত নন, নৈর্ব্যক্তিক নিরপেক্ষতায় প্রাজ্ঞ। মধুসূদনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চরিতমানসের কীর্তিত পার্থক্য মেনে নিয়েও শেষোক্ত জনের পুরাণ বিষয়ে আত্যন্তিক বৈধতা নিয়ে পাঠকের মনে প্রশ্ন থেকে যায়।

তৎসত্ত্বেও, অন্ত্যপর্যায়ী কবিতায় পুরাবৃত্তকে তির্যক সাবলীলতায় সাচীকৃত করে রবীন্দ্রনাথ যে মিশ্র রস এনেছেন তার দুটি উদাহরণ :

> ১ কুহেলি গেল, আকাশে আলো দিল যে পরকাশি
> ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি।
>
> 'সাগরিকা', মহুয়া।

> ২ আমি আজ কোথা আছি, প্রবাসে অতিথিশালা মাঝে
> তব নীল লাবণ্যের বংশীধ্বনি দূর শূন্যে বাজে।
>
> 'নীলমণিলতা', বনবাণী।

* প্রথম চিত্রলেখটি প্রেমের অভিজ্ঞতার মধ্যে চিরায়ত পৌরাণিক একটি অনুষঙ্গকে ব্যক্তি-স্বাশ্রয়ী ভঙ্গিতে অন্তর্গত করে নিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়টি নিঃসন্দেহে উত্তীর্ণতর শুধু **coenesthesia** বা দৃশ্যাঙ্গ ও শ্রুতিকল্পের সামগ্রিক যোগফলই নয়, পুরাণের মুক্তি

হিসেবেও ওই নিদর্শনটি আধুনিক কাব্যের একটি দিক্‌চিহ্ন হয়তো। আত্মপুরাণে কৃষ্ণকাহিনীর ব্যবহার জয়দেবে সুষ্ঠু সূচনা পেয়েছিল। তার সমাধা রবীন্দ্রনাথের প্রেম প্রকৃতি এবং মাথুরের ত্র্যম্বক এই মিতালেখ্যে।

অতঃপর পুরাণকে আত্মপ্রসঙ্গে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করার ক্ষেত্রে কোনো অন্তরায় রইল না। পুরাণ রইল না কাহিনীকথনের পাত্র হয়ে—সুসান কে ল্যাঙ্গারের ভাষায়—হয়ে উঠল **thematic shift,** বা বিষয়বস্তুর খাত-পরিবর্তনের সূত্র। কিংবা, শ্রীমতী হ্যারিসনের ভাষায় এ রকম বলা যায়, পুরাণ-জনয়িত্রী প্রবণতা (**the myth-making instinct**) কবিকে স্বাধিকারপ্রমত্ত করে তুলতে সাহায্য করল।

ফলত কবিদের স্বভাব নিজ-নিজ বৈশিষ্ট্য অংশত অতিক্রমও করেছে। দুটি দৃষ্টান্ত :

১ ঘুচে যায় ভয় ;
জানি, জানি বিধাতা নির্দয়
কোনও দিন পারিবে না অর্গলিতে সে স্মৃতির দ্বার ;
ইন্দ্রত্বের ধ্রুব অধিকার
তোমার প্রেমের স্মৃতি রচিয়াছে মোর লাগি যেথা
অয়ি মহাশ্বেতা ॥

'মহাশ্বেতা', অর্কেস্ট্রা। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

২ পশ্চাতে ধায় মরণ চাঁদের আলো
দিগন্ত-ফণা, তুহিন, পাণ্ডু, কালো।
বিস্মরণীর বালুতীর যায় দেখা ?
হে বীর অতনু, নাচিকেত ধনু টানো,
দেহ-দুর্গের রক্ষায় মোরে আনো—
তোমার প্রাকৃত বাহুতে, মহাশ্বেতা ॥

'মহাশ্বেতা', চোরাবালি। বিষ্ণু দে।

দেহবিঘোষক সুধীন্দ্রনাথ দেবীপুরাণের সংস্পর্শে যেখানে দিব্য একটি জ্যোতির্বলয় রচনা করেছেন, বিষ্ণু দে সেখানে মহাশ্বেতাকে মৃন্ময়ী মূর্তিতে গড়েছেন। যেন পুরাণের অন্ধকারে দু-জনে কিছুক্ষণের জন্য চারিত্র-বিনিময় করে নিয়েছেন।

আবার চারিত্রের অভিক্ষেপ ঘটিয়ে যথেচ্ছ পুরাণ ব্যবহারও এঁরা করেছেন :

১ ব্যাধভয়াহত, তাই তো পাহাড়ে আড়াল খোঁজা,
প্রসার্পিনার মুঠিতেও তাই প্রণয়রতি
পিতৃসারস যযাতি-শিরার প্রবল গানে।

'যযাতি', চোরাবালি।

২ উপরন্তু, দেবযানী-শর্মিষ্ঠার কলহকলাপে
আমার অদ্বৈতসিদ্ধি পণ্ড হয়ে থাক বা না থাক,
অকাল জরায় আমি অবরুদ্ধ নই শুক্রশাপে।

'যযাতি', সংবর্ত।

বিষ্ণু দে-র অপ্রতিরোধ্য আশাবাদে যেখানে পাতালকন্যা প্রসার্পিনা (পের্সিফোনে) এবং জরাবিদ্বেষী যযাতির রূপক একই নিশ্বাসে বিধৃত, সুধীন্দ্রনাথের আত্মস্থ নির্বেদ সেখানে যযাতি-রূপকটিকে ধারণ করেছে। সম্ভবত 'জেসন' কবিতাটিতে সুধীন্দ্রনাথের ওই সুস্থির অথচ অনুত্তেজিত আত্মঅভিক্ষেপ নব্য-পৌরাণিক কবিতার জয়কেতন শূন্যে তুলে ধরেছে।

অবশ্য জীবনানন্দই পুরাণ প্রযোগের ত্রিকালজ্ঞ জাতিস্মর। তাঁর সেমেটিক এবং ইয়েট্‌সীয় বিশ্বভৌম সংস্কার (*anima mundi*) থেকে আরম্ভ করে আত্মজীবনী-পুরাণের মানবী নায়িকাদের (বনলতা সুরঞ্জনা-সুচেতনা সুদর্শনা-শঙ্খমালা) প্রাক্‌রূপিণী প্রতিমাবৃত্তের দেবায়নের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত কঠোপনিষৎ সমীক্ষণে এসে পৌঁছনো একটি বিশ্বপুরাণ পরিক্রমার সংরক্ত দৃষ্টান্ত। 'সংরক্ত' শব্দটি এখানে তীব্র, ও গভীর ভাবে যাপিত জীবনের কেন্দ্র থেকে উৎসারিত মূর্ত অভিজ্ঞানের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর পুরাণ-সমীক্ষার সঙ্গে তুলনা করলে জীবনানন্দ সম্বন্ধে ওই অভিধার যাথার্থ্য ব্যক্ত হতে পারে। বুদ্ধদেব সুরঙ্গমা-চিত্রাঙ্গদা-পাঞ্চালীর চরিত্রায়ণে পুরাণকে ব্যক্তিগত করে তুলবার পক্ষপাতী, কিন্তু 'অসম্ভব দ্রৌপদীর অন্তহীন শাড়ি' বুনে যখন তিনি দর্শককে মুগ্ধ করেন, অবচেতনের দুরূহ চাহিদা মেটে না। জীবনানন্দ লোকান্তরে সেই অবচেতনাকে আশ্রয় করেন যার সামগ্রিক দাবিতে যৌথ স্মৃতি কখনো-কখনো একান্ত নিজস্ব স্বপ্নপ্রয়াণের তাড়নায় আলোড়িত, দ্রবীভূত ও নতুন ভাবে আকারিত হতে থাকে। নিহিতার্থপ্রয়াসী চিত্রকর ডালি-র ভাষায় এই প্রবণতাকে mythomania বা অনৃত স্মৃতিবিহার বলা সম্ভব। জীবনানন্দের কৃতিত্ব, তিনি স্মৃতির সমবেত উত্তরাধিকারটিকে বিপর্যস্ত, বিবিক্ত ব্যক্তির মানসিকতায় বিম্বিত করে আবার এই অনিকেত শতকের মানুষকে চৈতন্যের সার্বজনিক সেই তীর্থের কথা বললেন, সেখানে 'মানুষের পটভূমি হয়তো বা শাশ্বত যাত্রীর।'

কিন্তু নিখিলব্যাপী পুরাণ-চেতনার গোপনতম কেন্দ্রে বাঙলাদেশের অন্তরঙ্গ শ্যামল পুরাবৃত্তই সর্বাধিক সক্রিয় হয়েছে। যখন প্রতীচী থেকে কোনো স্রোত আসে নি, তখন বাঙলাদেশ ভারতপুরাণকে স্বকীয় অভিরুচি অনুযায়ী ব্যবহার করেছিল। মালাধর বসু, দ্বিজ মাধব, মুকুন্দরাম প্রভৃতি বিদগ্ধ কবি বারংবার ভারতবর্ষ ঘুরে বাঙলা দেশের আঞ্চলিক প্রসঙ্গেই আপন সীমা পেয়েছেন, বলে উঠেছেন : 'গ্রামের দেবতা বন্দি

আসর ভিতর' (মুকুন্দরাম)। মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে সেই প্রবণতার নব পর্যায় সূচিত হয়েছে এবং বিবর্তিত হয়ে জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা'য় একটি স্নিগ্ধ পরিণতি পেয়েছে। আধুনিক কবির চেতনায় সমস্ত ভুবনপ্রদক্ষিণ একটি সাঙ্কেতিক প্রতিশ্রুতি: জননী দুর্গার চারিদিক ঘুরে এসেই গজানন বিনায়কের চরিতার্থ বিশ্ববীক্ষণের মতো। এবং এই দেশের মাতা অথবা মাটিতেই বিশ্বময়ীর প্রসারিত আঁচল দেখতে অভ্যস্ত কবিরা ক্রমশ ব্যক্তিগত ও আন্তর্জাগতিক পুরাণকে অনায়াসেই নিসর্গধর্মী দেশাত্মবোধে রূপান্তরিত করলেন। এই প্রক্রিয়াটি অনিঃশেষ বৈচিত্র্যে গতিশীল। তাই অবক্ষয়ে পাণ্ডুর প্রেমিকের সান্ত্বনা হয়ে যখন বৃষ্টি নেমে আসে— 'রাধার চোখে নামে কিশোর কৃষ্ণ' (অরুণকুমার সরকার), সর্বত্যাগী বৈরাগীর কাছেও এক মুহূর্তে চোখে পড়ে যায় মানবিক আকর্ষণে মায়াবী মনোহর সংসার, আর, 'দুই নয়নের একটি কৃষ্ণ, অন্যটি তার রাধা' (অরবিন্দ গুহ)। আবার পরিণতির পিপাসায় নিজের এবং জগতের শৈশবস্মৃতির ঐশ্বর্য সংহরণ করে নিয়ে প্রেমিকার কাছে স্বগত প্রেমিক উচ্চারণ করেন: 'আমার সমস্ত ধেনু প্রথম দিনের মার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছি' (আলোক সরকার)।

Mask বা মুখচ্ছদ

আধুনিক কবি যে-মুখচ্ছদ ব্যবহার করেন তার পিছনে বর্ণাঢ্য ও জটিল অতীত রয়েছে। প্রাক্-প্রস্তর গুহামানব একদিন মুখোশ পরে প্রতিদ্বন্দ্বী জন্তুকে ভয় দেখিয়েছিল। একটি গুহায় দেখা যায় পাখির মুখোশ এঁটে বাইসনকে বর্শা দিয়ে ছিন্নভিন্ন করেছে, সেই আলেখ্য। কোমলে-কঠিনে মেলানো বিচিত্র এই ভয় দেখানোর পদ্ধতি বিচিত্রতর হল পৃথিবীতে যখন কৃষিযুগ এল, পশুপালনের ছন্দ মানুষের করায়ত্ত হল। কিন্তু তখনো অবিজিত নিয়তির সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া বাকি। কখন বৃষ্টি হবে, শস্যকে সত্বর করবে, কেউ জানে না। তাই সে শুরু করে দিল ঐন্দ্রজালিক আয়োজন, সাঙ্গীতিক নৃত্যনাট্য। সেই নৃত্যনাট্যেও অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ল মুখোশ। এবং আশ্চর্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে দিন সরল কৃষক অভিনেতা ব্যবহার করেছিল মৃত পুরুষের প্রেতাত্মার প্রতিকৃতি অথবা জন্তুর মুখোশ।

অতঃপর কিন্তু মুখোশের উপযোগিতা, অন্তত সাময়িক ভাবে, প্রাহসনিক রূপকল্পের অন্তর্গত হয়ে সভ্য মানুষের চিত্তবিনোদনে প্রমাণিত হয়েছে। এ দিক থেকে দেখলে mask-শব্দটির পূর্বসূত্র:

Maskharat (Arabic)—maschera (Italian)—masque (maske, বা mask)।

আরব্য উৎসে প্রায় বিদূষক, অথবা রঙ্গাভিনেতার দৃশ্যব্যঞ্জনা প্রকট হলেও ষোড়শ শতকের ইটালিতে তার অর্থ দাঁড়াল মুখের আব্রু। এরই মধ্যে ঐ কৌতুকী পরিবেশ-রচনার সঙ্গে-সঙ্গে ছদ্মবেশের তাৎপর্যটি যে ইংরেজিতে চলে এসেছিল, লিডগেটের 'mummings by way of disguisings'-প্রভৃতি বিনোদ-কথিকার নামেই তার প্রমাণ। এমনি করেই আরব্য 'মস্‌খরাহ্‌' একদিন মিল্টনের 'Comus'এ এসে সম্ভ্রান্ত, শুদ্ধ একটি ভঙ্গিতে আশ্রিত হল। যা ছিল হসন্তিকা, হয়ে উঠল শিল্পরীতি।[৪]

গবেষণার বিষয়, আধুনিক কবিতায় এই বিমিশ্র উত্তরাধিকার কিভাবে কাজ করেছে। নখাগ্র পর্যন্ত তীব্র সচেতন আধুনিক কবিও মুখোশের পক্ষপাতী। ইয়েট্‌স্‌ কি জাপানি নো-নাটক থেকে মুখোশের রহস্য শিখেছিলেন? নো-নাটকে প্রধানত নায়ক এবং তার সহানুগামীদের মধ্যেই মুখোশের ব্যবহার সীমাবদ্ধ। তা থেকে একটা সিদ্ধান্তে আসা কঠিন নয়। মুখোশ-ব্যবহারের সঙ্গে কোথাও একটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বোধ রয়ে গেছে। এই স্বাতন্ত্র্য এক হিসেবে প্রাধান্যসূচক। আদিম যুগের মানুষ যত অজস্র রকমের মুখোশ ধারণ করেছিল সেগুলি ওই স্বাতন্ত্র্যের প্রাধান্যে উজ্জ্বল। কখনো প্রতিপক্ষকে বিপর্যস্ত করবার জন্য রঙচঙে মুখোশ, কখনো-বা নিহত প্রতিপক্ষের চিত্রিত করোটি—দুয়েরই চল ছিল। বিজয়ী এবং বিজিত, পরাক্রান্ত এবং পরাভূত—দুটি ভূমিকাই মৃত্যুর মূল্যে অসামান্য, এবং প্রাত্যহিকের গৌণতা থেকে অনেক বড মানের।

আধুনিক কবি বিজয়ী এবং বিজিত, দুটি ভূমিকাই গ্রহণ করেছেন। স্বনির্বাসিত, প্রবাসী তিনি, পরিপার্শ্বের উপরে তাঁর কোনো দাবিদাওয়া নেই। নিঃশর্ত হয়ে প্রকৃতি অথবা প্রতিপক্ষের মতো পরিপার্শ্বকে যদি তিনি দেখেন—যা আজকের পরিচ্ছন্ন, একাকী নাগরিকের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক—তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু সমস্যাটি আরো গভীরে গিয়েছে। ইয়েট্‌সের ভাষায় বলতে গেলে, আধুনিক শিল্পী-মাত্রকেই মুখচ্ছদ ব্যবহার করতে হবে। কেন না, তিনি সর্বাঙ্গীণ এবং দুরূহ একটি সত্যবস্তুকে খুঁজছেন। এবং সেই সত্যকে পাওয়া যাবে মানুষের প্রোথিত চেতনা বা মগ্নচৈতন্যের গূঢ়তলচারিতায় নয়, অথবা তার উলটো অর্থাৎ প্রকাশ্য মুখোশেও নয়—দুয়ের সংগ্রামে। তাই প্রত্যেক শিল্পীকেই এমন এক-ধরনের মুখোশ পরতে হবে যা তাঁর প্রবণতার আমেরু বিপরীতধর্মী। আত্মলীন শিল্পী এঁটে নেবেন কর্মী-পুরুষের মুখচ্ছদ, আর তা হলেই স্বভাবী আত্মময়তা ও অভিনীত বহির্মুখিতার নাটকীয় টানা-পোড়েনের মধ্য দিয়ে সত্যসন্ধানের প্রক্রিয়াটি জীবন্ত ও বিচিত্রিত হয়ে উঠবে।

প্রাচীন বাঙলা কবিতায় শিল্পীর একটি অপরূপ ছদ্মবেশ দেখতে পাওয়া যায়।

৪ সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রীক নাটকের কাল থেকেই হয়তো মুখোশ ব্যবহারের প্রথার কথা বর্ণিত হবে। কিন্তু এখানে কবির মুখচ্ছদ ব্যবহারের নিহিত অনুষঙ্গ অনুমিত হয়েছে।

বিশেষত বৈষ্ণব পদাবলীতে। কবি তাঁর আকাঙ্ক্ষারক্তিম অস্মিতাকে যৌথ রূপকে রূপান্তরিত করেছেন। মনে হতে পারে কবি ও পাঠক একই বাসনার অংশীদার। তুলিয়ে দেখলে অবশ্য চোখে পড়বে, আত্মপ্রকাশে নানা ভাবে নির্জিত, অথচ সত্তাপ্রবণ কবি সমবায়ী হয়েও অভিজাত। অভিজাত, কেন না, অ-সনাক্ত।

কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কীর্তিমান্ কবিরা সবাই নিজেদের সনাক্ত হতে দিয়েছিলেন এই মনে করে যে তা হলে পরিবেশকে শুধরে নেওয়া যাবে। শিল্পী-সংস্কারক হওয়ার প্রলোভনে তাঁদের শিল্পকাজ খর্ব ও ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, কিন্তু লোভ সংবরণ অসাধ্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রে এসে স্বাপ্নিক সংস্কারকের এই আস্পৃহা অবশ্যমান্য নিয়তি হয়ে দাঁড়াল। বঙ্কিম তাঁর বন্ধুকে লেখা একটি পত্রে এই ট্র্যাজেডি আশ্চর্য ভাবে বর্ণনা করেছেন :

> Malicious fortune has made me a sort of Jack of all trades and I can turn up any kind of work, from transcendental metaphysics to verse-making···

অতীন্দ্রিয় পরাতত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে কবিতা লেখা পর্যন্ত ব্যাপ্ত সঞ্চারপথে সামাজিক সন্দর্ভও তাঁকে প্রচুর লিখতে হয়েছিল। মধুসূদন 'বীরাঙ্গনা' রচনা করে শতাব্দীর কাছে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কিন্তু আবেগময় হৃদয়ের উপরে যে-বর্ম তিনি পরেছিলেন, সেটি সমাজচেতনার নয়, ধ্রুপদী শিল্পচেতনার। কিন্তু বিহারীলাল ? আবেগসর্বস্ব দিব্যোন্মাদ বিহারীলালকেও সহানুভূতির সারার্থবোধিনী লিখতে হয়েছিল : 'বঙ্গসুন্দরী'। বরং তাঁর কাছে শিক্ষার্থী, বুদ্ধিমান্ অক্ষয়কুমার বড়াল যাবতীয় মাত্রাতিরেক সত্ত্বেও—একটি সুদক্ষ নৈঃসঙ্গের অহমিকাব্যূহ গড়ে নিয়েছিলেন বলেই লিখতে পেরেছিলেন :

অবস্থার শিখরে উঠিয়া,
অবস্থার গহ্বরে লুটিয়া,
বুঝিয়াছি আমি যাহা, তর্কে কি বুঝাব তাহা
প্রকৃতির জড়পিণ্ড তুমি—
বুঝাইব কেমনে তোমারে ?
জীবন নহে তো সমভূমি—
দেখিয়া লইবে একেবারে।

অক্ষয়কুমারের সেদিনকার সতীর্থ রবীন্দ্রনাথ তখনো হৃদয়ের উচ্চারণে কিছুটা বেপরোয়া ছিলেন। অবশেষে শীলিত আবেগ নিয়ে যখন কবিকর্মে ব্যাপৃত হলেন, তিনি কি এক রকমের mask খোঁজেন নি ? কবি ও কর্মীর বিরোধাভাস তিনি অনায়াসেই

মানিয়ে নিয়েছিলেন, অংশত বিগত শতকের ধারারক্ষী হিসেবে, অংশত নৈর্ব্যক্তিক সৌজন্যময়তায়। তাঁর এই দ্বৈতসত্তা প্রায়শই আত্মসাম্যে বিধৃত হয়েছে। কিন্তু (ছবিতে তাঁর অপাবৃত উৎকাঙ্ক্ষার কথা না তুলেও বলা যায়), সেই আত্মসাম্য বিচলিতও হয়েছে অনেক বার। শেষ মুহূর্তে যখন বললেন তিনি শুধু কবি, আর-কিছু নন, নিঃসঙ্কোচ একমুখিতা অভিব্যক্ত হল। কিন্তু পুরোপুরি mask ব্যবহার তাঁর পক্ষে কি কখনো সম্ভব ছিল? শেষের দিকে আতিথেয় শেলিকে সরিয়ে রেখে সংরুদ্ধ কীট্স্‌কেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। নাটকের মুখ্য অভিনেতা হিসেবে সেই মুহূর্তে নিজেকে কল্পনাও করেছেন। যে কারণে কীট্স্‌ শেলিকে সহযোগ দিয়েছিলেন সেই রকম শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র মহামানবতাবোধের সম্প্রচারক ঠাউরে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে ইয়েট্স্‌ মনে-মনে ইতিপূর্বেই বহুদূরে সরে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ-পর্যায়ের কবিতা দেখলে তাঁর কী ধারণা হত জানি না। শুধু এটুকু বলা সম্ভব, রবীন্দ্রনাথ যে-মুহূর্তে নিপুণ মুখচ্ছদ ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন, মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষার্থী আধুনিক কবিরা কর্মযোগী রবীন্দ্রনাথকে অগ্রাহ্য করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের বিজ্ঞাপিত সেই অসন্তোষের তরঙ্গ থিতিয়ে এলে দেখা গেল এঁরা অনেকেই কর্মযোগের দর্শনে তাঁদের ভরসা স্থাপন করেছেন। অমিয় চক্রবর্তীর গান্ধীবাদ, সুধীন্দ্রনাথের চূড়ান্তপন্থী মানবতাবাদ, বিষ্ণু দে বা সমর সেনের কর্ষিত মার্ক্স্‌বাদ, প্রেমেন্দ্র মিত্রের হুইট্‌ম্যান-নজরুলস্পৃষ্ট মহাযানী গণচর্যা—নিছক থিয়োরির খাতিরে এ সব নিষ্পন্ন হয়েছিল, এ কথা বলব না। তবু এঁদের কারো ভরকেন্দ্রই ওই রাজনৈতিক-সামাজিক দর্শনপদ্ধতিগুলিতেই, এ কথাও বিশ্বাস্য নয়।[৫] অমিয় চক্রবর্তী মহাত্মা গান্ধী থেকে অ্যালবার্ট শোয়াইৎজার পর্যন্ত পরিক্রমা করেও প্রতীকশোভন আত্মগোপনতায় অভ্যস্ত। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার অন্তঃশরীরে তাঁর

৫ নন্দনতত্ত্ববিৎ আবু সয়ীদ আইয়ুব মার্ক্স্‌বাদের কাব্যিক প্রয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন: Can a contemporary poet with all the sophistication and scepticism that is not only in his brain but has gone deep into his blood, adopt a detai'ed all-embracing—far too all-embracing—system of thought like Marxism, and make great poetry out of it, as Dante did out of Thomist philosophy? 'Tendencies In Modern Bengali Poetry', Longman's Miscellany 1943. সমস্যাটিকে Mask-এর সমস্যার দিক থেকে দেখলে প্রশ্নপ্রণেতা নিশ্চয় একটা সমাধান পেতেন। 'প্রাকৃত' (naive) কবি ও 'ব্যক্তিপ্রকৃতির' (sentimental) কবির মধ্যে তফাৎ বোঝাতে গিয়ে শিলার দেখিয়েছেন প্রাকৃত কবি প্রকৃতিসর্বস্ব, ব্যক্তিপ্রকৃতির কবি প্রকৃতিকে ব্যবহার করেন। উপস্থিত প্রসঙ্গে বলা যায়, প্রাচীন কবি যেখানে ধর্ম বা রাজনীতির আশ্রয় নিয়েছেন, আধুনিক কবি উদ্দীপন-বিভাব হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এ দিক দিয়ে দেখলে সুকান্ত ভট্টাচার্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের চেয়ে অনাধুনিক।

অনিকেত স্বৈরবৃত্ততা অপ্রকট নয়। বিষ্ণু দে-র মার্ক্‌সীয় মনন এবং একাকিত্বের বোধ আজও কি মসৃণ দ্বৈরথের স্তর ছাড়িয়ে কবিতার অবচেতনে সুসমঞ্জস হয়েছে? সপ্রতিভ নাগরিকতাই কি সমর সেনের সর্বস্ব নয়? এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের লোকায়ত জীবনবাদ কি তাঁর রোম্যাণ্টিকতারই ছদ্মবেশী রূপভেদ নয়?

প্রকৃত প্রস্তাবে, স্বভাবের সহজাত রোম্যাণ্টিকতাকে লুকিয়ে রাখাই একদা আধুনিকতা বলে গৃহীত হয়েছিল। প্রমথ চৌধুরী সেই মক্‌শো-করা আধুনিকতার রীতিচতুর ধারক ছিলেন। কিন্তু তাঁর আধুনিকতা তথা অ-রোম্যাণ্টিকতা যে বহুলাংশে প্রদর্শিত সে কথা পুনর্বিচারে আজ স্বচ্ছ। তাঁর কবিতাবলীর সচেতন পাঠক আজ লক্ষ্য করবেন যে 'বিশ্লিষ্ট বোধ'এর (dissociation of sensibility) তাগিদে তিনি অগ্রসর হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁর কবিতায় স্বপ্ন ও সত্যের যুগলমিলন সংঘটিত। তাঁর অনেকগুলি সনেটে নিরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস এবং একাধিক ট্রিওলেটে রোম্যাণ্টিক উৎকণ্ঠা অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁর একটি ট্রিওলেটে একটুখানি প্রার্থনা শ্লেষশূন্য :

কত রঙে কত রূপ ধরে
ছবি যেন কবিকল্পনা।
বুক মোর আছে মেঘে ভরে
তাহে সখি দাও আল্‌পনা।

তা হলে কি এমন অনুমান করা সম্ভব হবে, প্রমথ চৌধুরী সংস্কারকের মুখোশ পরেছিলেন? সে কথা বললে নিশ্চয় অতিকথন হবে। তবু এটা বললে কি অন্যায় হবে, হৃদয় এবং বুদ্ধি, ব্যক্তিগত আবেগ এবং ব্যক্তিত্বের মধ্যে অন্তত দৃশ্যত একটি প্রাচীর তুলে তিনি পরবর্তী কবিদের ছদ্মবেশ পরতে সাহায্য করেছিলেন? যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কি প্রমথ চৌধুরীরই সাক্ষাৎ অনুব্রতী নন? এবং বীরবলকে যে-পরবর্তীরা অনেক দূর ছাড়িয়ে এসেছিলেন তাঁদের স্বভাবও কি অজ্ঞাত আধারে লুকোনো নয়? বিশ্বসাহিত্যে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ জাতীয়তাবোধের মাধ্যমে ইতিমধ্যে শিল্পীর আত্মগোপনতা ও আত্মপ্রকাশের পথ অবারিত হয়ে গিয়েছিল। ইতিহাসের বিধানে অনতিব্যবধানে পৃথিবীর প্রাচীন একান্নবর্তিতা ঘুচে গেলে এক-একটি দেশ নিজস্বতা অর্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এবং ঐতিহাসিক লক্ষ্য করলেন, দেশপ্রেমিক অথবা স্বদেশবিস্মৃত শিল্পীরা জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে, স্বদেশীয় পুরাণ এবং বিষয়বস্তু অবলম্বন করে এসেছেন, নরওয়ের ইবসেন, সুইডিশ স্ট্রিণ্ডবর্গ, জর্মন গ্যেটে, রাশিয়ার টলস্টয় কি টুর্গেনিভ— এঁরা প্রত্যেকেই তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বজায় রেখেও স্বাদেশিকতার গরীয়ান্‌ পোশাক পরেছেন। স্বাদেশিকতা ও প্রাতিস্বিকতাকে একসঙ্গে অথবা একটির আবরণে আরেকটিকে, রক্ষা করার প্রবণতা পূর্বোক্ত শিল্পীদেরই দ্বারা প্রভাবিত কল্লোলীয় কবি

ও কথাশিল্পীদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। এর এপিক প্রমাণ গোকুলচন্দ্র নাগের 'পথিক'। এই উপন্যাসে অবচ্ছিন্ন ব্যক্তির কাছে স্বদেশ-ভাবনা বারংবার এসেছে যা চরিত্রের ঐক্যসূত্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু ব্যক্তি ও স্বদেশ, কবি ও কর্মীর কোনো অন্তর্লীন যোগসূত্র কি কল্লোলীয় লেখকদের সম্পাদ্য ছিল?

জীবনানন্দেই সেই যোগসূত্র স্থাপিত হল। মুখচ্ছদের ব্যবহারে তিনি কবিকর্মের ভিতর থেকে মনীষান্বিত কর্মযোগের একটি ঈপ্সিত আয়তন রচনা করতে পেরেছেন। জীবনানন্দ ক্রমশই সত্যের কেন্দ্রে ধাবমান হয়েছেন এবং সভ্যতার ভয়ঙ্কর সন্ধিক্ষণকে কবিতায় অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে একক ও সামাজিক মানুষের ভবিষ্যস্বর্গের ভাবিকথনে আশ্বস্ত হয়েছেন :

> সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ,
> এ বাতাস কি পরম সূর্যকরোজ্জ্বল,
> প্রায় ততোদূর ভালো মানবসমাজ।

সংস্কারকের মুখোশ জীবনানন্দের মুখে চেপে বসে নি। কিন্তু ব্যক্তির ঐশ্বর্যশালী হৃদয় থেকে নব্য-পুরাণ রচনা করে তিনি মহাজাতিক একটি সত্যের চেতনায় উপনীত হতে পেরেছিলেন। ঐন্দ্রজালিকের ক্ষমতাকে বিকৃত না করে তাকে সংস্কারকের ক্ষমতায় পরিণত করতে চাওয়া তাঁর অভীপ্সা ছিল। ইয়েট্‌স্ বলেছিলেন :

> I, that my native scenery might find imaginary inhabitants, half-planned a new method and a new culture.

বিশ শতকের বাঙলাদেশের শ্রীহীন মুখাবয়বে জীবনানন্দও একটি অপূর্ব মুখচ্ছদ আরোপ করেছেন। সে জন্য আত্মপুরাণকে নির্মমভাবে সঙ্কুচিত করতে হয় নি তাঁকে। জীবনানন্দ একাকিত্ব এবং ঐতিহ্যকে যে ভাবে মিলিয়ে দিয়েছিলেন, ভারতীয় শ্রেয়োভাবনায় সিঞ্চিত হয়ে তা নিশ্চয় সর্বায়ত একটি ঐক্যময়তা পেয়েছিল। তাঁর কবিতায় ব্যক্তি ও স্বদেশ একই সঙ্গে মুখচ্ছদ পরে মৃত্যু নামক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয়ীর ভূমিকা নিয়েছে।

১৩

সাহিত্য পরিভাষা

-রঞ্জিত সিংহ

কোনো বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞানের বিষয়কে সঞ্চারক্ষম করে তুলবার অভিপ্রায়ে পরিভাষা সৃষ্টি আবশ্যিক ঠেকে। 'পরিভাষা'র আভিধানিক অর্থ: বিশেষ অর্থবোধক শব্দ,—যে সব শব্দের সন্ধান সাধারণ অভিধানে নাও মিলতে পারে। যেমন, রসায়ন শাস্ত্রের পরিভাষা 'ক্ষারলবণ ('basic salt'-অর্থে) অভিধানের সারবন্দি শব্দমালার মধ্যে না পাওয়া গেলে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কারণ সাধারণ-জ্ঞানের পরিধিতে ওই শব্দের প্রয়োজনীয়তা খুব জরুরি নয়। ওই শব্দের আবিষ্ক্রিয়ার মূল্য বোঝেন একমাত্র রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ। কিছু অধিকারীর কাছে ওই শাস্ত্রের কোনো বিশেষ প্রসঙ্গ পৌঁছে দেবার দায়িত্বেই শাস্ত্রজ্ঞ ওই জাতীয় শব্দের সহায়তা মেনে নেবেন। অপর পক্ষে পরিভাষার প্রয়োজনে সাধারণ অর্থপ্রধান শব্দও অনেক সময় বিশিষ্ট অর্থে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। যেমন, দার্শনিক পরিভাষায় 'সামান্য' ('General'-অর্থে) শব্দ সাধারণ অর্থে স্বল্পতাবোধক। এইখানে বিপত্তিরও সৃষ্টি হয়। প্রায়োগিক ('technical'-অর্থে) শাস্ত্রের দুরূহতার অন্যতম কারণও এই। এই সব বিপত্তির অবকাশ সত্ত্বেও রাজশেখর বসুর মতো একজন বহুদর্শী বলেছিলেন, 'মাতৃভাষায় প্রয়োগের উপযুক্ত পারভাষা যতদিন প্রতিষ্ঠালাভ না করবে ততদিন বাহন পঙ্গু থাকবে। অতএব বাঙলা পরিভাষার প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক।'

সাহিত্যপাঠের অধিকারীভেদ সম্পর্কে সব দেশেই বহু পরস্পরবিরোধী মন্তব্য জমা হয়ে উঠেছে। তবু 'রসিক' ও 'রসজ্ঞ'—এই দুই শব্দদ্বয়ের নিহিত সূক্ষ্ম প্রভেদ সম্পর্কে আজ হয়তো অনেকেই অবহিত। প্রথমজনের রসাস্বাদন যেখানে নির্বাচন-নিরপেক্ষ, দ্বিতীয়জনের রসগ্রহণে নির্বাচনই একমাত্র পন্থা। ফলে সাহিত্যের সঞ্চারসমস্যাকে ('communication problem'-অর্থে) কেন্দ্র করে সাহিত্যের মূল শাখাপ্রশাখার পাশাপাশি উপধারার ('sub-section'-অর্থে) মতো সমালোচনা সাহিত্য জন্ম নিয়েছে অ্যারিস্টটলের আমল থেকে। বাঙলা সমালোচনার বয়সকালও স্বল্প নয়—ঈশ্বরগুপ্তের রচনায় তার আদিরূপ পাওয়া যায়। এই বিষয়ের যিনি অধিকারী এবং এই বিষয় উপলব্ধির জন্য যাঁর মানসিক ক্ষেত্র প্রস্তুত বা যিনি প্রস্তুত করতে আগ্রহী তাঁদের দুজনের মধ্যে ভাবনা আদানপ্রদানের সহায়ক হিসেবেই এই উপসাহিত্যের উৎপত্তি। যদিও সাহিত্যের রসাস্বাদ শুধুমাত্র উপলব্ধিযোগেই গ্রহণীয়, তবু সেই সাহিত্যোৎকর্ষের

উপলব্ধিকে পৌঁছে দিয়ে অপরের রুচিকে আরো শিক্ষিত করে তুলবার দায়দায়িত্ব কোনো ব্যক্তির উপর বর্তালে তাঁকে যুক্তিগ্রাহ্য, বিশ্লেষণধর্মী ভাষায় বিষয়টির উপস্থাপনা করতে হয়। এ কাজে সেই বিশেষ অর্থবোধক শব্দের বিশেষ প্রয়োজন। অর্থাৎ পরিভাষা।

উদাহরণের সাহায্যে কথাটি বিশদ করা যেতে পারে—

"When lovely woman stoops to folly and
Paces about her room again, alone,
She smoothes her hair with automatic hand
And puts a record on the gramophone."

'The Wast Land'-কাব্যমালার উদ্ধৃত অংশের পর্যালোচনা সূত্রে সমালোচক হয়তো এই ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন: এখানে যে চরিত্রের উপস্থাপনা করা হয়েছে এবং তার দ্বারা যে ঘটনাটি সংঘটিত হল, 'The Waste Land'-কাব্যমালার আত্যন্তে সে চরিত্র বা ঘটনার উৎস ও পরিণতির পারম্পর্য রক্ষিত হয় নি। এই পংক্তি-চতুষ্টয়ের আগে ও পরে যে সব ঘটনার উল্লেখ আছে তা বিচ্ছিন্ন হয়েও যে কারণে অখণ্ড রসসত্তা ('organic whole'-অর্থে), তার মূলে রয়েছে কবির অনুভূতিপুঞ্জের ঐক্যবোধ যার পারবশ্যে বিচ্ছিন্ন বিষয় পরস্পরসম্বন্ধযুক্ত হয়ে যায়। এই জাতীয় বিশ্লেষণের কাজে সমালোচক যে দুরূহতার আশ্রয় নেন তা ওই পরিভাষা ব্যবহারের কারণেই। ইংরেজিতে যে যে কাব্যলক্ষণকে এলিয়টী পরিভাষায় 'dissociation of sensibility', 'unified sensibility', 'objective correlative', বা 'speech rhythm' বলা হয়, বাঙলা ভাষাভাষীর কাছে সেই সেই ধারণাগুলি যথাক্রমে 'বিভক্ত বোধ', 'অনুভূতি-পুঞ্জের ঐক্যবোধ', 'পরস্পরসম্বন্ধযুক্ত বিষয়াশ্রয়', 'কথ্যছন্দ' বা ওই জাতীয় কোনো নতুন শব্দে পরিভাষিত করতে লক্ষ্য করা গেছে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বুদ্ধদেব বসুর আগে বাঙলা সাহিত্য-সমালোচনা ঠিক বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান অর্থে সম্ভবত গৃহীত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর কথা মনে রেখেও এ মন্তব্য করা চলে। পক্ষান্তরে আলোচ্য মন্তব্যের অনুসিদ্ধান্ত ('corollary'-অর্থে) হিসেবেই বলা যায়, 'আধুনিক কাব্য' ("সাহিত্যের পথে' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্ভূত)-প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ রসবিশ্লেষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন বলেই তাঁর 'বিহারীলাল' বা 'মেঘদূত'-বিষয়ক প্রবন্ধাদি থেকে মর্জি ও রীতিগত ('style'-অর্থে) ভাবে তা সম্পূর্ণ পৃথক্। এখানে রবীন্দ্রনাথ অনেক বেশি যুক্তিনিষ্ঠ। ফলে এ রচনার ভাষাতেও পারিভাষিকতার স্পর্শ লেগেছে। রসবিশ্লেষণের দায়িত্বেই রবীন্দ্রনাথকে এই সময় বহু শব্দ তৈরি করতে হয়েছে। যেমন, 'impersonal'-অর্থে নৈর্ব্যক্তিক, 'aesthetics'-অর্থে নন্দনতত্ত্ব, 'free-verse'-অর্থে মুক্তছন্দ, 'prose rhythm'-অর্থে গদ্য-ছন্দ, 'abstract'-অর্থে নির্বস্তুক,

'active'-অর্থে সকারী, 'passive'-অর্থে 'অকারী', 'anarchy'-অর্থে, নৈরাজ্য, 'compulsory'-অর্থে আবশ্যিক। এর সব কয়টি শব্দ উপরে উল্লেখিত প্রবন্ধভুক্ত নয়। তবে মোটামুটি ওই সময় থেকেই সাহিত্যের আদর্শ ও পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে উপমা-উৎপ্রেক্ষার কাব্যময় গদ্য ছেড়ে, যুক্তিপ্রধান গদ্যের আশ্রয় নিতে হয় তাঁকে। এমন কি 'artificer' শব্দের বাঙলা পরিভাষা 'রূপকার' আজকাল বহুব্যবহৃত বটে, কিন্তু এই শব্দটিও যে রবীন্দ্র-কৃত সে কথা আমরা কয়জন জানি? তানপ্রধান ছন্দের লক্ষণ বোঝাতে গিয়ে, ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় যখন তানপ্রধানের 'স্থিতিস্থাপকতা' গুণের দিকে আমাদের শ্রুতিকে আকর্ষণ করেন, তখন হযতো ওই বিশেষ পরিভাষার আবিষ্কর্তা রবীন্দ্রনাথকে, 'elasticity'-অর্থে যিনি শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন তাঁকে মনে রাখি না। যাই হোক এ কথা স্বীকার্য, বিশেষ জ্ঞানের সংক্ষেপার্থ-শব্দ ভাবতে গিয়ে আন্তরিক কারণে নয়, পরস্মৈপদী ভাবনায় লেখক অনেক সময় দুরূহ হয়ে ওঠেন। রসজ্ঞান রসপিপাসুর মনে সঞ্চারের দায়িত্ব আছে বলেই শব্দ তৈরি ছাড়া সমালোচকের গত্যন্তর নেই। রসবিশ্লেষণধর্মী সাহিত্যের নিকটতম পরিভাষার ব্যবহারই সুধীন্দ্রনাথ-লিখিত সমালোচনা দুরূহ মনে হওয়ার অন্যতম কারণ। ফলে 'art for art's sake'-অর্থে সুধীন্দ্রনাথ যখন 'কলাকৈবল্যবাদ' শব্দটি ব্যবহার করেন বা হর্বর্ট রীড্-কথিত 'personality' বা 'character' এই শব্দদ্বয়কে যখন যথাক্রমে 'ব্যক্তিস্বরূপ' ও 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য—এই দুই শব্দে অনুবাদ করার চেষ্টা করেন—তখন অনভ্যস্ত পাঠক নিশ্চয়ই দ্বিধাকম্পিত। অথবা সুধীন্দ্রনাথ যখন বলেন 'ধ্রুপদী ঢঙ বর্তমান কাব্যের ছদ্মবেশমাত্র', তখন তা শুধু পরিভাষার ব্যবহারের ফলেই অনধিকারী বা অনভ্যস্ত পাঠকের কাছে দুরূহ। 'Classical'-অর্থে ধ্রুপদী শব্দের প্রযোগ জানা থাকলে এই পংক্তির সেই দুরূহতাটুকুও কেটে যায। রসবিশ্লেষণের খাতিরেই 'image' শব্দের পরিভাষা নিয়ে সুধীন্দ্রনাথকে ভাবিত হতে হয়েছিল। এই ভাবনায় যিনি সহোদর, সুধীন্দ্রনাথ-ব্যবহৃত 'চিত্রকল্প' শব্দেব নিহিত অর্থ তাঁর মনে নিশ্চয়ই এসে পৌঁছবে। চিত্রকল্প চিত্র নয়। উপমা বা উৎপ্রেক্ষার মতো তুলনীয় বিষয়-বিষয়ীর ভেদরেখা সেখানে অনুপস্থিত। শুধুমাত্র 'বাক্প্রতিমা' বললে শব্দনির্মিত চিত্র বা মূর্তি—এই ধারণা মনে আসে। কিন্তু 'চিত্রকল্প' শব্দের ব্যঞ্জনা চিত্রের বাইরে এবং চিত্রের গভীরে। বিভিন্ন অনুপুঙ্খসমেত সংহত কল্পনা বা ভাবনাবলয় যখন চিত্রমুখে দেখা দেয়, চিত্রকল্পের জন্মলগ্ন তখনই। এই সব কারণে সুধীন্দ্রনাথ যখন বলেন, '...স্বপ্লাদ্য প্রতীকের মধ্যেই উৎকৃষ্ট কবিতার চিত্রকল্প দ্বন্দ্বসমাসের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য'—তখন এই শব্দটির প্রয়োগগত বিশেষ উপযুক্ততা ধরা পড়ে। ফলে যখন 'symbolic' শব্দের বাঙলা পরিভাষায় প্রয়োজন ঘটল তখন বাঙলা শব্দকোষে ইতিপূর্বে গৃহীত 'প্রতীক' শব্দটিকে একটু বেঁকিয়ে-

চুরিয়ে সুধীন্দ্রনাথ বললেন—'ফরাসী প্রতীকীরা য়েটস-এর থেকে পৃথক।' কীট্স্‌কথিত 'negative capability'র বাঙলা পরিভাষা সুধীন্দ্রনাথ দত্তই প্রথম উদ্ভাবন করেন—'নৈরাত্ম্যসিদ্ধি'। অবশ্য একজন সাম্প্রতিক সমালোচককে ওই শব্দটি 'অনির্দেশী বিভূতি' —এই গ্রহণযোগ্য পরিভাষায় ব্যক্ত করতে দেখেছি। অনুরূপ স্বতঃসিদ্ধ বাক্য 'poetry is written with words' বাঙলা ভাষায় 'কাব্য শব্দোপায়ী'—এই শব্দবন্ধে পরিভাষিত করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। বুদ্ধদেব-ব্যবহৃত 'vision'-অর্থে পরাদৃষ্টি (একজন সাম্প্রতিক সমালোচক 'vision'-অর্থে 'বীক্ষা' এই উল্লেখ্য পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন), 'temporary suspension of disbelief'-অর্থে তৎকালীন নাস্তিক্যলোপ, 'interpretation'-অর্থে অন্তরাখ্যান, 'jargon'-অর্থে সন্ধ্যাভাষা, 'versification'-অর্থে পদ্যীকরণ, 'technique'-অর্থে প্রকরণ, 'lyricism'-অর্থে গীতলতা, 'confused'-অর্থে 'বিপ্রলাপিত'—নিশ্চয়ই সুধীন্দ্রনাথ-ব্যবহৃত 'catharsis'-অর্থে চিত্তশুদ্ধি, 'content'-অর্থে 'আধেয়', 'conventional'-অর্থে প্রথাসিদ্ধ, 'elemental'-অর্থে তন্মাত্রিক, শব্দাবলির মতোই অমোঘ অথচ দুরূহ। 'Imagination' শব্দের বাঙলা পরিভাষা 'কল্পনা' আমাদের শব্দকোষে গৃহীত শব্দ বটে কিন্তু বুদ্ধদেব-কৃত 'আকল্পনা' শব্দের পূর্বে 'fancy' এই পরিভাষাকে বাঙলায় রূপ দেওয়া হয় নি। এই শাস্ত্রের বিজ্ঞানীর কাছে যে কারণে এই শব্দাবলি অমোঘ, একই কারণে এই শাস্ত্রের বহির্ভূত জনসমুদ্রের কাছে এই সব শব্দ দুরূহ। তাই 'inscape'-অর্থে অন্তঃসুষমা, 'instress'-অর্থে অন্তঃস্পন্দ, 'counter rhythm'-অর্থে প্রতিস্পন্দন (হপ্‌কিন্সকৃত এই তিনটি শব্দ সমালোচনার জগতে স্বীকৃত ও গৃহীত), 'assonance'-অর্থে স্বরসংগতি বা স্বরানুপ্রাস, 'dissonance' অর্থে স্বরবিরোধ, 'auditory imagination'-অর্থে শ্রুতিকল্পনা বা 'visual imagination'-অর্থে চিত্রকল্পনা, 'objective poet'-অর্থে নৈরাত্ম্যপন্থী কবি, 'dramatic poetry'-অর্থে নাট্যগুণধর্মী কবিতা, 'dynamic classicism'-অর্থে গতিময় নৈরাত্ম্যতা- ইত্যাদি পরিভাষা যদি আজকের রসসন্ধানী ব্যবহার করেন তবে তাঁর দুরূহতা বাঙলায় রসবিশ্লেষণের উপায়ানুসন্ধানেরই ফল। এই প্রয়াসকে নিরুৎসাহ করলে হয়তো এই বিজ্ঞানের সম্ভাব্যতাকে ('probability'-অর্থে বুদ্ধদেব কর্তৃক ব্যবহৃত) অঙ্কুরে বিনষ্ট করা হবে।

বাঙলা সমালোচনায় ইতিপূর্বে প্রস্তাবিত বা গৃহীত পরিভাষার একটি ছোট তালিকা দেওয়া গেল, যে শব্দগুলি সমালোচকের নিত্য ও অবশ্য প্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। যথা, 'Abnormal'-অর্থে অস্বভাবী, 'Abnormality'-অর্থে অস্বভাবিতা, 'Absolute' পরম, 'The Absolute'-অর্থে কৈবল্য বা নিরপেক্ষ, 'Academic' প্রাতিষ্ঠানিক, 'Accessory' আনুষঙ্গিক বা সংযোগী, 'Accident' আপতন, 'Accidental' আপতিক,

'Accuracy' যাথাযথ্য বা যাথাতথ্য, 'Achievement' অবদান, 'Acquirement' ব্যুৎপত্তি, 'Actual' প্রাকৃত, 'Adequate' যথাযোগ্য বা যথোচিত, 'Aesthetic' নান্দনিক, 'Allegory' রূপক, 'Allegorical' রূপকী, 'Ambiguous' দ্ব্যর্থক, 'Ambition' অভীপ্সা, 'Appraisal' মূল্যায়ন, 'Artistic treatment' শিল্প রূপায়ন, 'Assimilation' আত্তীকরণ, 'Association' ভাবানুষঙ্গ, 'Authority' প্রামাণ্য, 'Autobiographical' আত্মজৈবনিক, 'Average' গড়পড়তা, 'Axiom' স্বতঃসিদ্ধ, 'Balance' ভারসাম্য, 'Catastrophe' সর্বনাশী সমাপ্তি, 'Certitude' প্রমিতি, 'Chiaroscuro' আলো-আঁধারি, 'Chorus'-অর্থে বৈতালিক, 'Clarity' প্রাঞ্জলতা, 'Cliche' ধরতাই বুলি, 'Climax' পরমলক্ষণ বা শিখরসন্ধি, 'Combination' সন্নিপাত, 'Complex' বহুলাঙ্গ, 'Conflict' সংঘর্ষ বা সংঘট্ট, 'Stream of Consciousness' চেতনাস্রোত, 'Construction' নির্মিতি বা বাক্যবন্ধ, 'Self-contradictory' স্বতোবিরোধী, 'Canviction' নিশ্চিতি বা প্রতীতি, Co-ordination সন্নিবেশন, 'Coterie' দল বা গোষ্ঠী, 'Criticism of life' জীবনভাষ্য, 'Criterion' নিকষ, 'Cultivation' প্রকর্ষণ, 'Cynic' শুভনাস্তিক, 'Cynicism' শুভনাস্তিক্য, 'Decadence' অবক্ষয়, 'Degree' মাত্রা, 'Denouement' গ্রন্থিমোচন, 'Destructive' বৈনাশিক, 'Detachment' নির্লিপ্তি, 'Dimension' আয়তন, 'Divine Discontent' ঐশী অতৃপ্তি, 'Emotion recollected in tranquillity' নিস্তাপ স্মৃতির অন্তর রোমন্থন, 'Erotic' কামোদ, 'Esoteric' গোষ্ঠীগত, 'Essence' সারাৎসার, 'Extreme' প্রান্তিক, 'Extrovert' বহির্মুখ, 'Introvert' অন্তর্মুখ, 'Fallacy' হেত্বাভাস, 'Flexibility' নমনীয়তা, 'Genre' জাতি, 'Harmony' স্বরসঙ্গতি, 'Hypothesis' অনুমিতি বা উপপত্তি, 'Illusion প্রতিভাস, 'Immediate অব্যবহিত, 'Incidental' প্রাসঙ্গিক, 'Incompatible' বিসংবাদী, 'Incongruous' বিসংগত, 'Inconsistent' স্ববিবাদী, 'Individuality' প্রাতিস্বিকতা, 'Insular' দ্বৈপায়ন', 'Integrity' অবৈকল্য, 'Integrated' অবিকল, 'Intellect' মনীষা, 'Interesting' ঔৎসুক্যকর, 'Introspection' অনুব্যবসায়, 'Introspeective' অনুব্যবসায়ী, 'Legitimate' বৈধ, 'Folk-literature' লোকসাহিত্য, 'Court Literature' সভা বা দরবারি সাহিত্য, 'Local colour' স্থানবর্ণিমা, 'Mannerism' বা মুদ্রাদোষ, 'Mature' রসঘন, 'Maturity' রসঘনতা, '*Inherent* Meaning' শব্দার্থ, '*Adherent* Meaning' কাব্যার্থ, 'Mediocrity' মাধ্যমিকতা, 'Medium' প্রণালী বা বাহন বা মাধ্যম, 'Melodrama' অতিনাট্য, 'Mentality' চিত্তবৃত্তি, 'Mixed Metaphor' উপমা-সংকর, 'Immoral' দুর্নৈতিক, 'Amoral' অনৈতিক, 'Mystic' মরমী, 'Narrative

Poem' কাহিনী-কবিতা, 'Naive' গ্রাম্যসরল, 'Norm' মূলরূপ, 'Observation নিরীক্ষা, 'Passion' সংরাগ, 'Passionate' সংরক্ত, 'Pathetic fallacy' জীবজড়-ভেদ, 'Pattern' রূপকল্প, 'Thought Pattern' চিন্তাকল্প, 'Pedantic' বিপণ্ডিতী বা নকল পণ্ডিতী, 'Pictorial Quality' চিত্রলতা, 'Pioneer' প্রবর্তক বা নিয়ামক, 'Plagiarism' কুম্ভিলকতা, 'The Plastic Art' নম্যকলা, 'Platitude' চর্বিতচর্বণ, 'Platonic' প্লাতনিক, 'Poetic' কাব্যাত্ম, 'Poetic diction' পদ্যান্বয়, 'Posterity' মহাকাল, 'Practical' কাবয়িত্রী, 'Theoretical ভাবয়িত্রী, 'Precision' যাথার্থ্য, 'Prophet ভাবিকথক বা প্রবক্তা, Proportion' সমানুপাত, 'Proportionate' সমানুপাতিক, 'Well-proportioned' সুষম, 'Sense of Proportion' মাত্রাজ্ঞান, 'Punctuation' বিরামচিহ্ন, 'Realism' বস্তুতন্ত্র বা বস্তুবাদ, 'Objective' তন্ময়, 'Subjective' মন্ময়, 'Reflection' প্রতিবিম্বন, 'Religious' পাবিত্রিক, Retrospection' অনুচিন্তা, 'Sensual' ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, 'Sensuous' ইন্দ্রিয়ানুগত, 'Serious Writer' তন্নিষ্ঠ লেখক, 'High Seriousness' পরানিষ্ঠা, 'Sequence' পারম্পর্য, 'Significance' ব্যঞ্জনা, 'Sketchy' ঈষদঙ্কিত, 'Skill' নৈপুণ্য, 'Slang' অপভাষা, 'Standard' পরাদর্শ, 'Still life' জড়চিত্র, 'Style' রীতি, 'Substitute' প্রতিকল্প, 'Sur-realist' অতিবাস্তববাদী, 'Sympathetic' অনুকম্পায়ী, 'Synonymous', সমার্থক, 'Tendency' ঝোঁক বা উন্মুখতা, 'Tradition' ঐতিহ্য 'Transcendental' অতিগ বা লোকোত্তর, 'Texture' বিন্যাস বা বয়নকাক, 'Tautology' অনুলাপ, 'Dramatic Monologue' নাটকীয় মনোকথন, 'Monodrama' মনোনাট্য।

বাঙলা সমালোচনার পরিভাষার পরিমণ্ডল সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ পথিকৃতের সম্মান পেলেও এ কাজে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বুদ্ধদেব বসু। রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-পূর্ববর্তীদের সংশ্লেষণী ('Synthesis'-অর্থে) সমালোচনা থেকে সুধীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব বসুর বিশ্লেষণী ('analysis'-অর্থে) সমালোচনা নিছক রসাস্বাদ থেকে বিশেষজ্ঞানের দিকে যাত্রা, জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানের অধিক্ষেত্রে প্রবেশ। এই বিজ্ঞানের পরিপুষ্টির জন্যই বিশিষ্ট শব্দাবলির প্রয়োজন ঘটেছে এবং এর শ্রীবৃদ্ধিকল্পেই এই বিশিষ্ট সংকেতার্থ-শব্দ বা পরিভাষা আজ ক্রমশবর্ধিষ্ণু শব্দভাণ্ডারে রূপান্তর লাভ করেছে। এর মধ্যে যতটুকু দুরূহতা তা এই শব্দাবলির সঙ্গে শুধু পাঠকের পরিচয়েচ্ছার শ্রমেই ধীরে ধীরে কেটে যাবে। কিন্তু এই আবিষ্ক্রিয়ার অমোঘতার অবস্থান পাঠকের রসোপলব্ধির গভীর পরাদৃষ্টির মধ্যে।

১৪

আধুনিক বাঙলা কবিতা : অনুবাদচর্চা

অরুণকুমার ঘোষ

মার্কিন কবিশিরোমণি রবার্ট ফ্রস্ট কবিতার সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে জানিয়েছিলেন: কবিতা হচ্ছে, 'হোয়াট গেট্‌স লেফ্‌ট আউট্‌ ইন্‌ ট্রান্‌স্লেসন্‌'। এই নেতিভাবক বিবৃতি থেকে অনিবার্য ভাবেই নিষ্পাদিত হয় এই অনুধাবন যে, কবিতার অনুবাদ অসম্ভব। বস্তুত দুটি ভিন্‌দেশী ভাষার মধ্যে, সাধারণত সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভিত্তিগত ও ভাষার নিজস্ব রূপগত—এ দু প্রকারের বৈষম্য এক ভাষা থেকে আর এক ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রে, এক দুর্লঙ্ঘ্য সমস্যার প্রাচীর খাড়া করে। কিন্তু তবু কবিতার অনুবাদ হয়েই চলে, প্রায়শই একই কবিতার বিভিন্ন অনুবাদ একই ভাষায়, এবং অনুবাদে বিনীত ভাবে প্রচুর সময়, শ্রম, অভিনিবেশ নিয়োগ করেন কত সৃষ্টিশীল ধ্যানী কবি, বিদগ্ধ সাহিত্যপ্রেমী। ফলত কাব্যানুবাদের বিরুদ্ধে ধারালো সব যুক্তি উপস্থিত করা গেলেও শেষ পর্যন্ত তার তাৎপর্য ও উপযোগিতা স্বীকার করে নিতেই হয়। একটি ভাষার কবিতার নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার বা রক্তাল্পতা দূরীকরণে বিশেষ ভাবেই কার্যকর হতে পারে ওই ভাষায় ভিন্ন ভাষার কবিতা-অনুবাদের প্রচেষ্টা। এর ফলে তাতে সংযোজিত হতে পারে ভাব ও ভাবনার নতুন পদ্ধতি, বৃদ্ধি পেতে পারে তার রূপকল্পের ঐশ্বর্য ও উপস্থাপনের সামর্থ্য। আর অনুবাদক নিজে কবি হলে তাঁর কবিতার-প্রসঙ্গ ও প্রকরণ-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা ও বোধের ঋদ্ধিসাধনেও ওই প্রয়াস বিশেষ সহায়ক হতে পারে।

অনুবাদকের কাছ থেকে এটাই প্রত্যাশিত যে, সৃষ্টির স্বাধীনতা ও মূলের প্রতি বিশ্বস্ততা, এই আপাত-বিপ্রতীপ দাযকে তিনি একই বিন্দুতে মেলাতে চেষ্টা করবেন। এ ব্যাপারে কোনো একটির প্রতি অতিশযিত উন্মুখতা তাঁর থাকবে না। স্বাধীনতার যথেচ্ছ অপব্যবহারে যেমন তিনি একেবারে বিকৃত করবেন না মূলকে, তেমনি আক্ষরিক অনুবাদ নামক আলেয়ার বিভ্রমেও পথ হারিয়ে ফেলবেন না তিনি। বস্তুত আক্ষরিক অনুবাদ মূল কবিতার সামগ্রিক তাৎপর্যকে কখনোই ছুঁতে পারে না। বোদলেয়ারের *Tableaux parisiens*-এর অনুবাদের পরিচায়নসূত্রে অনুবাদকের কর্তব্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটি বিদ্যুৎ-চকিত সগর্ভ উক্তি করেছিলেন ওয়াল্‌টার বেঞ্জামিন: 'সমস্ত মহৎ রচনাই তাদের পঙ্‌ক্তিগুলির ফাঁকে ফাঁকে তাদের সম্ভাব্য অনুবাদকে কিছুটা ধরে রাখে।'[১]

১. দি টাস্ক অফ্‌ দি ট্রান্‌স্লেটর, ইলুমিনেশন্‌স।

কিন্তু, মূল কবিতার ভাববস্তু ও রূপশিল্পের অনন্য আস্বাদ ও কবির বিশিষ্ট মেজাজটি আভাসিত করে তুলে, অনুবাদ্য সৃষ্টির প্রতি যথাসম্ভব আনুগত্য রক্ষা এবং অনুবাদের স্বতন্ত্র কাব্যগৌরব সম্পর্কে সচেতনতা—অনুবাদকের অম্বিষ্ট হিসেবে এই দ্বিমুখী প্রবণতার সমপ্রাধান্যকে তত্ত্বের ক্ষেত্রে না হয় স্বীকার করে নেওয়া গেল, এমন কি এ কথাও কবুল করা গেল যে জ্ঞানত, অনুবাদের সততা এবং কবিতা হিসেবে তার উপভোগ্যতা তথা শিল্পসাফল্য, এ দুয়ের কোনোটিকেই ছাড়তে চাইবেন না অনুবাদক, যেহেতু এ দু দিককে মেলানোর অসাধ্যসাধনের রোমাঞ্চই তাঁকে প্রবলভাবে টানে অনুবাদের কাজে, কার্যক্ষেত্রে এ দু দিক সমান ভাবে বাঁচিয়ে সত্যিই কি চলতে পারেন তিনি ? অনুবাদটি পড়তে গিয়ে সজাগ পাঠকের অনিবার্যভাবে কি মনে হবে না যে অনুবাদকের অভিনিবেশ বা দক্ষতার পাল্লা এক দিকে অন্তত একটুও ঝুঁকে পড়েছে ? এ কথাও কি বলা যায় না যে, অনুবাদক নিজে কবি হলে অনুবাদে তাঁর স্বতন্ত্র কবিব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাবেই এবং সেই সূত্রেই দেখা দেবে তাঁর অনুবাদটিকে স্বতন্ত্র কবিতারূপে চরিতার্থ ক'রে তোলার দিকে অধিক নিবিষ্টতা ? আর কাব্যানুবাদে সবচেয়ে সার্থকভাবে ব্রতী তো একজন কবিই হতে পারেন। 'এন্‌কাউণ্টার' পত্রে তিনজন সাহিত্যসন্ধিৎসুর র‍্যাবোর কাব্যানুবাদসম্বন্ধীয় চিঠির উত্তর দিতে গিয়ে, প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে জানিয়েছিলেন রবার্ট লোয়েল : 'কেউ নিজে কবি না হলে তাঁর পক্ষে অপর ভাষার কবিতাকে নিজের ভাষায় কবিতা করে তোলা সম্ভব নয়।' কাব্যানুবাদে সিদ্ধিলাভ করতে হলে, প্রয়োজন বিনীত ধৈর্য ও শ্রমশীলতা, তন্নিষ্ঠ অভিনিবেশ, স্থিরলক্ষ্য সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায়, এক কথায়, মগ্নতা। আবার মহৎ কাব্যানুবাদে তো বটেই, যথার্থ সার্থক কাব্যানুবাদেও অনুবাদকের শুধু ভাষাজ্ঞান, শ্রমশীলতা, অভিনিবেশ থাকলেই চলে না, একটি সৃষ্টিক্ষম মনেরও অধিকারী হতে হয় তাঁকে, যেহেতু সেখানে চাই বোধ ও বুদ্ধির ফলদ সখ্য, বিশ্লেষণী মনন ও সৃষ্টিদীপ্ত কল্পনার নিরন্তর সহযোগ। আর এইখানেই অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে কাব্যানুবাদক হিসেবে কবির সর্বাধিক যোগ্যতার দাবি।

বাঙলা কাব্যানুবাদচর্চার ক্ষেত্রে ইংরেজি ও অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য ভাষার কবিতার অনুবাদের পাশাপাশি সংস্কৃত ও অন্যান্য প্রাচ্যভাষার কবিতার অনুবাদের আর একটা ধারাও বয়ে এসেছে। তবে বাঙলা কবিতায় মৌলিক সৃষ্টির মূলে ফলদ প্রবর্তনা ও শক্তি সঞ্চারে, সংস্কৃত ও অন্যান্য প্রাচ্য ভাষার কবিতার অনুবাদ-প্রয়াসের তুলনায় ইংরেজি ও অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য ভাষার কবিতার অনুবাদ-প্রয়াসের ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, বা অভিনিবেশযোগ্য। তাই প্রধানত সেদিকে দৃষ্টি রেখেই বাঙলা কাব্যানুবাদপ্রয়াসের তাৎপর্য ও চরিতার্থতা বিচারে এগোতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের অদ্বিতীয় কবিশিল্পী, অনেকেরই কাছে তিনি প্রথম 'আধুনিক'ও ;

কিন্তু তাঁর কাব্যানুবাদ-প্রয়াসে কোনো একাগ্র অভিনিবেশের পরিচয় উন্মোচিত হয়ে ওঠে নি। তখনও 'মানসী'র কবিতাধারা উৎসারিত হয় নি, কবির সঙ্গে একজন শিল্পী এসে যোগ দেয় নি, সেই শেষকৈশোর ও নবযৌবনে 'প্রভাতসংগীত' ও 'কড়ি ও কোমল'-এর যুগে, রবীন্দ্রনাথ—ভিক্তর হুগো, শেলি, শ্রীমতী ব্রাউনীং, ক্রিষ্টিনা রসেটি, সুইনবার্ন, আর্নেষ্ট মায়ার্স, অগষ্টা ওয়েবষ্টার, প্রভৃতি কবির কয়েকটি কবিতা অনুবাদ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি যে সব ইংরেজি ও চীনা কবিতা অনুবাদ করেছেন তা হয় অন্যের অনুবাদের পরিমার্জনসূত্রে, নয় কোনো প্রবন্ধের বক্তব্য প্রতিপাদনেরপ্রয়োজনে। 'পরিচয়' প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় শেলির 'ওয়ান্ ওয়ার্ড ইজ্ টুউ অফ্‌ন প্রোফেন্‌ড্'-শীর্ষক কবিতার নীরেন্দ্রনাথ রায়-কৃত অনুবাদের সঙ্গে ওই অনুবাদের রবীন্দ্রনাথ-কৃত সংশোধন ও রবীন্দ্রনাথের চিঠি ছাপা হয়েছিল। ১৩৩৯এ রবীন্দ্রনাথ 'তীর্থযাত্রী' নামে এলিঅটের 'দি জার্নি অফ্ দি মেজাই'এর যে অনুবাদ করেন, তার উপলক্ষ্য ছিল ওই কবিতারই বিষ্ণু দে-কৃত অনুবাদকে শোধন করার বা তৎকালীন রাবীন্দ্রিক গদ্যছন্দে পুনর্লিখনের অনুরোধ রক্ষা। 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে সংকলিত বিশ্রুত 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ, এমি লোয়েল, এলিঅট ও এডউইন আর্লিংটন রবিনসনের কবিতা ও কবিতাংশ অনুবাদ করেন। অনিশ্চিত স্মৃতির উপর নিভরতায় এবং বদ্ধমূল বিরাগের দৌরাত্ম্যে রবীন্দ্রনাথের ওই অনুবাদ স্বভাবতই কিছুটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। আধুনিক পশ্চিমা কাব্যের তুলনায় হাজার বছরেরও বেশি আগে লেখা লি-পোর চীনা কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রকৃত আধুনিকত্ব পরিস্ফুট করতে ওই প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ লি-পোর চারটি কাব্যাংশেরও অনুবাদ করে দেন। অন্যত্র 'ছন্দ'-সম্পর্কিত তাত্ত্বিক আলোচনাসূত্রে, 'ছন্দোগার'-পর্যায়ে 'গদ্যছন্দ'এর নমুনা দাখিল করতে গিয়ে, তিনি একটি চৈনিক কবিতার অনুবাদ ('সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষকেই মনে হত সকলের সেরা') উপস্থিত করেন এবং গদ্যছন্দের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করার জন্য ওয়াল্ট্ হুইটম্যানের 'আই শ ইন্ লুইসিয়ানা এ লাইভ-ওক্ গ্রোয়িং' কবিতাটির এবং চৈনিক কবি য়ুয়ান চেনের একটি কবিতার আর্থার ওয়ালি-কৃত 'দি পিচার' শীর্ষক ইংরেজি অনুবাদের বাঙলা অনুবাদ করেন। হুইটম্যানের ওই কাব্যানুবাদ-সংশ্লিষ্ট মন্তব্যে দেখা যায় যে, হুইটম্যানের ওই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেয়েছিলেন 'প্রচ্ছন্ন আবেগের ব্যঞ্জনা' যা 'কাব্য' এবং 'ভাব-বিন্যাসের শিল্প', যাকে তিনি বলতে চেয়েছেন 'ভাবের ছন্দ'। মনে হয়, কাব্যানুবাদের উপযোগিতা ও সার্থকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তেমন সুনিশ্চিত ও সচেতন ছিলেন না। তাই তাঁর অনুবাদপ্রচেষ্টা, বিশেষ করে উত্তরকালে, নেহাতই উপলক্ষ্যঘটিত, অর্ধমনস্ক প্রয়াসমাত্রে পর্যবসিত থেকে গেছে। পূর্বোক্ত শেলির কবিতার নীরেন্দ্রনাথ রায়-কৃত অনুবাদের সংশোধনের সঙ্গে 'পরিচয়'-সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে—'মূলের

ভাবটাকে বাঙলায় যথাসাধ্য বোধগম্য করতে গেলে একেবারে ঠিক তার মাপসই করে আঁট করা চলে না। তাই প্রতিরূপ না হয়ে কতকটা অনুরূপ হয়েছে।'—এমন অনুধাবনে তিনি কাব্যানুবাদের স্বরূপ সম্পর্কে স্বচ্ছ বোধেরই পরিচয় দিয়েছেন ; অথচ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-র পদ্যে হাফেজের কবিতা অনুবাদ-চেষ্টা অনুমোদন করতে না পারার কারণ দর্শাতে গিয়ে তাঁকে তিনি একটি চিঠিতে যে লিখেছিলেন : 'বিদেশী ভাষার উচ্চশ্রেণীর কাব্যগুলিকে পদ্যে অনুবাদ করার চেষ্টা বর্জনীয় বলে আমি মনে করি। কবিতার এক দিকে ভাবার্থ, আর এক দিকে ধ্বনির ইন্দ্রজাল। ভাবার্থকে ভাষান্তরিত করা চলে কিন্তু ধ্বনির মোহকে এক ভাষা থেকে আর এক ভাষায় কোনোমতেই চালান করা যায় না। চেষ্টা করতে গেলে ভাবার্থের প্রতিও জুলুম করতে হয়।'[২] —তাতে, ডক্টর শহীদুল্লাহ্-র কাব্যানুবাদক হিসেবে ব্যর্থতার প্রধান কারণ যে তাঁর কবিত্বশক্তি তথা সৃষ্টিক্ষমতার অভাব, এই মূল সত্যটি এড়িয়ে গিয়ে, মহৎ বিদেশী কবিতার পদ্যে অনুবাদ প্রযাসমাত্রকেই তিনি নিরর্থক বলে মনে করেছেন।

'তীর্থসলিল' (১৯০৮), 'তীর্থরেণু' (১৯১০) ও 'মণি-মঞ্জুষা' (১৯১৫)—এই তিনখানি গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মোট ৫৪১টি কাব্যানুবাদ চায়িত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যানুবাদের স্বকীয় রসসৌন্দর্য ও সৃষ্টিগুণে মুগ্ধ হয়েছিলেন ; কিন্তু নির্মোহ বিচারে এই সিদ্ধান্তে আসতেই হয় যে, পরিমাণে যতখানি তা বিপুল, সার্থকতায় মোটেই ততখানি উজ্জ্বল নয়। সবচেয়ে চোখে পড়ে তাঁর মধ্যে মগ্নতা, স্থিরলক্ষ্য অভিপ্রায় ও সুস্থির রুচির অভাব। 'তীর্থরেণু'র পরিচিতি হিসেবে সন্নিবিষ্ট প্রারম্ভিক কবিতাটিতে সত্যেন্দ্রনাথ নিজের অজান্তেই তাঁর এলোমেলো নির্বিচার নির্বাচনে উদ্ঘাটিত চিন্তাবিরহিত অপরিণত বিস্ময়বোধের কথা স্বীকার করে গেছেন :

'খুঁজি না, বাছি না, বুঝি না, কেবল
চেয়ে থাকি অনিমেষে।'

তাই 'তীর্থসলিল'এ ব্লেক, সুইনবার্ন, টেনিসন, ভিক্তর হুগো, হোমর, বাল্মীকি, ভার্জিল, শেলি, গেয়টে, শেক্সপীয়ার, কালিদাস, সাফো, ভবভূতি, হুইটম্যান, ব্রাউনিং, হাফেজ, [illegible] ম, কা[illegible], [illegible], [illegible]এাক, বায়রণ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি কবির কাব্যানুবাদের পাশেই স্থান পেয়েছে মাউরি জাতির 'ঘুম-পাড়ানি', জাপানী 'ঘুম-পাড়ানি', হাবসী নারীর গান, বেলুচির গান, মুমূর্ষু তাতার সিপাহীর গান, নেপালী শ্লোক ইত্যাদির অনুবাদ। 'তীর্থরেণু'তে সংকলিত হয়েছে তরু দত্ত, লেকঁৎ দ্য লিল, পল্ ভ্যার্লেন, তু-ফু, বোদলেয়ার, পাউণ্ড, লি-পো, ল্যাণ্ডর, দে ম্যুসে, ক্রিষ্টিনা রসেটি, শিলার প্রভৃতির কাব্যানুবাদের সঙ্গেই তেলেগু ও তামিল ছড়া, কসাক্ ঘুমপাড়ানী গান, মুণ্ডারি কবিতা,

২. 'আনিসুজ্জামান রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র' দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৬।

মেক্সিকোর নৃত্য-গীতিকা, ব্রাহুই গান, আইসল্যাণ্ডের রণচণ্ডীর গান, নিশানের মর্যাদা (নান্‌সান্‌ যুদ্ধের পর একজন মৃত জাপানী সৈনিকের পাগড়ীর মধ্যে প্রাপ্ত) ইত্যাদির অনুবাদ। লেকঁৎ দ্য-লিলের কবিতার অনুবাদ 'গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে', পল ভ্যারলেনের 'শিশিরের গান', ভিক্তর হুগোর 'জিন্‌', বোদলেয়ারের 'সন্ধ্যার সুর', স্বামী বিবেকানন্দের 'মৃত্যুরূপা মাতা', তরু দত্তের 'যোগাদ্যা'-ইত্যাদি কয়েকটি অনুবাদে সত্যেন্দ্রনাথ মূল কবিতার মেজাজ, ভাববস্তু, ধ্বনিস্পন্দন এবং অন্যান্য রূপকল্পের আভাস ফোটানোয় কমবেশি চরিতার্থতা অর্জন করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর অধিকাংশ অনুবাদ-প্রয়াসই চিন্তাহীন ত্বরিত ভাষান্তরকর্মের ফলে এক নির্জীব, যান্ত্রিক চরিত্রহীনতায় মিশে গেছে।

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের ব্রাউনিংএর কাব্যানুবাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অনুবাদগুলিতে 'নবজন্মের নূতন শ্রী' প্রকাশ পাওয়ার কথা বলেছিলেন তিনি, বলেছিলেন অনুবাদকের 'দুঃসাহসী নাবিকবৃত্তিতে' অসাধারণ কৃতিত্বের কথা। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ব্রাউনিং ছাড়া শেলিরও অনেকগুলি কবিতার অনুবাদ করেছিলেন। 'ব্রাউনিঙ-পঞ্চাশিকা' ও 'শেলি-সংগ্রহ'-এ গ্রন্থিত দুই ব্রাউনিং ও শেলির কাব্যানুবাদ-গুলিতে তিনি মাঝে-মাঝেই একটু বেশি স্বাধীনতা নিয়েছেন, কিন্তু ওই দুটি অনুবাদকর্মে তাঁর নিজস্ব স্বরভঙ্গি ও ভাষাশিল্পের কোনো পরিচয় যেমন আমরা পাই না, তেমনি ব্রাউনিং ও শেলির মানসতা, ভাব ও উপস্থাপনের বৈশিষ্ট্যকে তিনি তীক্ষ্ণ নৈপুণ্যের সঙ্গে ধরে দিতেও পারেন নি।

মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'হেমন্ত-গোধূলি' কাব্যের প্রারম্ভিক নিবেদনে জানিয়েছিলেন যে তাঁর অনুবাদ 'যেমন মূলের ঘনিষ্ঠ অনুবাদ নয়, তেমনই ভাষায় ও ভাবে তাহা একেবারে ভিন্ন পদার্থও নয়।' অর্থের চেয়ে ভাবকে প্রাধান্য দিলেও তিনি মূলের বাণীচ্ছন্দকে যতদূর সম্ভব বাঙলায় ধরবার চেষ্টা করেছেন। পাঠকদের তিনি শুধু লক্ষ্য করতে বলেছেন, তাঁর অনুবাদগুলি বাঙলা এবং কবিতা হয়েছে কিনা; তা যদি না হয়ে থাকে, তবে এদের কোনো মূল্য নেই। এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, মূল কবিতার ভাব ও বাণীচ্ছন্দের প্রতি মনোযোগী হয়েও মোহিতলাল বাঙলা কবিতা হিসেবে তাঁর অনুবাদের আস্বাদ্যত সম্পর্কেই যেন বেশি ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছেন। তাঁর অনুবাদ-সম্ভারের মধ্যে সংখ্যায় সর্বাধিক হাইনের কবিতার অনুবাদ। মূলের অনুসরণে সততা এবং স্বতন্ত্র কাব্যমূল্য, এ দুদিকের বিচারে অবশ্য তাকে উত্তীর্ণ বলা চলে না, যেমন উত্তীর্ণ বলা চলে না তাঁর মালার্মের *Angoisse* কবিতার ('উৎকণ্ঠা' নামে যার অনুবাদ করেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত) অনুবাদ 'অন্তর-দাহ'কে। বস্তুত হাইনের এবং মালার্মের কবিতার এই অনুবাদে মোহিতলালের অভ্যস্ত ভাষাভঙ্গির নিষ্প্রাণ সান্নিধ্যে আমরা হঠাৎ অনুভব করি যে তাঁর একদা-ভাস্বর ভাষাবিন্যাস ও বাণীভঙ্গিমা কেমন সময়-স্পৃষ্ট

বলে যেন এখন মনে হয়। বোদলেয়ারের *Harmonie du soir* কবিতার মোহিতলাল-কৃত অনুবাদ 'সন্ধ্যার সুর' মোটামুটি আস্বাদ্য। ওই একই কবিতার অনুবাদ তাঁর আগে করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, পরে করেছেন বুদ্ধদেব বসু। মোহিতলাল সবচেয়ে সাফল্য অর্জন করেছেন ক্রিষ্টিনা রসেটির ('গান', 'জন্মদিন', 'দুর্গম'), জর্জ সিলভেষ্টার ভিয়েরাকের ('নাগার্জ্জুন', 'প্রেতপুরী'), ওয়াল্টার ডে লা মেয়ারের ('নিদালি') ও এডওয়ার্ড ডাউডেনের ('বন্ধু') কবিতার অনুবাদে। এই সব ক্ষেত্রে মোহিতলাল উদ্দিষ্ট কবি ও কবিতার সঙ্গে মানসতা ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আভ্যন্তর সংযোগ উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তাঁর অনুবাদে কমবেশি মৌলিক কবিতার স্বাচ্ছন্দ্য ও সৃষ্টিগুণ সঞ্চারিত হয়েছে।

অনুবাদকের কাছে পরম প্রত্যাশিত ধ্যান, মগ্নতা, অভিপ্রায়ের একাগ্রতা, বাঙলা কাব্যানুবাদের ইতিহাসে প্রথম উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল একালের প্রধান চারজন কবির রূপান্তরকর্মে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে—ত্রিশের দশকের এই অন্যতম তিন প্রধান কবির সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত করতে হয় অরুণ মিত্রের নাম, ত্রিশের দশকের শেষে বা চল্লিশের দশকের একেবারে প্রথমে, সে যেখানেই তাঁকে স্থাপন করি না কেন।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর অনুবাদ-কবিতার সংগ্রহ 'প্রতিধ্বনি'র 'ভূমিকা'র আরম্ভেই যদিচ স্বীকার করেছেন : 'আমার মতে কাব্য যেহেতু উক্তি ও উপলব্ধির অদ্বৈত, তাই আমি এও মানতে বাধ্য যে তার রূপান্তর অসম্ভব', তবু প্রায় পরক্ষণেই জানিয়েছেন যে বাংলা ভাষার 'ব্যঞ্জনা বাড়ানোর অন্যতম উপায় অনুবাদ।' বস্তুত কাব্যানুবাদের গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর মনে যে কোনো দ্বিধা ছিল না, তিনি যে এর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন মৌলিক সৃষ্টিসাধনার পরিপূরক অনুশীলনের প্রকৃত অবকাশ, তার খুব স্পষ্ট প্রমাণই আমরা পেয়ে যাই 'প্রতিধ্বনি'র ওই ভূমিকায়। এমন কি ওইখানে তাঁর মুখে আমরা এমন কথাও শুনি : 'অন্ততপক্ষে আমাকে অনুবাদ পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে-সুযোগ দিয়েছে, নিজের বক্তব্যে তার অর্ধেকও মেলে নি ;'। অনুবাদের আদর্শ সম্বন্ধে সুধীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধারণার কিছু উদ্‌ভাসও ওই ভূমিকায় লভ্য। তাঁর মতে বিদেশী কবিতার আক্ষরিক তর্জমা বা ছন্দের দিক থেকে যথাযথ অনুকরণের চেষ্টা 'আসলে অনর্থের বিড়ম্বন,' এবং অপরীক্ষিত আত্মবিশ্বাসের প্রথম যুগেই তিনি বুঝেছিলেন 'যে বঙ্গানুবাদ যখন বাঙালীদেরই পাঠ্য, তখন তার বিচারে বঙ্গীয় আদর্শের বিধিনিষেধ অকাট্য।....এবং চিত্রকল্পের বেলাতেও মাছি-মারা কেরানী রসাভাস ঘটায়, অভীষ্ট আবেগ জাগিয়ে, দর্শকের সাধুবাদ পায় না।' অবশ্য এ ব্যাপারেও আতিশয্য পরিহার্য, তাই 'যীশুর জীবনী লিখতে এখন যেমন অনূদিত বাইবেলের আক্ষরিক রীতি অনাবশ্যক, তেমনই অনাবশ্যক ক্রীস্‌মাসের পরিবর্তে জন্মাষ্টমীর ব্যবহার ; এবং তার পরে এমন একটা সাধারণ

নিয়ম হয়তো গ্রাহ্য যে ভাবচ্ছবির তারতম্যেও অভিপ্রায় যেখানে বদলায় না, সেখানেই পরিচিত, বা সার্বভৌম প্রতীক প্রয়োজ্য, অন্যত্র নয়।' 'প্রতিধ্বনি'র এই ভূমিকাতেই সুধীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন: 'যে-পুস্তক-তিনখানায় হিউ মেনাই, সীগ্‌ফ্রিড্‌ সস্থন্‌ ও হান্‌স্‌ কারোসা-র লেখা-কটি প্রথম দেখেছিলুম, সেগুলি যেহেতু দ্বিতীয় বার হাতে আসেনি, তাই উপস্থিত সংস্করণে মূলের চিহ্নমাত্র আছে কি না সন্দেহ।' কিন্তু যেখানে মূল তাঁর হাতের কাছে, চোখের সামনেই ছিল, যেমন উইলিয়ম্‌ শেক্‌স্‌পীয়র, হাইন্‌রিখ্‌ হাইনে, স্তেফান্‌ মালার্মে, পোল ভালেরি, ডি-এইচ লরেন্স-এর কাব্যানুবাদে, সেখানেও তিনি যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছেন এবং মূল থেকে কমবেশি সরে গিয়ে নিজস্ব মানসতা ও স্বরভঙ্গির উদ্‌ভাস ঘটিয়েছেন। তাঁর রূপান্তরে প্রায়শই দেখি ভিন্‌দেশী অনুষঙ্গ ও প্রতিমার বঙ্গীয়করণ। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য তাঁর হাইনের কবিতা-অনুবাদ—'তত্ত্বকথা', 'মহাকাব্য', বিশেষ করে 'পরিবাদ'। সুধীন্দ্রনাথের স্বাধীন অনুবাদপ্রয়াস সর্বত্র সমফলপ্রসূ হয় নি। হাইনে, শেক্‌সপীযর, ভালেরি, মালার্মে, লরেন্স—কাব্যানুবাদ-প্রয়াসে তাঁর সার্থকতা থেকে অসার্থকতার এই ভাবে এক ক্রম-অধোমুখী রৈখিক নক্‌শা এঁকে তোলা যায। মূল কবিতার কবির সঙ্গে মানসতায় দুরতিক্রম্য ব্যবধান থাকলে কুশলী কবি-অনুবাদকের অনুবাদপ্রয়াসও যে কেমন নিষ্ফল হয়ে যায় তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লরেন্সের 'অন্‌ দি ব্যালকনি'র সুধীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ 'কালতরী'। সুধীন্দ্রনাথের গম্ভীর তৎসম শব্দের শোভাযাত্রায় এখানে লরেন্সের সহজ, প্রায়-কথ্য স্বাচ্ছন্দ্য বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। মূল কবিতার কবির সঙ্গে কবিধর্মে দুস্তর পার্থক্য সুধীন্দ্রনাথের মালার্মের কাব্যানুবাদকেও লক্ষ্যভ্রষ্ট করেছে। 'সংবর্ত' কাব্যের নতুন সংস্করণের 'মুখবন্ধ'এ তিনি জানিয়েছিলেন: '...মালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট: আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ; এবং উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দপ্রয়োগের পরীক্ষারূপেই বিবেচ্য।' অথচ কবিতার প্রসঙ্গ ও প্রকরণ দু দিক দিয়েই তাঁর ও মালার্মের কবিতা সম্পূর্ণ পৃথক্‌ খাতে বয়েছে। বস্তুত 'অর্কেস্ট্রা'র নতুন সংস্করণের 'ভূমিকা'য় সুধীন্দ্রনাথের উক্তি 'শিল্প সচেতন রূপকারের অভূতপূর্ব সৃষ্টি' এবং ফ্রঁসোয়া কোপে-কে লেখা চিঠিতে মালার্মের উক্তি: 'Le hasard n'entame pas un vers, c'est la grande chose' অর্থাৎ 'কবিতার একটি পঙ্‌ক্তিকেও দৈব স্পর্শ করে না, এটাই একটা বিরাট ব্যাপার', পাশাপাশি রাখলে তবেই আমরা দৈব পরিহারের সংকল্পে মালার্মে ও সুধীন্দ্রনাথের কবিমানসতার একমাত্র সংযোগবিন্দুটির সন্ধান পাই। নইলে, মালার্মের সাধনা ছিল শব্দশিল্পের শুদ্ধতার, কোনও বক্তব্য পরিবেষণ তাঁর অভীষ্ট ছিল না। অথচ সুধীন্দ্রনাথের কবিতা বক্তব্যপ্রধান। রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: 'আমার মনে হয় কাব্যের প্রধান অঙ্গ lyricism নয়, intellectualism এবং এতেই বিভিন্ন

মনের আত্মকীয়তার প্রকাশ। কাব্যে intellectualism আনতে হলে প্রাধান্য দিতে হবে চিন্তাকে।' ('দেশ' সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৯) মালার্মে প্রচলিত সাধারণ শব্দকেই শুদ্ধতার ব্যঞ্জনায় তুলে নিতে চেয়েছিলেন, অথচ সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় দেখি গম্ভীর তৎসম শব্দের সমারোহ এবং অনেক সময়ই তিনি অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দও ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর পূর্বোক্ত চিঠিতেই রয়েছে: '…অসাধারণ চিন্তার অভিব্যক্তিতে অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার প্রশস্ত: কেননা এই ধরনের শব্দ মানব মনের অলসগমনের প্রতিবন্ধক।' কাব্যভাবনায় এই ভাবে মালার্মের প্রায়-বিপ্রতীপ বিন্দুতে অবস্থান করার জন্য সুধীন্দ্রনাথ স্বভাবতই তাঁর অনুবাদে মালার্মের মূল কবিতার প্রতি সুবিচার করতে পারেন নি। এই সূত্রে বিশেষ করে মালার্মের '*L'Azur*' কবিতার সুধীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ 'নীলিমা'র কথা স্মর্তব্য। পোল্ ভালেরির '*Ébauche d'un Serpent*'-এর অনুবাদ 'আদিনাগ'এ মূল থেকে কিছুটা সরে গিয়েও সুধীন্দ্রনাথ মোটামুটি সার্থকতা অর্জন করেছেন। শেক্সপীয়রের সনেট-অনুবাদেও তিনি স্বাধীনতা নিয়েছেন, তবু মূলের আবহ, প্রসঙ্গ ও প্রকরণ তাঁর ওই অনুবাদে যেমন আভাসিত তেমনি তাঁর অনুবাদ স্বতন্ত্র কবিতা হিসেবেও শিল্পসাফল্য লাভ করেছে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিস্ময়কর সিদ্ধি তিনি অর্জন করেছেন হাইনের কবিতা-অনুবাদে। 'আত্মপরিচয়', 'বর্ষশেষ', 'স্মৃতিবিষ'—এই সব অনুবাদ স্বতন্ত্র শিল্প-সার্থকতায় বাঙলা কবিতার চিরন্তন সম্পদ হয়ে রইল।

প্রথম দিকে বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ-প্রয়াসে সেই একান্ত-কাঙ্ক্ষিত ধ্যান, মগ্নতা, একাগ্র অভিনিবেশ লক্ষ্যগোচর হয়ে ওঠে নি। তাঁর তখনকার অনুবাদ-প্রয়াসের নিদর্শন হিসেবে এজরা পাউণ্ড, ই. ই. কামিংস, ওয়ালেস স্টীভেন্স, ডি. এইচ. লরেন্সের কাব্যানুবাদগুলিকে আমরা অনুধাবন করতে পারি। তখন বোদলেয়ারের কবিতার অনুবাদও তিনি করেছিলেন কিন্তু পরবর্তী কালে সে অনুবাদ অতিক্রান্ত হয়। উত্তরজীবনে বোদলেয়ার, হেল্ডার্লিন, রিল্‌কে—প্রতীচ্যের এই তিন মহৎ কবির কবিতার ও কালিদাসের 'মেঘদূত' এর যে অনুবাদ বুদ্ধদেব করলেন, তাতে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায়, একাগ্র অভিনিবেশ, বিনীত সশ্রদ্ধ শ্রম, সর্বোপরি ধ্যান, মগ্নতার পরিচয়। এই নিবিষ্ট অনুবাদ-প্রয়াসের ফলেই তিনি উপলব্ধি করলেন: 'যতক্ষণ আমরা কানে-কানে ধনুকের ছিলা না-টানছি ততক্ষণ আমরা আমাদের ক্ষমতার সীমা জানতে পারি না—লেখকের জীবনে ধৈর্য ও পরিশ্রমই সব।'[৩]

কালিদাসের 'মেঘদূত'এর মূল ভাষা বুদ্ধদেবের আয়ত্ত ছিল, কিন্তু বোদলেয়ারের কবিতার মূল ফরাসী, রিল্‌কে ও হেল্ডার্লিনের কবিতার মূল জর্মান প্রায় অপরিচিতই

৩. 'কবিতা ও আমার জীবন আত্মজীবনীর ভগ্নাংশ', 'কবিতার শত্রু ও মিত্র' পৃ ৬১।

ছিল তাঁর। এই তিন কবির ক্ষেত্রে তাঁর অনুবাদ-প্রক্রিয়া মোটামুটি একই রকম। অনুবাদকর্মে তাঁর অবলম্বন ছিল কবিতাগুলির মূল লেখন, অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ইংরেজি অনুবাদ এবং ফরাসি-ইংরেজি বা জর্মান-ইংরেজি অভিধান। মূল কবিতার অভিপ্রায়, শব্দ ও চিত্রকল্পের প্রয়োগ তিনি বুঝে নেবার চেষ্টা করেছেন, একই কবিতার ভিন্ন-ভিন্ন ইংরেজি অনুবাদ তুলনা করে, অভিধান ও ভাষাবিদ্ বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে, কখনও বা সমালোচকের ব্যাখ্যার দ্বারস্থ হয়ে। মূল কবিতার পঙ্‌ক্তি-সংখ্যা, স্তবক ও অনুচ্ছেদের গঠন বা বিন্যাস যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, চিত্রকল্পগুলি যাতে থাকে অনাহত, সারবস্তু থাকে অবিকৃত, সে সম্পর্কে সাধ্যমতো যেমন সজাগ থেকেছেন তিনি, তেমনি স্বতন্ত্র কবিতা হিসেবে তাঁর অনুবাদের আস্বাদ্যতা ও শিল্পমূল্য সম্পর্কেও তিনি গভীর ভাবে সচেতন থেকেছেন। বরং এ অনুধাবন মোটেই অসঙ্গত হবে না যে একজন সৃষ্টিশীল কবি হিসেবে খুব স্বাভাবিক ভাবে অনুবাদের স্বতন্ত্র কাব্যমূল্যের প্রতিই তাঁর তীক্ষ্ণতর অভিনিবেশ পড়েছিল। 'হেল্ডার্লিন-এর কবিতা'র প্রারম্ভে 'অনুবাদকের বক্তব্য'এ তিনি লিখেছিলেন : 'অন্য একটি বিষয়েও আমি নিরন্তর মনোযোগী ছিলাম—যাতে বাংলা ভাষার কবিতা হিশেবে অনুবাদগুলি পাঠযোগ্য হয়, কেননা আ মা র বি শ্বা স যে ক বি তা র অ নু বা দে র প ক্ষে ক বি তা হ য়ে ও ঠা ই স ব চে য়ে জ রু রি দ র কা র।' (পৃ ২০)

'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর কবিতাগুলি রচনার সময় থেকে প্রায় ধারাবাহিক ভাবে বুদ্ধদেব কাব্যানুবাদ-প্রয়াসে নিবিষ্ট হয়ে থেকেছেন। 'যে-আঁধার আলোর অধিক' এর কবিতাগুলির রচনাকাল : ১৯৫৪-১৯৫৮। ১৯৫৫য় 'কবিতা'-পত্রে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ-কবিতার সংকলন 'প্রতিধ্বনি'র তন্নিষ্ঠ বিশ্লেষণসূত্রে, বুদ্ধদেব, কাব্যানুবাদের স্বরূপ, তাৎপর্য, উপযোগিতা, লক্ষ্য, অনুবাদের সঙ্গে অনুবাদকের সম্পর্ক, মৌলিক কবিতাসৃষ্টিতে অনুবাদচর্চার উপকারী সহযোগ-ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর গভীর, অনতিসংক্ষিপ্ত ভাবনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। 'কবিতার শত্রু ও মিত্র' গ্রন্থে আহৃত 'কবিতা ও আমার জীবন আত্মজীবনীর ভগ্নাংশ'-শীর্ষক পূর্বোদ্ধৃত দ্যুতিমান রচনায় বেশ স্পষ্ট প্রত্যয়দৃপ্ত কণ্ঠেই বুদ্ধদেব আমাদের জানিয়েছেন : 'আমি অন্তত অনুবাদকে দুধের বদলে ঘোল ব'লে ভাবতে পারি না; আমার মনে হয় সেটাও একটা সৃষ্টিকর্ম; তারও জন্য চাই প্রেরণা, যার উৎপত্তিস্থল মূল কবির প্রতি প্রেম আর কখনো বা তাঁর সঙ্গে একাত্মবোধ; তাতেও আছে সেই আনন্দ যা সত্যিকার নিজস্ব কিছু লেখার সময় প্রাপ্ত হই আমরা; আর সেটাও বিস্তর খাটিয়ে নেয় আমাদের, ব্যবহার করে আমাদের সব বুদ্ধিবৃত্তি ও অভিনিবেশ।' (পৃ ৬৩-৬৪) এবং 'আজকের দিনে রচনাকর্মকে আমি যে-ভাবে দেখি এবং চিন্তা করি, যে-সব সমস্যা তা উপস্থিত করে এবং যে-ভাবে তার সমাধানের পথ

খুঁজে পাই ; যে-ভাবে, ধরা যাক, আমার সাম্প্রতিক কবিতা ও গদ্য-কবিতা ও কাব্যনাট্য, এমন কি কোনো-কোনো গদ্যরচনা আমি লিখেছিলাম, তার মধ্যে কতখানি আমার অনুবাদকর্মের অবদান আছে, তা আমি মনে মনে ভালোই জানি।' (পৃ ৬৪-৬৫)' কবিতার অনুবাদও যে এক ধরনের সৃষ্টিকর্ম এবং অনুবাদকের মৌলিক কবিতাসৃষ্টির ভাবনা ও প্রচেষ্টাকে তা যে ব্যাপক-ও অনিবার্য.ভাবে প্রভাবিত করে, তারই দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতি উপর্যুক্ত দুটি অংশে আমরা আধারিত দেখতে পাই।

ডেনিস লেভার্টভ এক সাক্ষাৎকারে (The Craft of Poetry—Interviews fro.n The New York Quarterly, William Packard, Editor) তাঁর 'In Praise of Krishna'-র মতো মূল ভাষায় অজ্ঞতাজনিত পরোক্ষ অনুবাদের সঙ্গে তাঁর অন্যান্য মূল ভাষা থেকে সরাসরি অনুবাদের পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে জানান যে প্রথমোক্ত ধরনের পরোক্ষ অনুবাদ-প্রয়াসে মূল ভাষার ধ্বনি সম্পর্কে অনুবাদকের প্রকৃত কোন ধারণাই থাকে না। এরই প্রেক্ষিতে 'শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা'র 'অনুবাদের বক্তব্য'এ বুদ্ধদেবের এই আত্মতৃপ্ত মন্তব্য : 'অন্ততপক্ষে এ-বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই যে ইংরেজি ভাষায় আমি যতটা অভ্যস্ত ফরাশিতে ঠিক ততটা হ'লেও আমার এই অনুবাদগুচ্ছ যা হয়েছে তা থেকে ভিন্ন কিছু হ'তো না।'...যেন হঠোক্তি বলেই বোধ হয়। তবু বুদ্ধদেবের এই বোদলেয়ারের কাব্যানুবাদ নানা দুর্বলতা ও বিচ্যুতি সত্বেও বিশেষ তাৎপর্যময় ও সংক্রামক হয়ে উঠেছে, প্রধানত ইংরেজি ভাষার মধ্য দিয়েই মূল কবির সঙ্গে অনুবাদক-কবির গভীর আত্মিক সহযোগে। বোদলেয়ারীয় মেজাজ ও আবহ তাঁর ঐ অনুবাদে তিনি প্রায়শই ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন ; রচনা করে তুলতে পেরেছেন বেশ কিছু শিল্পসার্থক স্বাদু সজীব বাঙলা কবিতা। আর তাঁর নিজের পরবর্তী কাব্যধারায় তো বটেই, অন্তত কিছুকালের জন্য তরুণ বাঙালি কবিদের অনেকেরই কবিতায় ওই অনুবাদ অনস্বীকার্য ছায়া বিস্তার করেছে।

বুদ্ধদেবের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ 'যে-আঁধার আলোর অধিক' ; তা তাঁর নিজেরই ভাষায় তাঁর 'জীবনের এক সন্ধিলগ্নে দাঁড়িয়ে আছে।' এই কাব্যগ্রন্থের ভাববস্তুতে বোদলেয়ার ও রিল্‌কে এবং রূপকল্পে বোদলেয়ার ছায়া ফেলে গেছেন। 'তবু যদি মনে হয় ভুল / নাস্তিমায় নিজেরে মিলাও, / মুছে যাক ব্যবহার্য নাম, / হাওয়ার আনন্দে ব'য়ে যাও / তারার রূপালি অন্ধকারে' ; ('চল্লিশের পরে', 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর') আর 'প্রান্তরে কিছুই নেই ; জানালায় পর্দা টেনে দে। / ওরা তোকে কেবল ভোলাতে চায়—ঘাস, মাটি, পুকুর, আকাশ / ফেলে দে পুতুল, ফুল, পোষা পাখি, শৌখিন ক্যাকটাস ; / ডুবে যা নিরভিমান, একতান, বিশ্বস্ত নির্বেদে।' ('আটচল্লিশের শীতের জন্য : ২', 'যে-আঁধার আলোর অধিক')—এই ভাবে বুদ্ধদেবের আগে-পরের

কাব্যোচ্চারণ পাশাপাশি রেখে আমরা বুঝে নিতে পারি 'যে-আঁধার আলোর অধিক'এর ভাববস্তুতে বোদলেয়ারের অমোঘ সংক্রাম। পল দেমনিকে লেখা বিশ্রুত 'দ্রষ্টার চিঠি'তে 'প্রথম দ্রষ্টা, কবিদের রাজা, সত্যিকারের এক দেবতা' বলে বোদলেয়ারকে আবিষ্ট অভিবাদন জানিয়েও আর্তুর র‍্যাঁবো সেই সঙ্গে বোদলেয়ার সম্পর্কে বলতে ভোলেন নি : 'তবু তিনি বড়ো পরিশীলিত আবেষ্টনে জীবন কাটিয়েছেন, এবং তাঁর অতি-প্রশংসিত প্রকরণ অকিঞ্চিৎকর ; অজানার আবিষ্কার নতুন প্রকরণ দাবি করে।' বোদলেয়ারের এই কাব্যপ্রকরণ সম্পর্কেও বুদ্ধদেব কিন্তু সশ্রদ্ধ। 'শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা'-গ্রন্থের ভূমিকায় তাই তিনি বোদলেয়ারের 'ছন্দোবন্ধের দার্ঢ্য, মিলের বিস্ময় ও পর্যাপ্তি, নিয়মনিষ্ঠ সনেটের প্রতি অমর আসক্তি'—এই সব 'নির্ভুল ভাবে ক্লাসিক লক্ষণ'এর কথা বেশ জোর দিয়েই উল্লেখ করেছেন। 'যে-আঁধার আলোর অধিক'এ সনেট বা সনেটকল্প কবিতাই বেশি। এদের সংক্ষিপ্ত, পরিমিত গঠন, আঁটো বাঁধুনি, ঘনসংহত শব্দবিন্যাসের পেছনে বুদ্ধদেবের বিবর্তিত কবিস্বভাবের স্বাভাবিক উন্মুখতা, ধৈর্যশীল প্রয়াস, সুধীন্দ্রনাথের উদ্দীপক সান্নিধ্য ছাড়াও বোদলেয়ারের কবিতার রূপকল্পের প্রতি বুদ্ধদেবের সশ্রদ্ধ আকর্ষণও প্রেরক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

'হে বিদেশী ফুল', 'এলিঅটের কবিতা' ও 'মাও ৎসে তুং-এর কবিতা'—এই তিনটি গ্রন্থেই প্রধানত বিষ্ণু দে-র ব্যাপক ও নিবিষ্ট কাব্যানুবাদপ্রয়াসের পরিচয় আধারিত। নানা দেশের নানা ভাষার অনেক কবির কবিতাই তিনি অনুবাদ করেছেন, কিন্তু তাঁর এই অনুবাদপ্রয়াসকে এলোমেলো খেয়ালী পর্যটন বলে মনে হয় না। 'হে বিদেশী ফুল'এর প্রারম্ভিক নিবেদনে বিষ্ণু দে লিখেছিলেন : 'যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি মূল কবিতার বিন্যাস, ছন্দ বা নিদেনপক্ষে মেজাজ অনুবাদের আভাসে বহন করতে।'[২] এখানে দুটি ব্যাপার লক্ষ্য করার মতো। প্রথমত বিষ্ণু দে তাঁর অনুবাদপ্রচেষ্টার লক্ষ্যের কথা বলতে গিয়ে মূল কবিতার বার্তা বা বিষয় বা ভাবের কথা উল্লেখ করেন নি। আর 'নিদেনপক্ষে মেজাজ' কথাটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে একজন কবি ও তাঁর কবিতার বিশিষ্টতাকে বুঝে নেবার পক্ষে তাঁর কাছে সবচেয়ে জরুরি মনে হয়েছে কবিতার মেজাজকে, যাকে অন্তত কাব্যানুবাদে ফুটিয়ে তুলতে না পারলে অনুবাদ-চেষ্টারই যেন আর কোনো তাৎপর্য থাকে না। দ্বিতীয়ত 'অনুবাদের আ[illegible] [illegible] মধ্য দিয়ে [illegible] প্রকরণ ; তাব[illegible] [illegible]ভাসে' যার উৎপত্তিস্থল মূল ক[illegible] বিষ্ণু দে-র এমনতরো প্রত্যাতই যেন অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে যে, কবিতার অনুবাদ কখনও মূলের অবিকল প্রতিরূপ হয়ে উঠতে পারে না, তা মূল কবিতাকে শুধু আভাসিতই করতে পারে। শেক্‌স্‌পীয়রের একই সনেটের সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে-কৃত অনুবাদ পাশাপাশি রাখলে তুলনায় মূলের প্রতি বিষ্ণু দে-কেই অবশ্য অধিকতর বিশ্বস্ত বলে মনে হবে। তবে অনুবাদের স্বতন্ত্র আস্বাদ্যতা ও সজীবতা তথা

কাব্যগুণ সম্পর্কেও মোটেই তিনি অনবহিত নন। মূল কবিতার কবির সঙ্গে দীর্ঘ ও নৈষ্ঠিক সহযোগে গভীর মর্মগত সম্পর্কের উপলব্ধি এবং অনুবাদচর্চা থেকে নিজের মৌলিক-সৃষ্টির পুষ্টিসংগ্রহ কাব্যানুবাদক বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রেও প্রতিপাদিত হয়েছে। এলিঅট প্রথমাবধিই তাঁর প্রিয় এবং নমস্য কবি। এলিঅটের কবিতায় এ কালের সমাজের বিচ্ছিন্নতা, খণ্ড চৈতন্য, প্রশ্নাকুলতা, দ্বিধাকে বিম্বিত হতে দেখেছেন তিনি। আত্মসচেতনতার এই মহাকবির কাছ থেকে আত্মসচেতনতার সমস্যা, নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টির গুরুত্ব এবং ঐতিহ্যের বোধ ও জিজ্ঞাসা সম্পর্কে তিনি পাঠ নিতে চেয়েছেন। পরবর্তী কালে এলুয়ারের কবিতায় ব্যক্তির প্রেমাবিষ্টতা ও সমষ্টির সংগ্রামী মুক্তিকামনার সমীকরণ এবং লোর্‌কার কবিতায় স্বদেশীয় লোকগাথা ও লোকস্বভাব থেকে প্রণোদনা সংগ্রহের নজির এই দুই কবির সঙ্গে তাঁকে আন্তরিক সহমর্মিতায় লগ্ন করেছে।

এলিঅটের কবিতার অনুবাদ করতে গিয়ে বিষ্ণু দে যে ভাবে বিদেশী নাম, পরিমণ্ডল বা আবহ, উল্লেখ ইত্যাদির বঙ্গীয়করণ করেছেন, তার প্রয়োজ্যতা সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের মনে কিন্তু সংশয় জেগে ওঠে। এলিঅটের '*Gerontion*' কবিতার অনুবাদ 'জরায়ণ'এ বিষ্ণু দে মূলের নিসর্গ-পরিমণ্ডলকে একেবারে উল্‌টিয়ে দেন, 'in a dry month'কে 'ভিজে ভাদরে বাদলে'তে, 'waiting for rain'কে 'রৌদ্রের আশায়'তে, 'in the warm rain'কে 'পশ্চিমা রৌদ্রে'তে, এবং 'dry brain in a dry season'কে 'ভরা বাদরে ভিজা মাথায়'তে রূপান্তরিত করে। এলিঅটের কবিতাপর্যায় '*Ash-Wednesday*'কে বিষ্ণু দে রূপান্তরিত করেছেন 'চড়কের গান'এ। উপবাস ও অনুতাপের জন্য নির্ধারিত Lent-নামে অভিহিত খ্রীষ্টীয় পর্বের প্রথম দিনটিকে, বর্ষচক্র ঘুরে বর্ষশেষ ও নববর্ষাবম্ভের রূপকস্বরূপ চৈত্রসংক্রান্তিতে অনুষ্ঠেয় শৈব উৎসববিশেষে এই রূপান্তর—ভাবাবহ, অভিপ্রায় ও তাৎপর্যের দিক দিয়ে স্পষ্টতই ঔচিত্যবিরোধী বলে বোধ হয়। আবার এলিঅটের ওই কবিতাপর্যায়ে, মূলে, Virgin ও Mary যেখানে খুব সহজ স্বাভাবিকতাতেই চলে আসেন, সেখানে অনুবাদে বিষ্ণু দে তাঁদের যথাক্রমে দেবকীমাতা ও শ্রীরাধায় রূপান্তরিত করে শৈব উৎসব-নির্দেশক শিরোনামের তলায় বৈষ্ণব অনুষঙ্গ এনে ফেলেন।

স্টিফেন স্পেণ্ডারের কবিতার অনুবাদ 'এক্‌সপ্রেস ট্রেন'এর মতো উজ্জ্বল রূপান্তর-কর্মের নিদর্শন সত্ত্বেও ত্রিশের দশকের অন্যতম প্রধান কবি অমিয় চক্রবর্তী অনুবাদে প্রত্যাশিত অভিনিবেশ দেখান নি। বরং তাঁর সমকালীন কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র নানা কবির কবিতা-অনুবাদে নিয়োজিত থেকেছেন। এর মধ্যে 'হুইটম্যানের কবিতা'-গ্রন্থ ভাবকল্পনা ও স্বরভঙ্গির ক্ষেত্রে মার্কিনি অগ্রপথিক কবির সঙ্গে তাঁর নিবিড় নৈকট্যে বিশেষ ভাবেই গণ্য ও আস্বাদ্য হয়ে ওঠে।

অনুবাদে মূল কবির স্বভাবধর্ম ও মানসতার প্রতি বিশ্বস্ততা, মূল কবিতার ভাববস্তু ও রূপকল্পের বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সততা এবং স্বতন্ত্র কবিতা হিসেবে অনুবাদের শিল্পসার্থকতা —এই দুই দিকের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায় অরুণ মিত্রের কৃতিত্ব যে কতখানি উজ্জ্বল, তা খব সহজেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে যদি আমরা তাঁর সম্প্রতি-প্রকাশিত অনুবাদ-কবিতার বহু প্রতীক্ষিত সংকলন 'অন্য স্বর'এর নিবিষ্ট পর্যালোচনে নিযুক্ত হই। মূলের প্রতি যথাসম্ভব আনুগত্য রক্ষায় তাঁকে সবচেয়ে বেশি শক্তি যুগিয়েছে মূল কবিতার ভাষায় তাঁর অসামান্য ব্যুৎপত্তি। পাণ্ডিত্য ও রসবোধের বিরল সমন্বয়ে প্রকৃতই দীপ্ত তাঁর ফরাসি ভাষায় অধিকার; আবার সৃষ্টিশীল কবির ব্যক্তিত্ব-সংশ্লেষে তাঁর অনুবাদে সৃষ্টিগুণের উদ্ভাসন, স্বতন্ত্র কবিতা হিসেবে তার আস্বাদ্যতা ও উত্তরণ সম্পর্কেও তিনি গভীর ভাবেই সচেতন। 'গাঙ্গেয় পত্র' পঞ্চম সংকলন শ্রাবণ ১৩৮৪ অগাষ্ট ১৯৭৭এ পুষ্কর দাশগুপ্তের সঙ্গে 'কবিতা বিষয়ক আলোচনা'-সূত্রে এমনতরো উস্কে দেওয়া মন্তব্য করতে দেখি তাঁকে: 'অনুবাদ প্রভাবিত করে, না প্রভাবিত হয় সেটাই এক প্রশ্ন। অনুবাদের কাজে নিজের ব্যক্তিত্বকে ঠেকিয়ে রাখা খুব কঠিন।' মরিস সেভ, পিয়ের দঁ রঁসার, ঝোয়াশ্যাঁ দ্যু বেলে—এইসব পুরোনো কবির কবিতা যেমন তিনি অনুবাদ করেছেন, তেমনি অনুবাদ করেছেন বোদলেয়ার, পল ভের্লেন, রঁ্যাবো, পল ক্লোদেল, মাক্স ঝাকব, গীওম আপোলিনের, ঝ্যুল স্যুপেরভিয়েল, সঁ্যা-ঝন-পের্স, পিয়ের র‍্যভেরদি, পল এল্যুয়ার, অঁরি মিশো, ঝাক প্রেভের, র‍্যনে শার—এই সব আধুনিক কবির কবিতা। এর মধ্যে বোদলেয়ারের একটিমাত্র কবিতার ('লে ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর মুখবন্ধরূপে সন্নিবিষ্ট 'পাঠকের প্রতি') তিনি যে অনুবাদ করেছেন, মূলের মেজাজ ও রূপকল্পের যথাসম্ভব বিশ্বস্ত আভাসে তা একই কবিতার বুদ্ধদেব-কৃত অনুবাদকে নিষ্প্রভ করে দেয়। আবার প্রেভেরের কবিতার 'কথার ফটোগ্রাফ' দিয়ে বর্ণনা এবং নাটকীয়তা-তীব্র গল্প বলার ধরন, বাংলা কবিতায় অব্যর্থ ভাবে তুলে আনতে পারেন তিনি। সর্বোপরি মূল কবিতার কবির সঙ্গে আত্মিক সহযোগের গাঢ়তায় রঁ্যাবো, পের্স ও এল্যুয়ারের কবিতার তর্জমা তাঁর হাতে এক অমোঘতায় জ্বলে ওঠে।

'এখন বজ্জাতগুলোকে টিট করা দরকার / চাই খুব জবরদস্ত এক / বন্দুক সরকার, / মন্ত্রী হোন জল্লাদ— / তারপর দেখা যাক জমির আস্বাদ / ভোলে কি ভোলে না / অবাধ্য স্বাধীন ছোটলোক তেলেঙ্গানা।' ('রাম রাম')—সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'অগ্নিকোণ'এর একেবারে শেষ কবিতার এই প্রচার-চীৎকৃত সাংবাদিক বিবৃতি, আর একই কবির—'অন্ধকারের চোখ জলে, / চোখে আগুন। ('মা, তুমি কাঁদো') এবং 'ফুল ফুটুক না ফুটুক / আজ বসন্ত ('ফুল ফুটুক না ফুটুক') / —এমন স্পন্দিত উচ্চারণের মাঝখানে এক তাৎপর্যময় বিভাজনরেখার মতো দাঁড়িয়ে তাঁর 'নাজিম হিকমতের

কবিতা'র অনুবাদগুলো.। এই সমস্ত অনুবাদই যে স্বতন্ত্র কাব্যমহিমায় আমাদের সমান ভাবে স্পর্শ করে তা নয়। 'তুমি আমি' ও 'তুমি আমার দেশ' এর মতো অনুবাদ তো স্থুল বিবৃতিসর্বস্বতায় পীড়াদায়কই লাগে। তবু এদের মধ্যে আছে এক সংগ্রামী হৃদয়ের আন্তরিক উত্তেজনা, স্বপ্ন, আশা, প্রেম, সংকল্প, যা প্রধানত ইংরেজি ও কিছুটা ফরাসি অনুবাদের মধ্য দিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে প্রচণ্ড ভাবে নাড়িয়ে তাঁর সৃষ্টিপ্রেরণার নিভন্ত চুল্লীকে তীব্র ভাবে উস্‌কে দিতে পেরেছিল। এরই ফলে সুভাষ মুখোপাধ্যায় আবার সত্যিকারের নতুন কবিতা লিখতে পারলেন, যা সংগ্রামের স্বপ্ন ও সংকল্প, মানুষের প্রতি বুকভরা ভালোবাসার প্রত্যয়দীপ্ত উচ্চারণে যেমন প্রাণময়, তেমনি কবিতা হিসেবেও রূপসিদ্ধ। সুভাষ মুখোপাধ্যায় আরও কয়েকজন কবির কবিতা অনুবাদ করেছেন। তার মধ্যে পাব্‌লো নেরুদার কবিতার অনুবাদ শুধু সংখ্যার দিক দিয়ে নয়, কাব্যভাবনা বা কাব্যাদর্শের গভীরতর সাযুজ্যহেতু সজীবতা ও আস্বাদ্যতায় বিশিষ্ট।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের পাবলো নেরুদার কবিতার অনুবাদ গ্রন্থবদ্ধ হয়ে বেরিয়েছে। এ ছাড়াও তিনি লোরকার কবিতার অনুবাদ করেছেন, অনুবাদ করেছেন পুশকিন্, লেরমন্‌তফ্, ব্লক্, আখ্‌মাতোফা, মায়াকভস্কি, এসেনিন্-প্রভৃতি রুশ কবির কবিতা। কবিমানসতা ও কাব্যভাবনার গভীরতর সাযুজ্যের জন্যই মঙ্গলাচরণের কাব্যানুবাদের মধ্যে নেরুদা, ব্লক্, মায়াকভ্‌স্কি, এসেনিনের মতো কবির কবিতার অনুবাদে, একই সঙ্গে মূল কবিতার মেজাজ ও রূপকল্পকে যথাসম্ভব আভাসিত করা ও স্বভাষার স্বতন্ত্র একটি কবিতা হিসেবেও অনুবাদকে উত্তীর্ণ করে দেওয়া—অনুবাদকের এই দ্বিমুখী দায় সম্পর্কে সচেতনতা প্রোজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে। কাব্যভাবনা ও কবিমানসতার নৈকট্যের জন্য কোনো কবির প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, তাঁর কবিতার দীর্ঘ নৈষ্ঠিক পঠনে তাঁর কবি-স্বভাবের সঙ্গে আত্মিক যোগ স্থাপন ও তাঁর কবিতার মর্মলোকে প্রবেশের নিবিষ্ট প্রয়াস সিদ্ধেশ্বর সেনের মায়াকভ্‌স্কির কাব্যানুবাদেও দেখা যায়।

অনুবাদ্য কবিতার মূল ফরাসি ভাষার সঙ্গে দীর্ঘ ঘনিষ্ঠ পরিচয়, ওই ভাষায় ব্যাপক অধিকার, অনুবাদক হিসেবে লোকনাথ ভট্টাচার্যকেও প্রত্যয়দীপ্ত বিশিষ্টতা দিয়েছে। তাঁর 'অন্যতম প্রিয়তম কবি' র‍্যাঁবোর প্রতি আন্তরিক অনুরাগ ও র‍্যাঁবোর কবিমানসতা ও কাব্যস্বভাবের সঙ্গে মর্মগত সম্পর্ক স্থাপনই তাঁর র‍্যাবোর কাব্যানুবাদকে সজীব ও সুদীপ্ত করেছে। অনুবাদে মূল কবিতার স্বাদ সঞ্চার ও কবির মেজাজের আভাস প্রদান এবং বাঙলা কবিতা হিসেবে ওই অনুবাদের স্বাতন্ত্র্য ও রসোত্তীর্ণতা নিষ্পাদন, এ দুয়ের মধ্যেও তিনিও যথাসম্ভব সামঞ্জস্য রেখে চলতে চেয়েছেন। র‍্যাঁবোর '*Une Saison En Enfer*' নামক কাব্যগ্রন্থের মূল ফরাসী থেকে তাঁর 'নরকে এক ঋতু' নামে অনুবাদ গ্রন্থাকারে বেরিয়েছে। র‍্যাঁবোর আরো কবিতার অনুবাদ করেছেন তিনি

যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য '*Le Bateau Ivre*'এর অনুবাদ 'মাতাল তরণী' ও '*Voyelles* এর অনুবাদ 'স্বরবর্ণ'। লোকনাথ আরও কয়েকজন ফরাসি কবির অনুবাদ করেছেন, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন, অঁরি মিশো, র‍্যনে শার।

চল্লিশের দশকের অনুবাদপ্রয়াসের মধ্যে দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরীর 'লুই আরাগঁর কবিতা' ও সতীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'মায়াকভ্স্কির কবিতা' অনুল্লিখিত থাকা উচিত নয়। আর ওই দশকেরই কবি জগন্নাথ চক্রবর্তীর নানা অনুবাদকর্মের মধ্যে সম্প্রতিকালে প্রকাশিত প্রাচীন রুশ মহাকাব্যের অনুবাদ 'ইগর গাথা', ধ্রুপদী সাহিত্যে আধুনিক মননদীপ্ত অভিনিবেশ ও মূল রুশ ভাষা থেকে স্পন্দিত বেগবান গদ্যে বিচক্ষণ ভাষান্তরের সমবায়ে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে।

পঞ্চাশের দশকের বাংলা কাব্যানুবাদপ্রযাসের মধ্যে যেন বিচ্ছিন্ন দুটো ধারার দেখা মেলে। একটি ধারায় প্রকাশিত, কাব্যানুবাদের তাৎপর্য ও উপযোগিতা সম্পর্কে যথোচিত গুরুত্ববোধ, অনুবাদে তন্নিষ্ঠ অভিনিবেশ, মগ্নতা; আর একটি ধারায় দেখি কাব্যানুবাদ সম্পর্কে যেন একটা অবজ্ঞা ও অনুকম্পার ভাব, কিছুটা অভিনবত্বের চমক আনতে ত্বরিত, অর্ধমনস্ক অনুবাদপ্রয়াস। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, আলোক সরকার ও শরৎকুমার মুখোপাধ্যাযের অনুবাদ-প্রচেষ্টায়—দায়িত্ববোধ, নিবিষ্টতা এবং অনুবাদে মূল কবিতার প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা ও বাঙলা ভাষার কবিতা হিসেবে স্বতন্ত্র আস্বাদ্যতা সঞ্চার—এই দুই লক্ষ্যকে মেলানোর মুখ্য সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতার কমবেশি পরিচয় পাই।

প্রথম দিকে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকারের সঙ্গে যুগ্মভাবে কিছু ফরাসি কবিতার অনুবাদ 'ভিন্‌দেশী ফুল' নামে একটি পুস্তিকার নিবদ্ধ করেন। এ ছাড়া ইংরেজি, ইতালীয় ও হিস্পানি কবিতার অনুবাদও তখন তিনি করেন। অলোকরঞ্জনের ওই সময়কার রূপান্তরপ্রচেষ্টার মধ্যে সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী কোলরিজের বিশ্রুত দীর্ঘ কবিতা 'দি রাইম্ অফ্ দি এন্‌সিয়েণ্ট ম্যারিনার'এর অনুবাদ 'বুড়ো নাবিকের উপকথা' ('সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত')। পরবর্তীকালে জর্মান ভাষায় ব্যাপক অধিকার অর্জন অলোকরঞ্জনের জর্মান কাব্যানুবাদকে এক বিশেষ আয়তন দিয়েছে। বিশ্লেষণী পাণ্ডিত্য ও রসগ্রাহী আস্বাদনশক্তির উজ্জ্বল সমন্বয় দেখি তাঁর মধ্যে। তাঁর হ্যেল্ডারলিনের কয়েকটি কবিতার অনুবাদ 'ঈথারদুহিতা' নামে এক অত্যল্পপ্রচারিত ক্ষীণ পুস্তিকায় আধারিত হয়েছে। এই নৈষ্ঠিক সংবেদী অনুবাদ হ্যেল্ডারলিনের উধ্বর্মুখ শীতল আকৃতিকে যেমন সহজেই চিনিয়ে দেয়, তেমনি বাঙলা ভাষার মৌলিক কাব্যাস্বাদকেও প্রোজ্জ্বলভাবে উপস্থিত করে। কিছুকাল আগে অলোকরঞ্জন-কৃত 'এই বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক কবি' য়োল্‌ক বীয়ারমানের কবিতায় এবং 'ব্রেশ্‌টের কবিতা [illegible]

এর অনুবাদ গ্রন্থাকারে বেরিয়েছে। তাঁর ব্রেশ্‌ট-অনুবাদ মূল কবিতার কবির সঙ্গে প্রার্থিত আত্মিক সহযোগের অভাবেই হয়তো বা তেমন প্রত্যয়-উদ্বোধক (convincing) তথা স্বচ্ছন্দ ও স্বতন্ত্র কাব্যাস্বাদে দ্যুতিময় হয়ে উঠতে পারে নি। ফলত তাঁর হেল্ডারলিন ছাড়া অন্যান্য জর্মান কবির কাব্যানুবাদের মধ্যে অধিকতর উল্লেখ্য : হাইনে, রিল্‌কে, গুন্টার আইশ ও পাউল সেলানের কবিতার অনুবাদ।

'গাছের পত্র' প্রথম সংকলন আশ্বিন ১৩৮২, অক্টোবর ১৯৭৫এ প্রকাশিত 'অনুবাদের দায়' নিবন্ধে শঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন, তাৎপর্যপূর্ণ, চরিতার্থ, অনুবাদে, প্রয়োজনবোধ, মগ্নতা ও ভাষাজ্ঞানের মিলনের কথা। ওই লেখাটিতেই তাঁর ও অলোকরঞ্জনের যুগ্ম সম্পাদনায় নিষ্পন্ন 'সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত' সংকলনের দুর্বলতার কথা যে রকম তীব্র ভাষায় তিনি কবুল করেছেন, পরিতাপ করেছেন ওই কাজে উপযুক্ত মগ্নতার অভাবের জন্য, তা অনুবাদকর্ম সম্বন্ধে যথোচিত গুরুত্ববোধ ও দায়িত্বচেতনাকেই ধরিয়ে দেয়। তাঁর কাব্যানুবাদ পরিমাণে তেমন বেশি নয়, কিন্তু তাব মধ্যেই অনুবাদক হিসেবে তাঁর নিবিষ্টতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় যথেষ্ট আলোকিত হয়েছে। অবশ্য এর মধ্যে এলিঅটের দীর্ঘ কবিতা 'ড্রাই স্যালভেজেস'এর অনুবাদ, প্রয়াস হিসেবে অভিনিবেশযোগ্য হলেও মূল কবিতার কবির মানসতাব সঙ্গে যথাযোগ্য সাযুজ্যের অনুপস্থিতিতেই বোধ হয় তেমন অভিঘাতী হয়ে উঠতে পাবে নি। আবার ওই বাঞ্ছিত সাযুজ্যেব নিবিডতাই তাঁব ব্রেশ্‌ট ও হিমেনেথের কবিতার, বিশেষ করে নিকোলাস গিয়েনের কবিতার অনুবাদকে অনস্বীকার্য আস্বাদ্যতায় ঋদ্ধ করেছে। 'চিড়িয়াখানা ও অন্যান্য কবিতা' (দেশবিদেশের কবিতা : ৪) নামে গ্রন্থিত গিয়েনের কবিতা-অনুবাদে মূল কবিতার তির্যক ব্যঙ্গ, প্রতিবাদ-প্রতিবোধ, ক্ষোভ ও অন্তর্বেদনার যুক্ত প্রবাহকে অব্যাহত রেখেই তিনি তাঁর অনুবাদকে স্বতন্ত্র কাব্যমহিমায় গরীয়ান করে তুলতে পেরেছেন।

নানাদেশের নানাভাষার বেশ কয়েকজন কবির কবিতারই অনুবাদ করেছেন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তার মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য দিব্যোন্মাদ ইংরেজ কবি ব্লেক, আর হিস্পানি দুই কবি—লোকস্বভাবী, ইন্দ্রিয়বর্ণিল লোর্কা আর নগ্ন কবিত্বের সন্ধানী হিমেনেথের কবিতার অনুবাদ। একমাত্র প্রকাশিত কাব্যানুবাদগ্রন্থ, হিমেনেথের কবিতা-অনুবাদের সংকলন 'শিকড়ের ডানা'র প্রারম্ভিক নিবেদনে দেবীপ্রসাদ জানিয়েছেন : 'স্বীকার করতে হয় অনুবাদও এক ভাবে কবিতাটির ভাষ্য।'—এই সগর্ভ বাক্যটি সঙ্গতভাবেই 'আক্ষরিক অনুবাদ' কথাটির মধ্যে যে আত্মপ্রতারণার বিভ্রান্তি রয়েছে তাকে উন্মোচিত করে দেয়। অনুবাদকে স্বতন্ত্র কাব্যমূল্যে ঋদ্ধ করার দিকে প্রধানত নজর রেখে, সঙ্গে মূল কবিতার অন্তর্বস্তুটুকু যথাসম্ভব বজায় রাখতে দেবীপ্রসাদ যে সচেষ্ট থেকেছেন, সে কথা তিনি ওই নিবেদনেই প্রকাশ করেছেন : '[illegible]

আমার দুঃসাধ্য জেনে গোড়া থেকেই আমি শুধু চেষ্টা করেছি অন্তত কবিতার বিনিময়ে একটি কবিতা যদি পাওয়া যায়। তার মধ্যে, যথাসম্ভব, অন্তর্বস্তুটুকু অন্তত যাতে না হারায়। যাতে তা একটু পাঠযোগ্যও হয়ে উঠতে পারে আমার ভাষায়।' লোর্কা ('লোর্কা: প্রথম পর্যায়ের কবিতা' মাসিক বাঙলা দেশ অনুবাদ-সংখ্যা বর্ষ ৬ সংখ্যা ৩-৪ আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৭৭) ও ব্লেকের কবিতার অনুবাদে ('অগরিজ অব ইনোসেন্স' পরমা সংকলন : ৩ বর্ষা ১৩৭৭), মূল কবিতার ভাব, আবহ, রূপকল্প ও কবির মেজাজের আভাস যেমন দেবীপ্রসাদ ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, তেমনি বিশেষ অভিনিবিষ্ট থেকেছেন তাঁর অনুবাদকে বাঙলা ভাষার কবিতারূপে চরিতার্থ ক'রে তোলার প্রয়াসে। তবে স্বাভাবিক ভাবেই ব্লেকের কবিতা-অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল ভাষা তাঁর আয়ত্তে থাকার জন্য কাব্যানুবাদের পূর্বোক্ত দুই দিকের মধ্যে প্রার্থিত ভারসাম্য তিনি রাখতে পেরেছেন, কিন্তু হিমেনেথ ও লোর্কার কবিতা অনুবাদ করতে গিয়ে মূলের প্রতি বিশ্বস্ততার চেয়ে অনুবাদকে স্বতন্ত্র কবিতা হিসেবে রসগৌরব দেওয়ার দিকেই তাঁর সুস্পষ্ট ঝোঁক পড়েছে।

র‍্যাঁবো ও ভের্লেনের কবিতার মনোযোগী ও স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছেন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়। আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ওই একই দশকের অর্থাৎ পঞ্চাশের জনসমাদৃত দুজন কবিই, প্রচুর অনুবাদ করেছেন। সুনীলের অবশ্য কাব্যানুবাদের বই এখনও পর্যন্ত একটাই বেরিয়েছে; শক্তির কিন্তু একক ও যুগ্ম কাব্যানুবাদের বই একের পর এক প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদের দুজনেরই অনুবাদ-প্রয়াসে অনুবাদকের দায়িত্ব তেমন ভাবে স্বীকৃত নয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কেমন দায়হীন অবজ্ঞার দৃষ্টিতে যে কাব্যানুবাদকে দেখেছেন, তা তাঁর 'অন্য দেশের কবিতা'-র ভূমিকা "অন্য দেশের কবিতা: বিংশ শতাব্দী'তে স্পষ্ট। সেখানে তিনি লিখেছেন: 'প্রথমেই জানিয়ে রাখতে চাই যে, এই বইতে যাঁরা বিশুদ্ধ কবিতার রস খুঁজতে যাবেন, তাঁদের নিরাশ হবার সম্ভাবনাই খুব বেশি। এ বইতে কবিতা নেই, আছে অনুবাদ কবিতা। অনুবাদ কবিতা একটা আলাদা জাত, ভুল প্রত্যাশা নিয়ে এর সম্মুখীন হওয়া বিপজ্জনক। অনুবাদ কবিতা সম্পর্কে নানা ব্যক্তির নানা মত আছে, আমি এতগুলি কবিতার অনুবাদক, তবু আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, অনুবাদ কবিতার পক্ষে কিছুতেই বিশুদ্ধ কবিতা হওয়া সম্ভব নয়, কখনো হয় নি।' ওই লেখাতেই সুনীল জানিয়েছেন যে, একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির অনুরোধেই তিনি এ কাজে হাত দেন, কোনো অনিবার্য আভ্যন্তর তাগিদে নয়, এরকম কোনো পরিকল্পনাই তাঁর ছিল না। তবু তিনি যে এ দায়িত্ব নিতে পরাঙ্মুখ হন নি তার কারণ এ-কাজটাকে তিনি খুব গুরুতর মনে করেন না। 'এখানে বিশেষ কোনও প্রতিভা বা মেধার প্রশ্ন নেই,

প্রয়োজন শুধু পরিশ্রম।' নানা দেশের নানান্ ভাষার অনেক কবির কবিতাই সুনীল একের পর এক অনুবাদ করে গেছেন তাঁর 'অন্য দেশের কবিতা'য়। এক-একজন কবির বিশিষ্ট মেজাজ, তাঁর কবিতার স্বতন্ত্র ভাবাবহ ও উপস্থাপনভঙ্গি বুঝে নিতে অনুবাদকের যে বিনীত ধৈর্য, নৈষ্ঠিক প্রযত্ন ও ঐকান্তিক নিবিষ্টতার প্রয়োজন, তার বিশেষ কিছু পরিচয়ই তাঁর এই অনুবাদ-প্রয়াসে মেলে না। তবে তাঁর বেশ কিছু কাব্যানুবাদই মূল-সম্পর্কে অনবহিত থেকে একরকম স্বচ্ছন্দে পড়ে যাওয়া যায়। কিন্তু শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মূল কবিতার প্রতি আনুগত্যের ব্যাপারে বেপরোয়া ভাবে অসতর্ক থেকেও, ত্বরিত দায়হীনতায় একের পর এক, ওমর খৈয়াম, কালিদাস, হাইনে, রিল্‌কে, লোর্‌কা, নেরুদা—এই ধরনের ভিন্ন স্বভাবী কবিদের কবিতা, যে ভাবে অনুবাদ করে গেছেন, তাতে প্রায়শই এটুকু স্বস্তিও আবার মেলে না।

স্বতন্ত্র কবিকৃতিতে তেমন চিহ্নিত না হলেও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তন্নিষ্ঠ অভিনিবেশ ও সচেতন একাগ্রতা নিয়ে বেশ কিছুকাল ধরেই অনুবাদ-প্রয়াসে নিয়োজিত রয়েছেন। 'দেশ বিদেশের কবিতা' পর্যায়ে তাঁর চারখানি কাব্যানুবাদ গ্রন্থ: জ্‌বিগ্‌নিয়েভ হেরবের্টের 'ভাবুকবাবু', পেটার হান্‌ট্‌কের 'অর্থহীনতা আব সুখ,' হান্‌স মাগ্‌নুস এনৎসেন্‌সবারগারের 'ফেনা : কবিতা যারা পড়ে না তাদের জন্য কবিতা' ও 'ইয়েশি 'হারাসিমোভিচের কবিতা' এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অগ্রন্থিত কজেভিচ ও হোলুবের কবিতা-অনুবাদ অবশ্যই স্বতন্ত্র মনোযোগের দাবি রাখে।

পুষ্কর দাশগুপ্ত—ষাটের দশকে এই একজন মাত্র কবি-অনুবাদকের মধ্যেই, যথাযোগ্য প্রস্তুতি ও মানসতা, ধৈর্যশীল অনুধাবন, বিনীত প্রযত্ন, তন্নিষ্ঠ অভিনিবেশ খুঁজে পাই। মূল কবিতার ভাববস্তু ও রূপকল্পের যথাসম্ভব আভাস প্রদান ও স্বতন্ত্র বাঙলা কবিতা হিসেবে অনুবাদের শিল্পসার্থকতা সম্পাদন—কাব্যানুবাদের এই দুই দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষায় পুষ্কর বিশেষ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। লোর্‌কা, হিমেনেথ, আলবের্তি—এই তিন প্রধান স্প্যানিশ কবির বেশ কয়েকটি কবিতা অনুবাদ করেছেন তিনি। এর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য লোর্‌কার দীর্ঘ কবিতার অনুবাদ: 'সানচেথ মেহিয়াসের জন্য শোকগাথা' ('সারস্বত' বা 'সারস্বত প্রকাশ' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা)। 'বিশ শতকের ফরাসি কবিতা আটজন কবি'-নামক অনুবাদ-কবিতার এক অতীব উল্লেখযোগ্য সংকলনের সম্পাদক পুষ্কর, এখন সমগ্রত ফরাসি কবিতার অনুবাদেই নিবিষ্ট। পুরোনো ফরাসি কবিদের কবিতা যেমন তিনি অনুবাদ করেছেন, তেমনি অনুবাদ করেছেন আলোয়াই জিয়ুস বের্‌ত্রঁ নামে স্বল্প-পরিচিত কিন্তু তাৎপর্যবান্ ফরাসি কবির কবিতা (Le 24/২৪ তৃতীয় সংকলন) এবং মাক্স জাকব গীয়োম আপলিনেয়র, ব্লেজ সঁদ্রার, সঁ্যা ঝন্ প্যার্স, অঁরি মিশো, ফ্রঁসিস

পোঁজ, জাক্‌ প্রেভের, রনে শার প্রভৃতি কীর্তিমান আধুনিকদের সঙ্গে দানিয়েল বিগার মতো নতুন ফরাসি কবির কবিতাও (Le 24 / ২৪ পঞ্চম সংকলন)। তাঁর সাম্প্রতিক অনুবাদকর্মের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ব্লেজ সঁদ্রারের 'Prose du Transsibe'rien et de la petite Jeanne de France' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতার অনুবাদ, 'ট্রান্সসাইবেরিয়ান আর ফ্রান্সের ছোট্ট জানের গদ্য' এবং জাক্‌ প্রেভেরের 'Lanterne Magique De Picasso'-শীর্ষক দীর্ঘ কবিতার অনুবাদ 'পিকাসোর ম্যাজিক লণ্ঠন' ('বিশ শতকের ফরাসি কবিতা আটজন কবি)। এই দুটি কবিতাব দুরূহ রূপান্তরকর্ম পুষ্কর ধৈর্যশীল নিষ্ঠায ও সাহসিক নৈপুণ্যে সমাধা করেছেন।

সম্প্রতি কালে বাঙলা কাব্যানুবাদের ধারা যে বেশ কিছুটা শীর্ণ ও মন্থর হয়ে পড়েছে, তা একটু অনুধাবন কবলেই বোঝা যায়। এর মধ্যে যা কিছু শ্লাঘনীয় রূপান্তরপ্রয়াস দেখতে পাই, তা সবই প্রায় বয়ঃপ্রাপ্ত কবিদের কৃতি। তরুণতর ও তরুণতম কবিদের মধ্যে এ ব্যাপারে হয় সার্বিক অনীহা ও ঔদাসীন্য, নয় দায়িত্বজ্ঞানবিবহিত নিষ্ঠাহীন বিচ্ছিন্ন ত্বরিত প্রযাসের দেখা মেলে। এর প্রধান কাবণ তাৎপর্যপূর্ণ কাব্যানুবাদপ্রয়াসে নিয়োজিত হতে গেলে যে বিনীত ধৈর্য, নৈষ্ঠিক প্রযত্ন, একাগ্র অভিনিবেশ, মগ্নতা, সুস্থির পঠন ও অনুধ্যান প্রযোজন, এখনকার বাঙলার সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে তার সাক্ষাৎ মেলা ভার। সুলভ চাতুরী ও চমকের প্রলোভন, বহিরঙ্গ পারিপাট্যের ঔজ্জ্বল্যে ভাবের দীনতা ও ভাবনার অগভীরতা গোপন করার প্রতারক প্রবণতা, এখন বাঙলা কবিতায় শুদ্ধতার সন্ধান ও শিল্পসিদ্ধির আকৃতিকে প্রায়শই বিপর্যস্ত করে দেয়। কবির যে মানসিক প্রস্তুতি অর্জন করা চাই, তাঁর যে থাকা উচিত নিরন্তর পঠন-অভ্যাসে দেশবিদেশের কবিদের কাছ থেকে সচেতন সন্ধিৎসু মন নিয়ে শিক্ষাগ্রহণের আগ্রহ, এই প্রোজ্জ্বল সত্যটিই বেশ কিছু কাল আগে থেকে, এ দেশে আডাল হয়ে গিয়েছে। এর ফলে তরুণ কবিদের অধিকাংশের মধ্যে অন্তত লোপ পেয়েছে বিদেশী কবিতার নানা তাৎপর্যপূর্ণ পরীক্ষানিরীক্ষা সম্পর্কে খোঁজখবর রাখার তাগিদ, আর এই মনোভাব বিশেষ করেই কাব্যানুবাদের সিদ্ধির পথে প্রাচীর তুলে দিয়েছে। কারণ মৌলিক কবিতা-সৃষ্টির ক্ষেত্রে অশিক্ষিতপটুত্ব যদি বা কাউকে কখনো-সখনো উতরিয়ে দিতে পারে, নৈষ্ঠিক প্রযত্ন ও সচেতন মননের সাহচর্যহীন নিছক সৃষ্টিকল্পনা কাব্যানুবাদের ক্ষেত্রে কিন্তু শক্তিহীন, অসহায়।

সামগ্রিক ভাবে আধুনিক বাঙলা কাব্যানুবাদচর্চার আর-একটা অভাবের কথাও মনে হয়। বিদেশী কবিতার অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়ে এ কালের বাঙালি অনুবাদক প্রতীচ্যের সমসাময়িক কবিদের প্রায় উপেক্ষা করে পুরোনো কবিদের দিকেই দৃষ্টি দেন। বোদলেয়ার বা রিল্‌কের কবিতা তাই এখনো আমাদের কাছে আধুনিক কাব্যকলার পরাকাষ্ঠার

চিহ্নিত। এই অবস্থার একাধিক হেতুই অনুমান করা সম্ভব। প্রথমত, সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা অন্যের ছাড়া-পোশাক পরতেই বেশি আগ্রহী। তাই পাশ্চাত্ত্য দেশে যে সাহিত্য-আন্দোলন, সাহিত্যিক ভাবনাপদ্ধতি ও প্রকাশরীতি পরিত্যক্ত হয়, আমরা তার দিকেই অবধারিতভাবে ঝুঁকি। দ্বিতীয়ত, পরীক্ষানিরীক্ষামূলক নতুন সাহিত্যের বাহক বিদেশী বই ও পত্রপত্রিকা এ দেশে আসা ক্রমশই কমে যাচ্ছে। ফলে ওই নতুন বিদেশী সাহিত্যের যথাযথ পরিচয় আমাদের কাছে পৌঁছোচ্ছে না। আর তাই ওই সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ বা মুগ্ধতা বোধ করে কোনো অনুবাদক যে তার রূপান্তরে প্রয়াসী হবেন, তার সম্ভাবনা খুবই হ্রাস পাচ্ছে। তৃতীয়ত, এ ক্ষেত্রে আর একটা বড় সমস্যাও রয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক সংস্কার, গ্রামীণ মনোভাব, অবৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা দ্বারা অধিকৃত আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন-পরিবেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত বাঙলা কবিতার ভাষা, দ্রুত ধাবমান পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহক, শিল্প-বিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলির জীবনযাপন ও মানসতার প্রকাশক সমকালীন য়ুরোপীয় কবিতার ভাববস্তু ও উপস্থাপনকে যথাযথ আভাসিত করতে যে সক্ষম নয়, প্রায় গল্প-উপন্যাস-সর্বস্ব বাঙলা ভাষার শব্দের পুঁজি যে আজকের পশ্চিমা কবিতার ভাব ও ভাবনার নানাবিদ্যামুখী বিস্তার ও বৈচিত্র্যের তুলনায় দীন—এ উপলব্ধির সচেতনতাও হয়তো বা সমকালীন প্রতীচ্য কাব্যধারার অনুবাদ-প্রয়াসে বাঙলা ভাষার অনুবাদকদের নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম করে থাকবে।

১৫

কাব্যনাট্য ও তার ভাষা

অশ্রুকুমার সিকদার

যে নৈরাত্মসিদ্ধি বা ব্যক্তিত্বের বিনাশের কথা এলিয়টের নামের সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত, সেই কথাই অন্য ভাবে একদিন কীট্‌স্‌ একটি বিখ্যাত চিঠিতে বলেছিলেন—'একটা ঘরের মধ্যে যখন লোকজনের সঙ্গে আমি থাকি…তখন ঘরের সকলের সত্তা আমার উপর যেন মুদ্রিত হয়ে যেতে থাকে এবং **I am in a very little time annihilated**—আমার আমিত্ব অল্প সময়ের মধ্যেই বিনষ্ট হয়ে যায়।' কীট্‌স্‌ যে *Otho the Great* লিখেছিলেন তাকে কেউ সার্থক কাব্যনাট্য বলবেন না, কিন্তু তাঁর চিঠিপত্র থেকে বোঝা যায় কাব্যনাট্যরচনার মৌলিক শর্ত কীট্‌সের জানা ছিল। সেই মৌলিক শর্ত কীট্‌স-কথিত নিগেটিভ ক্যাপাবিলিটি, নৈরাত্মসিদ্ধির অন্য নাম। **'It has as much delight in conceiving an Iago as an Imogen. What shocks the virtuous philosopher delights the chameleon poet.'** এই নৈরাত্মসিদ্ধি তাঁর দ্বিতীয় প্রকৃতি ছিল বলেই শেক্স্‌পীয়র একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, শ্রেষ্ঠ কাব্যনাট্যকার।

কবিস্বভাবের এই বৈশিষ্ট্য শুধু কাব্যনাট্যের বিষয়বিন্যাসে বা চরিত্রকল্পনায় যে সাহায্য করে তাই নয়, এই বৈশিষ্ট্য ব্যতিরেকে কাব্যনাট্যের ভাষা সমস্যার সমাধান অসম্ভব। কাব্যনাট্যকারের এই নেতিশক্তি যে বিচিত্র সৃষ্ট চরিত্রের আড়ালে স্রষ্টাকে গোপন রাখবে তাই নয়, বা অন্য ভাবে বলতে গেলে, বিচিত্র চরিত্রের মধ্য দিয়েই যে কবিকে প্রকাশ করবে তাই নয়, সে চরিত্রের মুখে পরিস্থিতি অনুযায়ী সঙ্গত ভাষা যোগাবে—চরিত্র সঙ্গত ভাষার মধ্য দিয়ে নিজস্ব সত্তা পাবে। স্বরচিত '*Countess Cathleen*' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ইয়েট্‌স্‌ এই ধরনের কথাই বলেছিলেন। তাঁর মতে, নাট্যকারের নিজস্ব কোনো দর্শন নেই; যদি কোনো দর্শন থাকে তবে তা পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়ে শুধু নয়, কুশীলবের অবস্থা সমস্যা ও ক্রিয়াকর্মের মধ্য দিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে অথচ স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পায়। নাট্যকার যখন বহুরূপী, আর যখন তিনি কবি, তখনই তিনি কাব্যনাট্যকার হতে পারেন।

আর একটা কথা জেনে নেওয়া দরকার, গীতিকবিতার স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীলতায় এবং আপাতপ্রয়াসহীনতায় কাব্যনাট্যরচনা সম্ভব নয়। আকারে-ছোট গীতিকবিতাই একমাত্র কবিতা—কবি গ্রেভ্‌স্‌ বা সমালোচক আইভর্‌ উইন্টার্সের এই দাবি মেনে নিলে

অবশ্য, কাব্যনাট্যকে কাব্য বলে মেনে নেওয়া কঠিন হবে। কিন্তু গীতিকবিতার মানে পৃথিবীর সব রকমের কাব্যকে যাচাই করতে গেলে এমন সব মহা এবং মহৎ কাব্য অপ্রস্তুত হবে, যাদের কাব্যত্বের দাবি অস্বীকার সভ্যতার পক্ষে অসম্ভব। ভেবে দেখা দরকার, কোনো তাত্ত্বিক শুদ্ধতার দায়ে আমরা কার্যত পরশুরামের কুঠার ব্যবহার করতে রাজি আছি কি না। এ কথা সত্য যে, গীতিকবিতার সর্বাঙ্গে যে অনুপ্রাণিত অগ্নিকণিকা থাকে মহাকাব্যে বা কাব্যনাট্যে তা সর্বত্র থাকে না—মধ্যবর্তী অন্য জরুরি অংশগুলিকে পরিকল্পিতভাবে পদ্ধতি ও প্রকরণের বুদ্ধিমান কৌশলে পার করে নিয়ে যেতে হয়; ডিয়নিসীয় মত্ততায় তাদের পংক্তিগুলো জন্ম নেয় না, পরিকল্পনা, বুদ্ধির খাদ, গল্পের কাঠামো ধরে তার আবির্ভাব। এবং আজকাল কে না জানে যে গীতিকবিতাও বেশির ভাগ সময় ডিয়নিসীয় মত্ততায় আবিষ্ট করে জন্ম নেয় না। কাব্যনাট্যে সর্বত্র গীতিকবিতার সমুন্নত শিখর প্রত্যাশা করা যাবে না, বিনিময়ে অথচ জীবন সম্বন্ধে সেখানে এমন এক সার্বভৌম উপলব্ধি অর্জন করা যায়, গীতিকবিতা তার সমগ্র সুষমা সত্ত্বেও যা দিতে কদাচ সক্ষম। তাই যে কবি গীতিকাব্যকেই কাব্যের পরাকাষ্ঠা বলে বিবেচনা করেন, অনুপ্রেরণাবাদের উত্তেজনায় বুদ্ধিকে নির্বাসন দিতে চান, তাঁর পক্ষে কাব্যনাট্য রচনা অসম্ভব কর্ম। গীতিকবিতা প্রথম স্বরের কাব্য, কাব্যনাট্য তৃতীয় স্বরের কাব্য—এদের পার্থক্য মৌলিক। কাব্যনাট্যে নানা বিরুদ্ধ দাবিসমূহের মধ্যে রচয়িতাকে যে সামঞ্জস্য ও বোঝাপড়া করতে হয়, তা হয় গীতিকবির স্বভাববিরুদ্ধ, অথবা তা তিনি করতে অনিচ্ছুক। কাব্যনাট্যকারকে অথচ বুদ্ধির খাদ ও চিন্তার কাঠামোর সঙ্গে ক্ষণদাক্ষিণ্যময়ী প্রেরণার বারবার বোঝাপড়া করতে হয়।

তার নামই জানিয়ে দিচ্ছে তাকে নাটক ও কাব্য হিসাবে সার্থক হতে হয়। এ কথার অর্থ এই নয় যে রচনাটিতে সমগ্র ভাবে নাট্যলক্ষণ মোটের উপর বর্তমান থাকবে; তার অর্থ এই যে, তার প্রত্যেকটি বাক্য ও চরণকে নাটকীয় সঙ্গতির কষ্টিপাথরে যাচাই করতে হবে। আবার রচনাটির কোনো কোনো চরণ বা কোনো কোনো অংশ কাব্যত্বের দ্বারা আক্রান্ত হলেই চলবে না, উপরন্তু সমগ্র নাটকটিকে হয়ে উঠতে হবে একটি অখণ্ড কাব্য। এখানে নাটকীয়তার মধ্যে কাব্যত্ব এবং কাব্যত্বের মধ্যেই নাটকীয়তা নিহিত। এই জৈব ব্যাপার থেকে কাব্যত্ব ও নাটকীয়তাকে বিচ্ছিন্ন ভাবে বিচার করার অর্থ শবব্যবচ্ছেদ করা অথচ তাতে প্রাণের রহস্য অজানা থেকে যায়। কাব্যনাট্যকে নাটক হওয়ার পরেও কাব্য হতে হবে। ঘটনা গতি উৎকণ্ঠা বিস্ময় এই সব নাটকীয় গুণ যেমন থাকবে, তেমনি ঘটনা চরিত্র ভাষাকে কেন্দ্র করে তারই মধ্য দিয়ে একটি কেন্দ্রীয় তাৎপর্যও পুষ্পিত হবে কাব্যের মতো। কাব্যনাট্যে বস্তুমরীচিকার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসবে কবির দিব্যদৃষ্টি, কবির ধ্যান। কাব্যনাট্যকে দুই হিসেবে সত্য ও

বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে হয়—একদিকে জীবনের নাটকীয় সংঘাতের চিত্র হিসাবে, অন্য দিকে কবির দিব্যকল্পনার প্রতীক হিসাবে। দুই স্তরে একই সঙ্গে কাব্যনাট্যকে সফল হতে হবে—বাস্তবতা ও প্রতীকের স্তরে। আমাদের পরিচিত 'অধঃপতিত স্বপ্নের' জগৎ, বিশ্বাসভঙ্গের ভুবন, তার এক খণ্ড বস্তুমরীচিকা নাটকে ধরতে হয় ; তারই মধ্যে আবার বিম্বিত করতে হয় উপলব্ধির নির্যাসকে, প্রতীকী সত্যকে। মানুষের জগৎকে বর্জন করে নাটক রচিত হতে পারে না, কেননা 'It is the anthropomorphic form *par excellence*'। মানুষের সঙ্গেই এসে যায় মানুষের সংঘাত পরিশ্রম স্বেদের লবণ। কিন্তু কাব্যনাট্য সেই দিনানুদিনের স্তরে থাকে না, তাকে উঠতে হয় ধ্যানময় সত্যের স্তরে, স্থায়ী উপলব্ধির অতিমর্ত্য জগতে।

কাব্যনাট্যের চরিত্রেরও তাই দুই স্তরের সাফল্য চাই—বাস্তবতার স্তরে এবং ব্যঞ্জনার স্তরে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য মনে রাখা দরকার কাব্যনাট্যের চরিত্রের এই দুই স্তর আসলে অবিভাজ্য। এক দিকে সমাজে স্বভাবে অভিজ্ঞতায় যে ধরনের মানুষ দেখি সচরাচর চরিত্রটি তাদের প্রতিনিধি হবে। প্রতিনিধি হবে, কিন্তু তাই বলে লুপ্ত হবে না তার প্রাতিস্বিকতা। এই পর্যন্ত গেল বাস্তবতার স্তর। কিন্তু আরো এক স্তর আছে যেখানে চরিত্র মানুষের প্রতিচ্ছবি নয়, সত্যের ব্যঞ্জনা, উপলব্ধির প্রতিমা। আবার কখনো কাব্যনাট্যকারের নিজস্ব সত্তার, এমন কি অজ্ঞাত সম্ভাবনার উপলব্ধি ও প্রকাশের মাধ্যম—যে স্তরে অন্ধ রাজা অয়দিপাউস সোফোক্লিসের সত্তার অন্তরতম কোনো সম্ভাবনাকে ভাষাগত প্রকাশের আলোয় আনে। এলিয়টের শহীদ বেকেটের মধ্যেও মনে হয় স্রষ্টার অজ্ঞাতে স্রষ্টার সত্তার নানা উপকরণ—অহমিকা, প্রলোভন, আত্মসমর্পণ—সব প্রকাশ পেয়েছে। এই ব্যাপার হয় বলেই, যদিও চরিত্রের মুখে পারিপার্শ্বিক অনুযায়ী সঙ্গত ভাষা যোগানো কাব্যনাট্যকারের কাজ, যদিও সমস্ত চরিত্রের মধ্যে অপক্ষপাত স্রষ্টার মতো বিরাজ করা তাঁর কর্তব্য, তবুও কোনো কোনো সময় যে চরিত্র কাব্যনাট্যকারের সত্তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে আলোয় টেনে বের করে, সেই সমস্ত চরিত্রের মুখের কথার সঙ্গে কাব্যনাট্যকারের নিজের কথা যেন দ্বৈতকণ্ঠে উচ্চারিত হতে থাকে। কারণ কাব্যনাট্যকার শুধু বহুরূপী স্রষ্টা নন, তিনি কবি, তিনি দ্রষ্টা। পরিস্থিতি-পরিবেশ অনুযায়ী, চরিত্রসঙ্গতি বজায় রেখে সংলাপের বাক্যপুঞ্জের একটা প্রাথমিক অর্থ থাকে, অন্য দিকে কাব্যনাট্যকারের নিজের তরফ থেকে সেই একই বাক্যপুঞ্জের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে তিনি সঞ্চারিত করে দেন কোনো স্বতন্ত্র মহত্তর ব্যঞ্জনা। *The Elder Statesman*এ লর্ড ক্লাভারটনের মুখের এই কথা কয়টি কি শুধু বৃদ্ধ নায়কের কথা ? মনে হয়, বার্ধক্যের দরজায় এসব এলিয়টেরও কথা :

I hope this benignant sunshine

And warmth will last for a few days more.
But this early summer, that's hardly seasonable,
Is so often a harbinger of frost on the fruit trees.

সমস্ত কাব্যনাটক যে কারণে সামগ্রিক বিচারে একটা অখণ্ড কাব্য, সেই কারণে এই ধরনের নাটকে চরিত্রগুলি হয়, উইলসন নাইটের ভাষায়, 'symbol of a poetic vision'। সহযোগী ও প্রতিবাদী ইমেজের মধ্য দিয়ে যেমন একটি কবিতার অগ্রগতি ও বিকাশ হয়, তেমনি সহযোগী ও বিরুদ্ধবাদী চরিত্রের মধ্য দিয়ে কাব্যনাটকের অগ্রগতি হয়, তার মধ্যে ধরা পড়ে কাব্যের মহিমা।

বুঝে নিতে হবে, কাব্যনাট্যের কথা বলতে গেলে কেন বারেবারেই ভাষার কথা এসে যায়। ককতো 'poetry of the theatre' এবং 'poetry in the theatre' এই দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন তার মধ্যে 'poetry in the theatre'ই কাব্যনাট্য এবং সেইটিই আমাদের বিবেচনার বিষয়। আগের আলোচনায় স্পষ্ট করেছি এই কবিতা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, নাটকের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আবার এই কবিতা ফ্রান্সিস ফার্গুসনের 'theatrical poetry' বা 'hidden poetry'ও নয়। ঘটনা-পরম্পরার অনুপুঙ্খের মধ্যে যে কবিতা নিহিত থাকে, যে কবিতা প্রচ্ছন্ন থাকে ভাষার আড়ালে সেই কবিতা কাব্যনাট্যের কবিতা নয়। কাব্যনাট্যে মেনে নিতে হবে ভাষার প্রাথমিকতা। ফার্গুসনের মতে মঞ্চের এই কবিতা 'based upon the histrionic sensibility and the art of acting; it can only be seen in performance or by imagining a performance'। অভিনয়ের বাইরে বা নিচু দরের অভিনয়ে এই অদৃশ্য কবিতা হারিয়ে যায়। কিন্তু কাব্যনাট্যের কবিতা অভিনেতার স্বরক্ষেপ বা অঙ্গসঞ্চালনের উপর নির্ভরশীল নয়। নাটকের নিরুচ্চার মুহূর্তে এই যে 'non-verbal' কবিতার দেখা মেলে সেই কবিতা কাব্যনাট্যের কবিতা নয়। কাব্যনাট্যের কবিতা ভাষায় আশ্রিত—অভিনেতা-নির্দেশকের যোগ্যতা-অযোগ্যতার পরপারে তার স্থান।

২

বাস্তবতার শর্ত পালনের জন্যে নাটকের ভাষার ক্ষেত্রে পদ্যের জায়গায় গদ্যের দাবিকে প্রবল ভাবে সমর্থন করেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিপন্থীরা। গদ্যই যেহেতু চলতি জীবনের বিনিময়-মাধ্যম সেই কারণে যুক্তিপন্থীরা মনে করেছিলেন একমাত্র গদ্যের সাহায্যে জীবনের বাস্তব রূপটিকে সঙ্গত ও সত্যভাবে রূপায়িত করা সম্ভব। পদ্যছন্দের মোহকারী শক্তিকে তাঁরা নিদারুণ সন্দেহের চোখে দেখতেন। নাটকে গদ্য ব্যবহার

যখন একচ্ছত্র হয়ে উঠল তখন আমরা সোফোক্লিস বা শেক্‌স্‌পীয়র বা রাসিন্‌কে পেলাম না বটে, কিন্তু চেখফ্‌ ইব্‌সেন সীগ্ণ শ-প্রভৃতিকে পেলাম এবং তাঁদেরই অন্যতম ইব্‌সেন একটি চিঠিতে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করলেন, 'Verse has been most injurious to dramatic art'। কিন্তু যুক্তিবাদের প্রতাপে নাটকের মাধ্যম একমাত্র গদ্যই হয়ে ওঠায় নাটকের মান নেমে এলো—নাটক যেন আর আগের মতো উচ্চাশী রইল না।

বাস্তবতার তাগিদে প্রকৃতির মুখে আয়না ফেলার ভ্রান্ত উৎসাহে কিছুদিন পরেই ভাঁটা পড়ল। নাট্যকারেরা আর 'desert of exact likeness to reality'র বন্ধ্যাত্বে তৃপ্ত হতে পারলেন না। যে এক স্বতন্ত্র ভুবন সন্ত বা মাতালের চোখে ধরা পড়ে, ধরা পড়ে দিব্য অপাঙ্গে, সেই অতিমর্ত্য সত্যের জগৎকে ধরার জরুরি দরকার অল্প দিন পরেই নাট্যকারেরা অনুভব করতে শুরু করলেন। বুঝলেন তাঁরা, পরিবর্তমান বাস্তব জগতের বস্তুমরীচিকা গদ্যনাটকে সহজেই ধরা যায় বটে, কিন্তু ধরা যায় না নিহিত সত্যকে, মানবনিয়তির প্রগাঢ়তম উপলব্ধিগুলিকে। নাটকের বাহন হিসেবে গদ্যের এই দুর্বলতা বুঝতে পেরে কেউ-কেউ গদ্যের সীমানা বাড়াতে চাইলেন, চাইলেন গদ্যের মধ্যে কবিত্ব আনতে। এই চেষ্টার প্রমাণ আছে চেখফে ইব্‌সেনে, স্ট্রিণ্ডবার্গে, রবীন্দ্রনাথে। কিন্তু সম্প্রতি শঙ্খ ঘোষ যেমন চমৎকার ভাবে দেখিয়েছেন, গদ্যের কবিতা আর গদ্যকবিতা এক নয়, তেমনি কবিত্ব থাকা আর কবিতা হয়ে উঠা এক ব্যাপার নয়। ইংরেজি অনুবাদের উপর নির্ভর করে কিছু জোর করে বলা উচিত নয়, তবু ওয়াকিবহাল সাক্ষীদের সমালোচনা থেকে মনে হয়, ইব্‌সেন বা চেখফের নাটকে কখনো-কখনো কবিত্ব এসে যায় বটে, কিন্তু তাঁদের গদ্যনাটক কবিতা হয়ে ওঠে নি। এলিয়টের মতে চেখফ্‌ ও ইব্‌সেন অসামান্য প্রতিভাধর হওয়া সত্ত্বেও গদ্যের দ্বারাই তাঁরা বিঘ্নিত। ফার্গুসন বলেন ইব্‌সেন ও চেখফের সাফল্য 'represents a triumph over the limitation of the modern realistic theatre.'। তাঁরা নাটকে কবিত্ব সঞ্চার করেছেন, কিন্তু আমাদের আলোচ্য নাটকের কবিত্ব নয়, কাব্যনাট্য—এমন নাটক যা আবার কবিতাও। বোধ হয় একমাত্র রবীন্দ্রনাথ 'ডাকঘর'এ এমন গদ্যনাটক লিখতে পেরেছিলেন যে নাটক হয়ে উঠেছে কাব্যনাট্য। 'ডাকঘর'—যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'গদ্যলিরিক'—তার শব্দকে যথাস্থান থেকে না সরিয়েও তাকে যে গদ্য-কবিতার ফর্মে সাজানো যায় সেটা আমি অন্য জায়গায় প্রমাণ করেছি। 'ডাকঘর'এ যা আছে তা গ দ্যে র ক বি তা ন য়, গ দ্য ক বি তা—তাই এই গদ্যনাটক হয়ে উঠেছে কাব্যনাট্য। 'অন্তর্মুখী বিষয়কেও গদ্য ধরতে চায় তার বাইরের দিকে উদ্ঘাটন

করে। কবিতায় আছে এর উল্টো চলন। কবিতা বাইরের বিশ্বকেও আয়ত্ত করতে চায় ভিতরের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে।' সেই দিক থেকেও 'ডাকঘর' কবিতা, তাই কাব্যনাট্য। আর একটা গদ্যনাটককে বোধ হয় এই মর্যাদা দেওয়া যায়—বেকেটের *Waiting for Godot* যেখানে একটি 'totally unique experience' কবিতার ভাষার স্বচ্ছতায় প্রকাশিত। লোরকার *The House of Bernarda Alba* বা ডাইলান টমাসের *Under Milk Wood* নাটকের গদ্যে কবিত্ব থাকলেও তাদের কাব্যনাটক বলা যায় না, কারণ এই দুই নাটক বাইরের দিক উদ্ঘাটন করে, আমাদের ভিতরের দিকে ঘুরিয়ে নেয় না। তাই অনেক গদ্যনাটকে কবিত্বের ছোঁয়া লাগলো বটে, বাস্তব-অনুকরণের বাইরে গদ্যের সীমা প্রসারিত হল বটে, কিন্তু বিরল ব্যতিক্রম বাদ দিলে, গদ্যনাটক কাব্যনাট্য হলো না।

গদ্যের সীমার মধ্যেই বাস্তবের অতিরিক্ত সত্যকে ধরার চেষ্টায় কেউ-কেউ প্রতীক ব্যবহার করলেন। শুধু মেটারলিঙ্ক নয়, যে ইবসেন একদিন 'ডল্স্ হাউস' রচনা করেছিলেন, তিনি স্বভাবপন্থার দাবি একদিন পরিত্যাগ করে প্রতীকের আশ্রয় নিলেন। তিনি লিখলেন, *The Wild Duck*, *The Lady from the Sea*-ইত্যাদি। প্রচলিত পরিচিত জগতের অন্তরালে অন্তর্গূঢ় সত্যকে ধরতে গিয়ে সচেতন ভাবে প্রতীকের আশ্রয় নিলেন, যেমন ইব্সেন তেমনি চেখফ্। ইব্সেনের বন্য মরাল, ঠাণ্ডা উত্তর সমুদ্র যেমন প্রতীক, তেমনি প্রতীক চেখফের সমুদ্রসারস। সনাতন কাল থেকেই অবশ্য নাটকে প্রতীক ব্যবহৃত হয়ে আসছে, কিন্তু সেই সব নাটকে প্রতীকের বিশেষ স্বতন্ত্র সচেতন গুরুত্ব ছিল না। আধুনিক নাটকে সত্যের ব্যঞ্জনা ধরার জন্য প্রতীকের ব্যবহার হয় সচেতন ভাবে—তার মধ্যে সঞ্চারিত করা হয় অতিরিক্ত তাৎপর্য; নাট্যকেন্দ্রও সরে যায় সেখানে, যেমন 'মুক্তধারা'র বাঁধে, 'রক্তকরবী'র জালাবরণে। সে যাই হোক, প্রকৃত প্রতিভাবান স্বভাবপন্থী নাট্যকার, যিনি স্বেচ্ছায় গদ্যকে নাট্যবাহনরূপে নির্বাচন করেছেন, তাঁকে কী ধরনের অসুবিধায় পড়তে হয়ে *Seagull* তার চমৎকার নিদর্শন। গদ্য দিয়ে কাব্যের তাৎপর্য ধারণের চেষ্টায় যে অবশ্যম্ভাবী অসুবিধা তার থেকে মুক্তিপণ হিসেবে ব্যবহার করতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত ঐ সমুদ্রসারসের প্রতীককে। গদ্যে স্বেচ্ছাবন্দী না হলে অথচ এই তাৎপর্যের দ্যোতনা কাব্যনাট্যের স্পন্দিত ভাষার প্রকাশ করা যেত, সম্ভবত কোনো প্রতীকের ব্যবহার ব্যাতিরেকেই।

এলিয়ট তাঁর নাটকের বাহন হিসেবে পদ্য ব্যবহার করে বাস্তবের পরিচিত ভুবন এবং তারই সঙ্গে সম্পৃক্ত সত্যের প্রতীকী ভুবনের মধ্যে সংযোগ রচনা করলেন, এখানেই এলিয়টের কাব্যনাট্যের ঐতিহাসিক মূল্য। তাঁর রচনার সাহিত্যমূল্য সম্বন্ধে মত-পার্থক্যের অবকাশ আছে, কিন্তু কাব্যনাট্যের ছন্দপ্রকরণ নির্বাচনে তাঁর তত্ত্ব ও ব্যবহারের

গুরুত্ব মানতেই হবে। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যনাট্যে কাব্যের প্লাবনে নাটকের ডুবুডুবু অবস্থা। মেটারলিঙ্ক প্রমুখ প্রতীকী নাট্যকারের প্রভাবে কাব্যিকনাট্য নামে যে সংকর পদার্থের জন্ম হয়েছিল তাও 'urgencies of actuality' বর্জন করে খামখেয়ালি কাল্পনিকতা, কূটত্ব ও রূপকথার জগতে যেন প্রস্থান করেছিল। কোনো কোনো বিষয় নিজে-নিজেই কাব্যময় এই ভ্রান্ত ধারণা ওই সব নাট্যকারকে ওই কর্মে আরো বেশি প্ররোচিত করেছিল। তারই জন্যে মনে করা হত, যা বাস্তবজীবন থেকে, সাময়িক কালের তপ্ত সমস্যা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন—রূপকথা বা পুরাণ বা অতীত ইতিহাসের বিস্মৃত জগৎ—তাই বুঝি কাব্যনাট্যের একান্ত বিষয়। এক ধরনের গদ্যনাটক যেমন বাস্তবের তাগিদে আপতিক-সাময়িকের বাইরে মুখ বাড়ালো না, তেমনি এই দ্বিতীয় ধরনের প্রতীকী বা কাব্যিক গদ্যনাট্য বা ভুল আদর্শের কাব্যনাট্য সম্পূর্ণ জীবন-বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজস্ব নির্মিত এক শূন্যতায় বিলম্বিত হয়ে থাকল। ইবসেন ও চেখফ্ যেখানে গদ্যের গণ্ডির মধ্যে দাঁড়িয়ে কাব্যের প্রতীকী জগৎকে ধরতে চেয়েছিলেন, সেখানে এলিয়ট উলটো দিক থেকে এসে পদ্যের মাধ্যমে সমসাময়িক জগতের ধমনীর কম্পনটি ধরতে চাইলেন। দুই জগৎকে পুরোপুরি মেলাতে পারেন নি ইব্‌সেন-চেখফ্; দুই জগতের মধ্যে মিলন ঘটানোর কৌশলটি শেখালেন এলিয়ট। সত্যকে আপতিকের সঙ্গে আপতিককে সত্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে শেখালেন তিনি কাব্যভাষার সাহায্যে। এলিয়টের যাত্রাক্রম ইব্‌সেনের বিপরীত দিকে—প্রথম নাটকের ধর্ম ও রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বসংকুল, ধর্মীয় শহীদের ঐতিহাসিক পরিবেশ ও ক্যাথিড্রালের মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডল পরিত্যাগ করে তিনি দ্বিতীয় নাটকে স্বভাবপন্থার অতিপরিচিত ড্রইংরুমে ফিরে এলেন। কোনো কোনো বিষয় নিজে-নিজেই কাব্যময় এই ধারণার অবসান ইতিমধ্যে ঘটায় এলিয়টের পক্ষে এই প্রত্যাবর্তন বেশি সহজ হয়েছিল। আর এই বিষয়ের অনুরোধে তিনি কাব্যনাট্যকে চেনা পৃথিবীর কাছে ফিরিয়ে আনলেন বটে, কিন্তু তাঁকে সত্যের প্রতীকী জগৎকে উপেক্ষা করতে হল না—কেন না আপতিকের গহনে প্রচ্ছন্ন সত্যোপলব্ধিকে অমরত্ব যে দিতে পারে সেই ছন্দঃস্পন্দময় ভাষাই তাঁর বাহন। সাময়িকতার দাবিতে তাঁর কাব্যনাট্যের ভাষা মুখের কথার স্পন্দনের নিকটবর্তী, স্থায়ী সত্যের দাবিতে অথচ তা নিঃসন্দেহে কাব্য হয়ে উঠতে চায়।

কাব্যনাট্যের ভাষা 'হীন স্বপ্ন' ও 'সমুন্নত স্বপ্নের' আপাত-দ্বিধাবিভক্ত জগতের মধ্যে সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াত করবে। বস্তুসত্য ও তদতিরিক্ত সত্যকে এই ভাষা একই সঙ্গে স্পর্শ করে নাটকীয়তা ও কাব্যত্বের যুগ্ম সার্থকতায়। নাটকে প্রকৃতির অনুকরণপ্রবণতা, মাইমেসিস বা 'naturalist fallacy'র বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ইয়েট্‌স্‌ও একজন ছিলেন। এলিয়ট স্বভাবপন্থীর পরিবেশ স্বীকার করে নিয়েও কবিতার সাহায্যে

এই গণ্ডিবদ্ধতাকে অতিক্রম করে গেলেন, কিন্তু ইয়েট্‌স্‌ স্বভাবপন্থার সঙ্গে ততটুকুও বোঝাপড়া করতে তৈরি ছিলেন না। আইরিশ রূপকথা লোককাহিনী থেকে নাটকের কাহিনী নির্বাচনে তিনি সংকোচ বোধ করলেন না, যদিও সঙ্গত কারণেই সেই সব উপাখ্যানকে তিনি আধুনিক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তুললেন। অন্য দিকে 'dry as dust' আধুনিক মানুষের ব্যবহৃত সংকর গদ্য তিনি অগ্রাহ্য করলেন মহৎ ভাব-প্রকাশের অনুপযুক্ত বিবেচনায়। ইয়েট্‌স্‌ তাঁর নাটকে সন্ত ও মাতালের চোখে যে সত্য কখনো কখনো ধরা পড়ে তাকে স্থায়িত্ব দেবার জন্যে ছন্দোবদ্ধ বাণীকে নির্বাচন করেছিলেন—বস্তুজগৎকে শিল্পময় শৃঙ্খলা দেবার প্রয়োজনে 'ancient sovereignty of language' প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কাব্যনাট্যে ভাষার এই প্রাধান্য মেনে নিতে হবে। গীতিকাব্যের জায়গায় কাব্যনাট্যের সাধনা ইয়েট্‌স্‌-এর মতে পৌরুষের সাধনা—কিন্তু এই পৌরুষের সাধনায় সিদ্ধি, তার মতে, একমাত্র কাব্যের ছন্দোবদ্ধ বাণীর টংকারই দিতে পারে।

স্বভাবপন্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে জাপানি নোহ্‌ নাটকের প্রভাবে ইয়েট্‌স্‌এর নাটকের পরবর্তী বিবর্তন হল নৃত্য ও নাটকের ভেদরেখা লোপের দিকে। শব্দের ব্যুৎপত্তি আমাদের বলে যে একদিন নৃত্য ও নাট্য একই বীজ থেকে জন্ম নিয়েছিল, কিন্তু সে অনেক প্রাচীন কালের কথা। তারপর দীর্ঘ সময়ের বিবর্তনে এই দুই শিল্প পৃথক্‌ ধর্ম ও স্বতন্ত্র ঐতিহ্য অর্জন করেছে। আজ তাদের মধ্যে ভেদরেখা লুপ্ত করে দিলে সেই তৃতীয় শিল্প নাটকও থাকবে না, নৃত্যও থাকবে না—হয়ে উঠবে অন্য এক শিল্প, যার নাম রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন নৃত্যনাট্য, ইয়েট্‌স্‌এর অনুকরণে তার অন্য নাম হতে পারে 'plays for dancers'। শিল্পমাধ্যমের সংমিশ্রণে আপত্তির প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন স্বতন্ত্র শিল্প হিসাবে চিহ্নিত করার। আর এই সংমিশ্রণের আর এক অর্থ দাঁড়ায়, ভাষার যে প্রাচীন সার্বভৌমত্ব ইয়েট্‌স্‌ নাটকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত সেই ভাষার উপর আস্থাহীনতা, বাক্যের সৃষ্টির উপর সংশয়। গদ্য নাট্যকারেরা একদিন যেমন নিরুপায় হয়ে প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছিলেন, ইয়েট্‌স্‌ও তেমনি নৃত্যের সহযোগ চাইলেন। এই চাওয়া এক দিক থেকে ব্যর্থতার স্বীকৃতি। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যকে যদি এই সঙ্গে কাব্যনাট্য হিসেবে বিচার করি, তা হলে দেখি তুলনায় রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে ভাষার মহিমা অনেক বেশি—কারণ এখানে সুর ও নৃত্যের ভঙ্গিমা, ভাষায় নিবদ্ধ ভাববস্তুর অনুগামী। ইয়েট্‌স্‌এর '*At the Hawk's Well*' প্রভৃতি নাটকে নৃত্য, আবহসংগীত, বাজপাখির চীৎকার, প্রতীকী ভঙ্গিমা, ভাষার সঙ্গেই সমান মূল্যবান। কিন্তু সত্যকার কাব্যনাট্যে এরা বড়ো জোর পশ্চাৎপটের মূল্য পায়—তার অন্তর্নাট্য ও বহির্নাট্যের যথার্থ প্রতিষ্ঠা ভাষার অমর বিন্যাসের মধ্যে। তাই

কাব্যনাট্য ব্যাপারে ইয়েট্স্‌এর পরবর্তী পরীক্ষানিরীক্ষা আমাদের এক কানাগলিতে উত্তীর্ণ করে, সেখান থেকে অগ্রগতির পথ অবরুদ্ধ। কাব্যনাট্যের আদর্শ এতই দুরধিগম্য যে এলিয়টও একবার হতাশ হয়ে ভেবেছিলেন ব্যালেই হতে পারে যথার্থ কাব্যনাট্য—যেখানে বিশুদ্ধ সংগীতকে আশ্রয় করে অভিব্যক্ত হয় নৃত্যের বিশুদ্ধ ভঙ্গিমা। তবু এই কবি তত্ত্বের দিক থেকে অন্তত কাব্যনাট্যের অনেক প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন ; তাঁর সেই মীমাংসাগুলো আমাদের জেনে নেওয়া দরকার।

৩

কাব্যনাট্য বাস্তবকে আশ্রয় করে, কিন্তু শুধু বাস্তবের মধ্যে নিবদ্ধ-গ্রথিত থাকতে পারে না। বাস্তবতার দাবিতে এলিয়ট পরবর্তী নাটকসমূহে সমসাময়িক পরিমণ্ডল গ্রহণ করেছেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে এমন ছন্দোবদ্ধ বাণী নির্বাচন করেছেন যা বাস্তবজীবনের কথ্যপ্রকরণের সঙ্গে আত্মীয়তা রেখেও গদ্যের ও শুকনো বাস্তবতার আত্মাহীন গণ্ডিকে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারে। এলিয়টের কৌশল হচ্ছে, সাধারণ মানুষের মুখের কথা বাক্‌ভঙ্গিমার স্পন্দনে দুলিয়ে দিয়ে, তাকে গভীরতর তাৎপর্য বহনের যোগ্য করে তোলা। এবং এইভাবে দুই জগতের মধ্যে সেতু নির্মাণ করা। *The Confidential Clerk* নাটকে স্যার ক্লড্ বলেছে—

> I want a world where form is the reality
> Of which the substantial is only a shadow.

গদ্যনাটক যাকে আয়ত্ত করে সে স্থূলবস্তু বা 'substantial', জানে না যা ধরা পড়ে সে আসলে ছায়া, সত্যের মরীচিকা। কাব্যনাট্য 'form'এর মধ্য দিয়ে 'reality'কে ধরতে পারে, কেন না রূপ ও বস্তুর মধ্যে সেখানে কোনো ভেদ নেই। প্রকৃতপক্ষে সেক্যুলার ও স্পিরিচুয়ল এই দুই ভুবনের মধ্যে, 'form' ও 'realityর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করাই আর্টের প্রধান সমস্যা।

জীবনের কেন্দ্রটি যদি কাব্যের বহুধাবিচিত্র ভাষায় বিধৃত হয়, তা হলে সত্যোপলব্ধির সংস্পর্শে বস্তুজগৎ পুষ্পিত হয়ে উঠবে ; সমস্ত বিশৃঙ্খল উন্মার্গগামী তাৎপর্যরহিত বহির্জগৎ শিল্পের দিব্য সুষমায় সুশৃঙ্খল, অমর ও সত্য হয়ে উঠবে। বিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতার জগতে শিল্পের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে এলিয়ট ভাষার উপর, নাটকীয় ছন্দোবদ্ধ ভাষার উপর, তাঁর সুগভীর আস্থা স্থাপন করেছেন। ছন্দের আভ্যন্তরীণ সুনিয়মিত সংগঠনই কাব্যকে গদ্য থেকে পৃথক্ করে দেয়। ভিতরে এই সংগঠন থাকে বলেই বিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতার জগতে শৃঙ্খলা স্থাপন করার তার সামর্থ্য

এত বেশি। আর ছন্দোবদ্ধ সার্থক কাব্যের পরিণামেই যেহেতু শম, নিঃশব্দ ও 'একক অগ্নিশিখা'র বিরল রাজ্যে প্রবেশ করা যায়—সেই কারণেও ছন্দোবদ্ধ ভাষার সামর্থ্য বেশি। ছন্দোবদ্ধ ভাষা,—কিন্তু কোন্ ছন্দ? অমিত্রাক্ষর? কিন্তু অমিত্রাক্ষর বড বেশি নিয়মিত, এবং সমকালের জীবন থেকে সম্পর্কবিহীন। এলিয়টও তাই নিয়মিত ব্ল্যাংক্ ভার্স ব্যবহার করেন নি। না কি গদ্যছন্দ? অথচ গদ্যছন্দে চলতিকালের বস্তুমরীচিকাকে যত সহজে ধরা যায়, তত সহজে ধরা যায় না অন্তর্গূঢ় সত্যকে। মনে হয় আধুনিক কাব্যনাট্যের পক্ষে মুক্তছন্দই সব চেয়ে উপযোগী—যে ছন্দে স্বাধীনতা ও নিয়মের সম্মিলন—স্বাধীনতা দিয়ে সে ধরে সাময়িককে, নিয়ম দিয়ে সে ধরে সত্যের সুষমাকে। এই ছন্দের স্পন্দন অনুভব করা যায় রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলো পড়ার সময়, তাদের সুরহীনতার অপরিহার্য 'শ্রীহীন বৈধব্য' সত্ত্বেও। 'কালসন্ধ্যা'-ইত্যাদি কাব্যনাট্যে বুদ্ধদেব বসুরও প্রধান বাহন সেই ছন্দ।

ভাষার উপরে এলিয়ট-ধরনে এতখানি ভরসা রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে অনেক সমালোচক বলেন, যাঁরা কবি হিসেবে সার্থক হবার পর নাটক রচনায় হাত দেন তাঁরা আসলে পূর্বের অভ্যাসের বশে স্বাভাবিক ভাবে ভাষাকে মূল্য দেন বেশি—তাঁরা বুঝতে চান না, নাটকের পক্ষে ভাষা যথেষ্ট নয়। এ কথা ঠিক যে কাব্যময় ভাষা যথেষ্ট নয়, নাটকে থাকতে হবে নাটকীয়তা। কিন্তু নাটকের নাটকীয়তা বলতে যাই বুঝি না কেন, তারো সত্যকার অবলম্বন ভাষা। তাই কাব্যনাট্যকার যদি ভাষাকেই প্রাথমিক বলে মনে করেন তা হলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। তা ছাড়া আগেই বলেছি, সর্বোচ্চ বিচারে মহৎ কাব্যনাট্য একটি অখণ্ড কাব্যও বটে। একদিকের বিচারে নাটক জীবনের প্রতিচ্ছবি, চরিত্রগুলি সেখানে জীবন-সমস্যার মুখোমুখি হয়ে কথা বলে, কাজ করে, আবার অন্য দিকের বিচারে সমস্ত চরিত্রের ঐকতানের মধ্য দিয়ে নাট্যকার একাই কথা বলেন, 'making a play its author's poem.'। শব্দবিন্যাস, সহযোগী-প্রতিযোগী ইমেজের অত্যন্ত নিপুণ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নাইট্স্ তাঁর 'শ্রীযুক্তা ম্যাকবেথের কয় সন্তান ছিল?'-প্রবন্ধে দেখিয়েছেন ঘটনা বিরোধ সমস্ত কিছু ছাপিয়ে শেক্স্পীয়রের নাটকটিকে একটি দীর্ঘ কবিতা হিসেবে দেখা যায় এবং দেখলে ওই রচনা আরো বেশি আস্বাদ্য হয়ে ওঠে। এ কথাও মনে করতে পারি, নাটকে অ্যারিস্টটলের মত অনুযায়ী ঘটনাগতির প্রাথমিকতার বদলে কোলরিজ্ ভাষার প্রাথমিকতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য মানতেই হবে, কোলরিজের এই তত্ত্ব অনেকটাই রোম্যান্টিক বিভ্রমের ফসল। আসলে নাটকে ঘটনাগতি ও ভাষার মধ্যে কে প্রথম তাই নিয়ে কোনো বিরোধ নেই। নাটকে তো ভাষা অকারণে জায়গা জোড়ে না, শূন্যে বিলম্বিতও নয়, ঘটনাগতির

সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েই তার স্থান ; আবার ভাষাই ঘটনার অগ্রগতি ও উন্মোচন ঘটায় —সেখানে ক্রিয়া ব্যতীত ভাষা নেই, ভাষা ব্যতীত ক্রিয়া নেই। এই প্রসঙ্গে *Feeling and Form* গ্রন্থে সুজান্ ল্যাঙ্গার যে প্রস্তাব দিয়েছেন তাই স্বীকার্য মনে হয়—নাট্যকার ভাষার শব্দবিন্যাসের দ্বারা নাটকের ঘটনাতরঙ্গে পরিণামী মুহূর্তের দীর্ঘ পর্যায়কে বহু দূর পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করেন। ল্যাঙ্গারের এই মত অ্যারিস্টটল্ ও কোলরিজের মধ্যে যথার্থ সমন্বয় ঘটিয়েছে।

৪

যে সব নাটক বাস্তবের যথাযথ অনুকরণ করেছে বলে দাবি করে সেই সব নাটকও শিল্পের প্রয়োজনে স্বভাবের বিকার না ঘটিয়ে পারে না। মানবচৈতন্যের প্রয়োগে অভিজ্ঞতার জগৎকে রূপদানই শিল্প, সুতরাং চৈতন্যের ছোঁয়ায় এবং রূপদানের প্রয়োজনে স্থূল অভিজ্ঞতার পরিবর্তন না ঘটালে চলে না। তিনটে দেয়াল-ওয়ালা ঘর বাস্তব জগতে কোথায়ও নেই। নাটকের বাস্তবতার দাবির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ খুব পুরোনো ; অভিনয়কালীন দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে ঘটনাবর্তের যে ঘনত্ব যে তীব্রতা, স্থূল বাস্তববাদের বিচারে তাও অবাস্তব ; এমন কি পত্র-পাত্রীর মুখে নাটকে যে গদ্য বসানো হয়, কি প্রতীকী কি স্বভাবপন্থী নাটকে, সে গদ্যও আমাদের পরিচিত জগতের গদ্য নয়। আসলে অন্য সমস্ত শিল্পের মতো নাটকেও, সমস্ত নাটকেই **stylization** থাকে এবং বস্তুজগতের সত্তাকে শিল্পে প্রকাশ করতে গেলে **stylization**-ব্যতীত গতি নেই। ছন্দও তো ভাষাবিন্যাসের **stylization** ; তা হলে ছন্দোবদ্ধ ভাষাকে নাটকে সংলাপের বাহন রূপে ব্যবহার করায় আপত্তি করা চলে না।

বস্তুমরীচিকাকে ধরতেই যেখানে গদ্যের পটুতা, দ্বিতীয় ভুবনকে, বস্তুর নিহিত সত্তাকে ধরতে ছন্দঃস্পন্দনময় ভাষার ব্যবহার কেন জরুরি মনে হয়? হয়তো ছন্দের তাল লয় স্পন্দনের মধ্যে সেই গুহ্য কারণ নিহিত। নিয়মিত তালে স্বরতরঙ্গ নিক্ষেপ এবং নৃত্য মানুষের আদিতম শিল্প—তার কাজকর্ম আনন্দবেদনার সঙ্গে প্রথম দিন থেকে যুক্ত। এই নৃত্যের সঙ্গে নাটকের যোগ শুধু শব্দের ব্যুৎপত্তিগত নয়—প্রকৃত পক্ষে নৃত্যের মাধ্যম যেমন লাবণ্যময় রেখান্বিত পেশল মানুষের দেহ, তেমনি নাটকেও অনেক পরিমাণে অভিনেতা-অভিনেত্রীর দেহ মাধ্যমের কাজ করে। নির্বাক্ স্থির আলোকচিত্রে অভিনেতার দেহের অমর ভঙ্গিমা দেখে আমরা অভিভূত হয়ে উঠি অনেক সময়, একটি আশ্চর্য ভঙ্গিমার মধ্যে জীবনসংকটের জটিলতা বিস্ময়কর ভাবে পুঞ্জিভূত হয়ে ওঠে। প্রাচীন দেশের ব্যালে-র মধ্যে যে নৃত্য ও নাট্যলক্ষণের সমন্বয়

ঘটতে পেরেছে তার মূল কারণ বোধ হয় দুই শিল্পের উৎস একই। নাটকের সঙ্গে নৃত্যের মাধ্যমগত যোগ আছে। নৃত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য নর্তকের ভঙ্গিমা ও তার পদনিক্ষেপের তাল। নাটকের মধ্যে ভঙ্গিমা যোগায় অভিনয়কালে সুশিক্ষিত সুপরিচালিত অভিনেতা, আর সেই ভঙ্গিমাকে সংলাপের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারে কাব্যনাট্য-রচয়িতার ছন্দোময় কাব্যভাষা। দেহস্পন্দনের ভিত্তি হিসাবে সেই ভাষা-সম্পদের নক্‌শা রচনা করতে গদ্যনাটক অক্ষম। দ্বিতীয়ত, ছন্দের সঙ্গে কণ্ঠস্বরের যোগ আমাদের দেহপ্রকৃতির মূল পর্যন্ত প্রসারিত এবং কণ্ঠস্বরের সঙ্গে দেহপ্রকৃতির প্রতিটি তন্তু থেকে জাত বিচিত্র অনুভূতিপুঞ্জের যোগ নিবিড় ও মৌলিক। অভিনীত নাটকে সংলাপ মুদ্রিত অবস্থায় থাকে না, কণ্ঠস্বরে উচ্চারণের মাধ্যমে জীবন্ত হয়। অথচ গদ্য মানুষের কণ্ঠস্বরের বিচিত্র প্রকাশের অপরিমিত সম্ভাবনাকে পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে পারে না। নাটকের সংলাপে ছন্দোবদ্ধ ভাষা ব্যবহার হলেই স্বরযন্ত্রের সমস্ত সম্ভাবনা উদ্ঘাটন করা সম্ভব। কাব্যনাট্যের ছন্দোময় ভাষা তাই শুধু আমাদের মনন ও মনীষার জগতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না, স্বরযন্ত্রের পরিপূর্ণ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সে সাড়া জাগায় আমাদের শারীরস্তরের মধ্যেও।

গদ্যভাষা মূলত অর্থের গণ্ডিতে বাঁধা বলে, সেই ভাষা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক স্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে, তাতে প্রকাশ করা যায় মোটের উপর এই স্থূল বস্তুজগৎকেই। সংগীতের মাত্রা যুক্ত হলে তবেই ভাষা উঠতে পারে মহত্তর স্তরে, প্রবেশ করতে পারে গভীরে। কাব্যনাট্যের ছন্দোবদ্ধ ভাষার মধ্যেই আছে সংগীতের সেই অতিরিক্ত মাত্রা—তাই কাব্যনাট্য যদি ধরতে যায় অন্তর্গূঢ় সত্যকে, বস্তুর নিহিত সত্তাকে, যদি আমাদের দৃষ্টিকে নিয়ে যেতে যায় সত্যোপলব্ধির মহত্তর স্তরে, তবে কাব্যনাট্যের ভাষা সংগীতময় তথা ছন্দোময় হতে বাধ্য। শব্দের অর্থ ও ধ্বনির যৌথ ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে যে কাব্যসংগীত জন্ম নেয়, সেই সংগীতই নিয়ে যেতে পারে আমাদের বাস্তব বৃত্তের বাইরে, সত্যের কাছাকাছি। বস্তুর জগৎ আর নিহিত সত্যের পৃথিবী—এই দুই আপাতপৃথক্ জগতের মধ্যে টংকৃত ছন্দোময় ভাষা সার্কাসের টান-টান তারের মতো সংযোগ রচনা করে। কাব্যোপলব্ধি অবলীলায় সার্কাস-নটীর মতো দুই জগতের মধ্যে পারাপার করতে পারে। তার মহত্তর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে কাব্যসংগীত চাই, তাই কাব্যনাট্যের ভাষা হবে ছন্দোময় স্পন্দিত। *The Confidential Clerk* নাটকে কোল্ বি-র সংগীত সম্বন্ধে একবার লুকাস্টা বলেছে—

> When I see it as a means of contact with the world
> More real than I've ever lived in.

সংগীত সেই অতিবাস্তব জগতের দ্যোতনা রচনা করতে পারে। তাই সংগীতের

লক্ষণাক্রান্ত কাব্যনাট্যের ছন্দোময় ভাষায় ধরা পড়ে বাস্তবের চেয়ে বড় সত্যের জগৎ।

এই সব কারণে, যে নাটক আপতিক-সাময়িক ও তুচ্ছ তথ্যের পুঞ্জে খুশি হতে চায় না, যে নাটক ধরতে চায় উচ্চতম উপলব্ধি স্থিরতম ভাষায়, তাকে ছন্দের মুখাপেক্ষী না হয়ে উপায় নেই। আরো দু-একটা কারণের ইশারা দেওয়া চলে। নাটক গদ্যে লেখা হলে তার ভাষাপরিধি সংকুচিত হতে বাধ্য—উপমা রূপক এই সব অলঙ্কার তাতে বেমানান লাগে, অনেক শব্দই গদ্যরীতির সঙ্গে খাপ খায় না। ছন্দোময় ভাষা কিন্তু কথ্যবাক্‌ভঙ্গিমার স্পন্দনে স্পন্দিত হয়েও আত্মসাৎ করে নিতে পারে সব রকম অলঙ্কার, সব রকমের শব্দ। ছন্দোময় সংলাপ তার মাধ্যম বলেই কাব্যনাট্যের ভাষাব্যবহারের দিগন্ত অনেক প্রসারিত। তা ছাড়া ছন্দের এমন কোনো রহস্য আছে, যাতে ছন্দোময় উক্তি আমাদের মনে প্রত্যয় জন্মায়। যে কথা গদ্যে বললে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না, অবান্তর বাক্‌বিস্তার বলে উপেক্ষণীয় মনে হয়, সেই কথাকেই ছন্দের স্পন্দনে দুলিয়ে দিলে তা সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। এই প্রত্যয় জন্মানোর গভীর রহস্যময় ক্ষমতায় কাব্যনাট্য অংশী হয়ে উঠতে পারে তখনই, যখন কাব্যনাট্য রচিত হয় ছন্দোবদ্ধ ভাষায়।

৫

মহাকাব্য ছন্দে লেখা, গীতিকবিতাও ছন্দে লেখা, কাব্যনাট্যও তাই। কিন্তু কাব্যনাট্যের ছন্দোবদ্ধ ভাষার সঙ্গে অন্য শ্রেণীর কাব্যের ছন্দোবদ্ধ ভাষার মৌলিক পার্থক্য কোথায়? একটা বড় পার্থক্য কালের। মহাকাব্যের কাল চির-অতীত, গীতিকবিতার কাল চির-বর্তমান। কিন্তু কাব্যনাট্যের কাল অন্য জাতের বর্তমান, যে বর্তমান ঘটমান, প্রতি পলে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে। গীতিকবিতা-মহাকাব্যের সঙ্গে কাব্যনাট্যের ভাষাগত পার্থক্যের কারণ শব্দবাক্যবিন্যাস-ইত্যাদিতে নেই, আছে কালগত এই স্বাতন্ত্র্যে। এলডার ওল্‌সন্‌ দেখিয়েছেন ভাষার ব্যবহার দুই রকম—'speech as *meaning*' এবং 'speech as *action*'। কাব্যনাট্যের ভাষা হবে দ্বিতীয় ধরনের। অন্য শ্রেণীভুক্ত কাব্যের ভাষার সঙ্গে কাব্যনাট্যের ভাষার এই দ্বিতীয় পার্থক্য—এই ভাষা হবে ক্রিয়ার বাহন, কর্মিষ্ঠ, গতিশীল। নাটকের ক্রিয়াবান্‌ ভাষা আর অভিনেতার সঙ্গত ভঙ্গিমা দুইয়ে মিলে সেই সক্রিয়তা পূর্ণতা পাবে।

কাব্যনাট্যে ব্যবহৃত ছন্দোবদ্ধ ভাষা তখনই সব চেয়ে নাটকীয় যখন নাটকের আভ্যন্তরীণ সংগঠনের সঙ্গে সে একাত্ম, নাটকীয় প্রয়োজন থেকে যখন তার উৎপত্তি।

কিন্তু সফল গীতিকবিরা যখন কাব্যনাট্য লেখায় হাত দেন তখন ভাষার ধর্মের এই পার্থক্যের কথা সব সময় খেয়ালে রাখেন না। ভুলে যান, নাটকের অনিবার্য তাগিদের বাহিরে যা কিছু, তা যতই কবিত্বময় হোক না কেন, নাটকে তার জায়গা নেই। নিজেদের স্বভাব বিসর্জন দেওয়া সহজ নয় বলেই গীতিকবিরা নাটকীয় উপযোগিতার শর্ত পালন করতে ভুলে যান। কাব্যময়তার দিকে সমস্ত মনোযোগ গিয়ে পড়ে বলে, তাঁদের রচিত কাব্যনাট্য নাটকীয়তার অভাবে খাঁটি কবিত্ব থেকেও বঞ্চিত হয়। কেন না কাব্যনাট্যে নাটকীয়তার মধ্যেই কবিত্ব। গীতিকবির এই ব্যর্থতার প্রমাণ শেলির *The Cenci*। এই সব গীতিকবিরা ভুলে যান কবিতাকে সংলাপের মধ্য দিয়ে নাটকাকারে সাজিয়ে দিলেই তা কাব্যনাট্য হয়ে যায় না—তার মধ্যে থাকা দরকার অকৃত্রিম বহির্নাট্য বা অন্তর্নাট্য। কাব্যনাট্যের কাব্যত্ব তার নাটকীয়তার সঙ্গে একাত্ম, তাদের কোনো বিচ্ছিন্ন সত্তা নেই। কাব্যনাট্যের প্রতিটি বাক্যের উপযোগিতা বিচারের জন্যে একটি আইনের প্রস্তাব করেছেন এলিয়ট, 'dramatic relevance'এর আইন। একই ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে লেখা দুটো নাটক—টেনিসনের *Becket* আর এলিয়টের *Murder in the Cathedral*—প্রথমটিতে মানা হয় নি নাটকীয় প্রাসঙ্গিকতার এই জরুরি শর্ত। দ্বিতীয়টিতে মানা হয়েছে বলেই দ্বিতীয়টি সার্থক কাব্যনাট্য। নাটকীয় প্রাসঙ্গিকতার কষ্টিপাথরে যে পংক্তি উত্তীর্ণ হবে না, বিচ্ছিন্ন কবিতা হিসেবে তা যতই সুন্দর হোক না কেন, বিষুব অঞ্চলের অতিবৃষ্টিরৌদ্রজীবিত অরণ্যের মতো' তা নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহের গতিকে বাধা দিয়ে নাট্যবস্তুকে শিথিল করে দেয়। সেই সব পদাবলী কবিতা হিসেবে চমৎকার হয়তো, কিন্তু সেই পদাবলী নিজের দিকেই দর্শক-শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করে সমস্ত নাট্যপরিণামকে লক্ষ্যচ্যুত করে দেয়।

আসলে কাব্যনাট্যের কবিতা আবৃত্তির কবিতা নয়, সেখানে কবিতাই মুখের কথা। অভিনয়কালে আবৃত্তির মতো করে পংক্তিগুলি উচ্চারণ করা হবে না, নাটকীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী মুখের কথার মতোই বলা হবে। এই প্রসঙ্গে *The Cocktail Party* নাটকে এলিয়ট নিজের সঙ্গে নিজে যে গোপন রসিকতাটি করেছেন তার কথা মনে পড়ে। রীলি এক জায়গায় বলেছে,—'Do you mind if I quote poetry, Mrs. Chamberlayne ?' উত্তরে জুলিয়া বলে, 'Oh no, I should love to hear you speaking poetry'. এই 'quoting poetry' এবং 'speaking poetry'র মধ্যে যে প্রভেদ গীতিকবিতা-কাব্যনাট্যের ভাষার মধ্যেও সেই প্রভেদ। *The Cocktail Party*তে সিলিয়ার নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি—

For what happened is remembered like a dream

In which one is exalted by intensity of loving
In the spirit, a vibration of delight
Without desire, for desire is fulfilled
In the delight of loving. A state one does not know
When awake, But what or whom I loved
Or what in me was loving, I do not know.

প্রকৃত কাব্যনাট্যের ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। উল্লেখযোগ্য নিদর্শন—তার অন্তর্নিহিত কাব্যময়তার দরুণ, কথ্যভাষার সঙ্গে তার প্রকরণগত সহমর্মিতার ফলে, এবং সিলিয়ার প্রেমের ব্যর্থতা, হতাশা, শূন্যতা, ও আত্মোৎসর্গের নাটকীয় সিদ্ধান্তের সঙ্গে এই সংলাপটি নৈতিক ভাবে যুক্ত বলে। এই সংলাপ নাটকীয়, কারণ বক্তার জীবন ও পরিস্থিতির সঙ্গে উক্তিটি সম্পৃক্ত বলে, শুধু কথার কথা নয় বলে।

এই সব কথা থেকে আর একটা জরুরি কথা বেরিয়ে আসে। মুদ্রিত পৃষ্ঠায় সাহিত্যিক সাফল্য ছাড়া আরো এক সাফল্য কাব্যনাট্যকে অর্জন করতে হয়। মঞ্চে অভিনয় ও প্রযোজনাগত সাফল্য। অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত কবিতার সঙ্গে কাব্যনাট্যের এই এক বড় পার্থক্য। প্রযোজকের হাতে কাব্যনাট্য হয় অভিনয়ের ব্লু-প্রিণ্ট। ইমারতের ব্লু-প্রিণ্ট যেমন ইস্পাতে-কংক্রিটে বাস্তব হয়ে ওঠে, তেমনি কাব্যনাট্যও রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় কাব্যনাট্যের সাহিত্যিক উৎকর্ষ সত্ত্বেও তা রঙ্গমঞ্চে সফল হতে পারে না। কাব্যনাট্যকারের পক্ষে এই বাধা অতিক্রম করা সহজ হয় যদি তিনি মঞ্চের ঐতিহ্য ও পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হন এবং নাট্যপরিচালকের সহযোগিতায় কাজ করার সুযোগ পান। থিয়েটারের অভিজ্ঞতা না থাকলে নাট্য ভেসে যেতে পারে কাব্যের স্রোতে। অথচ থিয়েটারের শিক্ষানবিশী দীর্ঘকালীন হলে মঞ্চের প্রয়োগপদ্ধতি যখন কাব্যনাট্যকারের দ্বিতীয় প্রকৃতিতে পরিণত হয় তখন তিনি নাটকের মধ্যে নাট্যরস বজায় রেখে কাব্যত্বকে অবাধ ব্যবহার করতে পারেন—কথ্যরীতির সীমার মধ্যে কাব্য ও নাটকের নিবিড়তম বিবাহ ঘটাতে পারেন। শেক্‌স্‌পীয়র *The Tempest*-প্রভৃতি শেষ পর্যায়ের নাটকে তার প্রমাণ দিয়েছেন।

গীতিকবিতায় সংক্ষিপ্তভাষণ, তির্যক্‌ভাষণের প্রয়োজনে, অন্তর্গূঢ় দীপ্তির দাবিতে যে কূটত্ব সৃষ্টি হয় তার বিরুদ্ধে আপত্তি করা চলে না। কারণ গীতিকবিতায় উপভোগ হয় ব্যক্তিগত নিভৃতিতে—মুদ্রিত পৃষ্ঠা থেকে একটা চরণ বা স্তবককে আমরা বারবার ফিরে ফিরে পড়তে পারি। কিন্তু নাটক সামাজিক শিল্প, আর রঙ্গমঞ্চে একটি কথা একবারই মাত্র আমরা শোনার সুযোগ পাই। সেই কারণে জটিলতম উপলব্ধিও কাব্যনাট্যে

ব্যঞ্জনাগুণের ক্ষতি না করে, যথাসম্ভব স্পষ্ট করে বলা দরকার, যাতে মনোযোগী দর্শক-শ্রোতার মনে তা সঙ্গত প্রতিক্রিয়া জাগাতে পারে। আর, একটি কবিতা তার পাঠকের জন্যে শতবর্ষকাল অপেক্ষা করতে পারে, কাব্যনাট্য পারে না ; বর্তমান যুগের মানুষের সামনে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তার সার্থকতা বিচার হয়। সমকালীন মানুষ—আর সেই মানুষের মনে শিক্ষাদীক্ষার কত তারতম্য থাকে। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রও মাটিতে-আসীন দর্শকমণ্ডলীকে তো উপেক্ষা করেন নি। নানা শ্রেণীর দর্শকে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগারে জমাট নাটকের মধ্য দিয়েই কাব্যনাট্য শ্রোতা-দর্শকের অজ্ঞাতসারে তুলে ধরে জীবনের এক জটিল মহৎ স্পন্দময় চিত্র।

৬

মধুসূদনে পূর্বপ্রস্তুতির প্রমাণ আছে। 'বীরাঙ্গনা' পড়লে মনে হয় তিনিই হতে পারতেন প্রথম কাব্যনাট্যকার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'ই বোধ হয় বাঙলায় প্রথম খাঁটি কাব্যনাট্য। ভাষা ও অন্তঃপ্রকৃতি দুই দিক থেকেই। এই নাটকে বস্তুজগতের দর্পণ রচিত হয় নি, এখানে নাট্যকার ধরতে চেষ্টা করেছেন একটি সত্যের স্বরূপকে। মানতেই হবে, নাট্যভাষার সন্ধানে এখানে রবীন্দ্রনাথ সার্থক হন নি পুরোপুরি। তবু প্রকৃতিপন্থী নাটক থেকে তিনি সরে গিয়েছিলেন 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকেই। পরে তিনি লিখলেন শেক্‌স্‌পীয়রীয় প্রথানুকরণে 'রাজা ও রানী' এবং 'বিসর্জন'। এই দুটি নাটক যে পদ্যনাটক তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু কাব্যনাট্য তাদের বলা চলে কি না এই নিয়ে বিতর্কের সুযোগ আছে। যদিও তাদের মধ্যে বহির্ঘটনার প্রবলতা আছে, বহুশাখান্বিত বৈচিত্র্যে অনেক সময় দুর্লক্ষ্য হয় নিহিত সত্যটি, তবু বস্তুর অনুকরণকে অতিক্রম করে দুটি নাটকেরই নির্দেশ ভিতরের দিকে। পরে তিনি ঘটনার চাপ ও চরিত্রের বহুলতা কমিয়ে এনে সত্যোপলব্ধিকে দিতে চেয়েছিলেন কেন্দ্রস্থ মহিমা, যেমন 'মালিনী'র মতো পদ্যনাট্যে ও 'শারদোৎসব' 'মুক্তধারা'-ইত্যাদি গদ্যনাট্যে। সত্যের সন্ধানে বিশেষ করে তিনি গদ্যনাট্যেই বেশি আস্থাশীল এই সময়। নাট্যাদর্শ তিনি নিলেন দেশীয় ঐতিহ্য থেকে, সেই ঐতিহ্যকে রবীন্দ্রনাথ করে তুললেন আধুনিক। পেয়ে গেলাম বিবেকের মতো ঠাকুরদাকে, উঠে এল বাউলবৈরাগী ভ্রাম্যমান্‌ গায়কের দল, পথিকেরা চলে এল বাঙলাদেশের পথপ্রান্তর থেকে, মঞ্চ হয়ে এল আসবাববিরল, প্রতীকী এবং পটহীন, আর পথ হল পটভূমি। কোনো কোনো সময় এই সব নাটকের গদ্য 'ডাকঘর'এর মতো গদ্য-লিরিকের স্তরে উন্নীত হল বটে, কিন্তু বেশির ভাগ সময় তার মধ্যে পেলাম গদ্যের কবিতা, যাকে ঠিক

গদ্যকবিতা বলা চলে না। তাই 'ডাকঘর'কে বাদ দিলে এই সব গদ্যনাটককে ঠিক কাব্যনাটক বলা উচিত হবে না। কেউ-কেউ বলতে চান রবীন্দ্রনাথের সুরবিবর্জিত নৃত্যনাট্যের কথাবস্তুকে মুক্তছন্দে লেখা কাব্যনাট্য বলে বিবেচনা করা চলে।

রবীন্দ্রনাথের সমকালে গিরিশচন্দ্র ঘোষ গৈরিশ ছন্দে পৌরাণিক নাটক লিখেছিলেন অনেক। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রবহমান পয়ারে লিখেছিলেন 'সীতা' আর অমিত্রাক্ষরে লিখেছিলেন 'পাষাণী' আর 'তারাবাঈ'। সন্দেহ কি এই সব নাটক পদ্যনাটক। কিন্তু কাব্যনাট্য তাদের বলা চলে না—কারণ ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে ধরা পড়ে নি সেই প্রতীকী ব্যঞ্জনা, বহির্ঘটনার চাপকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় নি ভিতরের দিকে। তাই আধুনিক কাব্যনাট্য রচনার যে প্রস্তুতি ও পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথে দেখি, দেখি কাব্যনাট্যের সমস্যা সম্বন্ধে যে গভীর সচেতনতা, তা গিরিশচন্দ্র বা দ্বিজেন্দ্রলালে নেই। রবীন্দ্রনাথের পরে অনেক দিন আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে। অপেক্ষার পরেও এই বিষয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিদর্শন আমরা পেলাম সেগুলি হয়তো রবীন্দ্রনাথের দ্বারা তত অনুপ্রাণিত নয়, যত বিদেশী পয়গম্বরদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। মনে পড়ছে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'প্রথম নায়ক'এর কথা, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'একলব্য' এবং রাম বসুর বিভিন্ন চেষ্টার কথা। একেবারে ইদানীং মোহিত চট্টোপাধ্যায় যে সব কিমিতিবাদী নাটক লিখেছেন সেগুলিকে ধরা যায় কাব্যনাট্য রচনার খণ্ডিত চেষ্টা হিসাবে। কিন্তু নীরেন্দ্রনাথ ও রাম বসুর রচনা বেশি কাব্যিক, নাটকের গুণে অনেকটা বঞ্চিত, অন্য দিকে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের রচনায় নাটকের গুণ অনেক বেশি হলেও, কাব্যের গুণ তাতে কম।

সম্প্রতি কালে বাঙলার কাব্যনাট্যের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ও সফল পরীক্ষা করেছেন বুদ্ধদেব বসু। তাঁর রচনা তন্নিষ্ঠভাবে বিবেচনা করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তিনি প্রতীচ্যের কাব্যনাট্যের পরীক্ষা বিষয়ে যেমন ওয়াকিবহাল ছিলেন, তেমনি সচেতন ছিলেন এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগ সম্বন্ধে। 'বাবু ও বিবি'র খণ্ডিত চেষ্টার ব্যতিক্রম, হিসেবে না নিলে, অবশ্য বলতেই হবে বুদ্ধদেব বসু কাব্যনাট্য তখনই লিখতে পেরেছেন যখন তাঁর প্রসঙ্গটি পৌরাণিক। সে দিক থেকে তাঁর সফল উদ্যম *Murder in the Cathedral*-স্তরেই রয়ে গেল। সমকালীন জীবন যেখানে এনেছেন, যেমন 'কলকাতার ইলেকট্রা'য়, সেখানে নাটক শুধু গদ্যে লেখা নয়, একেবারেই গদ্যনাটক। কিন্তু 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র গানগুলো বাদ দিলে, যদিও সেই নাটকের সংলাপ গদ্যেই লেখা তবু সেই স্পন্দমান গদ্য কবিতা হয়ে উঠেছে—গদ্যের কবিতা নয়, একেবারেই গদ্যকবিতা। যে কোনো অংশ বিশ্লেষণ করে দেখানো যেতে পারে এই গদ্য ছন্দোময় এবং স্পন্দিত। তা ছাড়া আগেই বলেছি কাব্যনাট্য ভাষানির্ভর, তার কবিতা ভাষার মধ্যে, 'non-verbal' কবিতা কাব্যনাট্যের কবিতা নয়। বুদ্ধদেব বসু নিজেও লিখেছেন 'তপস্বী ও

তরঙ্গিণী' বিষয়ে, 'এই নাটক বিশেষ ভাবে ভাষানির্ভর।' আর নাট্যকার যদিও লিখেছেন, 'লোকেরা যাকে কাম নাম দিয়ে নিন্দে করে থাকে তারই প্রভাবে দুজন মানুষ পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হল—নাটকটির মূল বিষয় হল এই…' তবু মনে হয় এই নাটক ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী দুজনেরই আত্মানুসন্ধানের নাটক। দুজনেই খুঁজছে সেই হারিয়ে ফেলা মুখ, যে মুখ তাদের স্বরূপ। এই ব্যাখ্যা যদি নির্ভুল হয় তা হলে এই নাটকও বহির্ঘটনার নাটক নয়, সত্তানুসন্ধানের নাটক—আর তাই যথার্থ কাব্যনাট্য। বুদ্ধদেব বসুর 'কালসন্ধ্যা'র সংলাপ একেবারেই পদ্যছন্দে লেখা—বিচিত্র ভাবানুযায়ী ছন্দে, বেশির ভাগই মুক্তছন্দে। এই নাটকও সমস্ত বহির্ঘটনার ভিতরে আসলে অর্জুনের আত্মপরিচয় লাভের নাটক। আর এই নাটকও ভাষানির্ভর—'একমাত্র অক্ষরেই নির্ধারিত এদের উদ্ধার।'

১৬

কবিতার সাময়িকী ও আধুনিকতা

সুবীর রায়চৌধুরী

এতদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল রবীন্দ্রনাথ-নজরুল প্রমুখ কয়েকজনকে বাদ দিলে সাময়িক পত্রে কবিতা ও পদ্যের প্রয়োজন প্রধানত পাদপূরণের জন্য। সম্পাদকেরা মোটামুটি এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, পত্রিকায় গল্প-উপন্যাস বা প্রবন্ধের চাহিদা আছে, কিন্তু কবিতা নেহাৎই অলংকরণের জন্য। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে 'কবিতা'র প্রকাশ এই 'বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত' করল। এটাই 'কবিতা'র একমাত্র কৃতিত্ব এমন কথা বল, আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে সাময়িকপত্রের পাঠকেরা এই প্রথম সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে, আদ্যোপান্ত কবিতায় ভর্তি কাগজ ছাপা হতে পারে।

আমি ভুলি নি ইতিপূর্বে তরুণদের প্রকাশিত 'কল্লোল', 'কালি-কলম' এবং 'পরিচয়'-পত্রিকায় কবিতা বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে ছাপা হত। এবং উক্ত পত্রিকায় কবিগণই পরবর্তী কালে 'কবিতা' প্রকাশ ও সাধারণ ভাবে আধুনিক কবিতা আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'কবিতা'র ঐতিহাসিক মর্যাদার সঙ্গে উক্ত পত্রিকাসমূহের তুলনা হতে পারে না। কেন না এর আগেও হয়তো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অনেক ভালো কবিতা ছাপা হয়েছে, বহু নতুন কবির আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু কবিতার পাঠক তৈরির কাজে এরা সবাই অল্প-বিস্তর ব্যর্থ। কবিতা যে রোমাঞ্চকর গল্প উপন্যাসের মতো এক নিশ্বাসে গলাধঃকরণের জন্য নয়, কবিতাপাঠের জন্য যে উপযুক্ত প্রয়াস ও প্রস্তুতি দরকার, এই চেতনা আগে ছিল না। 'কবিতা'-পত্রিকা যদি প্রকাশিত না হত তবে বাঙলা সাহিত্যের পাঠকসমাজ প্রেমেন্দ্র মিত্র-বুদ্ধদেব বসুকে চিনতেন, কেন না তাঁরা গল্প-উপন্যাসও লিখেছেন, কিন্তু জীবনানন্দ,[১] সুধীন্দ্রনাথ, সমর সেন, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী-প্রমুখ যাঁরা গল্প-উপন্যাস লেখেন নি, তাঁরা এই প্রতিষ্ঠা পেতেন কি না সন্দেহ। কেন না শুধু পদ্য লিখে (তা-ও দেশপ্রেমের নয়, অথবা আধুনিক গানও নয়) সাধারণের মনে স্থায়ী প্রভাব চিন্তা করা কিঞ্চিৎ দুরূহ।

প্রধানত এই উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে 'কবিতা' প্রথম প্রকাশিত হয়। এ জাতীয় পত্রিকা বাঙলায় প্রথম। সুতরাং কবি ও কবিতার অনুরাগীরা সঙ্গে-সঙ্গে একে

---

১ জীবনানন্দের মৃত্যুর পর তাঁর একটি উপন্যাস কোনো এক ত্রৈমাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়। "উপন্যাসের উপক্রমণিকা" নামে সুধীন্দ্রনাথের একটি খসড়া 'বৈশাখী'তে বেরিয়েছিল। বলা বাহুল্য এই অর্ধমনস্ক রচনার ভিত্তিতে তাঁদের ঔপন্যাসিক বলা চলে না। কেন না উপন্যাসকে তাঁরা কোনোদিনই ভাবপ্রকাশের মাধ্যম করেন নি।

অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। আধুনিক কবিতার পাঠক তৈরির ব্যাপারে এই পত্রিকার কৃতিত্ব অনেকখানি। বুদ্ধদেব বসুর বীরবলী ভাষায়, 'এটি কখনো মন জোগাতে চায় নি, মনকে জাগাতে চেয়েছিল।'

কিন্তু আন্দোলন বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ কোনো বিশেষ আদর্শের প্রচার বা প্রতিষ্ঠার জন্য গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে প্রচার, সে রকম কোনো লক্ষ্য 'কবিতা'র ছিল না। আদর্শ অর্থে শুধু রাজনৈতিক নয়, শিল্প-সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক যে কোনো মতবাদে এর কোনো গোঁড়ামি নেই। মোটামুটি ভাবে সে যুগে যাঁরা সমসাময়িক ছিলেন তাঁরাই আধুনিক রূপে 'কবিতা'য় অভ্যর্থিত হয়েছিলেন। নিশিকান্ত থেকে বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ থেকে জীবনানন্দ, সমর সেন থেকে অজিত দত্ত প্রভৃতি নানা বিচিত্র ব্যক্তিত্বের সমাহার ঘটেছিল কবিতায়। পরবর্তী কালে সাম্যবাদী কবি নামে খ্যাত, এ রকম একাধিক কবি 'কবিতা'র নিয়মিত লেখক ছিলেন, উক্ত পত্রিকায় সম্পাদকের আত্যন্তিক সাম্যবাদ-বিরোধিতা সত্ত্বেও। 'কবিতা'র পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিক মর্যাদা তখন সম্পাদক বা কবিগণ কেউ ভাবতেও পারেন নি। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর দুটি প্রবন্ধ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করব :

> শ্রদ্ধার সঙ্গে কবিতা ছাপা হবে—নামজাদা বা অনামজাদা যার লেখাই হোক না—প্রসাধনেও বৈশিষ্ট্য থাকবে—এই পত্রিকাপ্রকাশের মূল উদ্দেশ্য এইটুকুর বেশি আমার ছিল না। কিন্তু রচনাকালীন উপন্যাসের মতো, 'কবিতা' সেই প্রাথমিক পরিকল্পনা অতিক্রম ক'রে নিজে-নিজেই বেড়ে উঠলো। আজ পর্যন্ত তার প্রায় দুই দশকের ক্রিয়া-কলাপ কেউ কেউ অবগত আছেন। কবিতা—বিশেষত বাংলা ভাষার আধুনিক কবিতা—এই বিষয়টার একটি একান্ত রঙ্গমঞ্চ গড়ে উঠলো যেন—রচনায়, আলোচনায়, কোনো-এক সময়ে সংলগ্ন 'এক পয়সায় একটি'-গ্রন্থমালায়। সাহিত্যের অন্যান্য অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে শুধুমাত্র কবিতার উপর এই জোর দেবার প্রয়োজন ছিলো, নয়তো সেই উঁচু জায়গাটি পাওয়া যেতো না, যেখান থেকে উপেক্ষিত কাব্যকলা লোক-চক্ষের গোচর হ'তে পারে। 'কবিতা' যখন যাত্রা করেছিলো, সেই সময়কার সঙ্গে আজকের দিনের তুলনা করলে এ-কথা মানতেই হয় যে কবিতা নামক একটা পদার্থের অস্তিত্ব বিষয়ে পাঠকসমাজ অনেক বেশি সচেতন হয়েছেন, সম্পাদকেরাও একটু বেশি অবহিত—এমন কি সে এতোদূর জাতে উঠেছে যে কবিতা লিখে অর্থপ্রাপ্তিও আজকের দিনে কল্পনার অতীত হয়ে নেই।
>
> 'সাহিত্যপত্র'।

কবিতার জন্য পরিচ্ছন্ন আর নিভৃত একটু স্থান ক'রে দেবো, যাতে তাকে ক্রমপ্রকাশ্য

উপন্যাসের পদপ্রান্তে বসতে না হয়, কুণ্ঠিত হ'য়ে থাকতে না হয় রঙ-বেরঙের পসরার মধ্যে, অনেক বেশি গলার-জোর-ওলা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে—যাতে তারই জন্য নির্দিষ্ট লেখায় সধর্মীর সঙ্গে সসম্মানে পৌঁছতে পারে স্বল্পসংখ্যক সুনির্বাচিত পাঠকের কাছে—এইটুকু মাত্র ইচ্ছে করেছিলাম। 'সসম্মানে' এবং 'সুনির্বাচিত', এই বিশেষণ দুটি লক্ষণীয়: ···আমরা কবিতা নামক বিষয়টাকে জরুরি ব'লে মনে করি; মনে করি, ওতে সমগ্রভাবে মানবসভ্যতার অত্যন্ত কিছু এসে যায়—যদিও সেটা কেমন ক'রে ঘ'টে থাকে, 'পুনশ্চ' 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' বা 'চোরাবালি' নামক কাব্যগ্রন্থ লেখা না-হলে—যাকে আমরা 'দেশ' ব'লে থাকি সেই দৈনিকপত্র-পরিবেশিত জনগণের কোথায় কোন ক্ষতি হতো, সেটা বুঝিয়ে দেবার স্পর্ধা আমরা রাখি না। কিন্তু যেমন আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আমাদের দেহের অভ্যন্তরে অনেক যন্ত্র, অনেক গ্রন্থি নিরন্তর কাজ ক'রে যাচ্ছে, আমরা তা কখনো জানতে পারি না, কিন্তু কোথাও কোনো প্রক্রিয়া ক্ষুণ্ণ হলেই পীড়িত হ'য়ে পড়ি—সভ্যতার উপর কবিতার বা শিল্প-কলার প্রভাবও সেই রকম।

···আজ ভেবে দেখলে মনে হয়, 'কবিতা' আরম্ভ হয়েছিলো কবিতার পত্রিকা-রূপে নয়, কবিদের পত্রিকা-রূপে। অর্থাৎ, প্রতি সংখ্যায় কিছু কবিতা—এমনকি, কিছু ভালো কবিতা ছাপা হবে, আমাদের লক্ষ্য ঠিক এই রকম ছিলো না; সমকালীন সৎকাব্যের সমগ্র ধারাটিকে আমরা এর মধ্যে সংহত করতে চেয়েছিলাম।

সুতরাং কবিতার যাত্রা শুরু হয়েছিল আর-পাঁচটি লিট্ল্ ম্যাগাজিনের আদর্শে। কিন্তু সম্পাদকের ব্যক্তিত্বে ও প্রতিভায় ক্রমে ক্রমে একে কেন্দ্র করে বিরাট কবিগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। দুই দশকেরও বেশি রাজত্ব করবার পর 'কবিতা'র এমনই প্রভাব এবং প্রতিপত্তি তৈরি হয়েছিল যে এই পত্রিকায় স্থান না পেলে কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা প্রায় অসম্ভব ছিল। তিরিশের কোনো উল্লেখযোগ্য কবির নাম সহসা মনে করতে পারি না যিনি অন্তত একবার 'কবিতা'য় লেখেন নি। সমর সেন-প্রমুখ তো 'কবিতা'রই আবিষ্কার। চল্লিশের কবিদের মধ্যে শুধু একজনের নাম করা যায়, যাঁর কবি-প্রতিষ্ঠা 'কবিতা-নিরপেক্ষ। কিন্তু তিনিও অন্য নামে একবার 'কবিতা'য় লিখেছিলেন। মোটের ওপর চল্লিশের কবিদেরও প্রধান আশ্রয় ছিল 'কবিতা'—যিনি এই পত্রিকায় লেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন তাঁর কবিকর্ম স্বীকৃত, তিনি প্রতিষ্ঠিত। যুদ্ধের গোড়াতে 'কবিতা' শুধু পত্রিকাতে সীমাবদ্ধ রইল না, তার কার্যক্ষেত্র আরো বিস্তৃত হল। 'কবিতা'-গোষ্ঠীরই উদ্যোগে 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—রুচি এবং

আদর্শের দিক দিয়ে যাঁদের ব্যবধান মেরুপ্রমাণ। শুধু এক জায়গায় তাঁদের মিল ছিল, উভয়েই কবিতার অনুরাগী, যদিও সব সময় এক জাতের কবিতার নয়। তাঁরা উক্ত সংকলনে দুটো আলাদা ভূমিকায় স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে নানা যুক্তির অবতারণা করেছেন। তাঁদের মতামতের বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়, তবে তাঁরা এক বিষয়ে নিশ্চয়ই একমত ছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ আধুনিকদের মধ্যে প্রধান। এটা 'কবিতা'র সম্পাদকেরও ধারণা। এককালে রবীন্দ্র-বিরোধীদের পুরোধা বলে বুদ্ধদেব বসু নিন্দিত ছিলেন, কিন্তু 'কবিতা'-পত্রিকার ইতিহাসে এ জাতীয় বিরোধিতার কোনো নজির নেই। রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত কাব্যসংকলনের তিনি কঠোর সমালোচনা করেছিলেন, কিন্তু সে তো প্রধানত কবি-নির্বাচন প্রসঙ্গে, তাতে রবীন্দ্রনাথের কাব্য বা সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে কোনো অনাস্থা ছিল না। অন্যদিকে 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সম্পাদনের ভার সম্পূর্ণ ভিন্ন মতাদর্শের দুইজনের ওপর ন্যস্ত হওয়াতে সমগ্র ভাবে 'কবিতা'র আদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে।

অবশ্য এটা ঠিকই এই ঔদার্যের আহ্বান সত্ত্বেও বিচ্ছেদ ঘটেছে। শুরুতে যাঁরা ছিলেন, শেষ পর্যন্ত অনেকেই দূরে সরে গেছেন। এমন অনেক কবি আছেন 'কবিতা'র আদিযুগে নিয়মিত লেখক ছিলেন, এখনও কবিতা লিখছেন, কিন্তু ইদানীংকালের 'কবিতা'য় অনুপস্থিত। অবশ্য যে কোনো পত্রিকার ক্ষেত্রে এ-জাতীয় দু-একটি ঘটনা অপরিহার্য, তার দ্বারা মনের সজীবতাই প্রকাশ পায়। মোটের ওপর গদ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে 'বঙ্গদর্শন' বা 'সবুজপত্রে'র মতো আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে 'কবিতা'র অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

'কবিতা'র আবির্ভাবের পর এক দশক পর্যন্ত এই পত্রিকায় অধিনায়কত্ব অবিসংবাদিত ছিল। জ্যেষ্ঠ কবিরা তো বটেই তরুণ কবিরাও এই নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে 'চতুরঙ্গ', 'পূর্বাশা'-প্রভৃতি নতুন অথচ অভিজাত পাঁচমিশেলি পত্রিকাগুলিতেও কবিতা বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে ছাপা হতে লাগল। এটা লক্ষ্য করবার মতো উক্ত পত্রিকাগুলির সম্পাদকেরা সবাই কবি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত 'কবিতা' অদ্বিতীয় ছিল। কিন্তু তারপর থেকে তরুণ কবি সম্পাদিত দু-একটি কবিতাপত্রিকার আবির্ভাব ঘটে। এর মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব বসুর 'একক' এবং মণীন্দ্র রায় ও মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সীমান্তে'র নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য। শুদ্ধসত্ত্ব বসু নিষ্ঠার সঙ্গে কখনো নিয়মিত, কখনো অনিয়মিত ভাবে 'একক'-পত্রিকা দীর্ঘকাল ধরে প্রকাশ করেছিলেন, যদিও পত্রিকাটির অপরিহার্যতা কোনোদিনই পাঠক-সাধারণের কাছে স্পষ্ট হয়নি। সম্পাদনায় যে স্বাতন্ত্র্য পত্রিকাকে মর্যাদা দেয় 'এককে'র তা ছিল না। নতুন কবি আবিষ্কারেও সে অপ্রয়াসী। 'কবিতা'র

অনন্য ভূমিকার কথা আমরা যদি ভুলেও যাই তবু ভুলতে পারব না 'কবিতা'র জন্মের সঙ্গে সমর সেনের কবি হিসেবে উপস্থিতি জড়িত, 'কবিতা'র প্রেরণা না থাকলে অন্নদাশঙ্করের ছড়াগুলো হয়তো আদৌ লিখিত হত না। আধুনিক বাঙলা কবিতার অধিকাংশ আনুষ্ঠানিক কবিতাগুলিই যে 'কবিতা'-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। এটা 'কবিতা'-সম্পাদনায় সাফল্যের প্রধান নিদর্শন। নিরপেক্ষ 'একক'-এর তুলনায় 'সীমান্তে'র প্রচেষ্টা অনেক সংহত হলেও এটিও স্থায়ী হয় নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে এ পর্যন্ত প্রকাশিত কবিতা-পত্রিকার সংখ্যা অন্তত কুড়ি। অধিকাংশ পত্রিকাগুলিই অতি ক্ষণস্থায়ী, বিশেষত্বহীন এবং হাত-পাকানো কাঁচা লেখায় ভর্তি। এদের মধ্যে কয়েকটি সামান্য লক্ষণ আছে, যেমন, এর সম্পাদকেরা সবাই কাব্যচর্চা করে থাকেন; দ্বিতীয়ত, এগুলি অতি স্বল্পায়ু। কিন্তু এই ওষধি পত্রিকগুলিরও একটা প্রভাব আছে। এর ফলে কবিদের আবির্ভাব একান্ত ভাবেই সাময়িকপত্র-নির্ভর হয়ে উঠেছে। সাময়িকপত্রিকাকে আশ্রয় না করলে কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ অতি কঠিন কাজ। এর আপাত ভাবে দুটো কারণ নির্দেশ করা যায়। প্রথমত, এখনও পযন্ত কবিতার প্রধান পাঠক কবিরা। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থ কবিদের নিজ ব্যয়ে প্রকাশিত হয়। সুতরাং এই মুদ্রণকার্য থেকে বিজ্ঞাপনের যাবতীয় দায়িত্ব নির্বাহের জন্য একটি সংগঠনের প্রয়োজন। 'কবিতা'র 'এক পয়সায় একটি'-সিরিজ ছাড়াও পঞ্চাশের কবিতা-পত্রিকাগুলির প্রায় সবারই নিজস্ব প্রকাশভবন রয়েছে, যেমন, শতভিষা, কৃত্তিবাস, পূর্বমেঘ, কবিপত্র-ইত্যাদি।

আধুনিক কবিতা আন্দোলনে সাময়িকপত্রের ভূমিকা হল এই। আপনি সাম্যবাদী কবিতাই লিখুন অথবা ফিউচারিস্ট কবিতা লিখুন, একই পত্রিকায় পাশাপাশি ছাপা হতে বাধা নেই। 'কৃত্তিবাস'-পত্রিকার কর্ণধারদের কারো-কারো বীটবংশের প্রতি আত্যন্তিক আগ্রহ সত্ত্বেও তাঁরা একই সঙ্গে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী শঙ্খ ঘোষ-প্রমুখের কবিতাও প্রকাশ করেন। উক্ত পত্রিকার একদা অন্যতম সম্পাদক এবং অধুনা ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'ক্ষুৎকাতর আন্দোলন'এর প্রভাবও 'কৃত্তিবাস'কে সর্বাংশে উত্তেজিত করতে পারে নি।

প্রতি বছরই কিছু কিছু নতুন পত্রিকা বেরোয়, কিন্তু তাদের নতুনত্ব খুব কম। ১৩৬৭ সাল থেকে সুশীল রায়ের সম্পাদনায় 'ধ্রুপদী' প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকা-পরিকল্পনায় কিছুটা স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে। প্রথমত, এটি মাসিক পত্রিকা। কবিতার মাসিক পত্রিকা প্রকাশ খুবই দুঃসাহসিক ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, এর সম্পাদক উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন বলে বলতে পেরেছেন, 'এই শিল্পকাজে যাঁরা নিজেদের নিযুক্ত করেছেন—নবীন

প্রবীণ বা তরুণ—তাঁদের সকলের রচনা এই পত্রিকায় মুদ্রিত হবে।' প্রধানত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মেঘদূত'এর অনুবাদ 'ধ্রুপদী'তে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এই ভাবে সাময়িকীর ভিতর চিরায়ত প্রতিবিম্বিত হলেই সাময়িকতা যথার্থ আধুনিকতায় আত্মস্থ হয়।

এই কবিতাপত্রিকাগুলি বাদ দিয়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে দু একজনের কাব্য পড়ে আধুনিক কবিতা বিষয়ে কোনো ধারণা হওয়া মুশকিল। সে জন্য এই সাময়িকপত্রগুলির পাঠক-ক্রেতা যতই নগণ্য হোক, গুরুত্ব অনেকখানি। জনৈক বৈষয়িক-অর্থে বিচক্ষণ ব্যক্তির মতে, নিজের খরচে কবিতার বই বার করবার তবু একটা সার্থকতা আছে। কেন না কবিতার বই উপহার দেওয়াও একটা ফ্যাশন, তা ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে কৃতী হয়ে কবি-পরিচয় আরো গৌরব বাড়ায়, কিন্তু কবিতা-পত্রিকা প্রকাশ করা পণ্ডশ্রম মাত্র। হয়তো কথাটা অনেকেরই মনের কথা, তবে সারা দেশটা পুরোপুরি উপদেশবাদীতে ছেয়ে যায় নি বলে এখনও কিছু-কিছু বিশুদ্ধ কাব্যচর্চা সম্ভব হচ্ছে। সে কালের মত যে রকম দৈববাণীর মর্যাদা পেতে চলেছে তাতে সন্দেহ হয় ছন্দ-মেলাবার বাতিককে শেষ পর্যন্ত বিশেষ বয়েসের ব্যাধি নিদান দিয়ে স্নায়বিক চিকিৎসার পরামর্শ দেয়া হবে। কিন্তু 'সে দিন বিলম্বিত হউক।'

১৭

সংকলন অনুবাদ পর্যালোচনা কবিতাপত্র : নির্বাচিত পঞ্জী

নচিকেতা ভরদ্বাজ

[ব্যক্তিগত কাব্যগ্রন্থসমূহের বিবরণ নানা গ্রন্থে বহুল ভাবে সংকলিত হয়েছে এই বিবেচনায় বর্তমান পঞ্জী থেকে পরিহার করা হল। আধুনিক বাঙলা কবিতার সঞ্চয়নী বা সংকলন, আধুনিক কালের কবিতানুবাদকর্ম এবং আধুনিক কালের কবি ও কবিতাসম্বন্ধীয় আলোচনাগ্রন্থাদির যে তালিকা প্রকাশ করা হল তাও নিঃশেষ তালিকা নয়, অবিশেষজ্ঞ পাঠক সাধারণভাবে ব্যবহার করে সাহায্য পেতে পারেন সেই ভাবে মাত্র সম্পাদন করা হয়েছে। আধুনিক কবিতা বিষয়ক বিস্তারিত একটি পঞ্জী স্বতন্ত্র ও সুবৃহৎ গ্রন্থের বিষয়। আধুনিক কবিতাপত্রিকার একটি পঞ্জীও যথাসাধ্য তথ্যাগ্রহ করে পরিশেষে সংস্থান করা হয়েছে। সং।]